ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
জুন ২০১৬

গবেষক

মুহাম্মদ শামসুজ্জামান
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণা পত্র

আমি মুহাম্মদ শামসুজ্জামান এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা” শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব ও একক মৌলিক গবেষণাকর্ম। আমি এ গবেষণার পূর্ণ কিংবা অংশবিশেষ অন্য কোথাও প্রকাশ করিনি।

মুহাম্মদ শামসুজ্জামান
এম.ফিল. গবেষক
রেজি. নং: ১৯/২০১১-১২
সেশন: ২০১১-২০১২
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০
ফোন: +৮৮ ০২-৯৬৬১৯২০২-৭৩

Md. Ataur Rahman Biswas
Professor
Department of Islamic History and Culture
University of Dhaka
Dhaka-1000
Phone: +88 02-96619202-73
E-mail: ataurbiswas@gmail.com

Ref.................... Date.....................

প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের এম.ফিল গবেষক মুহাম্মদ শামসুজ্জামান কর্তৃক এম.ফিল ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত "ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা" শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং এটি একটি গবেষণালব্ধ মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতোপূর্বে কোথাও এবং কোন ভাষাতেই এই শিরোনামে এম.ফিল ডিগ্রির জন্য কোন গবেষণা সন্দর্ভ লিখা হয়নি। আমি এই গবেষণা অভিসন্দর্ভের চূড়ান্ত পাণ্ডুলিপিটি মনোযোগ সহকারে পড়েছি এবং এম.ফিল ডিগ্রি প্রদানের জন্য বিবেচনাযোগ্য বলে মনে করছি।

মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস
অধ্যাপক
ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

"ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা" নামক গবেষণা পত্র প্রণয়নে আমি বিশেষভাবে অত্র গবেষণা কর্মের তত্ত্বাবধায়ক এবং বিভাগীয় অধ্যাপক মোঃ আতাউর রহমান বিশ্বাস এর প্রতি কৃতজ্ঞ। তিনি এ গবেষণা কর্মটি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা, মূল্যবান উপদেশ দিয়েছেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার থেকে বিভিন্ন বই,পুস্তক ইস্যু করে দিয়ে সহযোগিতা করার পাশাপাশি অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগ স্বীকার করেছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বিভাগীয় অধ্যাপক ও কলা অনুষদের সম্মানীত ডীন ড. আখতারুজ্জামান এর প্রতি যিনি ২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত এম.ফিল পরীক্ষা কমিটির চেয়ারম্যান থাকা কালীন আমার বিলম্বে ফর্ম ফিলাপ করার পরেও অসুস্থতাজনিত বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আমাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন। যার কারণে গবেষণাকর্মের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সচল রাখতে সক্ষম হয়েছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অধ্যাপক এ.কে.এম ইদ্রিস এর প্রতি যিনি আমার মাস্টার্স পরীক্ষার রেজাল্ট প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই এম.ফিল প্রোগ্রামে ভর্তির জন্য উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এর প্রতি যিনি আমার গবেষণা কর্ম সম্পর্কে সার্বক্ষণিক খোঁজ খবর নেয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। এছাড়া বিভাগীয় সহকারী অধ্যাপক এ.কে.এম ইফতেখারুল ইসলাম সহ বিভাগীয় অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ, এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশের বিভাগীয় প্রধান ড. আমিরুল ইসলাম, প্রভাষক ড. মোঃ সাঈদ হোসেন, ফারজানা আক্তার, আহসান হাবীব, দেওবন্দ মাদ্রাসায় হাদীস বিভাগে বর্তমান অধ্যয়নরত মোঃ গোলাম মুক্তাদির, আব্দুল আযীয ও আব্দুল হামীদ এবং নয়াদিল্লীতে অবস্থানরত আমার বন্ধু কার্তিক দাস ও বাসুদেব দাস সহ দেশ বিদেশের পণ্ডিত ও শিক্ষাবিদদের নিকট থেকে যে সহযোগিতা পেয়েছি তা অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আমার পরম শ্রদ্ধেয় বাবা- মা, আমার একমাত্র ভাই, এবং ছোট বোন এর প্রতি যারা আমাকে বিভিন্ন ভাবে সহযোগিতার পাশাপাশি প্রতিকূল অবস্থায় গবেষণা কাজ চালিয়ে যাবার জন্য সাহস ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। তাসলিমা নাসরিন- আমার বন্ধু ও সহধর্মিনী যার সহযোগীতা ও অনুপ্রেরণাতেই নানা প্রতিকুলতার মধ্যেও গবেষণা কাজটি সুসম্পন্ন করতে পেরেছি। তাকে শুধু কৃতজ্ঞতা জানিয়েই শেষ করা যাবেনা, তার জন্য রইলো আমার শুভ কামনা। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টা কবুল করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের গৌরবময় ইতিহাসে দেওবন্দ মাদ্রাসার অবদান অনস্বীকার্য। ভারতের যেখানেই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে; মুসলমানদের ভূমিকা সেখানে রক্তিম আখরে সমুজ্জল হয়েছে। এর পেছনে কারণ ছিল, মুসলমানদের হাত থেকে ব্রিটিশদের ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার ইতিহাস ও এর পরবর্তী মুসলমানদের পীড়নকারী ব্রিটিশ নীতিসমূহ। মুসলমানরা সরকারের সাথে অসহযোগিতা করে শিক্ষা, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতিক প্রভৃতি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ে। এহেন পরিস্থিতিতে এটাই স্বাভাবিক যে, মুক্তি আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ মুসলমানদের ছাইচাপা ক্ষুব্ধ হৃদয়ের তুষানল হতেই উৎপন্ন হবে। এজন্য মুসলমানদের আকাঙ্খা ছিল ইংরেজদের কবল থেকে মাতৃভূমি ভারতকে মুক্ত করে ইসলামী সভ্যতার স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। সে আকাঙ্খা বাস্তবায়নের লক্ষেই মুসলমানরা শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও আব্দুল আযীযের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন সময় সশস্ত্রযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন যার নেতৃত্বের ভূমিকায় ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলেম সমাজ। কারণ দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ প্রথম থেকেই ইংরেজদের অনধিকার প্রবেশকারী বলে মনে করত। বস্তুতঃ দারুল উলূম দেওবন্দ তার শিক্ষার্থীদের মাঝে এক দিকে যেমন দ্বীনি ইলমের ক্ষেত্রে গভীর পান্ডিত্য সৃষ্টির প্রয়াস গ্রহণ করেছে তেমনি স্বদেশের স্বাধীনতার চেতনায় অনুপ্রাণিত করে দেওয়া হয়েছে প্রতিটি শিক্ষার্থীর অন্তরকে। যাতে সশস্ত্র জিহাদের সাথে সাথে তারা তাদের চারিত্রিক ও আদর্শিক চেতনার শাণিত তরবারিকে কাজে লাগিয়ে দ্বীনের হিফাযত করতে এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি থেকে স্বদেশের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয়। দারুল উলূম থেকে শিক্ষালাভকৃত উলামায়ে কেরামের মাঝে আমরা এরই বাস্তব প্রতিফলন দেখতে পাই।

প্রকৃত পক্ষে ১৮৫৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থতার প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই এ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এ প্রতিষ্ঠানের সার্বজনীনতা একথাই প্রমান করে যে, দ্বীনী তা’লীমের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ের সমন্বয় সাধন করে একটি সামগ্রিকতা সৃষ্টিই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের পরবর্তী কর্ম তৎপরতা দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়। দারুল উলুম দেওবন্দের সূত্রপাত যে দিন থেকে ছাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গণে ডালিম গাছের নিচ হতে শুরু হয়েছিল সেদিন থেকেই শুরু হয়েছে স্বাধীনতা আন্দোলনের আরেক নয়া অধ্যায়। পাঠদানের পাশাপাশি স্বাধীনতার দীক্ষাও চলতে থাকে। ফলে অল্পদিনেই এর সুনাম সুখ্যাতি ও আবেদন ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। দারুল উলুম দেওবন্দ যে ইসলামী ও সংগ্রামী উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেই অসামান্য উদ্যোগের প্রথম ফসল ছিলেন মাওলানা মাহমুদ হাসান যিনি পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ঐতিহাসিক ‘রেশমী রুমাল’ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। তিনি

তার দেশমুক্তির সংগ্রামী চেতনা তার ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করেন এবং তাঁর ছাত্রদের মধ্য হতেই পরবর্তীতে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের বহু নেতৃত্বের আবির্ভাব ঘটে যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন, শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী, মুফতী কিফায়েতুল্লাহ দেহলভী, মাওলানা শাব্বীর আহমেদ উসমানী প্রমুখ। তাদের ব্রিটিশ বিরোধী ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ও কর্মসূচীর মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়েছে ভারতের গৌরবোজ্জল স্বাধীনতা। একারণে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাদের সংগ্রামী অবদানকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে আসাই এই অভিসন্দর্ভের উদ্দেশ্য।

সূচীপত্র

ঘোষণা পত্র ii

প্রত্যয়ন পত্র iii

কৃতজ্ঞতা স্বীকার iii

সারসংক্ষেপ..iv

সূচীপত্র..vi

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১-৮

দ্বিতীয় অধ্যায়: ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও ক্রম-সম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি ৯-৩৩

২.১ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে আগমন ১০

২.২ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ ১৩

২.২.১ বিভিন্ন রাজকীয় ফরমান লাভ ও কোম্পানির কার্যক্রম ১৩

২.২.২ পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানির পরবর্তী তৎপরতা ১৭

২.২.৩ বক্সারের যুদ্ধ ও দিউয়ানী লাভ.. ২১

২.৩ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ক্রম-সম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি.. ২৫

২.৩.১ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট ২৭

২.৩.২ ১৭৮৪ সালের পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ২৯

২.৩.৩ কোম্পানির সনদ আইন ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৬........................ ৩০

২.৩.৪ ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট.. ৩৩

তৃতীয় অধ্যায়: ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতি ও মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া ৩৪-৭৩

৩.১ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলে গৃহীত মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ............ ৩৫

৩.১.১ বাণিজ্যনীতি ও এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব.. ৩৫

৩.১.২ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কোম্পানির অনুসৃত নীতি ৪০

৩.১.৩ ভূমিনীতি ও লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি.. ৪৬

৩.১.৪ শিক্ষানীতি ও মুসলমানদের উপর এর প্রভাব ৫২

৩.২ কোম্পানি সরকারের গৃহিত নীতির প্রতি মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া ৫৮

৩.২.১ মহীশূরের যুদ্ধ.. ৫৯

৩.২.২ ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০) ৬১

৩.২.৩ তিতুমীরের আন্দোলন.. ৬৩

৩.২.৪ ফরায়েজী আন্দোলন ৬৫

৩.২.৫ ওয়াহাবী আন্দোলন ৬৭

চতুর্থ অধ্যায়: ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ও ব্রিটিশ রাজের শাসন প্রকৃতি........ ৭৪-৯৪

৪.১ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ ৭৫
৪.২ বিদ্রোহের তীব্রতা.. ৭৭
৪.৩ ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম সম্পৃক্ততা ৮১
৪.৪ বিদ্রোহ পরবর্তী আলিমদের উপর নির্যাতন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব ও প্রতিক্রিয়া.. ৮৫
৪.৫ সিপাহী বিদ্রোহ নাকি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ৮৯
৪.৬ প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তী ব্রিটিশ রাজের ভারত শাসন নীতির প্রকৃতি................ ৯১

পঞ্চম অধ্যায়: দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও বিকাশ ৯৫-১২১

৫.১ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট ৯৬
৫.২ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য.. ১০৮
৫.৩ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা.. ১০৯
৫.৪ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী ১১৪
৫.৫ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে দেওবন্দ মাদ্রাসার অবদান ১১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা.. ১২২-২২৫

৬.১ দেওবন্দ আন্দোলন পরিচিতি ১২৩
৬.২ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের দারুল উলুম দেওবন্দে যোগদান ১২৪
৬.৩ মাওলানা মাহমুদ হাসানের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার অভ্যুদয়.............................. ১২৫
৬.৪ ভারতের রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব............................ ১২৬
৬.৫ সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি ও জমইয়াতুল আনসার গঠন পর্ব... ১২৯
৬.৫.১ জমইয়াতুল আনসার ও মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী.. ১৩০
৬.৫.২ জমইয়াতুল আনসারের সম্মেলন ও গৃহীত কর্মসূচী.. ১৩২
৬.৬ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কতৃক নাযারাতুল মা'আরিফ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা.................................. ১৩৫
৬.৭ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ... ১৩৭
৬.৮ বিপ্লবী মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশদের বিভক্তির প্রচেষ্টা.. ১৪০
৬.৯ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ ১৪১
৬.১০ বিভিন্ন দেশে বিশেষ মিশন প্রেরণ.. ১৪৩
৬.১১ ব্রিটিশ বিরোধী আন্তর্জাতিক মৈত্রী গঠন ১৪৪
৬.১২ কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর কূটনৈতিক তৎপরতা.. ১৪৬
৬.১৩ কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম.. ১৪৭
৬.১৪ শায়খুল হিন্দের হিজাজ গমন ও কুটনৈতিক তৎপরতা.. ১৪৯
৬.১৫ রেশমী রুমাল আন্দোলন ও এর ব্যর্থতা.. ১৫৪
৬.১৬ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা.. ১৬১
৬.১৭ শায়খুল হিন্দ এর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও ফতওয়া প্রদান........... ১৬২
৬.১৮ জামিয়া মিল্লিয়া স্থাপন কালে শায়খুল হিন্দের আহবান ১৬৮
৬.১৯ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে শায়খুল হিন্দের সভাপতিত্ব ও জাতির প্রতি আহবান... ১৬৯

৬.২০ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কর্তৃক কাবুলে কংগ্রেসের শাখা স্থাপন ১৭০
৬.২১ তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ভূমিকা ১৭১
৬.২২ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর তুরস্ক ভ্রমণ ও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা ১৭২
৬.২৩ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ভারতে প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ......................... ১৭৩
৬.২৪ দেওবন্দ আন্দোলনের নতুন কর্ণধার হুসাইন আহমদ মাদানী ও তার কার্যক্রম ১৭৫
৬.২৫ সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের প্রতিক্রিয়া ১৮৭
৬.২৬ আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেস ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের যৌথ অংশগ্রহণ......... ১৯১
৬.২৭ মুসলিম লীগের সাথে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের ঐক্যজোট গঠন.............................. ১৯৪
৬.২৮ মুসলিম লীগের পক্ষে শায়খুল ইসলামের নির্বাচনী প্রচারণা ১৯৬
৬.২৯ মুসলিম লীগ ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট.................................... ১৯৭
৬.৩০ নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন নিয়ে কংগ্রেস - মুসলিম লীগ সম্পর্ক ১৯৯
৬.৩১ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসেবে মাদানীর মনোনয়ন.................................. ২০১
৬.৩২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সবধরনের অসহযোগিতার নির্দেশ............................. ২০২
৬.৩৩ লাহোর প্রস্তাব ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের বিরোধীতা ২০৪
৬.৩৪ ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ২০৬
৬.৩৫ জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতে মাদানী ফর্মূলার প্রচার ২০৮
৬.৩৬ ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি ২০৯
৬.৩৭ সুভাস চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আযাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের উদ্যোগ.... ২১০
৬.৩৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা পেশ ও সিমলা অধিবেশন.. ২১১
৬.৩৯ ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের কঠোর সমলোচনা ২১২
৬.৪০ ভারত বিভক্তি প্রশ্নে ত্রিমুখী অবস্থান.. ২১৩
৬.৪১ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিপ্লবী আলিম ও স্বাধীনতাকামীদের সমন্বয়ে জোট গঠন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা... ২১৫
৬.৪২ জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম লীগের স্বার্থ হাসিল............................. ২১৬
৬.৪৩ পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে জমইয়াতে উলামায়ে ইসলামের প্রচারণা.................................. ২১৭
৬.৪৪ মুসলমানদের বিভক্তি রোধে শায়খুল ইসলাম মাদানীর আহবান................................... ২১৮
৬.৪৫ বিপ্লবী আলিমদের উপর মুসলিম লীগ পন্থীদের নির্যাতন.. ২২০
৬.৪৬ মন্ত্রী মিশন (কেবিনেট মিশন) পরিকল্পনা ও লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব ২২১
৬.৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্বাসনে দেওবন্দ আলিমদের ভূমিকা . ২২৩

সপ্তম অধ্যায়: ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন......... ২২৬-২৬২

৭.১ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য.. ২২৭
৭.১.১ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে মুসলমান ও আলিম সমাজ ২২৭
৭.১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার প্রয়াস.. ২২৮
৭.১.৩ সশস্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ২৩২
৭.১.৪ দেওবন্দ আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সম্পর্ক........................ ২৪৩
৭.১.৫ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন............................. ২৪৫
৭.১.৬ ইসলামী আকীদার পুনরুদ্ধার ২৪৮

৭.১.৭ বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ ২৪৯
৭.১.৮ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে দেয়া ২৪৯
৭.১.৯ দেওবন্দ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা ২৫০
৭.১.১০ উলামায়ে দেওবন্দের স্বদেশ প্রেম ২৫২
৭.১.১১ বিপ্লবী চেতনার কেন্দ্রস্থল ২৫৪
৭.১.১২ মুসলিম নেতৃত্ব ও রাজনীতির সূতিকাগার ২৫৫
৭.২ মূল্যায়ন ২৫৬

অষ্টম: অধ্যায় উপসংহার ২৬৩-২৭০

গ্রন্থপঞ্জি ২৭১-২৮৭

পরিশিষ্ট ২৮৮-২৯২

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা

১.১ ভূমিকা

দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ইতিহাস একটি অনুপ্রেরণাদায়ক ও তাৎপর্যপূর্ণ ইতিহাস। এই গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দেওবন্দী আলিমদের প্রচেষ্টা ও সংশ্লিষ্টতা কি ছিল তা পাঠক সমাজের নিকট তুলে ধরা। আর এ কারণেই অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে "ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা"। এই গবেষণায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন বলতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জনের আন্দোলনকে বুঝানো হয়েছে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন, সংগ্রামের ইতিহাস মূলত সংস্কারক, বিপ্লবী এবং বিদ্রোহীদের পরিচালনায় অগ্রগতি লাভ করেছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহর মত সংস্কারবাদীদের প্রচারিত জীবনধারা অনুসরণ করে জাতি পুনরুজ্জীবিত হয়েছিল এবং তাদের নিশ্চিত ভবিষ্যত সম্পর্কে অনুধাবন করতে পেরেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অবসানের লক্ষ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই দেশের বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হয়েছিল তবে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম মূলত উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সংগঠিত আকারে শুরু হয়েছিল। যদিও এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা দেশের প্রতিটি কোণায় কোণায় অবস্থান করছিল। তারা একক কোন ধর্ম বা গোষ্ঠীর ছিলেন না। তারা মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল এবং ধর্মের মানুষের মনের সংকীর্ণতাকে দূর করে সংগঠিত করেছিলেন।

তৎকালীন আলিম সমাজ কর্তৃক ভারতের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরত লড়াই ও উৎসর্গের দৃষ্টান্ত উপমহাদেশের মানব চেতনা উন্নয়ন এবং জাতীয়তাবোধ জাগ্রতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। আর এ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা তথা স্বাধীনতা লাভের আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা দেওবন্দী আলিমগণ। যাদের কেউ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন এবং আবার কেউ দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে অধ্যয়ন শেষে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু তাদের আন্দোলন সংগ্রামের ইতিহাস আজ জাতির নিকট অস্পষ্ট। আর দেওবন্দী আলিম সমাজের ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা ও ত্যাগ তিতিক্ষার ইতিহাস জাতির সামনে তুলে ধরার জন্যই আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। ভারতের জাতীয় সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেওবন্দী উলামাদের অংশ গ্রহণ। উলামাগণ শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণই করেননি বরং ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে মাতৃভূমির জন্য জীবন উৎসর্গও করেছিলেন। বিপ্লবী উলামাবৃন্দ* ব্রিটিশদের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে আনতে এবং তাদেরকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিলেন। পরবর্তীতে অন্যান্য রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তারা যে সাংগঠনিক, জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনা করেন তাতে ব্রিটিশরা পরিস্থিতির চাপে ভারতীয়দের কাছে

* আলিম একবচন এবং বহুবচনে উলামা, গবেষণাকর্মে ব্যাপক অর্থে উলামাবৃন্দ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

ক্ষমতা হস্তান্তর করতে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে অগণিত আলিম সমাজ অধ্যয়ন শেষে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অসাধারণ ভূমিকা রেখেছেন, তবে যে সকল দেওবন্দী আলিমগণ অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ সাংগঠনিক দক্ষতা বলে এই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছেন অত্র অভিসন্দর্ভে তাদের কর্মতৎপরতাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আর এ সকল আলিমদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন-

১. মাওলানা মাহমুদ হাসান যাকে শায়খুল হিন্দ উপাধি দেয়া হয়েছে।

২. মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী যাকে শায়খুল ইসলাম উপাধি দেয়া হয়েছে।

৩. মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী

এ তিনজন ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টা, ত্যাগ ও সাংগঠনিক দক্ষতার কারণেই উপমহাদেশে দেওবন্দ মাদ্রাসা কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা জাতীয়তাবাদ আন্দোলনে এক নতুন মাত্রা লাভ করেছে।

১.২ গবেষণা পদ্ধতি

এ গবেষণাকর্মে প্রায় সমানভাবে গুণবাচক উপাত্ত (Qualitative data) ও মাত্রিক উপাত্ত (Quantitative data) ব্যবহার করা হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক পদ্ধতির (Historical Method) মাধ্যমে গুরুত্বপর্ণ তথ্য উদঘাটন করা হয়েছে। বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে প্রায়োগিক পদ্ধতির (Empirical Method) যথাযথ কার্যকর প্রয়োগ করা হয়েছে। অতএব সবদিক বিবেচনা করে বলা যায় গবেষণাকর্মটিতে মিক্স মেথড (Mix Method) ব্যবহার করা হয়েছে। তবে গবেষণা কর্মটি বস্তুত পক্ষে বর্ণনামূলক।

তথ্যের উৎসসমূহ

বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রাথমিক ও সহায়ক দুই ধরনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের মধ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন, মাদ্রাসা কতৃক গঠিত বিভিন্ন কমিশন, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন লিফলেট, সমসাময়িক চিঠিপত্র, স্থাপত্য, সমসাময়িক বিভিন্ন প্লাকার্ড, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন সংক্রান্ত বিভিন্ন দলিল, সমসাময়িক বিভিন্ন সংবাদ পত্র ও সাময়িকী যা সরাসরি গবেষণাকর্মের সাথে সম্পৃক্ত ইত্যাদি। তাছাড়া বর্তমানে দেওবন্দ মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্র, গবেষক, অধ্যাপক এবং সেখানকার শিক্ষিত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার এর মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তবে গবেষণার প্রেক্ষাপট নিরূপন, তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণ, গবেষণা পদ্ধতির বিন্যাস এবং প্রাথমিক তথ্যের বিশ্লেষনের প্রয়োজনে সহায়ক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ, বিভিন্ন প্রকারের সাময়িকী, গবেষণা প্রতিবেদন, গবেষণা প্রবন্ধ, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, প্রাসঙ্গিক রচনাবলি, ইন্টারনেট ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য নেয়া হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধাবলী, গ্রন্থ, সমসাময়িক পত্র-পত্রিকা, ব্রিটিশ সরকার কতৃক প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য ও প্রতিবেদনসমূহ, বেসরকারীভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন তথ্য, প্রস্তাবিত গবেষণা বিষয়ক জার্নাল, সংশ্লিষ্ট তথ্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রভৃতি অধ্যয়নের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এছাড়া সরাসরি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী ঢাকা, বাংলাদেশ ন্যাশনাল আর্কাইভস, রাজশাহী আর্কাইভস, বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়াম লাইব্রেরী, রাজশাহী, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, কলকাতা কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার এবং দেওবন্দ মাদ্রাসা লাইব্রেরী, দারুল উলুম মঈনুল ইসলাম হাট হাজারী মাদ্রাসা লাইব্রেরী, ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী, থেকে তথ্য- উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণ

বর্তমান গবেষণাকর্মে প্রাথমিক সহায়ক উৎস থেকে পাঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে তথ্য-উপাত্ত নেয়া হয়েছে এবং পরবর্তীতে তুলনামূলক আলোচনা, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ও যুক্তিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণা পরিধি

এই গবেষণা কর্মে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে আগমন থেকে শুরু করে ক্ষমতালাভে তাদের পদক্ষেপ সমূহ কি ছিল এবং ভারতীয় উপমহাদেশে কোম্পানির ক্ষমতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করণের লক্ষে মুসলিম স্বার্থ বিরোধী যে সকল নীতি গ্রহণ করেছে এবং এ নীতির প্রতিক্রিয়ায় মুসলিম সমাজে যে সকল প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে সে সম্পর্কে আলোকপাত করার পাশাপাশি ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের (১৭৬৫-১৯৪৭) বিরুদ্ধে ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত দেওবন্দ মাদ্রাসা কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন সশস্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে একটি বিস্তারিত গবেষণা প্রয়াস চালানো হয়েছে।

গবেষণা সীমাবদ্ধতা

বর্তমান গবেষণাকর্মটি ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরোধিতায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। তবে এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করতে গিয়ে গবেষক বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার সম্মুখিন হয়েছে। যেহেতু এই গবেষণাকর্মটি সম্পন্ন করার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে, সেহেতু সময়ের সীমাবদ্ধতা থাকায় গবেষণাকর্মটি পরিপূর্ণ নাও হতে পারে। একইভাবে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রেও গবেষককে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া তথ্য অধিকার আইন ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব প্রাতিষ্ঠানিক আইনের কারণে সকল তথ্যই সংগ্রহ করা গবেষকের পক্ষে সম্ভবপর

হয়নি। সর্বোপরি অর্থের অপ্রতুলতা বর্তমানে যে কোন গবেষণা কর্মের জন্য একটি বড় প্রতিবন্ধকতা। তাছাড়া বর্তমান গবেষণা কর্ম পরিচালনার জন্য সরকারি, বেসরকারী বা স্বায়ত্ত্বশাসিত কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কোন প্রকার আর্থিক সহায়তা লাভ ছাড়াই গবেষককে তার গবেষণা কর্মকান্ড চালিয়ে যেতে হয়েছে। অতএব উপরোলিখিত প্রতিবন্ধকতা থাকা সত্ত্বেও গবেষক একটি বিশেষণাত্বক ও সত্য নির্ভর সিদ্ধান্তে উপনীত হবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে।

১.৩ অধ্যায় বিন্যাস

অত্র অভিসন্দর্ভটি উপরের প্রস্তাবনার আলোকে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিন্যাস করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও তাদের ক্রমসম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমানরা প্রায় সাতশত বছর (১২০৪-১৮৫৭) উপমহাদেশ শাসন করে। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় শক্তি সমূহ নৌ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে আরব তথা মুসলিম নৌ শক্তিকে পর্যুদস্ত করে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। বণিকবেশী বিভিন্ন ইউরোপীয় নৌ শক্তির মধ্যে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রথমে কেবল বাণিজ্যের জন্য আগমণ করেছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তৎকালীন উপমহাদেশের মুসলিম শক্তি তথা মুঘল সরকারের বিভিন্ন দুর্বলতার সুযোগে অত্যন্ত কৌশলে এদেশের সর্বময় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। আর তাদের এ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার প্রথম ধাপ ছিল ১৭৫৭ সালের পলাশীর ট্রাজেডি। পলাশী যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার পরাজয়ের পশ্চাতে মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা দায়ী থাকলেও সে সময়ের প্রভাবশালী হিন্দু নেতৃবর্গ তথা জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজা রাজবল্লভ, রায় দুর্লভ এর ষড়যন্ত্র কোন অংশেই কম ছিলনা। কোম্পানির ক্ষমতা লাভের দ্বিতীয় পর্যায় ছিল ১৭৬০ সালে মীর কাশিমের সাথে গোপন চুক্তি এবং চূড়ান্ত পর্যায় হল বক্সার যুদ্ধ (১৭৬৪) পরবর্তী ১৭৬৫ সালে দিউয়ানী লাভ।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতি ও মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। পলাশীর প্রতারণামূলক যুদ্ধে বাংলার নবাবকে পরাজীত করে কোম্পানির শাসকবর্গের কূটবুদ্ধি, ন্যায়নীতি বিবর্জিত সকল কলাকৌশল এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একশ্রেণীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগিতা এবং বিভিন্ন ধরনের শোষণমূলক রাজস্ব নীতি ও নির্যাতনের মাধ্যমে প্রচুর ধন-সম্পদ এ উপমহাদেশ থেকে নিজ দেশে পাচার করে। যার ফলে ইংল্যন্ডে যেমন একদিকে শিল্প বিপ্লব সংঘটিত হয় অন্যদিকে ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকালে সমৃদ্ধ এ জাতি সহসাই নিঃস্ব ও দরিদ্রতার মুখে নিপতিত হয়। ১৭৫৭ খ্রিঃ পলাশীর ষড়যন্ত্র মূলক যুদ্ধে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জয়লাভের ফলে উপমহাদেশের পূর্বাংশে বাংলায় ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তার পর থেকে রাজধানী কলকাতাকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও সভ্যতার যে বিকাশ লাভ করে তার ফলে এক নব্য আধুনিক শিক্ষিত সমাজ গড়ে ওঠে

যারা নিঃসন্দেহে ছিল হিন্দু।[১] বিদেশী শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন বৈষম্যমূলক নীতি ও নিজেদের অদূরদর্শিতার কারণে হৃত সর্বস্ব মুসলমান সম্প্রদায় সে সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতার সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ হয়ে একটি অবহেলিত জাতিতে পরিণত হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিভিন্ন শোষণ মূলক প্রশাসনিক নীতি ও সংস্কারের ফলে এ দেশের জনগণের মনে বিশেষ করে মুসলমানদের মনে এক মারাত্মক ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। যার কারণে মুসলমান নেতা মজনু শাহ, করিম শাহ, আগা মোহাম্মদ রেজা শাহ, হিন্দু নেতা ভবানী পাঠক, সহ প্রমুখের নেতৃত্বে সমগ্র উত্তর বাংলায় ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে ব্রিটিশ বিরোধী অভ্যুত্থান সৃস্টি হয়। তাদের আন্দোলন প্রকৃতিগতভাবে সশস্ত্র ও ব্রিটিশ উৎখাত আন্দোলন ছিল ঠিকই তবে তা জাতীয়তাবাদী ছিলনা বলে কোন কোন ঐতিহাসিক মত পোষণ করেছেন।[২] কিন্তু তাদের সশস্ত্র সংগ্রাম এদেশের মানুষকে তাদের হৃত গৌরব ফিরিয়ে আনতে উজ্জীবিত করেছিল এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

কোম্পানি উপমহাদেশের ধনসম্পদ লুণ্ঠন ও শোষণ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা তাদের বাণিজ্য নীতিতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অন্যায় নীতির প্রবর্তনের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী বস্ত্র শিল্পের ধ্বংস সাধন করে বহু মানুষকে বেকার কর্মহীন করে তোলে।[৩] প্রশাসন, ভূমি রাজস্ব এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে তাদের গৃহীত পদক্ষেপ ও প্রবর্তিত নীতির ফলে মুসলিম সম্প্রদায় একেবারে হতদরিদ্র জাতিতে পরিণত হয়। হান্টারের ভাষায় "আমরা এরকম এক শিক্ষাপ্রণালী আমদানী করেছি যার দ্বারা তাদের সমগ্র সম্প্রদায় বেকার হয়ে গেছে এবং তারা অপমান ও দারিদ্রের মুখে পতিত হয়েছে।"[৪] একদিকে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি ব্রিটিশ শাসক শ্রেণীর বিমাতা সুলভ আচরণ বা নীতি অন্যদিকে এদেশে ব্রিটিশ মদদপুষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব মুসলমানদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় করে তোলে যা হান্টার তার রিপোর্টে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। বিভিন্ন নীতির প্রবর্তনের মাধ্যমে মুসলমানদেরকে এমনভাবে চাকুরী থেকে সরিয়ে রাখা হয় যে, শেষ পর্যন্ত তাদের ভাগ্যে কুলি,পিয়ন ও চাপরাশীর চাকুরী ছাড়া অন্য কোন পদ থাকেনা। মুসলমান আমলে যারা মন্ত্রী, সেক্রেটারী, বিভাগীয় প্রধান, প্রাদেশিক শাসনকর্তা হিসেবে কাজ করেছেন আজ তারা সমস্ত কাজকর্ম হারিয়ে অভিশপ্ত বেকার জীবন যাপনে বাধ্য হয়েছেন।[৫] ব্রিটিশ শাসক গোষ্ঠীর সহযোগিতা এবং ব্রিটিশ প্রবর্তিত ইংরেজী ভাষা সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে কলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বুদ্ধিজীবীগণ যেমন ব্রিটিশ শাসনের প্রতি অনুগত হয়ে ওঠে তেমনি তারা মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব প্রদর্শন করতে থাকে। মুঘল শাসনের অবক্ষয়ের ফলে এবং ব্রিটিশ পাশ্চাত্য সংস্কৃতি অনুপ্রবেশের কারণে উপমহাদেশের মুসলিম সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে কুসংস্কার প্রবেশ করে মুসলমানদের যে অধঃপতন ঘটেছিল তা থেকে পরিত্রাণের জন্য শাহ ওয়ালী উল্লাহ নামে এক ধর্মসংস্কারকের আবির্ভাব ঘটে।

---

[১] রুস্তম আলী, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৮২।

[২] মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৩), পৃ. ৩৬১।

[৩] রুস্তম আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫।

[৪] হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদ: আব্দুল মওদুদ (ঢাকা: ১৯৭৪), পৃ. ১৪৪।

[৫] I.H. Qureishi (ed.), *A Short History of Pakistan,* Vol. IV (Karachi: University of Karachi, 1967), p. 131.

শাহওয়ালী উল্লাহর ইন্তেকালের পর পিতার অসমাপ্ত কাজের দায়িত্ব নেন শাহ আব্দুল আযীয (রঃ) যিনি উপমহাদেশে ব্রিটিশ হঠাও আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে এক ঐতিহাসিক ফতওয়া জারী করেন। মূলত তার ফতওয়াই উপমহাদেশের মুসলমানদের সকল আন্দোলন সংগ্রামে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের ভূমি ও ভূমি রাজস্বনীতির বদৌলতে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা বাংলার প্রায় সকল জমিদারি হস্তগত করে। এসকল নব্যসৃষ্ট জমিদার ও তাদের নায়েব গোমস্তাদের নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনে মুসলিম প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে। আর এ সকল অত্যাচারী জমিদারদের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষায় এগিয়ে আসেন তৎকালীন সময়ের ধর্মসংস্কারক তিতুমির। আর এ সমসাময়িক কালে আরও দুই জন মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটে তারা হলেন হাজী শরীয়তুল্লাহ ও তার পুত্র দুদুমিয়া। তবে বিদেশী ব্রিটিশ শাসন শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে বৃহৎ পরিসরে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হন সাইয়্যেদ আহমেদ শহীদ ব্রেলভী (রহঃ)। তার নেতৃত্বেই তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন চরম বিকাশ লাভ করে। যদিও বালাকোটের যুদ্ধে ব্রিটিশ মদদ পুষ্ট শিখদের হাতে তিনি শাহাদাত বরণ করেন। তার শাহাদাতের পর ওয়াহাবীরা আরও শক্তিশালী হয়ে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত হয়ে তাদের ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রম অব্যহত রাখে।

তৃতীয় অধ্যায়ে উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ও পরবর্তী ব্রিটিশ রাজের শাসন প্রকৃতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। ভারতবাসীর মধ্যে গত একশত বছরের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে **১৮৫৭** সালের সিপাহী বিদ্রোহে। এ বিদ্রোহ ছিল হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। হিন্দু-মুসলিম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ বলা হলেও এ বিদ্রোহ সংগঠন, পরিচালনা ও নেতৃত্বের মূল ভূমিকা পালন করে মুসলমান ও আলিম সমাজ। এ বিদ্রোহের ফলাফল মুসলমানদের জন্য দুর্বিসহ হলেও এ বিদ্রোহের ফলেই ব্রিটিশরা তাদের শাসন ব্যবস্থার রূপ পরিবর্তন করে। মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্য মূলক নীতি এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে বিভিন্ন সশস্ত্র বিদ্রোহ মূলতঃ উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

চতুর্থ অধ্যায়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। **১৮৫৭** সালের বিদ্রোহের ব্যর্থতা, মুসলমানদের প্রতি অমানবিক নির্যাতন ও মুসলিম ধর্মীয় শিক্ষা সংস্কৃতির অবক্ষয় এর সমাধান কল্পে **১৮৫৭** সালের মহাবিদ্রোহে অন্যতম নেতৃত্বদানকারী উলামাশ্রেণীর চিন্তনের ফলশ্রুতিতেই মূলতঃ জন্ম নেয় দেওবন্দ মাদ্রাসা। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা এবং এর আয়ের উৎস নির্ধারণ এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে একই মতাদর্শ সম্বলিত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেওবন্দ আন্দোলনের বিস্তার প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করা হয়েছে। এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের বিপ্লবী চেতনার দীক্ষা ও তাদের শিষ্যগণ কর্তৃক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বিভিন্ন উপায়ে বাস্তবে রূপদানের প্রচেষ্টাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল দেওবন্দ আন্দোলন। দেওবন্দ মাদ্রাসা ও এই মাদ্রাসা হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিম-উলামাগণই ছিলেন দেওবন্দ আন্দোলনের প্রধান ভিত্তি।

পঞ্চম অধ্যায়ে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা সম্পর্কে অলোচনা করা হয়েছে। দেওবন্দ মাদ্রাসা থেকে পাশ করা ছাত্র ও শিক্ষকগণই মূলত মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ রূপে উৎসর্গ করেছিলেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে এবং বিভিন্ন সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে ব্রিটিশ বিরোধী তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসা অগ্রণী ভূমিকা পালন করায় এ আন্দোলনের কর্ণধারগণ ব্রিটিশদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন যা ইতিহাসে বিরল।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দেওবন্দ মাদ্রাসা কতৃক পরিচালিত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে মূল্যায়ণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পটভূমি ও ক্রম-সম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি

২.১ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারতে আগমন

আর্যদের ভারত আগমনের সময় থেকে ভারতের ইতিহাসের যাত্রা শুরু। সেই ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতীয় উপমহাদেশে আর্যদের আগমন ঘটেছিল বসবাসের জন্য। কিন্তু পরবর্তীতে আর্যগণ শাসনক্ষমতা গ্রহণ করলেও কখনো লুন্ঠন অথবা লুন্ঠিত সম্পদ ভারতের বাইরে স্থানান্তরের ব্যাপারটি ঘটেনি। বেশকিছু লুন্ঠনের ইতিহাস জানা যায় মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে। মুঘল যুগ (১৫২৬ - ১৮৫৭) ছিল সাম্রাজ্য সৃষ্টি, বিস্তার আর শাসনের। মুঘল শাসনের ক্রান্তিকাল বা শেষের দিকে এই উপমহাদেশে আগমন ঘটে ইউরোপীয় জাতিসমূহের।

প্রাচীনকাল থেকেই ইউরোপের সাথে জলপথে ভারতের সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর প্রচুর চাহিদা ছিল। খ্রিষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে পূর্বাঞ্চলে রোম সাম্রাজ্যের বিস্তৃতির সূত্র ধরে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়। কিন্তু সপ্তম শতাব্দীতে মিশর সিরিয়া প্রভৃতি দেশগুলোতে আরবদের প্রভূত্ব স্থাপিত হলে পাশ্চাত্য দেশগুলোর সাথে ভারতের সরাসরি বাণিজ্যিক সম্পর্কের অবনতি হয় এবং ভারতীয় বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ আরবদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আরব বণিকরা ভারতীয় পণ্য সামগ্রী নিয়ে আরব সাগর ও লোহিত সাগর দিয়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলে ইটালীর বণিকদের নিকট পৌছে দিত। ইতালির বণিকরা তা ক্রয় করে পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে বিক্রয় করত। ইউরোপের বাজারে এসকল পণ্যের বিশেষ করে প্রাচ্যের মসলা, গোলমরিচ ও এলাচ প্রভৃতির ব্যাপক চাহিদা থাকায় এ সকল বাণিজ্য ছিল খুবই লাভজনক।[১] কিন্তু বহু দেশ ও রাষ্ট্রের ভিতর দিয়ে মানুষের হাত বদল হয়ে এসব পণ্য ইউরোপে পৌছতে যেমন বণিকদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হত তেমনি বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শুল্ক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দস্যুদের উৎপাত ব্যবসা বাণিজ্যের পথে নানা অন্তরায় সৃষ্টি করত।[২] ১৪৫৩ সালে তুর্কীরা এশিয়া মাইনর এবং কনস্টান্টিনোপল দখল করে নিলে প্রচলিত বাণিজ্য পথে প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু প্রাচ্যের সাথে ইউরোপের ব্যবসা বাণিজ্য এতই লাভজনক ছিল যে, প্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে তারা ব্যবসা পরিত্যাগ করতে মোটেই প্রস্তুত ছিল না। তাই তারা আরব ও ভেনিসদের একচেটিয়া ব্যবসা ধ্বংস করে এবং তুর্কীদের পাশ কাটিয়ে প্রাচ্যের সাথে সরাসরি বিকল্প বাণিজ্য পথের অনুসন্ধানে নেমে পড়ে।

অন্যদিকে চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ইউরোপে রেঁনেসার ফলে পশ্চিম ইউরোপের মানুষের মনে শিল্প-সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানে নবজাগরণের সূচনা করে। এসময় তারা অজানাকে জানার আগ্রহে মেতে ওঠে। এই ব্যাপারে

---

[১] Ramkrishna Mukherjee, *The Rise and Fall of the East India Company* (Bombay: Propular Prokashon, 1958), p. 55.
[২] Hunter, *A History of British India*, Vol. 1 (Newyork: Longmans, Green and Co., 1966), p. 241.

প্রথম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে স্পেন ও পর্তুগাল। অবশেষে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোডাগামার নেতৃত্বে ইউরোপীয়রা জলপথে ভারতবর্ষে আগমনের পথ আবিষ্কার করে। এরপর পর্তুগীজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতি একে একে ভারতবর্ষে আসতে থাকে। ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপ কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির যুগ থেকে Mercantilism অর্থাৎ সওদাগরী বাণিজ্যের যুগে প্রবেশ করে, মার্কেন্টাইল ব্যবস্থার প্রাথমিক অংশীদার ছিল বিভিন্ন হকাররা এবং হকাররাই পরবর্তীতে বড় বড় বণিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়। এ বণিক গোষ্ঠীর মাধ্যমেই ইউরোপে শিল্প বিপ্লব হয়। পরবর্তীতে এই বণিকরাই বিভিন্ন দেশে উপনিবেশ স্থাপন করে। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য সম্বন্ধে ইংরেজ ও ওলন্দাজ পর্যটকদের বিবরণী প্রাচ্যের সহিত বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে ইংরেজ বণিকদের আগ্রহী করে তোলে। ১৬০০ সালে ভারত ও পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। উক্ত সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বৃটেনের রাণী প্রথম এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩) উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য ইংরেজদের চার্টার বা বাণিজ্য সনদ প্রদান করেন। চার্টারে কোম্পানির নাম দেয়া হয় "The Government and Company of Marchants of London trading into the Eeast Indies"[৩] চার্টার লাভের সময় ২১৭ জন বণিক নিয়ে গঠিত এ কোম্পানির মেয়াদ ছিল ১৫ বছর। তবে, তা নবায়নযোগ্য। আর যৌথ পুঁজি ছিল মোট ৬৮ হাজার পাউন্ড। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী সম্পর্কে রামকৃষ্ণ মুখার্জি বলেন

> The East India Company had become the most important joint-stock company in England. In the seventeenth century it averaged a rate of profit of about 100 percent.[৪]

প্রথমদিকে ইংরেজ কোম্পানি জেমস ল্যাঙ্কাস্টার (James Lancaster) এর নেতৃত্বে সুমাত্রা, জাভা ও মলুক্কাসের দিকে দুটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করে। কে.এন. চৌধুরী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

> The first fleet of the Company, composed of four ships under the command of Captain James Lancaster, left the Thames in February 1601 and returned twoyears later from the East Indies laden mainly with pepper. A second Voyage was sent out in March 1604 with the instruction to the commander Henry Middleton.[৫]

ইংরেজ বণিকরা বান্তামে (Bantem) একটি বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করেন। কিন্তু, শীঘ্রই সেখানে অবস্থানরত ওলন্দাজদের সাথে ইংরেজদের সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয় এবং শেষপর্যন্ত ইংরেজদের মসলা দ্বীপপুঞ্জ পরিত্যাগ করতে হয়। মসলা দ্বীপপুঞ্জে ওলন্দাজদের বিরোধিতার ফলে ইংরেজরা ভারতে আগমন করে। কিন্তু, এখানেও তারা পর্তুগীজদের বিরোধীতার সম্মুখীন হয়। এভাবে মালয় দীপপুঞ্জে ওলন্দাজদের বিরোধিতা এবং ভারতে পর্তুগীজদের বিরোধিতার ফলে কোম্পানি বহু অসুবিধার সম্মুখীন হলেও ইংরেজ বণিকরা মালয় দ্বীপপুঞ্জের

---

[৩] P. Thankappan Nair, *British Beginnings in Bengal (1600-1660)* (Calcutta: Punthi Pustak, 1991), p. 1.
[৪] Ramkrishna Mukherjee, *op. cit.*, p. 69.
[৫] K.N. Chaudhury, *The English East India Company* (London: Taylor and Francis Group, 1915), p. 39.

চেয়ে ভারতের দিকেই বেশী মনোযোগ দেয়। এভাবে ভারতবর্ষে English East India Company উপনিবেশ স্থাপন করে।

প্রশ্ন হল East India Company ভারতবর্ষে বা দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্যের জন্য কেন আসল? চতুর্দশ শতাব্দীতে ইউরোপে রেঁনেসা, ইউরোপ তথা ইংরেজদের মধ্যে অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জাগরণ নিয়ে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় উৎপাদিত দ্রব্যের বাজার সৃষ্টি এবং কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য নতুন বাণিজ্যক্ষেত্র সন্ধানের প্রেক্ষাপটে কোম্পানির এ মহাদেশে আগমণ ঘটে। তাছাড়া পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে পাশ্চাত্য থেকে ভারতে পৌছাবার জলপথ আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই নতুন পথ আবিষ্কারের দ্বারা ভারতের সাথে ইউরোপের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। সেই সূত্র ধরে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে আগমণ করে। মূলত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি বণিক গোষ্ঠী হিসেবে একচেটিয়া বাণিজ্য পরিচালনা করে অধিক মুনাফা লাভের আশায় দক্ষিণ এশিয়ায় আগমন করে এবং এর পশ্চাতে আমরা আরও কতিপয় কারণ খুঁজে পাই। তাহলো;

ক. দক্ষিণ এশিয়ায় বাণিজ্যের উপযুক্ত পরিবেশ বিরাজমান ছিল।

খ. এ অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল নৌপথ নির্ভর তাই নৌশক্তিতে বলীয়ান ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানী এ অঞ্চলে আগমনে উদ্বুদ্ধ হয়।

গ. এদেশের উৎপাদক শ্রেণী অর্থাৎ শ্রম ছিল সস্তা ও সহজলভ্য এবং এ উৎপাদক শ্রেণী কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের বিশ্ববাজারে ব্যাপক চাহিদা ছিল এবং তা ছিল লাভজনক।

ঘ. এ অঞ্চলে সহজ বিনিময় যোগ্য মুদ্রাব্যবস্থা থাকায় ইংরেজ বণিকরা সহজেই তাদের ধাতব মুদ্রা বিনিময় ও পণ্য গ্রহণ করতে পারত।

ঙ. দক্ষিণ এশিয়ায় ইংরেজদের আগমনের অন্যতম আর একটি কারণ হল এ সময় ইউরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবত সংঘাত ও দ্বন্দ্ব চলছিল, আর ফরাসীরা দক্ষিণ এশিয়ায় বণিক গোষ্ঠী হিসেবে আগেই আগমন করেছিল। ফরাসীরা যাতে এ অঞ্চলে একচেটিয়া প্রাধান্য বিস্তার করতে না পারে সেজন্য ইংরেজরা দক্ষিণ এশিয়ায় আগমন করে।

চ. তৎকালীন এ অঞ্চলের অন্যতম বন্দর সুরাট ছিল সমকালীন ইউরোপের যে কোন বন্দরের সাথে তুলনীয়। যার কারণে কোম্পানী এ অঞ্চলে আসতে বেশি আগ্রহী হয়।

তাদের আগমনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বাণিজ্য হলেও পরবর্তীতে শাসন, লুন্ঠন ও লুন্ঠিত সম্পদ বৃটেনে হস্তান্তরই ছিল তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

২.২ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পদক্ষেপ

দক্ষিণ এশিয়ায় ব্রিটিশ রাজনৈতিক আধিপত্য স্থাপনে ব্রিটিশদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা না থাকলেও বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনাপ্রবাহের ফলে উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রাণীর চার্টার লাভের ফলে কোম্পানি ভারতবর্ষের সাথে বাণিজ্য আরম্ভ করে। তবে, প্রথমদিকে কোম্পানির প্রত্যক্ষ লক্ষ্য ছিল দূরপ্রাচ্যে মসলা ব্যবসা। সেখানে ব্যর্থ হয়ে কোম্পানি ভারত বাণিজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে।[৬] ভারতের মূল ভূখন্ডে ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজরা তেমন সফল হতে পারেনি কারণ তাদের সফলতার প্রধান প্রতিবন্ধক ছিল মুঘলদরবারে পূর্ব থেকেই প্রভাব বিস্তারকারী পর্তুগীজরা। এসময় ভারতের শাসনক্ষমতায় ছিলেন সম্রাট জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭)। এছাড়া কোম্পানির চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পর্তুগীজরা পূর্ব থেকেই এখানে অবস্থান করছিল। তবে, নানাবিধ কারণে জাহাঙ্গীরের আমলে পর্তুগীজদের কর্মতৎপরতায় কিছুটা ভাটা পড়ে। এমতাবস্থায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। নিম্নে তাদের পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হল;

২.২.১ বিভিন্ন রাজকীয় ফরমান লাভ ও কোম্পানির কার্যক্রম

১৬০৮ সালে উইলিয়াম হকিংস নামে একজন নাবিক ইংল্যান্ডের সমসাময়িক কালের রাজা প্রথম জেমসের (১৬০৩-১৬২৫) একটি পত্র নিয়ে মুঘল দরবারে আসেন। ইংল্যান্ডের রাজা এই পত্রে ভারতে ইংরেজ বণিকদের কিছু সুযোগ সুবিধা প্রদানের অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু পর্তুগীজ ও জেসুইটদের বিরোধীতায় হকিংস ইংরেজদের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায় করতে না পারলেও স্যার টমাস রো (১৫৮১-১৬৪৪) এর প্রচেষ্টায় জাহাঙ্গীর ইংরেজদের কিছু বাণিজ্যিক সুবিধা প্রদান করে ফরমান জারি করে। ফরমানের শর্ত অনুযায়ী

ক. ইংরেজরা পর্তুগীজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে গুজরাটের শাসনকর্তা অস্ত্র দিয়ে তাদের সাহায্য করবেন।

খ. ইংরেজ বণিকদের শুল্ক কর্মকর্তারা কোনোরূপ হয়রানি করতে পারবে না।

গ. ইংরেজদের পণ্য বন্দরে ভিড়লেই শুধু শুল্ক নির্ধারণ করা যাবে।

ঘ. ইংরেজ বণিকরা যে কোন বন্দরে স্বাধীনভাবে ঘর ভাড়া নিতে পারবে।

ঙ. ইংরেজ কোম্পানির কোন কর্মচারীকে মুঘল শাসকগণ বন্দী করতে পারবে না।[৭]

এই ফরমান বলে কোম্পানি সর্বপ্রথম ১৬১৩ সালে ভারতের পশ্চিম উপকূল বন্দর সুরাটে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। এভাবে স্যার টমাস রো ভারতে ভবিষ্যৎ ইংরেজ শাসনের প্রাথমিক ভিত গড়ে তোলেন। যদিও সুরাটে কুঠি স্থাপন করতে তাদের বহু বাধা মোকাবিলা করতে হয়।[৮] মূলত ১৬১৩ সালে সুরাটে বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করে নিজেদের অবস্থান পাকা পোক্ত এবং একচেটিয়া মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে কোম্পানি বিভিন্ন প্রদক্ষেপ গ্রহণ করে।

---

[৬] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ৯।

[৭] এ কে এম শাহনেওয়াজ, *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ (মোগল পর্ব)* (ঢাকা: প্রতীক, ২০০৭), পৃ. ১২-১৩।

[৮] রুস্তম আলী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।

পরবর্তীতে কোম্পানি ১৬৩৩ সালে উড়িষ্যার হরিহরপুরের বালাসোরে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া কোম্পানির বাংলা বাণিজ্য প্রথমে দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাধ্যমে অতিবাহিত হলেও ১৬৫০ সালে বাংলায় একটি বাণিজ্য কুঠী নির্মাণের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হান্টার এর মতে,

> The arrival of the English at Hugli in 1650 promised an accession of trade to the new imperial port, and anincreased customs revenue to the Mughal Governor.[৯]

১৬৫১ সালে ইংরেজরা বাংলায় বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম এটিকে বাংলার ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার ১ম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০] ওই বছর বাংলার সুবেদার শাহ সুজা (১৬৩৯-৬০) ইংরেজদেরকে বিনা শুল্কে বাংলায় অবাধ বাণিজ্য করার অধিকার দেন। শর্ত ছিল কোম্পানি সরকারকে বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্ব দিবে।[১১] ১৬৪৯-১৬৮৯ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়কালে কোম্পানী বাণিজ্যে প্রভূত উন্নতি করে। তাদের উন্নতি ও লভ্যাংশ বৃদ্ধির ফলে কোম্পানির উচ্চাকাঙ্খা ও বাড়তে থাকে। ১৬৫৭ সালে ক্রমওয়েল (Cromwell) ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে একটি নতুন সনদ প্রদান করেন, যার দ্বারা কোম্পানি যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন এবং বিচারকার্য সমাধা সহ নানা প্রকার ক্ষমতা ও সুবিধা প্রাপ্ত হয়।[১২] অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ পেয়ে কোম্পানি তাদের বাণিজ্য দ্রুত সম্প্রসারণ করতে থাকে। এসময় কাসিম বাজার (১৬৫৮), পাটনা (১৬৫৮), ঢাকা (১৬৬৮), রাজমহল ও মালদহ প্রভৃতি স্থানে কোম্পানি নতুন কুঠি স্থাপন করে। ১৬৮০ সাল নাগাদ কোম্পানির বাণিজ্য দেশের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে। বাণিজ্য বৃদ্ধির সাথে সাথে সরকারের বিরুদ্ধে কোম্পানির নানা অভিযোগ ও বৃদ্ধি পায়। কোম্পানির অভিযোগ ছিল সরকারি কর্মচারীরা কোম্পানির কর্মচারীদের অযথা হয়রানি করে উৎকোচ দিতে বাধ্য করে। সরকারের অভিযোগ ছিল কোম্পানি শর্ত মোতাবেক বাণিজ্য না করে অসদুপায় অবলম্বন করছে। ১৬৮২ সালে বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যবস্থাপনার জন্য উইলিয়াম হেজেজকে প্রথম গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। হেজেজই প্রথম ব্যবসার স্বার্থে বাংলায় ব্রিটিশ সামরিক উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। ১৬৮৬ সালে হেজেজের স্থলে গভর্ণর হিসেবে নিযুক্ত হন জব চার্নক।[১৩] তিনি সুবা বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে চট্টগ্রামে একটি সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে ১৬৮৬ সালের ডিসেম্বর মাসে হুগলী আক্রমণ করেন। আর এ যুদ্ধাবস্থা ১৬৮৬ সাল থেকে ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত জলে ও স্থলে বিরাজমান ছিল।[১৪]

---

[৯] Hunter, *A History of British India*, Vol. 2 (Newyork: Longmans Green and Co., 1966), p. 96.
[১০] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ১০।
[১১] Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company: 1756-1757* (Laiden: E.J Brill, 1966), p. 3.
[১২] ইয়াসমিন আহমেদ ও রাখী বর্মণ, *ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন* (ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো, ২০০৫), পৃ. ২১।
[১৩] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ২।
[১৪] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১), পৃ. ৩৪১।

এভাবেই চারবছর এ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধের পর সরকারের অর্থনীতির উপর নেতিবাচক প্রভাব এবং আর্থিক সঙ্কটের দরুণ সম্রাট আওরঙ্গজেব (১৬৫৮-১৭০৭) বিবাদ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এ্যাংলো-মুঘল যুদ্ধের পর সম্রাট আওরঙ্গজেব কোম্পানির মিনতি শ্রবণ করে ১৬৯০ খ্রিঃ এক নতুন ফরমান জারী করেন। ১৬৯০ সালে কোম্পানি সম্রাটের সাথে একটি শান্তিচুক্তি করে। কোম্পানিকে সেই চুক্তি অনুযায়ী এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করা হলেও কোম্পানি সারাদেশে বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পায়। এটিকে ঐতিহাসিকগণ ইংরেজদের কূটনৈতিক বিজয় বলে অভিহিত করেছেন।[১৫] এছাড়াও মুঘল সম্রাটের নিকট থেকে কোম্পানি সুতানুটিতে তাদের প্রধান কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। ফলে, কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক (১৬৮৬-৯৩) কোম্পানির মূল দপ্তর হুগলী থেকে সাতাশ মাইল দক্ষিণে সুতানুটিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন। এভাবে স্থাপিত হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত।

১৬৯০ সালে সুতানুটিতে কুঠি স্থাপনের পর থেকে কোম্পানি আশেপাশের এলাকায় আধিপত্য স্থাপন করে। ফলে, আইন-শৃংখলার অবনতি দেখা দিলে ইংরেজ বণিকরা আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সুবেদার ইবরাহীম খানের (১৬৮৯-৯৭) নিকট আবেদন করলে তিনি তাদের আরজি মঞ্জুর করেন। এ সুযোগে ১৬৯৬ সালে কোম্পানি সুতানুটি বসতিতে তৎকালীন ব্রিটিশ রাজার নামে ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণ করেন। এমনিভাবে স্থাপিত হয় এদেশে কোম্পানির আধিপত্য স্থাপনের আরেকটি শক্ত খুঁটি। ফোর্ট উইলিয়াম দূর্গ নির্মাণের দুই বছর পর কোম্পানি সুবেদার আজিম-উস-শানকে (১৬৯৭-১৭০৪) ষোল হাজার টাকা নজরানা প্রদান করে তিনটি মৌজার (সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর) উপর জমিদারী স্বত্বদানের আরজি জানায়।[১৬]

সুবেদার ১৬৯৮ সালে সে আরজি মঞ্জুর করে সরকারকে বার্ষিক ১১৯৪ টাকা ১৪ আনা ৪ পয়সা জমাদানের শর্তে কোম্পানিকে উক্ত তিনটি মৌজার জমিদারী সনদ প্রদান করেন। বাংলায় কোম্পানির সার্বভৌমত্বের বীজ উপ্ত হয় ১৬৯৮ সনে, যখন কোম্পানি কলকাতা, সুতানুটি ও গোবিন্দপুর নামক তিনটি গ্রামের উপর জমিদারি স্বত্ব লাভ করে এবং তথায় দূর্গ স্থাপন করার অনুমতি পায়। ফার্মিংগার ঠিকই বলেছেন যে, ঐ তিনটি গ্রামের উপর স্বত্বই ধীরে ধীরে প্রসারিত হয়ে অবশেষে গোটাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানির সার্বভৌমত্ব।[১৭] কোম্পানির জমিদারিস্বত্ত্ব লাভ ঐতিহাসিকভাবে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এখন থেকে কোম্পানি শুধু বিদেশী বণিক নয়, দেশের শাসক শ্রেণীর সদস্যও।[১৮]

---

[১৫] Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company: 1756-1757* (Laiden: E.J Brill, 1966), p. 5.
[১৬] *Ibid.*, p. 6.
[১৭] W.K Firminger, *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report (Indian Studies edition)*, (Culcutta: 1962), p. 78.
[১৮] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ১২।

কোম্পানির আধিপত্য বিস্তারের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের (১৭১৩-১৭১৯) নিকট থেকে প্রাপ্ত ফরমান। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর থেকে সিংহাসন ও অন্যান্য উচ্চপদ নিয়ে বিবাদ ও গৃহযুদ্ধ ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। এ সুযোগে কোম্পানি সরকারকে নানারকম পেশকাশ প্রদান করে অনেক সুযোগ সুবিধা আদায় করে নেয়। ১৭১৫ সালে কোম্পানি শারমেনের নেতৃত্বে সম্রাট ফররুখ শিয়ারের কাছে প্রতিনিধি প্রেরণ করে ৩০ হাজার পাউন্ড পেশকাশ বা পুরস্কার প্রদান করে বাংলা বাণিজ্যে কোম্পানির জন্য কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা প্রদানের আবেদন করে। শারমেনের আবেদন মঞ্জুর করে কোম্পানিকে অনেক নতুন সুযোগ সুবিধা ও অধিকার দিয়ে ১৭১৭ সালে সম্রাট ফররুখ শিয়র একটি ফরমান জারি করেন।[১৯]

কোম্পানী যে ফরমান বলে উপমহাদেশে তাদের আধিপত্যের পথকে প্রসারিত করতে সক্ষম হয় তা হল;

ক. বাৎসরিক তিন হাজার টাকা রাজস্বের বিনিময়ে কোম্পানি সারাদেশে বিনাশুল্কে অবাধ বাণিজ্য করবে।

খ. কোম্পানির মালামাল চুরি হলেও সরকার তা ফিরিয়ে দেবে অথবা সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ দিবে।

গ. মূল সনদ স্থানীয় কর্মচারীদের না দেখাবার অধিকার।

ঘ. ফ্যাক্টরী প্রধান প্রদত্ত দস্তক প্রদর্শনপূর্বক মালামাল চেক না করার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান।

ঙ. মুর্শিদাবাদ টাকশালে কোম্পানির নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার।

চ. সুবেদার কলকাতার পার্শ্ববর্তী আরও ৩৮ টি গ্রামের জমিদারী সনদ কোম্পানিকে দিবেন।

ছ. কোম্পানির অধীনস্থ কর্মচারীদের বিচার করার অধিকার কোম্পানির থাকবে।

১৭১৭ সালের ফরমান কোম্পানিকে উপমহাদেশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সুযোগ করে দেয়। ফররুখ শিয়রের ফরমান দ্বারা দেশের সার্বভৌমত্বকে আংশিকভাবে বিকিয়ে দেয়া হয় বলা যেতে পারে।[২০]

মূলতঃ সামান্য অর্থের বিনিময়ে এই ফরমান একদিকে যেমন দেশের সার্বভৌমত্বকে আংশিক ভাবে বিকিয়ে দেয়া হয় অন্যদিকে ব্রিটিশ আধিপত্যবাদকে আরও মজবুত করতে সহযোগিতা করে। ইংরেজদের বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হয় এবং তারা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বাণিজ্যের ঐশ্বর্যের বলে ইংরেজ বণিকগণ রাজনৈতিক শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে আগমন করলেও বিভিন্ন ঘটনার ফলে তারা উপমহাদেশের রাজনীতিতে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পড়ে। উপমহাদেশের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর অযোগ্যতা, দুর্বলতা, বিভেদ ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ইংরেজ বেনিয়াদের আধিপত্য বিস্তারের পথকে সুগম করে তোলে। এক পর্যায়ে মুঘলদের অদূরদর্শীতায় ইংরেজগণ তথা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বেনিয়া থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। পরবর্তীকালে এ কোম্পানি ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং ১৮৫৮ সালে বিলুপ্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করে। ঐতিহাসিক তারাচাঁদ এর মতে "যে পদ্ধতিতে ইংরেজরা ইন্ডিয়ার

---

[১৯] S. Bhattacharya, *The East India Company and the Economy of Bengal* (London: Luzac, 1954), Chapter 2.
[২০] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ১৩।

উপকূলে এসে তাদের রাজনৈতিক সৌভাগ্য প্রস্ফুটিত হওয়া পর্যন্ত ১৫০ বছর অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে তাদের বাণিজ্য পরিচালনা করেছিল এবং পরবর্তীতে তাদের উপমহাদেশ দখল মানব ইতিহাসে একটি চমকপ্রদ বিষয়" ।[২১] এভাবে বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কলাকৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে কোম্পানি দুর্বল সম্রাটদের নিকট থেকে বাণিজ্যিক সুবিধা সম্বলিত ফরমান লাভ করে। ব্রিজেন কে. গুপ্ত বলেন -

> A Century of English trade in Bengal left the relations between the provincial administrators and the East India Company strained. So long as trade was modest the relations had been cordial. The company's agents made generous present to the Mughal officials and in return recied patronage.[২২]

এসব ফরমানের অপব্যবহারের মাধ্যমে কোম্পানির বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়।[২৩] কোম্পানি সম্রাট ফররুখ শিয়রের কাছ থেকে ১৭১৭ সালে ফরমান লাভ করলেও বাংলার সুবেদার মুর্শিদকুলি খান (১৭১৭ - ১৭২৭), সুজাউদ্দিন খান (১৭২৭-১৭৩৯) ও আলীবর্দী খান (১৭৪০-১৭৫৬) সেই ফরমান কার্যকর করতে অস্বীকৃতি জানান। কিন্তু, প্রত্যেক সুবেদার অতি কৌশলে কোম্পানির সাথে সরাসরি দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলেন। অন্যদিকে মুর্শিদকুলি খানের পর থেকে শুরু হয় প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। সেই ষড়যন্ত্রের সুযোগে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে কোম্পানি।

২.২.২ পলাশীর যুদ্ধ ও কোম্পানির পরবর্তী তৎপরতা

১৭৫৬ সালে আলীবর্দী খানের মৃত্যুর পর সিরাজ-উদ-দ্দৌলা বাংলার সিংহাসনে আরোহন করেন।[২৪] সিংহাসনে আরোহনের পর থেকে তাঁর বিরুদ্ধে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। তিনি ১৭৫৬ সালের ১৬ জুন কলকাতা দখল করলেও পরবর্তীতে নানা কারণে ১৭৫৭ সালের ২ জানুয়ারী কোম্পানি পুনরায় কলকাতা পুনরুদ্ধার করে এবং সিরাজ-উদ-দৌলাকে আলীনগরের সন্ধি নামক শান্তি চুক্তি করতে বাধ্য করে। ব্রিজেন কে. গুপ্ত তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন

> The re-establishment of the company’s settlements in Bengal after the English defect as Calcutta was possible in one of two ways. The first was to approach to nawab to forgive the company; Theother was to avenge the defect by force.[২৫]

১৭৫৭ সালের ৯ ই ফেব্রুয়ারী সম্পাদিত আলীনগরের সন্ধিতে বলা হয়:

ক. ১৭১৭ গণের বাদশাহী ফরমান বাস্তবায়ন এবং ফরমানে উল্লেখিত কলকাতার পার্শ্ববর্তী ৩৮ টি মৌজা কোম্পানিকে হস্তান্তর করা।

খ. দস্তকমুক্ত মালামাল নবাবী চৌকিতে তল্লাশী না করা।

---

[২১] Tara Chand, *History of the Freedom Movemet in India*, Vol. 1 (New Delhi: Director of Publications Division, Govt.of India, Patiala House, 1972), p. 227.
[২২] Brijen K. Gupta, *op. cit.*, p. 8.
[২৩] Anil Saxena (ed.), *Encyclopaedia of Indian History*, Vol. 25 (New Delhi: Anmol Publication Ltd., 2006), p. 2.
[২৪] Brijen K. Gupta, *op. cit.*, p. 50.
[২৫] *Ibid*., p. 85.

গ. কোম্পানির ব্যবসা শুল্কমুক্ত করা।

ঘ. কলকাতায় দূর্গ ও টাকশাল তৈরীতে বাধা না দেয়া।

ঙ. কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দেয়া।

চুক্তির শর্তসমূহ বিশ্লেষণে দেখা যায় এ চুক্তি কোম্পানির আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাইল ফলক। ১৭১৭ সালের ফরমানের পূর্ণ বাস্তবায়ন হয় ১৭৫৭ সালের আলীনগর সন্ধিতে। সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন স্বাধীনচেতা নবাব। কিন্তু আলীনগরের সন্ধির মাধ্যমে তার অসহায়ত্ব প্রকাশ পায়। ফলে, কোম্পানি নবাবের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৭৫৭ সালে ২২ মার্চ ফরাসীদের দূর্গ চন্দননগর দখল করে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।[২৬]

এভাবে কোম্পানির বিজয়কে স্থায়ী রূপ দিতে এবং সিরাজ-উদ-দ্দৌলাকে উৎখাতের লক্ষ্যে ১৭৫৭ সালের ৪ জুন কোম্পানির পক্ষ থেকে উইলিয়াম ওয়াটস ও ষড়যন্ত্রকারীদের পক্ষে মীর জাফরের মধ্যে জগৎশেঠের বাড়িতে একটি গোপন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির শর্তসমূহ ছিল-

ক) উভয়পক্ষ আলীনগরের সন্ধি পালন করবে।

খ) সমুদয় সম্পত্তিসহ সকল ফরাসীদের ইংরেজদের নিকট সমর্পণ করা হবে।

গ) কোম্পানির সকল শত্রু নবাবের শত্রু হিসেবে গণ্য হবে।

ঘ) নবাবের প্রয়োজন হলে কোম্পানি সামরিক সাহায্য দিবে, তবে খরচ বহন করবে নবাব।

ঙ) কলকাতা আক্রমণ করার কারণে কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১ কোটি টাকা দিতে হবে।

চ) কলকাতার আশেপাশের জমিদারী সমূহ এবং কলকাতার দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলের উপর কোম্পানিকে জমিদারীস্বত্ত্ব প্রদান করা হবে।

ছ) হুগলীর ভাটিতে ভবিষ্যতে কোন নবাবী দূর্গ স্থাপন করা হবে না। বিনিময়ে মীর জাফরের নবাবী রক্ষার ব্যাপারে কোম্পানী সর্বাত্মক সহযোগিতা দিবে।

মীর জাফর ও কোম্পানির গোপন চুক্তি কোম্পানির ভিত মজবুত করে। এরপর সিরাজ-উদ-দ্দৌলা আলীনগরের সন্ধি মেনে চলছে না এ অভিযোগ এনে কোম্পানি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৩ জুন বৃহস্পতিবার সকাল ৮ টায় মুর্শিদাবাদ থেকে ২৩ মাইল দক্ষিণে ভাগীরথি নদীর তীরে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধ শুরু হয়। বিকাল ৪ টায় যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। প্রথমদিকে সিরাজ-উদ-দ্দৌলা জয়ী হলেও মীর জাফরের ষড়যন্ত্রে অবশেষে তিনি পরাজিত হন। পরাজিত হয়ে সিরাজ রাজমহলে যাওয়ার পথে মীর কাসিম কর্তৃক ধৃত হন এবং মীর জাফরের পুত্র মীরণের নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়। পলাশীর যুদ্ধ নামে আখ্যায়িত এই পাতানো খেলার[২৭] মাধ্যমে

[২৬] M.A. Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D 1754-1947* (Dhaka: University of Dhaka, 2011), p. 12.

[২৭] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ২৮.

কোম্পানি ১৭১৭ সালের ফরমান এবং আলীনগরের সন্ধির (৯/২/১৭৫৭) মাধ্যমে যে অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল তা পূর্ণভাবে লাভ করে। পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় স্বাধীন শাসনের সমাপ্তি ঘটে এবং এই প্রদেশে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শক্তিশালী রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিরূপে আবির্ভুত হয়। পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের মাধ্যমে এদেশে ইংরেজদের মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। পলাশী যুদ্ধের ফলে কোম্পানি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান থেকে রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পলাশী যুদ্ধের পূর্বে যে কোম্পানি ছিল ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর কৃপাপ্রার্থী আজ তারাই রাষ্ট্রক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। ইংরেজরা king makers বা নৃপতি স্রষ্টার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।[২৮] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও পলাশী যুদ্ধের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এ যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানিকে মূলধন হিসেবে আর বৃটেন থেকে স্বর্ণরৌপ্য আমদানি করতে হয়নি। বরং বাংলা অঞ্চল থেকে সংগৃহীত রাজস্ব দিয়ে কোম্পানি সমগ্র এশিয়ায় ব্যবসা পরিচালনা করে। ব্রিজেন কে. গুপ্ত বলেন-

> Indeed, at the battle of plassey Bengal had surrendered its destiny to the east India Company. The economic and political consequences of the defeat of Sirajuddaula have become legendary in Indian History. Economically the defeat marked the beginning of the impoverishment of the Indian economy and the establishment of an economic imperialismruthless in its form. Politically the extention of the protectorate over mir jafar paved the way for the creation of the British empire in India.[২৯]

এ যুদ্ধের ফলে কোম্পানির উপর দেশীয় সরকারের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তার অবসান ঘটে। বার্ষিক তিন হাজার টাকা পেশকাশের বিনিময়ে কোম্পানি বিনা শুল্কে বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ লাভ করে। পলাশীর পর কোম্পানির লোকদের দাপট এমনভাবে বেড়ে যায় যে, কোম্পানির দস্তক ব্যবহার করে তারা বিনা শুল্কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে অবাধ যোগদান করে। ফলে, ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩০] পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানির ভূখন্ড আরও সম্প্রসারিত হয়। পলাশী যুদ্ধের ফলে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার স্বাধীনতার অবসান হয়। ১৭৫৭ সালের জুন মাসে কোম্পানি মীরজাফরকে মুর্শিদাবাদের মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেন। গোপন চুক্তির শর্তানুযায়ী তিনি কোম্পানিকে প্রচুর টাকা ও বিশেষ বাণিজ্যিক সুবিধাদি প্রদান করেন। এছাড়া তিনি কোম্পানিকে চব্বিশ পরগণার জমিদারিস্বত্ব দিতে বাধ্য হন।[৩১] এভাবে প্রচুর অর্থসম্পদের মালিক হয়ে কোম্পানি ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনা করে। বাংলার সম্পদ, অর্থ ও জনবল দিয়েই ইংরেজরা দাক্ষিণাত্যে তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাভূত করে। এভাবে পলাশী যুদ্ধের পর বাংলায় কোম্পানির রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা থেকে সমগ্র ভারতে এবং ভারত থেকে সমগ্র ভারত মহাসাগরীয়

---

[২৮] M.A. Rahim, *op. cit.*, p. 14.
[২৯] Brijen K. Gupta, *op. cit.*, p. 127.
[৩০] *Ibid*., 132.
[৩১] Ramkrishna Mukherjee, *op. cit.*, p. 268.

অঞ্চলে ব্রিটিশরা আধিপত্য বিস্তার করে।[৩২] আর মীর জাফর ছিলেন ইংরেজদের হাতের পুতুল।[৩৩] ড. অনীল সাক্সেনা বলেন-

> After the Battle of Plassey Clive emerged as the supreme controller of the political destiny of Bengal.[৩৪]

মীর জাফরের সাথে গোপন চুক্তি এবং নবাবের বিপর্যয় এটাই প্রমাণ করে যে কোম্পানী বাংলায় একটি অপরাজেয় শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং বাংলায় রাজনৈতিক ভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপনের কারণে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতিতে পাশ্চাত্য নীতির অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে। ঐতিহাসিক তারাচাঁদ এর মতে -

> The Adventure which had commenced in the sixteenth century under the stress Mercantilist forces for the achievement of wealth and power, Had at last culminated in success unparalleled in history. This extraordinary phenomenon had three phases, in its first phase, The east India company's activities were confined to trade, in the second phase the company entered into armed conflict with its European rirals, established its trade monopoly and acquired political influence in India. In the third phase which began with the battle of plassey.[৩৫]

বাংলায় কোম্পানির ক্ষমতালাভের ক্ষেত্রে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হল ১৭৬০ সালে মীর কাশিমের ক্ষমতা লাভ। ১৭৫৭-১৭৬০ পর্যন্ত মাত্র তিন বছরে ষড়যন্ত্র করে ক্ষমতায় আসা নবাব মীর জাফর কোম্পানির যাবতীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ এই অজুহাতে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্ণর ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে পদচ্যুত করতে বদ্ধ পরিকর হন। ১৭৬০ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর কোম্পানী ও মীর জাফরের জামাতা মীর কাশিমের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তির প্রধান শর্তগুলো ছিল:

ক. মীর কাশিম ও কোম্পানির মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে।

খ. নবাবের শত্রু কোম্পানির শত্রু বলে বিবেচিত হবে।

গ. কোম্পানির সৈন্য নবাবকে সর্বদা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকবে। কোম্পানির যাবতীয় খরচ ও সেনাবাহিনী পোষণ বাবদ নবাব বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের কর্তৃত্ব ও দখল কোম্পানিকে দিয়ে দিবে।

ঘ. একের এলাকায় অন্যের প্রজা বাস করতে পারবেনা। কোন পলাতককে কারো এলাকায় আশ্রয় দেয়া হবে না।

ঙ. শাহজাদা বাংলা আক্রমণ করলে উভয়ে তা প্রতিরোধ করবে।

---

[৩২] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ৩৩।
[৩৩] A. R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, 2nd ed. (Dhaka: Bangla Academy, 1977), p. 31.
[৩৪] Anil Saxena (ed.), *op. cit.*, Vol. 25, p. 07.
[৩৫] Tara Chand, *History of Freedom Movement in India*, Vol. II (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1983), p. 35.

চুক্তি স্বাক্ষরের পর ১৭৬০ সালের ১৮ অক্টোবর গভর্ণর ভান্সিটার্ট মীর জাফরকে তার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে মীর কাশিমকে ডেপুটি নবাব হিসেবে নিয়োগ দিতে বললে মীর জাফর তাতে অস্বীকৃতি জানায়, ফলশ্রুতিতে কর্নেল কাইলাউট ও মীর কাশিম মুর্শিদাবাদের মীর জাফরের প্রাসাদ অবরোধ করে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করে। উপরোক্ত চুক্তি এবং মীর কাশিমের ক্ষমতায় আরোহন (২০ সেপ্টেম্বর ১৭৬০) থেকে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, নবাব হচ্ছে কোম্পানির হাতের পুতুল। কোম্পানী চাইলে নবাব থাকবে না চাইলে থাকবে না, এ চুক্তি বলে কোম্পানী বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের মত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ জেলার উপর নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হতে থাকে। কোম্পানির সাথে মীর কাশিমের গোপন চুক্তি এদেশে মুঘল শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে।

মীর কাশিম ছিলেন দেশাত্ববোধসম্পন্ন, স্বাধীনচেতা ও সুদক্ষ শাসক। ফলে, অচিরেই ইংরেজদের সাথে নবাবের দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। কোম্পানির কর্মচারীদের শুল্কবিহীন ব্যক্তিগত ব্যবসাকে কেন্দ্র করে নবাব ও কোম্পানির মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে যা যুদ্ধের রূপ নেয়। ১৭৬৩ সালের জুন মাসে যুদ্ধ শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। মীর কাশিম মুঙ্গের, পাটনাসহ কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পলায়ন করেন। অন্যদিকে কোম্পানী ১৭৬৩ সালের জুলাই মাসে মীর জাফরকে পুনরায় মুর্শিদাবাদের নবাব বলে ঘোষণা করে ফলশ্রুতিতে জনগণ ও নবাবের সৈন্যরা সহজেই বিভ্রান্ত হয় যা মীর কাশিমের পরাজয়কে ত্বরান্বিত করে। ১৭৫৭-১৭৬৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে সর্বমোট ৮ টি যুদ্ধ হয়। প্রথম ৭ টি যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মীর কাশিম ১৭৬৪ সালে ত্রিশক্তি আঁতাত করেন।

২.২.৩ বক্সারের যুদ্ধ ও দিউয়ানী লাভ

মীর কাশিমের স্বাধীনচেতা মনোভাব, ইংরেজদের ফরমানের অবমাননা, মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে রাজধানী স্থানান্তর, মীর কাসিমের সামরিক বাহিনীর পূনর্বিন্যাস, ইংরেজদের মিত্র ভাবাপন্ন, কর্মচারী ও জমিদারদের দমন, অস্ত্র-কারখানা নির্মাণ এবং সর্বোপরি অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে শুল্ক প্রথা রহিতকরণ প্রভৃতি কারণে ১৭৬৪ সালের ২২ অক্টোবর মীর কাশিম, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সম্মিলিত বাহিনী ইংরেজ বাহিনীর বিরুদ্ধে বক্সারে মুখোমুখি হয়। তিন মাসব্যাপী এ যুদ্ধে মিত্রবাহিনী পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজরা কেবলমাত্র বাংলার নবাবকে নয়, অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমকে ও চূড়ান্তভাবে পরাজিত করে। এছাড়া ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ভারতে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের পথ প্রশস্ত হয়।

পলাশী যুদ্ধের চরম পরিণতি হলো বক্সারের যুদ্ধ। পলাশীতে যার সূচনা বক্সারে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। পলাশী যুদ্ধের ফলে কোম্পানি অনেক সুযোগ সুবিধা লাভ করে ও ভারতে অকল্পনীয়ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তবে, এই সুযোগসুবিধা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ছিল আকস্মিক, অনায়াসলব্ধ এবং তার স্থায়ীত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল। সিরাজুল ইসলামের মতে-

> The battle of palashi did not bring about an immediate change in the political and economic structure.[৩৬]

বক্সারে জয়ের ফলে ইংরেজদের আধিপত্য হয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। পলাশী যুদ্ধে শুধু সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয় ঘটেনি বরং এতে বাংলার ভাগ্য নির্ধারিত হয়। কিন্তু, বক্সারের যুদ্ধে মুঘল সম্রাট, অযোধ্যার নবাব এবং বাংলার নবাবের একযোগে পতন ঘটে। ফলে, পলাশীর যুদ্ধ বাংলার ভাগ্য নির্ধারণ করলেও বক্সারের যুদ্ধের ফলে গোটা ভারতে তাদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পলাশী যুদ্ধে সামরিক শক্তি দিয়ে নয় বরং বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে তারা জয়ী হয়েছিল আর বক্সারের যুদ্ধ ছিল সামরিক বিজয়।[৩৭] পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজ শক্তির আধিপত্যের সূচনা হলেও যদি বক্সারে ইংরেজদের জয় না হত তাহলে ভারতবর্ষে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। তাই, ঐতিহাসিকগণ বক্সারের যুদ্ধকে চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণকারী যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৮]

এভাবে বলা যায় বক্সারের যুদ্ধের মাধ্যমে ইংরেজদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সামরিক মান মর্যাদা ও প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এ যুদ্ধের মাধ্যমে তাদের আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। এ যুদ্ধের পর ব্রিটিশ শক্তিকে আর নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য যুদ্ধ করতে হয়নি। পরবর্তী যুদ্ধগুলো ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের যুদ্ধ। সর্বোপরি বলা যায় বক্সারের যুদ্ধের পর ইংরেজদের ক্ষমতা হয়ে ওঠে অপ্রতিরোধ্য এবং তারা রাজকীয় স্বীকৃতি লাভের কাছাকাছি এসে পৌঁছে।[৩৯] ডঃ অনীল সাক্সেনা এর মতে-

> The Battle of Buxar was of far greater significance than the Battle of Plassey. The later Battle had been won through treachery rather than a keen contest against a youthful and weaknawab, but the Battle of Buxerwas won by the English after a hard fight against a confederacy of three Indian powers by virtue of their superior military prowess.[৪০]

এ যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় ইংরেজদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার সমস্ত বাধা দূর হয় যা ১৭৬৫ সালে দিউয়ানী লাভের মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পাই। বক্সার যুদ্ধের পর বাংলা তথা সমগ্র উত্তর ভারতের রাজনীতিতে কোম্পানী একটি অদ্বিতীয় শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ১৭৬৫ সালের পর বাংলার আপেক্ষিক অবস্থা ছিল স্বাধীনতা প্রয়াসী নবাব মীর কাশিম চূড়ান্তভাবে পর্যুদস্ত, মীর জাফরের পুত্র নাজমুদ্দৌলা, সাম্রাজ্যহীন সম্রাট শাহ আলম সহায় সম্পদহীন অবস্থায় সুজাউদ্দৌলার হাতে প্রায় বন্দি অর্থাৎ আঞ্চলিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে কোম্পানীই এখন এ অঞ্চলের ভাগ্য বিধাতা আর দেশীয় রাজশক্তিগুলো অবক্ষয়ের আবর্তে জীবন্মৃত। এ

---

[৩৬] Sirajul Islam, *History of Bangladesh 1704-1971*, Vol. 3 (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 1997), p. 57.

[৩৭] Ram Gopal, *How the British Occupied Bengal* (Bombay: Asia Publishing House, 1963), p. 215.

[৩৮] Vincent Smith, *The Oxford History of India* (Oxford: Clarendon Press, 1919), p. 471.

[৩৯] *বাংলাপিডিয়া*, সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত) (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১১), খণ্ড ৮, পৃ. ২৩৭।

[৪০] Anil Saxena, *op. cit.*, Vol. 25, p. 11.

পরিস্থিতিতে রবার্ট ক্লাইভ বাংলা বিহার উড়িষ্যার দিউয়ানী প্রার্থনা করে অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের সাথে একটি চুক্তি সম্পাদন করে যা এলাহাবাদ চুক্তি নামে পরিচিত।

বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল দিউয়ানী লাভ। মুঘল শাসন ব্যবস্থায় প্রত্যেক সুবা বা প্রদেশে নিজামত ও দিউয়ানী নামে দুটি আলাদা শাসন বিভাগ চালু ছিল। সুবেদার বা নাজিমের অধীনে ছিল নিজামত বা সাধারণ সামরিক, বেসামরিক শাসন, প্রতিরক্ষা এবং বিচার আর দিউয়ানী ছিল দিউয়ানের অধীনে, তিনি রাজস্ব সংগ্রহ এবং আর্থিক কর্মকান্ডের দায়িত্বে ছিলেন। সুবেদার এবং দিউয়ান উভয় ব্যক্তিই সরাসরি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে তারা একে অপরকে সাহায্য করতেন কিন্তু, একে অপরের উপর হস্তক্ষেপ করতে পারতেন না। উভয়ই স্ব স্ব কর্মকান্ডের জন্য সম্রাট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকতেন। ১৭১৭ সাল পর্যন্ত এ অবস্থা বিদ্যমান থাকলেও উক্ত সনে মুর্শিদকুলী খান সম্রাট ও কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতার সুযোগে সুবেদারীর সাথে দিউয়ানীর দায়িত্ব ও নিজে দখল করেন। পলাশী যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পর নবাবের নিজামত ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং ইংরেজদের সঙ্গে নতুন নতুন চুক্তি করে নবাব তার নিজামত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে তুলে দেন। তখন থেকে কোম্পানি হয়ে ওঠে দেশের একমাত্র হর্তাকর্তা। পলাশীর মাধ্যমে রাজনৈতিক পরিবর্তনকে স্বীকার করে অসহায় সম্রাট কয়েকবার কোম্পানিকে বাৎসরিক কিছু উপঢৌকনের বিনিময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানী গহণের জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কোম্পানি নানা কারণে সে সময় তা প্রত্যাখ্যান করে। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ করে কোম্পানি নতুন রাজনৈতিক ও সামরিক বলে বলীয়ান হয়ে ওঠে। বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলায় কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে দুর্নীতি ও অব্যবস্থা চরম আকার ধারণ করে। কোম্পানির প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনয়ন এবং বাংলা ও অযোধ্যার নবাবদ্বয় এবং মুঘল সম্রাটের সাথে রাজনৈতিক বন্দোবস্ত স্থাপনের জন্য কোম্পানি কর্তৃপক্ষ রবার্ট ক্লাইভকে লর্ড উপাধি দিয়ে দ্বিতীয়বারের মত গভর্ণর করে ভারতে প্রেরণ করে। তিনি এসে অনুধাবন করেন কোম্পানিই এখন এ অঞ্চলের ভাগ্য বিধাতা। সম্রাট শাহ আলম কোম্পানির আশ্রিত ও অনুগ্রহভাজন নাজমুদ্দৌলা কোম্পানির কৃপায় গদিতে আসীন আর অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা কোম্পানির কৃপাপ্রার্থী। এমতাবস্থায় কোম্পানি দিউয়ানী গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। লর্ড ক্লাইভ (১৭৬৭-৬১,১৭৬৫-৬৬) এলাহাবাদে অবস্থানরত সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে প্রচুর উপহার প্রদান করেন এবং কোম্পানীকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী প্রদানের আবেদন করে। সম্রাট ক্লাইভের আবেদন দুহাত বাড়িয়ে গ্রহণ করেন এবং ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট এক চুক্তিতে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানীর সনদ কোম্পানীকে প্রদান করেন। ফরমান আকারে প্রকাশিত এলাহাবাদের সন্ধি নামে পরিচিত এই চুক্তিতে স্থির হয় যে,

১. কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার দিউয়ানী লাভ করবে এবং বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার জনগণ থেকে কোম্পানী কর আদায় করবে।

২. কোম্পানি সম্রাটকে বার্ষিক ২৬ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। বাংলার নবাব নিজামতের ব্যয় হিসেবে বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা দিবে।

৩. কারা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি সম্রাট শাহ আলমের অধীনে থাকবে যা অযোধ্যার নবাব ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে।

৪. সম্রাট শাহ আলম বেনারস প্রদেশের শাসক হিসেবে বলবন্তসিংহকে পুনঃ অধিষ্ঠিত করবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত শাসক হিসেবে থাকবে যতক্ষণ পর্যন্ত বলবন্তসিংহ কোম্পানীকে রাজস্ব দিবে।

৫. নবাব সুজাউদ্দৌলাকে তার রাজ্য অযোধ্যা ফিরিয়ে দেয়া হবে কিন্তু এলাহাবাদ ও কারা জেলা দুটি তার থেকে নিয়ে নেয়া হবে।

৬. অযোধ্যার নবাব যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানীকে ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। কোম্পানির সাথে নবাবের মিত্রতার সম্পর্ক স্থাপিত হবে।[৪১] এভাবে দিউয়ানী লাভের মাধ্যমে কোম্পানি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হন এবং তাদের ক্ষমতালাভ আইন দ্বারা স্বীকৃত হয়। ফিলিপ জে.স্টার্ন এর মতে-

> The nawab's invasion was regarded by Edmund barke as marking a memorable era in the history of the world; His defeat at the battle of plassey in 1757 came quickly to be considered a revolution and the dewani grant that followed from it in 1765 the moment when, as Thomas pownull put in 1773. The Marchant had become sovereign.[৪২]

দিউয়ানী লাভ কোম্পানির জন্য ছিল এক বিরাট রাজনৈতিক বিজয়। দিউয়ানী কোম্পানিকে দেয় অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা ও রাজনৈতিক আধিপত্য। এর ফলে কোম্পানি নিজের দেউলিয়া অবস্থা থেকে রক্ষা পায়।[৪৩] দিউয়ানী লাভের পূর্বে ইংল্যান্ড থেকে যে বিপুল পরিমাণ পুঁজি (স্বর্ণ-রৌপ্যের আকারে) ভারতে আনতে হত দিউয়ানী লাভের পর আর তা আনতে হয়নি। এছাড়াও তাদের ব্যবসার সমস্ত পুঁজি বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় উদ্বৃত রাজস্ব থেকেই সংগৃহীত হত। দিউয়ানী লাভের গুরুত্ব জানিয়ে রবার্ট ক্লাইভ কোর্ট অব ডাইরেক্টরসকে জানান, এর ফলে কোম্পানি ও নবাবের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বের চির অবসান ঘটল। নবাব এখন কোম্পানির পেনশনভোগী মাত্র; বাদশাও তাই। সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানির হাতে। দিউয়ানী লাভের পর কোম্পানির যে আয় হবে তা দিয়ে কোম্পানির সমস্ত খরচ মিটিয়ে ব্যবসার সমস্ত পুঁজি সংগ্রহ করা সম্ভব।[৪৪]

দিউয়ানী লাভের ফলে এ অঞ্চলের রাজস্বে একদিকে যেমন কোম্পানি শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তোলে তেমনি ভারতে রাজ্যবিস্তারের পথ সুগম হয়। এই দিউয়ানীই কালক্রমে ইংরেজদেরকে সারা ভারতে তথা দক্ষিণ এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের সুযোগ এনে দেয়। এভাবে কোম্পানি বাংলা বিহার ও উড়িষ্যায় দিউয়ানী লাভের মাধ্যমে দক্ষিণ

---

[৪১] Ram Gopal, *op. cit.,* pp. 345-347.
[৪২] Philip J. Stern, *The Company State* (New York: Oxford University Press, 2011), p. 207.
[৪৩] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৪৫।
[৪৪] W.K Firminger, *op. cit.,* pp. 162-163.

এশিয়ায় সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রাথমিক পর্বের সমাপ্তি ঘটান। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সমন্বয়ে গঠিত সুবা বাংলায় সর্বপ্রথম ইংরেজদের ক্ষমতার আওতাভুক্ত হয়।[৪৫] ঐতিহাসিক তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

> The most Important stepundertaken in Bengal was the assumption of diwani. The assumption of diwanicontained some baneful effect too, the company collected the revenue, While theNawab was left with full responsibility to administer the province and maintainlaw and order.[৪৬]

সর্বোপরি বলা যায়, ধর্মপ্রচার ও বাণিজ্য এই দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে আগত ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করে ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল বরাবর কয়েকটি ঘাঁটি স্থাপন করে প্রথমে ব্যবসা বাণিজ্য এবং এদেশ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের কাজ শুরু করে। পরে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতার সুযোগে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে সচেষ্ট হয়। ফরাসি, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি বাণিজ্যসংস্থাকে একে একে বিতাড়িত করে ব্রিটিশরা শক্তিমান হয়ে ওঠে। আর এভাবেই উইলিয়াম হেজেজ ও জব চার্নক ভারতে ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার যে স্বপ্ন দেখেন তা অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পূর্ণতা লাভ করে। কোম্পানী দিউয়ানী লাভের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে এবং কোম্পানী তাদের কর্মকান্ডের আইনগত বৈধতা লাভ করে। রাম গোপালের মতে,

> The Company were the masters of the revenues and he was head of the government. It was a Sailent revolution.[৪৭]

দিউয়ানী লাভের ফলে নবাব কোম্পানির পুতুল এবং পেনশনের পাত্রে পরিণত হয়। দিউয়ানী লাভের পর কোম্পানীকে এদেশীয় শাসক শ্রেণীর সাথে আর কোন চুক্তি স্বাক্ষর করতে হয়নি। দিউয়ানী লাভের ফলেই কোম্পানি এদেশের রাজস্ব প্রশাসন এবং রাজস্ব প্রশাসনের আড়ালে রাজনৈতিক উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ঐতিহাসিক এম.এ রহীম বলেন

> The grant of Diwani gave the authority to revenue collection and administration of Bengal to the company which had already assumed the military control of the province.[৪৮]

২.৩ ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন ক্রম-সম্প্রসারণের গতি-প্রকৃতি

১৬০০ সালে ইংল্যান্ডের রাণী এলিজাবেথ (১৫৫৮-১৬০৩) কর্তৃক প্রদত্ত সনদের মাধ্যমে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাণিজ্যিক কার্যাবলী পরিচালনার জন্য কর্মচারী নিয়োগ ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। কিন্তু,

---

[৪৫] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *বাংলার ইতিহাস: ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনাপর্ব (১৬৯৮-১৭১৪)* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯), পৃ. ৫৯।

[৪৬] Tripta Desai, *The East Indian Company. A Brief Survey from 1599-1857* (New Delhi: Kanak Publications, 1984), p. 187.

[৪৭] Ram Gopal, *op. cit.,* p. 347.

[৪৮] M.A. Rahim, *op. cit.,* p. 17.

পরবর্তীতে ব্যবসা বাণিজ্য প্রসার লাভ করলে ১৬৬১ ও ১৬৭৬ সালের সনদ অনুযায়ী কোম্পানিকে বিভিন্ন দেশ বিজয়, দূর্গ নির্মাণ এবং স্বীয় নামে মুদ্রা প্রচলন ও সৈন্যবাহিনী গঠনের ক্ষমতা দেয়া হয়।[৪৯] ইংল্যান্ডে House of Proprietor বা মালিকদের সভা এবং Court of directors বা পরিচালকদের সভা নামে দুটি সমিতি কোম্পানির কার্যক্রম পরিচালনা করত। ডিরেক্টর সভায় মোট ২৪ জন সদস্য ছিলেন যারা শেয়ার হোল্ডারদের ভোটে বাৎসরিক নির্বাচিত হতেন এবং তারাই প্রকৃতপক্ষে কোম্পানির যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনা করতেন।[৫০] ১৭৫৭ সালে তথাকথিত পলাশীর এবং ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে জয়ের মধ্যে দিয়ে রবার্ট ক্লাইভের অধিনায়কত্বে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার তথা ভারত বর্ষের রাজনীতির মঞ্চে প্রথম আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানি ১৭৬৫ সালে মুঘল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা বিহার ও উড়িষ্যার দিউয়ানী তথা রাজধানী দিল্লী থেকে বহুদূরে অবস্থিত তিনটি মুঘল সুবার যাবতীয় রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পাওয়ার মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে ভূমি দখল করার যে প্রক্রিয়া অব্যহত ছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে। যদিও তখন পর্যন্ত সাধারণ প্রশাসনযন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা পরিচালনার ভার ও ক্ষমতা ছিল নবাবের হাতে। কোম্পানির দায়িত্বহীন ক্ষমতা এবং নবাবের ক্ষমতাহীন দায়িত্ব গ্রহনের এইরূপ শাসন ব্যবস্থা দ্বৈত শাসন বা Duel Government নামে পরিচিত। এই দ্বৈত শাসনের ফলে কয়েক বছরের মধ্যে বাংলার কৃষি, শিল্প এবং ব্যবসা বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়[৫১] এবং ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। "ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" নামে পরিচিত এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় ১ কোটি মানুষ মারা যায়। শাসনব্যবস্থায় এরূপ চরম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ব্রিটিশ সরকার ওয়ারেন হেস্টিংসকে (১৭৭২-৮৫) ভারতের গভর্ণর জেনারেল করে প্রেরণ করেন। তিনি এসেই দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসান ঘটান এবং শাসনব্যবস্থার সংস্কার করেন।[৫২] কোম্পানির সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে হেস্টিংস ক্লাইভের মুখোশ নীতির পক্ষপাতি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন যে তরবারির বলে কোম্পানী বাংলায় রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেছে এবং তরবারির বলেই তা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। এ সত্যের মাঝামাঝি আর কোন সত্য নেই।[৫৩]

হেস্টিংস তার সংস্কার নীতি বাস্তবায়নে এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, দেশের সার্বভৌমত্ব এখন সর্বতোভাবে কোম্পানির হাতে, মুঘল সম্রাটের হাতে নয়। এলাহাবাদ চুক্তি অনুযায়ী দারিদ্রপীড়িত সম্রাট শাহ আলমের প্রাপ্ত বাৎসরিক বরাদ্দ হেস্টিংস বন্ধ করে দেন। বাদশাহর নিকট থেকে কোন উপাধি বা খেলাত গ্রহন করতেও তিনি অস্বীকার করেন।[৫৪] সম্রাট শাহ আলম চুক্তিমাফিক বাৎসরিক করদানের জন্য চাপ দিতে থাকলে হেস্টিংস সম্রাটকে জানিয়ে দেন যে, বাংলার আয় থেকে এক পয়সাও বাংলার বাইরে প্রেরণ করতে তিনি অপারগ।[৫৫]

---

[৪৯] Ramkrishna Mukharjee, *op. cit.*, p. 75.
[৫০] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ১৫৯।
[৫১] Anil Saxena, *op. cit.*, Vol. 24, p. 21.
[৫২] *Ibid*., p. 217.
[৫৩] Hestings Minute, 12 October 1772, উদ্ধৃত, *Cambridge History of India*, Vol. 5, p. 597.
[৫৪] Jones Monckton, *Hestings in Bengal: 1772-1774* (Oxford: Clarendon Press, 1918), p. 147.
[৫৫] Hestings to Shah Alam, 13 September, 1773, উদ্ধৃত, G.W. Forrest, *Selections from the Letters, Despatches, etc.* in the Foreign Department of the Government of India, 1772-85 (1890), Vol. 1, p. 58.

সন্ধি মোতাবেক সম্রাটকে কর দানে অস্বীকৃতি জানানো রীতিমতো স্বাধীনতা ঘোষণার সামিল। এরপর কোম্পানির উপর সম্রাটের লেশমাত্র কোন কর্তৃত্ব বিরাজমান বলা যায় না। দিল্লীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ছাড়াও ওয়ারেন হেস্টিংস আরও অনেক সংস্কার আনয়ন করেন, যা সার্বভৌমত্বকেই প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ করে। তিনি নায়েবে দিউয়ানের পদ বিলুপ্ত করে শাসনকার্যে সর্বত্র ইউরোপীয় অফিসার নিয়োগ করেন। রাজস্ব শাসনের সমস্ত কার্যালয় মুর্শিদাবাদ থেকে সরিয়ে কলকাতায় স্থাপিত করেন। দিউয়ানী ও নিজামত আদালত কলকাতায় স্থানান্তরিত করেন। এসব আদালতের বিচারকগণ ও হেস্টিংস কর্তৃক নিযুক্ত হন। হেস্টিংসের কথায় "নবাব এখন সম্পূর্ণভাবে কোম্পানির আজ্ঞাবহ"।[৫৬]

হেস্টিংস বলেন- ব্রিটিশের ক্ষমতাকে রহস্যাবৃত রাখার জন্য যত কলাকৌশলই প্রয়োগ করা হউক না কেন, বিনয় ও ভদ্রতার ভান যতই করা হউক না কেন, ইহা সবার জানা যে, সত্যিকার ক্ষমতা এখন কোম্পানির হাতে আর সে ক্ষমতা নবাবকে ফিরিয়ে দেয়া একটি অবাস্তব প্রস্তাব। ইহা দিবালোকের মত সত্য যে, কোম্পানীই সব ক্ষমতার উৎস; নবাব ক্ষমতার দিক দিয়ে তার ছায়া মাত্র, এমনকি নবাবের নগণ্য চাকর বাকর পর্যন্ত সুপারিশ ও অনুমোদন ছাড়া নিযুক্ত হয়না।[৫৭]

২.৩.১ ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এ্যাক্ট

বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন ও দায়িত্ব সংজ্ঞায়িত করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রণীত প্রথম সাংবিধানিক আইন হল ১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং এক্ট বা নিয়ন্ত্রক আইন।[৫৮] এতদিন ভারতে কোম্পানির শাসনকার্যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হস্তক্ষেপ করেনি। ডিরেক্টর সভা দুটিই ভারত সংক্রান্ত সকল কার্য স্বাধীনভাবে নির্বাহ করত। বাংলা জয়ের পূর্বে কোম্পানি একটি লাভজনক প্রতিষ্ঠান ছিল। কিন্তু, বাংলা বিজয়ের পর কোম্পানির কর্মকর্তা কর্মচারীদের লুটপাটের কারণে শাসনকার্যে একদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় অন্যদিকে কোম্পানি লোকসানে দেউলিয়া হয়ে পড়ে। ঐতিহাসিক তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

> From 1767-1769, The financial difficulties of the company became very serious.[৫৯]

ফলে, ইতিপূর্বে কোম্পানি ব্রিটিশ সরকারকে বাৎসরিক ৪৫.৭ মিলিয়ন পাউন্ড প্রদান করলেও ১৭৬৮ সাল থেকে কোম্পানি তা প্রদানে ব্যর্থ হয় এবং কোম্পানির লোকসানের অবসান ঘটানোর উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ সরকারের কাছে ১ মিলিয়ন ঋণের আবেদন করে।[৬০] এমতাবস্থায় কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি, দ্বৈত শাসনের ফলে

---

[৫৬] Hestings to Court, *Bengal Secret Consultations*, 6 January 1773.
[৫৭] Hestings Minute, *Bengal Secrert Consultation*, 7 December 1775.
[৫৮] *বাংলাপিডিয়া*, ১২তম খণ্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০১১), পৃ. ২২৩।
[৫৯] Tripta Desai, *The East India Company: A Brief Survey from 1599-1857* (New Delhi: Kanak Publications 1984), p. 187.
[৬০] *Encyclopaedia Britanica*, Vol. 21, p. 87.

শাসন ব্যবস্থার জটিলতা, সুষ্ঠু বিচার ব্যবস্থার অভাব, কোম্পানির কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের অভাব, ১৭৬৯ সালে ইঙ্গ-মহীশুরের যুদ্ধে হায়দার আলীর নিকট কোম্পানির পরাজয় এবং সর্বোপরি ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ফলে ব্রিটিশ সরকার কোম্পানি ও কোম্পানির নব বিজিত রাজ্যটিকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাতে কোম্পানির ব্যবসা বাণিজ্যের উপর হস্তক্ষেপ করা আবশ্যক মনে করে। আর ১৭৭৩ সালে কোম্পানির সনদ নবায়নের সময় এ সুযোগ এসে যায়।[৬১]১৭৭৩ সনে কোম্পানির বঙ্গরাজ্য বিষয়ে পার্লামেন্টে আলোচিত হয়। আলোচনায় দাবি করা হয় যে "কোম্পানির বঙ্গরাজ্য আসলে ব্রিটেনের সম্পত্তি।[৬২]

১৭৭৩ সালের ১৮ মে বৃটেনের ১১ তম প্রধানমন্ত্রী লর্ড নর্থ (১৭৭০-১৭৮২) কোম্পানির সংবিধান পরিবর্তনের জন্য হাউজ অফ কমন্সে রেগুলেটিং বিল উপস্থাপন করেন। একই গণের ১০ শে জুন রেগুলেটিং আইন পাশ হয়। অবশেষে ২১শে জুন লর্ড সভার রাজকীয় সম্মতির মাধ্যমে এটিকে আইনে পরিণত করা হয়। আইনটির বিভিন্ন অনুচ্ছেদ বা ধারায় ৬৪ টি অধ্যায় ছিল।[৬৩] কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ও নতুন রাষ্ট্রের প্রশাসন কিভাবে পরিচালিত হবে সে বিষয়ে রেগুলেটিং এক্টে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। এর মাধ্যমে দুটি সমান্তরাল বিষয়ের জন্ম হয়। (ক) কোম্পানী ব্যবস্থাপনায় ধীরে ধীরে সরকারি (ব্রিটিশ) নিয়ন্ত্রণ প্রবেশ করে (খ) ১৮৫৮ সালে কোম্পানির সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হওয়া পর্যন্ত সময়ে কোম্পানির ক্ষমতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

রেগুলেটিং আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ভারতে কোম্পানিকে তার অবস্থান ও ক্ষমতা ধরে রাখার অনুমতি দেয়া হবে। তবে, সকল ব্যবস্থাপনা ব্রিটিশ সরকারের অধীনে আনা হয়। এই আইন হওয়ার কাল থেকেই পার্লামেন্ট সরাসরি ভাবে ভারতের শাসনকার্যে হস্তক্ষেপ করতে থাকে এবং ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রজাবৃন্দের ও শুভাশুভের দায়িত্ব ক্রমশ গ্রহণ করে।[৬৪] হেস্টিংসের জীবনীকার L. J Trotterবলেন,

> The regulating Act of 1773 was the first serious attempt made by Britinsh Lagislature to set up in India A form of govrnment suitable to changes conditions of the company's official work.[৬৫]

১৭৭৩ সালের Regulating Act শুধু কলকাতা শহর ও শহরতলীর উপর ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করে এবং এর বাইরের ভূখন্ডের উপর সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে সে আইন নিশ্চুপ থাকে। কোম্পানি কর্মকর্তাদের অসদাচরণ ও দুর্নীতি দমন করে স্বদেশীদের কল্যাণের জন্য এ নিয়ন্ত্রক আইন প্রণীত হলেও দেখা যায় যে, এ বিধানগুলো দুর্নীতি দমন করতে ব্যর্থ হয় এবং সর্বোচ্চ গভর্ণর জেনারেল থেকে শুরু করে নিম্নস্তর জেলা

---

[৬১] *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, ১২তম খন্ড, পৃ. ২২৩।
[৬২] *Journals of the House of Commons*, Vol. xxxiv, p. 308.
[৬৩] কাবেদুল ইসলাম, *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পুনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭* (ঢাকা: এডর্ন, ২০১০), পৃ. ৩২।
[৬৪] ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০; Vincent Smith, *Oxford History of India*, p. 521.
[৬৫] L.J. Trotter, *Waren Hastings* (United Kingdom: Baker Press, 2009), p. 75.

কর্মকর্তাদের মধ্যে ঢালাওভাবে দুর্নীতি আসতে থাকে।[৬৬] এছাড়া শাসন বিভাগ ও বিচার বিভাগের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এভাবে দেখা যায়, এই আইনসমূহ ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় পরিবর্তনের পরিবর্তে কোম্পানির কর্মচারীদের মধ্যে ব্যাপক আকারে দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ সৃষ্টি করে।

২.৩.২ ১৭৮৪ সালের পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট

ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ইংল্যান্ডের ব্রিটিশ সরকার কোম্পানির কার্যকলাপের উপর খুব একটা সন্তুষ্ট ছিল না। কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একাধিক আইন প্রণয়ন করে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- পিটের ভারত শাসন আইন বা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন, ১৭৮৪। রেগুলিং এ্যাক্টের প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল। প্রথমটি হল ব্রিটিশ প্রশাসনিক নীতি অনুযায়ী রাজ্য পরিচালনা করা এবং দ্বিতীয়টি হল কোম্পানির কর্মচারীদের লাগামহীন দুর্নীতি দূর করা। কিন্তু, উদ্দেশ্য সাধনে আইনটি অকার্যকর প্রমাণিত হয়।[৬৭] দশ বছর চালু থাকার পর এ আইনের অনেক ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়। ফলে রেগুলেটিং আইন সংশোধন করে একটি যুগোপযোগী আইন প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজনীয়তা থেকেই রেগুলেটিং এ্যাক্টের ত্রুটিগুলো দূর করার উদ্দেশ্যে ১৭৮৩ সালে চার্লস জেমস ফক্স এবং লর্ড নর্থ কোয়ালিশন সরকার একটি বিল উত্থাপন করেন।[৬৮] কিন্তু, লর্ডসভা কর্তৃক বিলটি প্রত্যাখ্যাত হয়। ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট (Pitt tre younger) ইন্ডিয়া এ্যাক্ট নামে আরেকটি ভারত শাসন আইন পার্লামেন্টে পাশ করেন।

এই আইন অনুসারে বোর্ড অব কন্ট্রোল নামে ইংরেজ রাজা কর্তৃক মনোনীত মন্ত্রী পরিষদের একজন সিনিয়র সদস্যকে প্রধান করে সর্বোচ্চ ৬ জন পার্লামেন্ট সদস্য নিয়ে গঠিত একটি পরিষদের উপর ভারতের শাসনভার ন্যস্ত হয়। এর কাজ হবে ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজ্য পরিচালনার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। কোম্পানির সমস্ত কাগজপত্রে এর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কোর্ট অব প্রোপাইটার্স এর ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস করা হয়।[৬৯] গভর্ণর জেনারেল পরিষদের সদস্য সংখ্যা চারজন থেকে কমিয়ে তিনজন করা হয়। এদের মধ্যে একজন থাকবেন ভারতবর্ষের রাজার সেনাবাহিনীর কমান্ডার ইন চীফ। পিটের ভারত শাসনে আরও বলা হয় চাকুরীতে যোগদানের দু মাসের মধ্যে সব সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাকে ভারত ও বৃটেনে তাদের যাবতীয় সম্পদের একটি পূর্ণ তালিকা কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের নিকট পেশ করতে হবে।[৭০] এভাবে কোম্পানির সর্বোচ্চ ক্ষমতা পরিষদের হাতে চলে যায় আর ডাইরেক্টরদের হাতে শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব কর্মচারীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করা সংক্রান্ত ক্ষমতা অবশিষ্ট থাকে।[৭১] তৃপ্ত দেশাই এর মতে-

---

[৬৬] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১২, পৃ. ২২৩।
[৬৭] *তদেব*, পৃ. ৩৫৮।
[৬৮] Tripta Deshai, *op. cit.*, p. 192.
[৬৯] *Ibid.*, p. 228.
[৭০] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৭, পৃ. ৩৫৮।
[৭১] ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।

> According to the Act of 1784, The commerce and the political affairs of the company were separated by leaving the company in full control of commerce while the board exercised control on political affairs.[৭২]

অন্য দিকে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তে বলা হয়েছে-

> Its essence was the institution of a dual control. The directors were left in charge of commerce and as political executants, but they were politically superintended by a new Board of control.[৭৩]

পিট ইন্ডিয়া এক্টের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা তে বলা হয়েছে

> Pitt's India Act proved to be a landmark because it gave the British government control of policy without patronage.[৭৪]

১৭৮৪ গণের ভারত আইনে সার্বভৌমত্বের প্রশ্নটি অমীমাংসিত থেকে যায়। এই আইন বাস্তবায়ন করার জন্য পার্লামেন্টে লর্ড কর্ণওয়ালিশকে সরাসরি নিয়োগ দান করে।

২.৩.৩ কোম্পানির সনদ আইন ১৭৯৩, ১৮১৩, ১৮৩৩ ও ১৮৫৬

১৭৮১ সন থেকে হেস্টিংসের সব সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করা। সদর দিউয়ানী আদালত ও সদর নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করে তিনি পরোক্ষভাবে সার্বভৌমত্বই ঘোষণা করেন। হেস্টিংস সার্বভৌমত্বের চূড়ান্ত রূপরেখা রচনা করেন। তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন লর্ড কর্ণওয়ালিস।১৭৯০-৯৩ সনে লর্ড কর্ণওয়ালিস একটি পূর্ণাঙ্গ শাসনতন্ত্র রচনা করেন। সে শাসনতন্ত্রে পরিস্কার ঘোষণা করা হয় যে, দেশের সার্বভৌম কর্তা হলো ইংরেজ।[৭৫] ১৭৯৩ সালের ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আইন (যেটি চার্টার সনদ, ১৭৯৩ নামে পরিচিত) ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক কোম্পানির সনদ নবায়নের উদ্দেশ্যে প্রণীত একটি আইন। George D. Bearce এর মতে-

> From 1784 to 1813 parliament passed almost no significant legislation relating to the East India Company or to India. A Charter Act of 1793 slightly attend the commercial system of India.[৭৬]

এ আইনে ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসন পদ্ধতি ও কর্মকান্ডের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির সামান্য পরিবর্তন আনা হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল এ সনদে বেসরকারি ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের চাপে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য করার অধিকার কিছুটা শিথিল করা হয়। কোম্পানির জাহাজগুলোতে বেসরকারি

---

[৭২] Tripta Deshai, *op. cit.*, p. 234.
[৭৩] *Encyclopaedia Britanica*, Vol. 21, p. 88.
[৭৪] *Ibid.*
[৭৫] N.K. Sinha, *The History of Bengal 1757-1905* (Calcutta: University of Calcutta, History of Bengal Publication Committee, 1967), pp. 80-81.
[৭৬] George D. Bearce, *British Attitudes Towards India, 1784-1858* (London: Oxford University Press, 1961), p. 36.

ব্যবসায়ীদের মালামাল পরিবহন করার জন্য সংরক্ষিত স্থান রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া এই সনদে আরও যে বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয় তাহল-

ক. গভর্ণর জেনারেল, গভর্ণর এবং কমান্ডার ইন চীফ নিয়োগের ক্ষেত্রে রাজকীয় অনুমোদন বাধ্যতামূলক করা হয়।

খ. সিনিয়র কর্মকর্তাদের অনুমতি ছাড়া ভারত ত্যাগের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

গ. অধীনস্থ প্রদেশ সমূহের উপর গভর্নরের ক্ষমতার অনুমোদন দেয়া হয়।

১৭৯৩ সালের সনদ আইন কোম্পানির অবস্থান পুনঃনির্ধারণ করে। এভাবে কোম্পানির উপর ব্রিটিশ সরকারের ক্ষমতা ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং কোম্পানির রাজনৈতিক কর্মকান্ড হ্রাস পেতে থাকে। পরবর্তীতে ১৮১৩ সালের সনদ আইন অনুযায়ী কোম্পানির সনদ নবায়ন করা হয়।

ভারতে কোম্পানির ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র একটি অনিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া এবং মুক্ত বাণিজ্যের ব্যবসায়ীদের প্রভাব বৃদ্ধি পাওয়ায় পার্লামেন্ট কোম্পানির স্বার্থ হানিকর কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট (১৭৬৯-১৮২১) এর ১৮০৬ সালের বার্লিন ঘোষণা এবং ১৮০৭ সালের মিলান ঘোষণার মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও তার ঔপনিবেশগুলোর সাথে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ করে মহাদেশীয় ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এমতাবস্থায় ইউরোপীয় বণিকরা কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়[৭৭] এবং সরকারের নিকট এশিয়ার বন্দরে প্রবেশ করার ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার খর্ব করার আবেদন করে। কিন্তু, কোম্পানি তার রাজনৈতিক এবং বাণিজ্যিক সুবিধা বিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করলে ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে উপমহাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের উপর কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার রহিত করে ভারতকে অগাধ বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত করা হয়। কোম্পানি অবশ্য তখনও চীনের সাথে বাণিজ্যের একচেটিয়া সুবিধা ধরে রাখতে সক্ষম হয়। এ আইনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সম্পদের উপর রাজকীয় সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৭৮] এছাড়া এই আইনের মাধ্যমে খৃষ্টান মিশনারীদেরকে ভারতে ধর্মপ্রচারের সুযোগ দেয়া হয়। তৃপ্ত দেশাই এর মতে

> The charter Act of 1813 greatly weekend the position of the directors, as the board's power were greatly increased.[৭৯]

১৮১৩ সালের সনদের ফলে একটি বাণিজ্যিক সংগঠন হিসেবে কোম্পানিকে বাজার নিয়ন্ত্রণকারী অন্যান্য শক্তিগুলোর সাথে কাজ করতে হয়েছে। ভারতীয় বাজারে প্রতিযোগিতায় অভ্যস্ত না হওয়ায় কোম্পানি বাণিজ্যিকভাবে ক্রমান্বয়ে একটি দুর্বল সংগঠনে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ১৮৩৩ সালে কোম্পানির সনদ পুনরায় নবায়ন করা হয়।

---

[৭৭] Tripta Deshai, *op. cit.*, p. 251.

[৭৮] ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬১।

[৭৯] Tripta Deshai, *op. cit.*, p. 253.

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে দেওয়া বিভিন্ন সনদ আইনের মধ্যে ১৮১৩ এবং ১৮৩৩ সালের সনদ আইন দুটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৩৩ সালের সেন্ট হেলেনা আইন বা সনদের মাধ্যমে কোম্পানিকে পুনরায় ২০ বছরের জন্য ভারতে বাণিজ্য করা ও কোম্পানি কর্তৃক অধিকৃত রাজ্য ইংল্যান্ডের রাজার পক্ষে পরিচালনা করার অনুমোদন দেয়া হয়। এ আইনের ফলে চীনের সাথে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য সুবিধা বাতিল করা হয়। বাংলার গভর্ণর জেনারেলকে সমগ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়। এ আইনের ফলে লর্ড বেন্টিংক প্রথম সমগ্র ভারতের গভর্ণর জেনারেল হন। এ আইনবলে গভর্ণর জেনারেল সমগ্র ব্রিটিশ ভারতের আইন প্রণয়নের ক্ষমতা পান। এভাবে সনদটির মাধ্যমে কোম্পানিকে অন্যদের সাথে একই সমতলে অবস্থান দিয়ে প্রতিযোগিতার পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়।[৮০] এরপর থেকে কোম্পানি রাজার পক্ষে একটি প্রশাসনিক প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে থাকে। কোম্পানির সর্বশেষ সম্মান ও সুবিধাটি ছিল ডাইরেক্টর কর্তৃক সিভিল সার্ভিসে ক্যাডেট মনোনীত করা। তৃপ্ত দেশাই এর মতে

> After this charter act the company lost all the commercial privileges, Now It was left only with administrative duties which it retained till 1857.[৮১]

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জন্য প্রণীত ১৮৫৩ সালের সনদ আইন হচ্ছে সর্বশেষ সনদ আইন। যেটি ১৮৩৩ সালের সনদ আইনের মেয়াদোত্তীর্ণের সময় প্রদান করা হয়। অন্যান্য সনদ আইনের সাথে এর ব্যতিক্রম হল এর মাধ্যমে কোম্পানির সনদ নবায়ন করা হলেও এতে নবায়নের কোন নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করা হয়নি। ১৮৫৩ সনের সনদ আইন কোম্পানির বাণিজ্য অধিকার ও পৃষ্ঠপোষকতা জনিত বিশেষ সুবিধা সব বিলোপ করা হয়।[৮২] এখন থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে মেধার ভিত্তিতে সিভিলিয়ান নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়।[৮৩] ডাইরেক্টরদের সংখ্যা ২৪ থেকে ১৮ তে কমানো হয়; যার মধ্যে ৬ জন নিয়োজিত হবেন রাজা কর্তৃক। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার প্রশাসনিক দায়িত্ব একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নরের উপর ন্যস্ত করা হয়। কাউন্সিল পুনর্গঠন করে এর সদস্য সংখ্যা ৬ থেকে বাড়িয়ে ১২ সদস্যে সীমিত করে দেয়া হয়। গভর্ণর জেনারেলের সম্মতি ছাড়া কোন আইন পাশ না করার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া উপমহাদেশের আইনসমূহকে বিধিবদ্ধ করার জন্য লন্ডনে একটি আইন কমিশন নিয়োগ করা হয়।[৮৪] ১৮৫৩ সাল থেকে কোম্পানি পার্লামেন্ট কর্তৃক বেধে দেয়া নিয়মানুযায়ী ইংল্যান্ডের রাজা ও পার্লামেন্টের পক্ষে ভারত শাসন করার বিধান করা হয়। কোম্পানির প্রকৃত ক্ষমতা বলতে এখন তেমন আর কিছুই রইল না।[৮৫] ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা এবং দুই শত বছর ধরে বৃটেনের সবচেয়ে বড় সংগঠন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এরপর একটি খোলসে পরিণত হয় এবং ১৮৫৭

---

[৮০] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১৭।
[৮১] Tripta Deshai, *op. cit.*, p. 253.
[৮২] *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৭।
[৮৩] *Britanica*, Vol. 21, p. 88.
[৮৪] ইনামুল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।
[৮৫] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৪, পৃ. ৩১৭।

সালের সিপাহী বিপ্লবের পর ১৮৫৮ সালে রাণীর ঘোষণার মাধ্যমে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আনুষ্ঠানিকভাবে বিলুপ্ত হয়।

২.৩.৪ ১৮৫৮ সালের গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট

১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট বৃটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন (১৮৫৫-৫৮) এর উদ্যোগে গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট নামে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি নতুন আইন পাশ করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে ভারতে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।[৮৬] এ আইন ছিল ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের প্রত্যক্ষ ফল। এ বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এটি ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তার কার্যকারিতা ও সক্ষমতা অনেক আগেই হারিয়ে ফেলেছিল। ফলে, ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করে যে, ভারতের শাসন ক্ষমতার ওপর সরাসরি ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এই প্রয়োজনীয়তা ও ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার ইন্ডিয়া এ্যাক্ট ১৮৫৮ প্রণয়ন করে। এ আইনের মাধ্যমে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে রাজ শাসন প্রতিষ্ঠা করা হয়। সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কোম্পানির কর্মচারীরা সংকল্প প্রকাশ করে এদেশকে তাদের অধীনস্থ করার জন্য। আর সে প্রতিজ্ঞা পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে এসে। এ সময়কালে মুঘল রাজশক্তির পতনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় কোম্পানির আধিপত্য ও সবশেষে ঘোষিত হয় ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব।

---

[৮৬] এমাজউদ্দীন আহমদ, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা* (ঢাকা: ২০১০), পৃ. ৬০৯।

তৃতীয় অধ্যায়

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকারের মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতি ও মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া

১৬০০ থেকে ১৮০০ সালের মধ্যবর্তী সময় ভারতের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের যুগ। প্রায় সাড়ে পাচঁশত বছর (১২০৬-১৭৫৭ খ্রিঃ) পর্যন্ত ভারত শাসন করার পর মুসলমানরা ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে ভারতের শাসনক্ষমতা হারায়। ভারতের শাসনভার গ্রহণ করে কোম্পানি দুটি প্রধান ধর্মীয় গোষ্ঠী হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং মুসলমানদের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির সকল উৎসগুলো বন্ধ করে দেয়। ডব্লিউ.ডব্লিউ হান্টার এর ভাষায়

> The Muslims were shut out from the military commend, the collection of the revenue and judicial and political employment which served as the great source of their wealth and prosperity during Muslim rule.[১]

ভারতবর্ষে কোম্পানির শাসন পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে ধীরে ধীরে অথচ ধারাবাহিকভাবে বাণিজ্য বিস্তার, বিচার ব্যবস্থার সংস্কার, প্রশাসনিক কর্মকান্ডের পুনর্গঠন, ভূমি-ব্যবস্থায় পক্ষপাতমূলক নীতিগ্রহণ, শিক্ষাব্যবস্থার পাশ্চাত্যকরণ প্রভৃতি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মাধ্যমে তারা যেমন একদিকে মুসলমান শাসক শ্রেণীকে ক্রমান্বয়ে ক্ষমতাহীন সম্প্রদায়ে পরিণত করে তেমনি অন্যদিকে তাদের ক্ষমতাকে স্থায়ী ও পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু সম্প্রদায়কে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে উন্নত জনগোষ্ঠীতে রূপান্তরের প্রয়াস পায়। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির গৃহীত এসব পদক্ষেপের ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজন সার্বিকভাবে লাভবান হলেও এর ফলে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত মুসলিম জনসমাজের অবস্থা ক্রমান্বয়ে শোচনীয় হতে থাকে। একদিকে কোম্পানি সরকারের নির্যাতন অন্যদিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সৃষ্ট হিন্দু সম্প্রদায়ের শোষণ, নিপীড়ন প্রভৃতি কারণে মুসলিম জনগোষ্ঠী এক পশ্চাদপদ ও নির্জীব জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এ অবস্থা অব্যহত থাকে।

৩.১ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনামলে গৃহীত মুসলিম স্বার্থবিরোধী নীতিসমূহ

৩.১.১ বাণিজ্যনীতি ও এর আর্থ-সামাজিক প্রভাব

ভারত উপমহাদেশে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে বাণিজ্যনীতি ছিল সর্বপ্রথম পদক্ষেপ। বস্তুতঃ বাণিজ্যের মাধ্যমেই এ উপমহাদেশে কোম্পানির কার্যক্রম শুরু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিকে বাংলার আমদানি ও রপ্তানী বাণিজ্য ছিল ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্নদেশ থেকে আগত বিদেশী বণিকদের হাতে। তবে, এ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরেজ কোম্পানি ব্যবসা বাণিজ্যে একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে।[২]

---

[১] W.W. Hunter, *The Indian Musalmans* (London: Trubner and Company, 1876), p. 150.
[২] S. Vattacharya, *The East India Company and The Economy of Bengal from 1704-1740* (Calcutta: K.L. Mukhopadhyy, 1969), p. 140.

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে, এশিয়া বিশেষ করে ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপক বাজার তৈরী করে। এ সময় কোম্পানির বাণিজ্য ছিল প্রধানতঃ দুই ধরণের। একটি হল আন্তর্জাতিক অপরটি হল আন্তঃএশীয়। এছাড়া প্রাদেশিক ও উপকুলীয় বাণিজ্যে ও কোম্পানি অগ্রগতি লাভ করে। প্রাদেশিক বাণিজ্য উত্তর ভারতের সাথে আর উপকূলীয় বাণিজ্য চট্টগ্রাম ও হুগলীর সঙ্গে চালু ছিল। এডেন ও গোয়াতে ও কোম্পানির বাণিজ্যিক তৎপরতা ছিল। কোম্পানি প্রধানত সুতি বস্ত্র, রেশম সুতা, কাঁচা রেশম, লবণ ও বিভিন্ন মশলা ইউরোপে বিশেষ করে ইংল্যান্ডে নিয়ে যেত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে উৎপাদিত এবং আড়ং-এ আসা পণ্যদ্রব্য প্রদেশের বিদ্যমান ভাষা না জানার কারণে কোম্পানির কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব ছিল। তাই, এসব পণ্য সংগ্রহ করতে কোম্পানিকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করতে হয়। এসব নীতিগুলোই সামগ্রিকভাবে বাণিজ্যনীতি নামে পরিচিত। তাদের বাণিজ্যনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল স্থানীয়ভাবে পুঁজি সংগ্রহ করা।[৩] K.N Chaudhury বলেন -

> The business history of the East India Company in the early seventeenth century shows certain peculiarities which are not on the whole shared by English trade to European countries. The company's export and import trades its organizations and institutional characteristics, its methods of finance all thesefeatures display certain innovations signs that business techniques and organization were being modified to suit new trading conditions.[8]

প্রথমদিকে মূলধন হিসেবে স্বর্ণরৌপ্য নিয়ে আসলেও পলাশী উত্তরকালে তাদের বৃটেন থেকে স্বর্ণরৌপ্য আমদানি করতে হয়নি; বরং এদেশ থেকেই অর্জিত মূলধনের উপর ভিত্তি করে ব্যবসা পরিচালনা করেছে। এছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা বরাবরই আমদানির চেয়ে রপ্তানি করেছে বেশী। কোম্পানি বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিনা শুল্কে বৈদেশিক বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করলেও তারা এর অপব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ ও ব্যক্তিগত বাণিজ্য আরম্ভ করে। যার ফলে দেশীয় বণিকরা উৎখাত হবার উপক্রম হয়।

কোম্পানী ভারতবর্ষে বাণিজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব নীতি গ্রহণ করেছিল তা হল-

১। Factory পদ্ধতি

২। দাদনী পদ্ধতি

৩। এজেন্সি পদ্ধতি

৪। ঠিকাদারী (Contract System) পদ্ধতি

৫। ব্যক্তিগত বাণিজ্য।

৬। নগদ টাকায় পণ্য ক্রয়।

৭। কর্ণওয়ালিশ পদ্ধতি।

---

[৩] সিরাজুল ইসলাম, *বাংলার ইতিহাস: ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো* (ঢাকা: চয়নিকা, ২০০৮), পৃ. ৩০।

[8] K.N Chaudhuri, *The English East India Company* (London: Tylor and Francis Group, 1965), p. 19.

ভারত - বাংলা অঞ্চলে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ওলন্দাজদের অনুকরণে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে। সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে নির্মিত অসংখ্য বাণিজ্য কুঠির রক্ষণাবেক্ষণ করত ফ্যাক্টরী প্রধান বা কুঠিয়াল। সুরক্ষিত এসব কুঠিগুলোতে সারাবছর স্বল্পদামে পণ্য ক্রয় করে মওজুদ রাখা হত। কুঠিয়াল পণ্যের মান যাচাই, সরবরাহকারীদের সাথে চুক্তি, সরবরাহ নিশ্চিতকরণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করত। এসব কুঠিসমূহ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চালু ছিল। পরবর্তিতে ফ্যাক্টরীর সুবিধা ব্যবহার করে কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় মনযোগী হওয়ায় কুঠিগুলো অনেক ক্ষেত্রে প্রাণভেট এজেন্সীতে পরিণত হয়। এ পদ্ধতিতে ব্যবসা সম্প্রসারিত হলেও কোম্পানির জন্য তা লাভজনক ছিলনা। ফলে, কোম্পানি এ নীতির পরিবর্তন করে।

কোম্পানির বাণিজ্যনীতির অন্যতম পদ্ধতি ছিল দাদনী ব্যবস্থা। এটি ১৭৫৩ সাল পর্যন্ত চালু ছিল।[৫]এ ব্যবস্থায় কোম্পানি কলকাতার ব্যবসায়ীদের সাথে চুক্তি করত। এসব কর্মচারিরা দাদনী ব্যবসায়ী নামে পরিচিত। কোম্পানি এদের সাথে যে চুক্তি করত তাতে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রব্য সরবরাহের শর্ত থাকত। দ্রব্য ক্রয়ের জন্য কোম্পানি এদেরকে অগ্রিম অর্থ প্রদান করত। তারা আবার অভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ীদের এবং তৃতীয় পর্যায়ে এরাই আবার উৎপাদকদের দাদন দিত। Sukumar Vattacharya এর মতে

> The East India Company advanced as dadani some of the commodities imported by them, particularly the woolen products known as broadcloth.[৬]

এ ব্যবস্থায় ১৭৫১ সাল নাগাদ কোম্পানির বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল ৩৪ লক্ষ। এই দাদনী ব্যবস্থার সব থেকে লাভবান ছিল কোম্পানি অন্যদিকে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত ছিল উৎপাদক শ্রেণী। পণ্যের বাজারমূল্য বেশি হলেও তারা উৎপাদিত পণ্য অন্য কোন বণিক গোষ্ঠীর নিকট বিক্রয় করতে পারত না। দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিক সময় চালু থাকা দাদনী ব্যবস্থার স্থলে ১৭৫৩ সালে প্রবর্তন করা হয় এজেন্সি ব্যবস্থা। দাদনী ব্যবসার প্রতি তাঁতীদের অনীহার কারণে মূলতঃ এই ব্যবস্থার প্রচলন করা হয়। কেননা, কোম্পানি তাঁতীদের বাজার দর হতে ২০-৩০ টাকা কম দিত। এজেন্সি ব্যবস্থায় প্রত্যেক আড়ং দেখাশুনার জন্য দায়িত্বে থাকতেন একজন বেতনভোগী ইংরেজ রেসিডেন্ট। তার অধীনে থাকত বেতনভোগী গোমস্তা। এ ব্যবসায়ও তাঁতীদের দাদন দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। এই এজেন্সী ব্যবস্থাও ত্রুটির উর্ধ্বে ছিল না। কোম্পানির কর্মকর্তা উইলিয়াম বোল্টস এর বর্ণনামতে দরিদ্র হতভাগ্য তাঁতীদের সম্মতির কোন তোয়াক্কা না করে গোমস্তা তাঁতীদের দাদন দিত।

এরপর কোর্ট অব ডাইরেক্টর এজেন্সি ব্যবস্থার পাশাপাশি চুক্তি (contract) ব্যবস্থা প্রবর্তন করে। এ ব্যবস্থায় দাদনী ব্যবসায়ীদের পরিবর্তে কলকাতার ব্যবসায়ী ও ফ্যাক্টরী প্রধানদের সাথে করা হয়। এম ওয়াজেদ আলীর

---

[৫] এম. ওয়াজেদ আলী, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস* (ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ২০০০), পৃ. ১১।

[৬] S. Vattacharya, *op. cit.,* p. 129.

মতে, এ সময় কোম্পানির বিনিয়োগ আংশিক দাদনী ও আংশিক এজেন্সি ব্যবস্থার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। ঢাকা, লক্ষীপুর, শান্তিপুর ও পাটনা আড়ং এজেন্সি ব্যবস্থার অধীনে এবং বাকী আড়ং সমূহ দাদনী ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এছাড়া গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনামলে (১৭৭৩-১৭৮৫) অল্পমূল্যের ঠিকাদারী বেশিমূল্যে প্রদান করা হত বলে সিরাজুল ইসলাম উল্লেখ করেছেন।

আর্থ-সামাজিক প্রভাব

কোম্পানি উপমহাদেশে বাণিজ্যের জন্য আগমন করে তাদের সুবিধার্থে এবং অধিক মুনাফালাভের প্রত্যাশায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নীতি প্রয়োগ করে। এ নীতিসমূহ এদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে অত্যন্ত নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সামগ্রিকভাবে বাংলায় রপ্তানী বাণিজ্য হ্রাস পায় এবং বাংলায় ইউরোপীয় শিল্পজাত পণ্যের আমদানী বাড়তে থাকে। যা আমরা নিম্মোক্ত চিত্রের মাধ্যমে উপলব্দি করতে পারি।

1601-1640 [৭]

Year	Ships sent out	Tonnage	Ships returned	Tonnage
1601-10	18	6692	10	3410
1610-20	63	27394	25	11535
1620-30	50	23103	38	21050
1630-40	37	19986	31	18323

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষির উপরই অর্থনীতির প্রাধান্য ছিল। শুধু কৃষিজাত কাঁচামাল রপ্তানী পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশ্ববাজারে বাংলার বাণিজ্যিক অবস্থান পরিবর্তন হয়। বাংলায় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যিক নীতি ও কোম্পানির শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের ফলে অন্য ইউরোপীয় বণিকরা প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশী বণিকরা বাণিজ্যের স্বার্থে কোম্পনীর বণিকদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এ কোম্পানি যে সকল পণ্য রপ্তানি করত তা হল-সুতা, রেশম, লবণ ইত্যাদি। কোম্পানির গৃহীত বাণিজ্যনীতির ফলে এসকল শিল্পে ভারতবর্ষ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। পলাশী পরবর্তী বাণিজ্য নীতি সুতা প্রস্তুতকারকদের জন্য দুঃখ বয়ে আনে। কেননা, দেশীয় সুতা উন্নতমানের ছিল না। কোম্পানি এ সময় সুতা তৈরীর জন্য কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। সুতা প্রস্তুতকারক কারখানায় যারা কাজ করত না তাদের আঙ্গুল কেটে দেয়া হবে এ মর্মে কোম্পানি আইন জারি করে। বাংলার সুতিবস্ত্রের তাঁতীরা প্রায় ১৮ ধরনের রেশম ও সুতিবস্ত্র উৎপাদন করত। কোম্পনীর বাণিজ্যে এজেন্সি ব্যবস্থায় বস্ত্র শিল্প সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তাঁতীরা দাদন নিতে অস্বীকার করলে তাদের কোমরে টাকা গুঁজে দিয়ে বেত্রাঘাত করা হত। পলাশী যুদ্ধের পর শাসক শ্রেণী কোম্পানি আইন পাশ করে তাঁতীদের নিয়ন্ত্রণ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে তাঁতীরা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এমনকি তারা

[৭] K.N Chaudhuri, *op. cit.*, p. 91.

স্বাধীনতা পর্যন্ত হারায়। পলাশী যুদ্ধ এবং ১৭৬৯-১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালের মন্বন্তর বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংস করে দেয়। সস্তাদামে কোম্পানির তাঁতবস্ত্র ক্রয়, তাঁতীদের মৃত্যু শতাব্দীর শেষ প্রান্তে ক্রমে বস্ত্র রপ্তানী বন্ধ করে দিয়ে ইংল্যান্ডের শিল্পজাত বস্ত্র ও পণ্য আমদানী শুরু করলে ক্রমেই বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক এলাকায় শ্রমশিল্পী বা কারিগরদের প্রায় সবাই ছিলেন মুসলমান। তাদের সমস্ত উন্নত মানের বস্ত্র যথা ঢাকাই মসলিন ও কাশ্মীরী শাল মুসলমান দক্ষ কারিগররা প্রস্তুত করে। কার্পেট বয়ন ছিল মুসলমানদের একচেটিয়া। অতি উচ্চমানের অলংকার প্রস্তুত স্বর্ণ ও রৌপ্যের খোদাই কাজ, সোনা রূপার বুটির কাজ এবং এ জাতীয় শত প্রকার উচ্চমানের শিল্পকর্ম মুসলমানদের হাতে ছিল। বিশেষ করে তাঁতশিল্প এত সমৃদ্ধ এবং এতো ব্যাপক ছিল যে, বাংলা একটি তুলা উৎপাদনকারী প্রদেশ হওয়া সত্ত্বেও এদেশের তাঁতশিল্পের জন্য বোম্বে ও সুরাট থেকে তুলা আমদানী করা হতো।[৮]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলায় উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে অন্যতম কাঁচারেশম উৎপাদন ও বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে কোম্পানির বাণিজ্য সম্প্রসারণ হয়েছিল ১৮৩২ সাল পর্যন্ত। বাংলায় জোরপূর্বক নীল চাষ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে রেশমের স্থান দখল করে নেয়। বাংলায় কোম্পনী অনুসৃত বাণিজ্যিক নীতির ফলে বাংলার অর্থনীতি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়। কোম্পানির অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা ও স্বার্থের উপর নির্ভরশীল কোম্পানী বাণিজ্যের ফলে বাংলার অভ্যন্তরীণ আন্তঃদেশীয়, উপকূলীয় বাণিজ্যে স্থানীয় বণিকদের পতন ঘটে। বাণিজ্যে একচেটিয়া ইংরেজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী বণিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য স্থানীয় কোন নীতির অনুপস্থিতি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ও বণিকদের দূর্বলতা এবং ইংরেজ বণিকদের আধিপত্যের মুখে দেশীয় বণিকদের টিকে থাকা ছিল প্রায় অসম্ভব। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ ব্যবসা দ্বারা বাংলা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। ব্যবসার প্রত্যেক ক্ষেত্রে এমনকি নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যেও তারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্লজ্জ প্রতিযোগিতায় একচেটিয়া ব্যবসা করে। অথচ স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সরকারকে শুল্ক দিতে হয়।[৯]

বাংলায় ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্যে দেশের স্থানীয় শিল্প বাণিজ্য যেমন পর্যুদস্ত হয়েছিল তেমনি সামগ্রিকভাবে অর্থনীতিতে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। গ্রামীণ অর্থনীতিতে মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসে। কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি হয়ে পড়ে পুরোটাই ভূমি ও কৃষিভিত্তিক। কোম্পানির কৃষি বাণিজ্যের ফলে বাংলা থেকে প্রচুর পরিমাণ অর্থসম্পদের নির্গমন পথ তৈরি হয় যা Drain of wealth নামে পরিচিত। বাংলা থেকে প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার করা হয়, দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ঐতিহ্য ধ্বংস হয়ে যায়। কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে ভারতের পণ্যসামগ্রী ইউরোপে রপ্তানি হলেও তার গতি একটা পর্যায়ে এসে থেমে যায়। আর কোম্পানির বাণিজ্য নীতির নেতিবাচক প্রভাবই বেশি পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিকভাবে

---

[৮] A.R. Mallick, *British Policy and the Muslims in Bengal*, 2nd ed. (Dhaka: Bangla Academy, 1977), p. 64.
[৯] R.C Majumdar, *History of the Freedom Movement in India*, Vol. 1 (Calcutta: Firma KLM Private Limited, 1971), p. 89.

উপমহাদেশে রপ্তানি বাণিজ্য হ্রাস পায় কিন্তু বাংলায় ইউরোপীয় শিল্পজাত পণ্যের আমদানি বাড়তে থাকে। কোম্পানির শুল্কমুক্ত বাণিজ্যের কারণে দেশীয় বণিকরা ক্রমান্বয়ে বাণিজ্যে তাদের আগ্রহ হারায়। কোম্পানির নীতির কারণে বাংলার তাঁতশিল্প ধ্বংস হয়ে যায়। ইংরেজ কোম্পানির বাণিজ্য নীতি মুসলমানদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বাণিজ্য উভয় ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত করে। মুসলমান আমলে বড় বড় ব্যবসা গুলো প্রায়ই ছিল মুসলমানদের হাতে। উপমহাদেশে ইউরোপীয়দের আগমনের সাথে সাথে মুসলমান বণিক শ্রেণী তাদের অধিকাংশ বিদেশী বাণিজ্য হারায়। তবুও তারা অভ্যন্তরীণ ব্যবসায় তাদের আধিপত্য বজায় রাখে এবং তাদের বাণিজ্য কর্ম পারস্য উপসাগরে ও আরব সাগরের উপকূলীয় রাষ্ট্রগুলো পর্যন্ত বিস্তৃত লাভ করে। কোম্পানী আমলে কোম্পানির ব্যবসায়ীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার ফলে মুসলমান ব্যবসায়ীদেরকে এসব এলাকা থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। এর প্রধান কারণ এই যে কোম্পানির ব্যবসায়ীরা শাসকদের কাছ থেকে যে সব বিশেষ সুযোগ সুবিধা পেত মুসলমান ব্যবসায়ীরা তা থেকে বঞ্চিত ছিল।[১০] ব্রিটিশ কোম্পানির বাণিজ্য নীতির দ্বারা বাংলার উন্নতিশীল মুসলিম বয়ন শিল্প ধ্বংস হয়ে যায়।[১১] কোম্পানি বস্ত্রশিল্পের পরিবর্তে জোরপূর্বক নীলচাষের নীতি গ্রহণ করায় একদিকে যেমন বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হয়ে যায় অন্যদিকে কৃষককূলের উপর নেমে আসে চরম দুর্ভোগ। যা আমরা দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-৭৩) "নীলদর্পণ" নাটকে দেখতে পাই। এছাড়া কোম্পানি বাণিজ্যের নামে যে অগাধ পরিমাণ সম্পদ বৃটেনে পাচার করে তার ফলে ভারতবর্ষের বাংলায় দুর্ভিক্ষ নেমে আসে। এটি শুধু এ উপমহাদেশকে অর্থনৈতিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বরং সামাজিক, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও এটি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছিল।

৩.১.২ প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থায় কোম্পানির অনুসৃত নীতি

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষের ক্ষমতা গ্রহণ করে। যা ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ রাজের শাসন গ্রহণ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। পলাশীর পর নামে না হোক কাজকর্মে কোম্পানিই ছিল দেশের হর্তাকর্তা।[১২] ১৭৬৫ সালের ১২ আগষ্ট কোম্পানি দিউয়ানী সনদ লাভ করে। এর মাধ্যমে রাজস্ব আয় থেকে সম্রাটকে বাৎসরিক ২৬ লক্ষ টাকা দিবে এবং নিজামত শাসনের জন্য মুর্শিদাবাদের নবাবকে দিতে হবে বাৎসরিক ৫৩ লক্ষ টাকা। দিউয়ানী লাভের পর কোম্পানি বেশি রাজস্ব আদায় এবং কম খরচে শাসন পরিকল্পনার জন্য "দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা" পরিচালনা করে। এই নতুন ব্যবস্থায় রাজস্ব ব্যাপারে দায়িত্ব ন্যস্ত থাকল দেশীয় আমলাতন্ত্রের উপর এবং ক্ষমতা থাকল কোম্পানির হাতে। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার ফলে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি এবং দুর্নীতি বেড়ে যায়। ফলে, ১৭৬৯-৭০ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। অবশেষে ১৭৭২ সালে হেস্টিংস দ্বৈত শাসনব্যবস্থা বিলুপ্ত করেন। দেশীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে

---

[১০] I.H. Qureishi, *A Short History of Pakistan*, Vol. 4 (Karachi: University of Karachi, 1967), p. 132.
[১১] *Ibid*, p. 131.
[১২] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১), পৃ. ৩৪৪।

প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশীকরণ করা হয়। ১৭৮০ সালের পর দেশী কর্মকর্তা বলে প্রশাসনে আর কেউ ছিল না। প্রশাসনের নিম্নতম পদ ছাড়া বাকীসব পদ দখল করে নেয় কোম্পানির কর্মচারীগণ। ভারতের মুসলমানরা অনেক বছর যাবৎ ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের একটি চিরন্তন বিপদের কারণ হয়ে রয়েছে। যে কারণেই হোক তাঁরা ব্রিটিশ নিয়ম কানুন থেকে দূরে রয়ে গেছে এবং যেসব পরিবর্তনকে উদার মনোভাবের হিন্দুরা স্বাগত জানিয়েছে সেগুলোকে তারা অন্য ধরনের ব্যাখ্যা করেছে।[১৩] মুঘল শাসনের সমাপ্তিকালের মুঘল সম্রাট আকবর শাহের (১৮০৬-১৮৩৭) প্রতি ব্রিটিশ আচরণ সম্পর্কে রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন ''যাহার পূর্বপুরুষগণ এক সময় কোম্পানির বণিকদিগকে ভারতবর্ষে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যাহার পূর্বপুরুষের সৌজন্যে বণিক কোম্পানী বাঙালায় আপনাদের ব্যবসায় চালাইবার সুবিধা পাইয়াছিলেন এবং যাহার পিতা বণিক কোম্পানীকে বাঙালা, বিহার এবং উড়িষ্যার দিউয়ানী দিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন তিনিই এখন সেই বণিক কোম্পানির বিচারে, সেই বণিক কোম্পানির কৃপায় এ রূপ ক্ষমতাশূন্য, প্রভূত্বশূণ্য ও রাজলক্ষণ শূন্য হইয়া পড়িলেন।''[১৪]

সামরিক বিভাগ

২য় খলিফা ওমর এর সময়কাল তথা ৬৩৮ খ্রিঃ এর পর থেকেই সামরিক জীবন ছিল মুসলমানদের সর্বোৎকৃষ্ট পেশা। ইংরেজ শাসনে মুসলমানরা অত্যন্ত কঠিন আঘাত পায় সামরিক বাহিনীর ক্ষেত্রে। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা আরোহণের ফলে সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের চাকরি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। সেনাবাহিনীতে মুসলমানদের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ার পিছনে দুটি কারণ

১. কোম্পানি উচ্চপদে কোন মুসলমানকে নিয়োগ দান করত না।

২. অভিজাত মুসলমানরা খ্রিষ্টান শাসকদের অধীনে সামরিক চাকরিকে অবমাননাকর মনে করত।

বাংলার সেনাবাহিনীকে ইংরেজরা তাদের নিজেদের জন্য হুমকি মনে করত। যার কারণে তাদের প্ররোচনায় মীরজাফর আলী খান প্ররোচিত হয়ে ৮০,০০০ সৈন্যকে বরখাস্ত করেন। মাত্র ১২ হাজার অশ্বারোহী ও সমান সংখ্যক পদাতিক বাহিনী রাখার অনুমোদন লাভ করেন। অন্যদিকে কোম্পানী দিউয়ানী লাভের পর বাংলার নবাবের সাথে যে টাকার চুক্তি করে তাও বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের কারণে কর্তন করা হয়। ফলে বাংলার সেনাবাহিনীর ভরণ-পোষণ অসাধ্য হয়ে পড়ে। এ কারণে নবাবের সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় অন্যদিকে ইংরেজদের বাহিনী শক্তিশালী হতে থাকে। ১৭৭২ সালে হেস্টিংস সরাসরি দিউয়ানী গ্রহণ করে নবাবের অবশিষ্ট সামান্য সংখ্যক সৈন্যকেও বাতিল করে। বঙ্গের মুসলিম শাসনামলে সামরিক বিভাগে মুসলমানদের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। সামরিক বিভাগের আয়ই মুসলমানদের ঐশ্বর্যের সোপান ছিল। আই

[১৩] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৯।

[১৪] রজনীকান্ত গুপ্ত, *সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস* (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৮৯৩), পৃ. ১৪৯।

এইচ কোরেশি বলেন "সেনাবাহিনী ছিল মুসলমানদের চাকুরীর আরেকটি লাভজনক স্থান। তারা সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদগুলো অধিকার করত এবং মনসবদার ও সিপাহী হিসেবে চাকুরী পেত"।[১৫] সামরিক বাহিনীতে চাকুরীকে মুসলমানরা অত্যন্ত সম্মানজনক পেশা মনে করত, কিন্তু এখন তাও গেল।

এখন তাদেরকে ঐসব চাকুরী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। কারণ ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তার জন্য এদেরকে সেনাবাহিনী থেকে বের করা প্রয়োজন ছিল।[১৬] বরাবরই মুসলমানরা ফৌজের চাকুরকে সম্মানজনক ও ভালো উপার্জানের পথ বলে মনে করত। কিন্তু ব্রিটিশ আমলে আজ তাদের এহেন পৈতৃক সামরিক পেশা প্রায় স্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে মনে মনে তারা তিক্ত ক্ষোভ ও তীব্র ব্যথা অনুভব করে। এভাবে ব্রিটিশ কোম্পানির শাসনে অভিজাত মুসলমানদের সামরিক বিভাগে প্রবেশের পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। চাকরি হারিয়ে হাজার হাজার অভিজাত মুসলমান প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে গিয়ে চাষাবাদ শুরু করে। Hunter তার "The Indian Musalmans" গ্রন্থে বলেন কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারে না। যদিও তাদেরকে যে স্থান দেয়া হত তার দ্বারা অর্থ-উপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

মোট কথা হল পলাশী যুদ্ধের পূর্বে সামরিক ও বেসামরিক চাকুরি ক্ষেত্রে সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। কোম্পানী ক্ষমতা হস্তগত করার পর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের প্রথম ধাপেই মুসলিম সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। সামরিক বিভাগের সংশ্লিষ্ট বেসামরিক কর্মচারীগণ ও চাকুরী হারায় এবং তাদের জীবিকার পথ বন্ধ হয়।[১৭] বিচারবিভাগে কাজী, মুফতী, মীর, আদল প্রভৃতি পদে বহু মুসলমান চাকুরী পেত। কোম্পানি কর্তৃপক্ষ কয়েক বছর মুসলিম আইন ও বিচার বিভাগের মুসলমান কাজী, মুফতী প্রভৃতি কর্মচারীকে বহাল রাখে। এরপর তারা ক্রমশ বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে মুসলমানদের জায়গায় ইংরেজদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা করে।[১৮] সরকারি ভাষা পরিবর্তনের পরেও কয়েক বছর মুসলমানগণ কয়েকটি বিভাগে নিজেদের আসন বজায় রাখে। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত মুসলমান উকিলের সংখ্যা হিন্দু ও ইংরেজ উকিলদের মিলিত সংখ্যার সমান ছিল। ১৮৫২ থেকে ১৮৬৮ সালের মধ্যে ২৪০ জন ভারতীয়কে চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়। এদের মধ্যে ২৩৯ ছিল হিন্দু আর মুসলমান ছিল মাত্র একজন।[১৯] হান্টার বলেন, নিজেদের পদ্ধতিতে শিক্ষিত মুসলমানরা দেখেছে যে তারা শাসন বিভাগের সব ক্ষমতা ও সবরকম মাহিনা-মুনাফা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অথচ এগুলো পূর্বে তাদেরই একচেটিয়া অধিকারে ছিল। তারা দেখেছে যে, জীবন ধারণের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা হিন্দুদের হাতে ক্রমে ক্রমে চলে যাচ্ছে।[২০]

---

[১৫] I.H. Qureshi, *op. cit.*, p. 131.
[১৬] Ram Gopal, *Indian Muslims, A Political History* (Bombay: Asia Publishing House, 1964), p. 15.
[১৭] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত* পৃ. ৫৩।
[১৮] *তদেব*, পৃ. ৫৪।
[১৯] *তদেব*, পৃ. ৫৭।
[২০] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।

সরকারি ভাষা পরিবর্তনের সমালোচনা করে সৈয়দ আমীর আলী বলেন, ইংরেজ শাসকদের এ ব্যবস্থার ফলে সরকারি চাকুরী প্রার্থীদের জন্য ইংরেজী জানার প্রয়োজন হয়। কিন্তু,তখনও সরকার ইংরেজী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে কোন আদেশ জারি করেননি। ব্রিটিশ সরকারের অবিশ্বাসের নীতি,ভাষা পরিবর্তন, মুসলমানদের ইংরেজী শিক্ষার প্রতি উপেক্ষা প্রভৃতি কারণে মুসলমানগণ সরকারি চাকুরীতে স্থান পায়নি। সৈয়দ আমীর আলী বলেন, যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান চাকুরী পায় তাহলেও ইহা রক্ষা করাও তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। কারণ, তাকে সরানোর জন্য তখন অফিসে ষড়যন্ত্র চলতে থাকে।[২১] এভাবে দেখা যায় যে, মুসলমানরা কোম্পানির হাতে রাজ্য হারানোর সাথে সাথে শাসনব্যবস্থার সকল পদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়। পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রভাবের ফলে লোকজন খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত হবে, এ মর্মে খ্রিস্টান মিশনারীদের ঘোষণার পর স্বভাবতই মুসলমানেরা তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যও ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য হারাবার আশংকা করে, তাই ধর্মীয় ব্যাপারে সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে মুসলমানদের অধিক মনক্ষুন্ন হয়।[২২]

বিচার ব্যবস্থায় কোম্পানির অনুসৃত নীতি

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের মাধ্যমে ভারতবর্ষে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর একদিকে যেমন ঘনঘন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় তেমনি প্রশাসন ও বিচারব্যবস্থারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ১৭৬৫ সালে দিউয়ানী লাভ, দ্বৈত শাসন প্রবর্তন প্রভৃতির ধারাবাহিকতায় কোম্পানির সরকার বিচার ব্যবস্থায়ও ঘনঘন পরিবর্তন আনে। বিদ্যমান ইসলামী তথা মুঘল বিচার ব্যবস্থাকে কোম্পানি তাদের নিজেদের মত করে সংস্কার করে। ১৮৬১ সাল পর্যন্ত বিচার ব্যবস্থায় ঘনঘন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আর এ পরিবর্তনের নেপথ্যে যে বিষয়টি মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিল সেটি কোম্পানি স্বার্থ। আবহমান সামাজিক অর্থনৈতিক জীবনযাত্রাকে ঠিক রেখে মুনাফা সুনিশ্চিত করাই ছিল কোম্পানির মূল লক্ষ্য। কোম্পানির বিচার ব্যবস্থার পূর্বে ভারতবর্ষের বিচারব্যবস্থা ছিল কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক। তবে, তা শুধুমাত্র ফৌজদারী বা দন্ড আইনের বেলায় প্রযোজ্য ছিল।[২৩] আর বিচার পরিচালনা করত মুসলিম কাজী, মৌলভী এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তিরা। কোম্পানি এ বিদ্যমান বিচার ব্যবস্থাকে মধ্যযুগীয় আখ্যা দিয়ে এর আমূল সংস্কার সাধন করেন। ঔপনিবেশিক বিচার ব্যবস্থার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করেন প্রথম গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫)। তিনি শাসন বিভাগের মত বিচার বিভাগের নানাবিধ সংস্কার করেন। ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সূচনায় দিউয়ানী ও ফৌজদারী মামলার ভার নবাবের হাতেই ন্যস্ত ছিল। ভূমি এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা, দিউয়ানী মামলা এবং খুন ও অন্যান্য অপরাধমূলক মামলা ফৌজদারী মামলা নামে পরিচিত ছিল। ১৭৬৫ সালে কোম্পানি দিউয়ানী মামলার ভার নিজেদের হাতে তুলে নেয়। তারপর রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের সুযোগে কোম্পানি ফৌজদারী মামলার ভারও নিজেদের হাতে নিয়ে নেয়। দিউয়ানী মামলা বিচারের জন্য প্রতি জেলায় কালেক্টরের অধীনে

---

[২১] এস.এ রশীদ, *ন্যাশনাল মোহামেডান এসোসিয়েশন*, তা.বি. পৃ. ২৫-২৬।
[২২] সৈয়দ আহমদ খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫।
[২৩] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

দিউয়ানী আদালত এবং ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য কাজীর জন্য ফৌজদারী আদালত স্থাপিত হয়। এছাড়া হেস্টিংস কলকাতায় সদর দিউয়ানী আদালত এবং সদর নিজামত আদালত স্থাপন করে তাদের উপর জেলার নিম্ন আদালতগুলো থেকে আসা আপিলের মামলা নিস্পত্তির দায়িত্ব অর্পণ করেন। সদর দিউয়ানী আদালতে গভর্ণর ও তার কাউন্সিলের দুজন সদস্য বিচারের দায়িত্বে ছিলেন। সদর নিজামত আদালতের বিচার করতেন নবাব নিযুক্ত বিচারক। ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং এ্যাক্ট পাশ হলে কলকাতার একজন প্রধান বিচারপতি এবং অন্য তিনজন বিচারপতি নিয়ে ১৭৭৪ সালে সুপ্রিমকোর্ট গঠিত হয়। স্যার এলিজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হন। কাঠামোগতভাবে মুঘল বিচারব্যবস্থার সাথে হেস্টিংসের ব্যবস্থার যথেষ্ট সাদৃশ্য ছিল।[২৪] হেস্টিংসের বিচার ব্যবস্থাকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেন দ্বিতীয় গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩)। পূর্বে নবাব ফৌজদারী মামলার বিচারের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। কর্ণওয়ালিশ ফৌজদারী মামলার বিচারের ভার ও নবাবের হাত থেকে নিয়ে গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলরদের হাতে ন্যস্ত করেন। জেলা কালেক্টরের হাত থেকে দিউয়ানী মামলার বিচারের ভার কেড়ে নিয়ে সে ভার জেলা জজদের উপর দেয়া হয়। কালেক্টরগণ এরপর শুধু রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে থাকেন। কর্ণওয়ালিশ গভর্ণর জেনারেল ও তার কাউন্সিলের অধীনে তিনজন বিচারকের সমন্বয়ে পাটনা, ঢাকা, কলকাতা ও মুর্শিদাবাদে চারটি প্রাদেশিক আদালত স্থাপন করেছিলেন। এছাড়া কর্ণওয়ালিশ ফৌজদারী মামলার বিচারের জন্য চারটি ভ্রাম্যমান আদালত স্থাপন করেছিলেন। এসব মামলার বিচারকার্য পরিচালনা করতেন কাজী ও মুফতীগণ। ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপিল আদালত ছিল সদর নিজামত আদালত। বিচার ব্যবস্থার সর্বনিম্নে ছিল আমীন ও মুন্সেফের আদালত। কর্ণওয়ালিশের শাসন ও বিচার-বিভাগীয় সংস্কারগুলো সংকলিত হয়ে কর্ণওয়ালিশ কোড নামে প্রকাশিত হয়। কর্ণওয়ালিশের বিচার ব্যবস্থা ছিল একটি ত্রিস্তরবিশিষ্ট কাঠামো। আইন শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা বজায় রেখে ঔপনিবেশিক শাসনকে বৃটেনের জন্য অর্থনৈতিকভাবে লাভবান করাই ছিল এর মূল উদ্দেশ্য।[২৫]

কর্ণওয়ালিশ প্রবর্তিত এ বিচার ব্যবস্থা কিছুদিন চালু থাকার পর ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে পড়ে। তার বিচার ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনেন লর্ড বেন্টিংক (১৮২৮-১৮৩৫)। তিনি সদর দিউয়ানী আদালত ও জেলা আদালতের মধ্যবর্তী প্রাদেশিক আদালত বিলুপ্ত করেন। নিম্ন আদালতগুলোতে দেশীয় লোক নিয়োগ করেন। এছাড়া জেলা আদালত ও অন্যান্য আদালত সমূহে অর্থনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে ব্যাপক সংস্কার করে বিচার ব্যবস্থায় গতিশীলতা আনা হয়। কোম্পানি শাসনের শেষ পর্যন্ত (১৮৫৮) বেন্টিংক এর সংস্কার মোতাবেক বিচার শাসন চলে।[২৬] এভাবে দেখা যায় কোম্পানির বিচার ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণে। বিশেষ করে দিউয়ানী বিচারব্যবস্থা সরাসরি প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণে ছিল।

---

[২৪] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৩।
[২৫] *তদেব*, পৃ. ২২৮।
[২৬] *তদেব*, পৃ. ২৩২।

এই বিচার ব্যবস্থাকে কোম্পানি ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থে ব্যবহার করে। নিম্ন আদালতসমূহে সামান্য সংখ্যক মুসলমানদের অস্তিত্ব পাওয়া গেলেও উচ্চ আদালতসমূহ থেকে মুসলিম কাজীদেরকে উৎখাত করা হয়। অথচ, ইতিপূর্বে এসব পদসমূহ মুসলমানদের দখলে ছিল। এ ব্যবস্থায় বিচারপ্রার্থীকে শুধু ব্যয়বহুল চক্রেই নিক্ষেপ করা হয়নি। বিচারের জন্য লন্ডনের প্রিভি কাউন্সিল পর্যন্ত পৌছাবার ব্যবস্থা করে সবল কর্তৃক দুর্বলের উপর নির্যাতনের জন্য আদালতকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হয়। সার্বিক মূল্যায়ন করলে যে জিনিসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে সেটা হল- কোম্পানি আমলের বিচারব্যবস্থায় ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার তুলনায় অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়াই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। আইন ব্যবসা ছিল মুসলমানদের আরেকটি সম্মান জনক পেশা।[২৭] কিন্তু ক্রমশ তাও তাদের জন্য একরকম নিষিদ্ধ করা হয়। কারণ জজ নিয়োগের ক্ষেত্রে মুসলমানদের বাদ দিয়ে শুধু হিন্দুদের নেয়া হয়। ১৮৫১ সাল পর্যন্ত মুসলমান উকিলেরা আইনব্যবসায় নিজেদের দখল বজায় রেখেছিলেন এবং তখনও তাদের সংখ্যা হিন্দু ও ইংরেজদের সমান ছিল। ১৮৫১ সালের পর লক্ষণীয় পরিবর্তন শুরু হয়। ফলে দেখা গেল ১৮৫২-১৮৬৮ সাল পর্যন্ত যে ২৪০ জন দেশী উকিলকে ভর্তি করা হয় তাদের মধ্যে ২৩৯ জনই হিন্দু এবং মাত্র একজন মুসলমান।[২৮]

প্রথম দিকে কোম্পানী বিচার বিভাগে উপদেষ্টা হিসেবে মুসলমানদেরকে নিয়োগ করে। কারণ তখন বিচারালয়ে ইসলামী শরীআহ আইন প্রচলিত ছিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলমানদের বিচার বিভাগে চাকুরী প্রদান প্রয়োজন ছিল। কোম্পানির ক্ষমতা বাড়ার সাথে সাথে এ ব্যবস্থা ও বাতিল করা হয়। ফলে মুসলমান আইন উপদেষ্টাদের চাকুরীও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। হান্টার এর মতে এ পর্যায়ে যেসব ভারতবাসী ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার পেয়েছেন পদলাভ করেছেন,তাদের মধ্যে একজনও মুসলমান নাই। কিন্তু দেশটা ইংরেজদের হুকুমতে আসার কিছুদিন পর পর্যন্ত মুসলমানরা সব রকম কাজকর্ম নিজেদের হাতেই রেখেছিল।[২৯] অভিজাত মুসলমানদের আয়ের ৩য় প্রধান উৎস ছিল বিচার বিভাগ। কোম্পানী দিউয়ানী লাভের পরও প্রায় পঞ্চাশ বছর যাবৎ মুসলমানরা চাকুরীতে বহাল ছিল। কারণ তখন পর্যন্ত অফিস আদালতের সরকারি ভাষা ছিল ফার্সী। ১৮২৯ সালে সবরকম শিক্ষার বাহন হিসেবে স্কুল কলেজে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা দেয়া শুরু হয়। ১৮৩২ সালে সিলেক্ট কমিটির সামনে ক্যাপ্টেন টি ম্যাকাম প্রস্তাব পেশ করেন যে, ক্রমশ ইংরেজী ভাষার প্রচলন করা হোক এবং মুসলমান কর্মচারীদের অন্তত পাঁচ বছর অবকাশ দিয়ে নোটিশ দেয়া হোক। ম্যাকেঞ্জিও অনুরূপ প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বলেন জেলাগুলোতে ক্রমশ এবং পরপর ইংরেজী প্রচলন করা হোক। হঠাৎ আকস্মিকভাবে ফারসীর পরিবর্তে ইংরেজীকে সরকারি ভাষা করা হয়। ১৮৩৭ সালের ১লা এপ্রিল থেকে সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজী প্রবর্তন করা হয়। মুসলমানগণ এর জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না। কিন্তু সহসা সবর্ত্র এ পরিবর্তন সাধিত

[২৭] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ৪৪।
[২৮] ডব্লিউ উইলিয়াম হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, অনুবাদ: আবদুল মওদুদ (ঢাকা, ১৯৭৪), পৃ. ১৬৬।
[২৯] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩।

হওয়ার ফলে হাজার হাজার মুসলমান কর্মচারী চাকুরী থেকে অপসারিত হন, যাদের জীবিকা সম্পূণরূপে নির্ভয় করত একমাত্র চাকরির উপর।

W. Hunter এসব সত্য স্বীকার করে বিদ্রুপ করে বলেছেন "এখন কেবলমাত্র জেলখানায় দু একটা অধঃস্তন চাকরী ছাড়া আর কোথাও ভারতের এই সাবেক প্রভুরা ঠাঁই পাচ্ছেনা। বিভিন্ন এমনকি পুলিশ সার্ভিসের্র উর্ধ্বতন পদগুলিতে সরকারি স্কুলের উৎসাহী হিন্দু যুবকদের নিযুক্ত করা হচ্ছে"।

এ পরিবর্তনের ফলে হিন্দু সম্প্রদায় পূর্ণ সুফল ভোগ করে। বিভিন্ন কলেজ থেকে কলকাতার বাবুদের সন্তান সন্ততি ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করে সর্বত্র সরকারি চাকরিতে একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কারণ, তাদের সামর্থ্য ও ইচ্ছা কোনটাই ছিল না। ফলে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার সমূহ জীবিকা অর্জনের সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দারিদ্র অনাহার ও ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়। বিচার ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে মুসলমানদেরকে বাদ দিয়ে বিচার বিভাগের উচ্চ পদগুলোতে ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়।[৩০] এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে বলা যায় যে,কোম্পানির স্বার্থ রক্ষাই ছিল বিচার ব্যবস্থার মুখ্য উদ্দেশ্য।

৩.১.৩ ভূমিনীতি ও লাখেরাজ বাজেয়াপ্তি

মুসলিম শাসন ব্যবস্থায় সরকার ছিল ভূমির মালিক। সরকার তার প্রতিনিধির মাধ্যমে ভূমি রাজস্ব আদায় করত এই প্রতিনিধিরা অভিজাত মুসলিম জমিদার নামে পরিচিতি ছিল। এরা রাজস্ব বিভাগের উচ্চ পদে আসীন থেকে হিন্দু গোমস্তা পেয়াদা ও নায়েবের মাধ্যমে কর আদায় করতেন, হিন্দুরা ছিল তাদের কর্মচারী মাত্র। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ছিল একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান।[৩১] ভূমি রাজস্বকে কেন্দ্র করে শুরু হয় কোম্পানির শাসন। কোম্পানীর শাসন প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দেশের আয় দিয়ে এদেশে ব্যবসা করা। আর সে আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব।[৩২] এম. এ রহীম তার গ্রন্থে বলেন -

> The East India Company was a trading concern. Its sole objective in the ecquisition of the diwani and the establishment of the political suprememacy was to make the maximum profit in its transaction. The land revenue policy of the company was directed towards the attainment of this objective.[৩৩]

কোম্পানি শাসনক্ষমতা গ্রহণের প্রাক্কালে জমির উপর প্রজাদের মালিকানা স্বত্ত্ব ছিল। তারা নির্দিষ্ট খাজনা দিত এবং বংশানুক্রমিক জমি ভোগ দখল করত। সরকার ও প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন ছিল মুঘল

---

[৩০] এম. এ. রহিম, *বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস* (ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১), পৃ. ৫৪।
[৩১] *তদেব*, পৃ. ৪৫।
[৩২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৭।
[৩৩] M.A Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D 1754-1947* (Dhaka: University of Dhaka, 2011), p. 31.

শাসকদের রাজস্ব নীতির আদর্শ। কিন্তু, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল মুনাফা অর্জন। ক্লাইভ (১৭৫৭-১৭৬৬) মুনাফা অর্জনের জন্য ১৭৬৫ সালে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন।[৩৪] এরপর কোম্পানি দিউয়ানী গ্রহণ করে রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। ফলশ্রুতিতে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় যাতে বাংলার এক তৃতীয়াংশ মানুষ মারা যায়।[৩৫] এরপর ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রত্যেক জেলার একজন ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করেন। একই সময়ে তিনি পাঁচসনা বন্দোবস্ত (১৭৭২-৭৭),[৩৬] একশালা বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। কিন্তু কৃষি, জমিদার ও রায়ত প্রভৃতি শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে এটা পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ১৭৮৪ সালের পিটস ইন্ডিয়া এ্যাক্ট একটি স্থায়ী ভূমি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এটি বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে চিরস্থায়ী আইনকানুন প্রবর্তনের জন্য কলকাতার কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ প্রদান করা হয়। অন্যদিকে এসব আদেশ বাস্তবায়নের জন্য সুনির্দিষ্ট আদেশসহ লর্ড কর্ণওয়ালিশকে ১৭৮৬ সালে ভারতের গভর্ণর করে পাঠানো হয়। কর্ণওয়ালিশ (১৭৮৬-৯৩) সম্পূর্ণ ব্রিটিশ মডেলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রণয়ন করেন। ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করার আগে তিনি ১৭৮৯ সালে তিনি জমিদারদের সাথে একটি দশশালা বন্দোবস্ত করেন এবং এই মর্মে ঘোষণা করেন যে, কোর্ট অব ডাইরেক্টরের অনুমোদন পেলে এটিকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ঘোষণা করবেন। ১৭৯২ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টরের অনুমোদন পেলে ১৭৯৩ সালের মার্চ মাসে কর্ণওয়ালিশ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ঘোষণা করেন। এর অর্থ এই যে, এখন থেকে জমির একচেটিয়া মালিক হবে জমিদার। রায়তগণ হবে তাদের প্রজা।[৩৭] জমির মালিক হিসেবে জমিদার সরকারের পূর্ব অনুমতি নিয়ে জমি বিক্রয়, দান বা অন্য যেকোন কাজে ব্যবহার করতে পারবে। দশশালা বন্দোবস্তে যে রাজস্ব ধার্য করা হয়েছিল তা অপরিবর্তিত থাকবে। তবে, জমিদার নিয়মিতভাবে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে জমি নিলামে বিক্রি করে বকেয়া রাজস্ব আদায় করা হবে বলে আইন পাশ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পরবর্তী বছরগুলোতে বকেয়া পরিশোধ না করার দরুণ অনেক জমিদারি বিক্রয় করে দেয়া হয়। কিন্তু নতুন ক্রেতারা ছিলেন হিন্দু-ব্যবসায়ী অথবা সরকারি কর্মকর্তা। পুরনো অভিজাত শ্রেণীর স্থলে হিন্দু-সমাজে এক নতুন পয়সাওয়ালা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। যাদের অবদান সে সম্প্রদায়ের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এই উঠতি হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সরকারি যন্ত্রে প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপন করে।[৩৮]

১৭৭২ সালের পর থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সম্পর্কে আলোচনা চলতে থাকে। বস্তুতঃ জমির উন্নতি, কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক অবকাঠামো নির্মাণ, কৃষি বিপ্লব, সর্বোপরি রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করাই ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উদ্দেশ্য। তাছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সুদৃঢ় করণের

[৩৪] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫।
[৩৫] *তদেব*, পৃ. ৪৬।
[৩৬] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৬।
[৩৭] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১), পৃ. ৩৫৪।
[৩৮] A. R Mallick, *op. cit.*, p. 72.

ক্ষেত্রে সহায়ক শ্রেণী হিসেবে একটি জমিদার শ্রেণী গঠন করাও ছিল এর অন্যতম উদ্দেশ্য। হান্টার বলেন এই বন্দোবস্তের আসল লক্ষ্য ছিল, যেসব নিম্নস্তরের হিন্দু কর্মচারী চাষীদের সঙ্গে সরাসরি কারবার করে তাদেরকেই জমির মালিক বা জমিদার হিসেবে স্বীকার করে নেয়া।[৩৯] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের অসন্তুষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করে তিনি আরো বলেন যে, এ পর্যন্ত যেসব হিন্দু গোমস্তা অত্যন্ত ছোট খাটো স্তরের কাজে নিয়োজিত ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তারা সবাই জমিদার বনে যায়। জমির মালিকানা স্বত্ত্ব লাভ করে এবং ধন দৌলতের অধিকারী হয়।[৪০] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কুফল মুসলমানদেরকে আরও পঙ্গু করে তোলে। মুসলমান আমলে রাজস্ব বিভাগে কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমানরা রাজস্ব আদায়কারী জমিদার হিসেবে উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। কিন্তু হিন্দুরাই প্রকৃতপক্ষে নায়েব ও গোমস্তা হিসাবে কৃষকদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করতেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দ্বারা লর্ড কর্ণওয়ালিশ ঐসব মুসলিম জমিদারী উচ্ছেদ করেন এবং তৎপরিবর্তে হিন্দু নায়েব ও গোমস্তাদেরকে জমিদার হিসেবে অধিষ্ঠিত করেন। ফলে মুসলমান জমিদারদের এক বিরাট সংখ্যা এবং তাদের পোষ্যগণ দিন দিন ধব্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। এ.আর মল্লিক বলেন-বন্দোবস্তের ফলেও হিন্দুরা ছিল ভাগ্যবান। বন্দোবস্তের সময় অধিকাংশ মুসলমানের জমিদারী হিন্দুদের হাতে চলে যায়। কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক হিন্দুই তাদের জমিদারী হারিয়েছেন। পুরনো হিন্দু পরিবারের পতন হলেও তাদের স্ব-ধর্মীয় অন্যজন তাদের স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন। ফলে সম্পত্তি তাদের সম্প্রদায়ের হাতছাড়া হয়নি।[৪১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কোম্পানি সরকার ও তাদের সহকারী এদেশীয় শ্রেণী কোম্পানির কর্মচারী, মুৎসুদ্দি, বেনে প্রভৃতি উপকৃত হলেও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এদেশের গরীব রায়ত শ্রেণী এবং মুসলমান জমিদার শ্রেণী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ভূমিতে কৃষকদের অধিকার হরণ করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ভূমিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বেনে, মুৎসুদ্দির অনুপ্রবেশ এদেশের সামাজিক ইতিহাসে এক নয়া যুগের সূচনা করে। এর ফলে পুরাতন জমিদার শ্রেণীর পতন হয়। সৃষ্টি হয় ইংরেজ অনুগত এমন এক জমিদার শ্রেণী ইতিপূর্বে জমি সম্বন্ধে যাদের কোনই ধারণা ছিল না। এছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তকালে যে ছয়টি জমিদার দেশের মোট রাজস্বের অর্ধেক প্রদান করত।[৪২] সূর্যাস্ত আইনের ফলে সেগুলোর মধ্যে একমাত্র বর্ধমানের রাজা ব্যতীত সবগুলোই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথম সাত বছরের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়।[৪৩] চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমান জমিদার শ্রেণী। তাদের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যায়।

Willium Willson Hunter লিখেছেন, মুসলমান আমলে রাজস্ব শাসনে মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং এসকল মুসলমান অফিসারদের হাতে তখন প্রচুর অর্থ ছিল সে অর্থ থেকেই তারা বিভিন্ন বেতনভাতা

---

[৩৯] হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আবদুল মওদুদ (অনু.) (ঢাকা: ১৯৭৪), পৃ. ১৫৭।
[৪০] *তদেব*, পৃ. ১৫৭-১৫৮।
[৪১] A. R Mallick, *op. cit.*, p. 72.
[৪২] সিরাজুল ইসলাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৫।
[৪৩] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৫।

ও সংস্কার কাজ করত। কোম্পানী দিউয়ানী লাভের পর ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করে, একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মুসলমানদের সে তহবিল হাতছাড়া হয়ে যায়, যাদের ইতিপূর্বে কোন তহবিল ছিল না তাদের মতই নবাব বা সুবিধাভোগীর কৃষক হয়ে গেল। কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণ করে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সকল নিয়ম নীতির প্রবর্তন করে তাতে অভিজাত মুসলমানরা বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় কেননা কোম্পানির উদ্দেশ্যই ছিল একটি ব্রিটিশ অনুগত বা রাজভক্ত নব্য এলিট শ্রেণী তৈরি করা। যারা মুসলমানদের প্রতিপক্ষ হবে। এম. এ রহীম তার গ্রন্থে বলেন

> By introducing the permanent settlement, the company's rulers achived their objective of creating an influential and loyal class of landed proprietors who became a strong pillar of the British rule in Bengal.[88]

পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থা পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করে ব্রিটিশ সরকার মুসলমানদের অর্থনৈতিক জীবনে তীব্র আঘাত করে।[৮৫] অতিরিক্ত রাজস্ব বৃদ্ধি এবং সূর্যাস্ত আইনের ফলে মুসলমান জমিদার শ্রেণী তাদের জমিদারিত্ব হারায়। তাদের জমিদারী অধীনস্থ হিন্দু কর্মচারী অথবা বেনিয়া ও ব্যবসায়ীদের সাথে বন্দোবস্ত করা হয়।[৮৬]

তাদেরকে জমির মালিকানা স্বত্ব দেয়া হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করার সুযোগ দেয়া হয়। এই অর্থ মুসলমান শাসনামলে মুসলমানদের হাতে আসত।[৮৭] এ ছাড়া চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদাররা ইচ্ছামত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করে তাদের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালাত। Munuddin Ahmad Khan তার গ্রন্থে জনৈক ইংরেজের মন্তব্য এভাবেই তুলে ধরেন "ইংরেজ ও তাদের আইন কানুন যে একটি মাত্র শ্রেণীকে ধ্বংসের মুখ থেকে রক্ষা করেছিল, তা হলো তাদের অধীনে নিযুক্ত এতদ্দেশীয় গোমস্তা দালাল প্রতিনিধিগণ"।[৮৮] ইংরেজদের পলিসি ছিল যাদের সাহায্যে তারা এদেশের স্বাধীনতা হরণ করে এখানে রাজনৈতিক প্রভূত্ব লাভ করেছে তাদেরকে সমাজের সর্বস্তরে প্রতিষ্ঠিত করে মুসলমানদেরকে একেবারে উৎখাত করা যাতে করে ভবিষ্যতে তারা আর কখনো স্বাধীনতা ফিরে পাবার কোন শক্তি অর্জন করতে না পারে। এম. এ রহীম তার গ্রন্থে বলেন

> The British policy towards the Muslims was based on distrust and their administrators followed the policy of excluding them from every position.[৮৯]

হেস্টিংসের ভূমি ইজারাদান নীতি এবং কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমান জমিদারদের স্থান দখল করে কোম্পানির কোন না কোন বেনিয়া যাদেরকে Junior Partner বলা হত। এরাই ছিল কলকাতার বাবু তথা হিন্দু সম্প্রদায়। কোম্পানী ভূমিতে দেওয়ান, আমিল, খাজাঞ্চি, কানুনগো, পাটওয়ারী ইত্যাদি পদের

---

[88] M.A Rahim, *op. cit.*, p. 34.
[৮৫] Hunter, *The Annals of Rural Bengal* (London: Smith, Elder and Co., 1872), pp. 153-154.
[৮৬] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।
[৮৭] Hunter, *op. cit.*, pp. 153-154.
[৮৮] Muin-ud-din Ahmad Khan, *Muslim Struggle for Freedom in Bengal* (Dhaka: East Pakistan Govt. Press, 1960), p. 8.
[৮৯] M.A Rahim, *op. cit.*, p. 36.

সৃষ্টি করে মুসলমানদের সরিয়ে রাজস্ব বিভাগে মুসলমানদের দীর্ঘদিনের একচেটিয়া প্রাধান্যের অবসান ঘটায়। সিরাজুল ইসলামের মতে -

> The permanent settlement laid the foundations of the British administrative system in Bengal, at least thought not in the whole of India. But it was done at the expense of the social order. The system put the whole society in a state of flug.[৫০]

মুসলমানরা তাদের জমিদারিত্ব হারালেও কিছু মুসলমানের ভূ-সম্পত্তি ছিল। তা হল লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি। মুসলমান আমলে সরকার বা ধনী লোকেরা শিক্ষক, সূফী, দরবেশ, ব্রাহ্মণ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে লাখেরাজ ভূমি দান করতেন। এছাড়া মসজিদ, মন্দির, দরগাহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণেও নিষ্কর ভূমিদান করা হত। বুকাননের মতে, সে সময় ২০ রকমের নিষ্কর জমি পরিলক্ষিত হয়।[৫১] খাজনাবিহীন এসব লাখেরাজ ভূমি প্রাপ্তির ফলে লোকেরা শুধু স্বচ্ছল জীবনযাপন করতে পারত তাই নয় বরং, অভিজাতরূপে সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করত।

লাখেরাজ সম্পত্তির অধিকাংশ ভূয়া ভেবে কোম্পানি সরকার এই নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত করে। গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ সালে এই উদ্যোগ নেন। হান্টার এর মতে ১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস এই সাংঘাতিক ফাঁকিটা ধরে ফেলেন, কিন্তু সেসব জোত বাজেয়াপ্ত করার বিরুদ্ধে জনমত তখন এতই প্রবল ছিল যে, কোনো সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা সম্ভব হয়নি। আরো বেশ কিছুদিন পর শেষ পর্যন্ত ১৮২৮ সালে নাগাদ সরকার এসমস্ত জোতস্বত্ব বাজেয়াপ্ত করে।[৫২]

লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির ফলে এক প্রকার আতংক ও ঘৃণার জন্ম দেয় বাংলার ঘরে ঘরে। শত শত মুসলমান পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় এবং তাদের শিক্ষা প্রণালী যা এতদিন লাখেরাজ ওয়াকফের জমিজমার উপর নির্ভরশীল ছিল তা মারাত্মক আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ১৮ বছরের হয়রানির পর একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়।[৫৩] কেননা কোম্পানী নির্দেশ দেয় যে ১৭৬৫ সালে পূর্বের যে সকল লাখেরাজ ভূমির দলীল দেখাতে ব্যর্থ হবে সে সকল ভূমিতে বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হবে। আর এ নিয়মের কারণে মুসলমানরা তাদের ভূমিগুলো হারিয়ে নিঃস্ব জাতিতে পরিণত হয়। কেননা মুসলমানরা শাসক শ্রেণী তথা অভিজাত হওয়ায় তারা তাদের দলীল দস্তাবেজ সংরক্ষণে তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি। অন্যদিকে হিন্দুরা দলীল দস্তাবেজ সংরক্ষণ করেছে। বোম্বেতে ইংরেজ সরকারের ইনাম কমিশন নামে একটি কমিটির মাধ্যমে মুসলমানদের বিশ হাজার এস্টেট বাজেয়াপ্ত করে এবং এ সম্প্রদ্রায়ের হাজার হাজার পরিবার পরিজনকে ধব্বংস করে।[৫৪] আর ১৮২৮ সালে কোম্পানী নির্দেশ দিল যে Collector যত বেশি ভূমি পূনর্গঠন করবে তত বেশি কমিশন পাবে। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করার ক্ষেত্রে যে সকল সংবাদ সংগ্রহকারীকে নিয়োগ দেয়া হয় তাদের কার্যক্রমে সমাজে দুর্নীতি ও উৎকোচ বৃদ্ধি পায়। মামলার

---

৫০ Sirajul Islam, *The Permanent Settlement* (Dacca: Bangla Academy, 1979), p. 255.

৫১ Robert Montgomery Martin, *Historical Documents of Eastern India*, Vol. 2 (New Delhi: Sundeep Prakashan, 1990), p. 310.

৫২ হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৯।

৫৩ *তদেব* ।

৫৪ I.H. Qureshi, *A Short History of Pakistan*, Vol. IV (Karachi: University of Karachi, 1967), p. 132.

দিন সম্পর্কে অনেককে নিয়মমত জানানো হয়নি। আর তারা এমনভাবে এ নোটিশ দিল যাতে জমিদাররা তা জানতেই পারল না। না জানার কারণে জমিদার তাঁর সনদ আনতে এবং জমা দিতে যায়নি। চট্টগ্রামে ১৪৮৬৩ টি মামলা এক তরফা নিষ্পত্তি করা হয়।[৫৫]

যার প্রেক্ষিতে Collector তাঁর জমিদারী বাজেয়াপ্ত করে অন্যকে দিয়ে দেয়। এ ব্যবস্থা প্রবর্তনে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মুসলমানরা। বলা হয়, মুসলমানরা এমনিতেই ক্ষতিগ্রস্থ ছিল এর মাধ্যমে মুসলমানদের আরও পঙ্গু করে দেয়া হল। ১৮৪৪ সালে প্রকাশিত তথ্যে জানা যায় যে, "এক ডজন জমিদারীর মধ্যে যাদের জমিদারীর পরিধি ছিল একটি করে জেলার সমান তার মধ্যে মাত্র দুটি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয় প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের নিকট। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীর উত্থান হয় যারা হয়ে পড়েছিল নতুন বিদেশী প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন। Hunter বলেন যে সব হিন্দু কর আদায়কারীগণ ঐসময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকরিতে নিযুক্ত ছিল নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানা অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ সবিধা প্রদান করে অথচ মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে।[৫৬] বিভিন্ন কারণে নিষ্করভূমির অধিকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তাদের মূল সনদ হারিয়ে ফেলে। ফলে, কোম্পানি তাদের মূল দলীল পেশ করার আদেশ দিলে যারা তা দেখাতে ব্যর্থ হয় তাদের ভূমি বাজেয়াপ্ত করে সরকার সেগুলোকে খাস জমিতে রূপান্তরিত করে। এর দ্বারা সরকারের ৪০ লক্ষ টাকার রাজস্ব বৃদ্ধি পেলেও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানদের যা কিছু ভূ-সম্পত্তি ছিল তাও হাতছাড়া হয়ে যায়। আব্দুল করিমের মতে, এর ফলে একদিকে যেমন অনেক মুসলিম পরিবার ধ্বংস হয়ে যায় তেমনি তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতির উপায়ও বন্ধ হয়ে যায়। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্ত হয়ে যায়। মসজিদ, মাদরাসা বা খানকাহ সংস্কারবিহীন অবস্থায় ধীরে ধীরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান আলিম সমাজ ও চরম হতাশা ও বিপদের সম্মুখীন হয়।[৫৭] হান্টার বলেন, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে শতশত পরিবার সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে।[৫৮] কোম্পানি আমলে মুসলমানদের ঐশ্বর্যের উপর একের পর এক আঘাত আসে। সরকারি চাকরী হারিয়ে ঐশ্বর্যশালী মুসলমান সমাজ দরিদ্র দশায় পরিণত হয়।[৫৯] সার্বিক অবস্থার মূল্যায়ন করে হান্টার বলেন, একশত সত্তর বছর পূর্বে ভারতবর্ষের কোন মুসলমানের পক্ষে দরিদ্র হওয়া অসম্ভব ছিল; এখন তাদের পক্ষে ধনী থাকা প্রায় অসম্ভব।[৬০] লর্ড মেটকাফ, ১৮২০ সালে মন্তব্য করে বলেন, দেশের জমি জমা প্রকৃত মালিকের নিকট থেকে কেড়ে নিয়ে এক শ্রেণীর বাবুদের নিকট হস্তান্তরিত করা হয় যারা

---

[৫৫] A. R Mallick, *op. cit.*, pp. 42-46.
[৫৬] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪১।
[৫৭] আবদুল করিম, *বাংলার ইতিহাস: ১২০০-১৮৫৭* (ঢাকা: বড়াল প্রকাশনী, ২০০৮), পৃ. ২৯১।
[৫৮] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।
[৫৯] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫২।
[৬০] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৭।

উৎকোচ ও চরম দুর্নীতির মাধ্যমে ধনশালী হয়ে পড়েছিল, এ এমন এক ভয়াবহ নির্যাতনমূলক নীতির ভিত্তিতে করা হয় যার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল।[৬১] এম. এ রহীম এর মতে -

> With the fell of the Muslim rule and the establishment of the company's power in Bengal the Muslims suffered one blow after another to their prosperity. They lost all government offices as well as estates. Their rent free lands were also resumed. These steps of the British rulers destroyed the prosperity of the Muslims and reduced them to poverty.[৬২]

৩.১.৪ শিক্ষানীতি ও মুসলমানদের উপর এর প্রভাব

ব্রিটিশ ভারতে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার ব্রিটিশ শাসনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রাক-ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষের প্রধান দুটি সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে যে শিক্ষাব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল তাহল প্রধানতঃ ধর্মীয় শিক্ষা। হিন্দু সমাজে জাতি বর্ণপ্রথা বিদ্যমান থাকায় একমাত্র ব্রাক্ষণরাই শিক্ষার সুযোগ লাভ করলেও মুসলমান সমাজে সকলেই একই শিক্ষা লাভ করত। এক্ষেত্রে হিন্দুরা সংস্কৃত এবং মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় ভাষা আরবীর মাধ্যমে শিক্ষালাভ করত। মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও রীতিকে প্রাধান্য দেয়া হত। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাংলা তথা ভারতীয় মুসলমানদের শিক্ষার প্রধান মাধ্যম ছিল আরবী ও ফার্সি। মুসলমান শাসনামলে ভারতের মুসলমানগণ শিক্ষাদীক্ষায় উন্নত ছিল। তারা শিক্ষাকে ধর্মের অঙ্গস্বরূপ মনে করত। প্রত্যেক মসজিদ, ইমামবড়া, খানকাহ এবং আলিম ও অবস্থাসম্পন্ন লোকের বাড়ীতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল। শাসক, ওমরাহ ও রাজকর্মচারীগণ শিক্ষার অনুরাগী ছিলেন এবং শিক্ষার উন্নতির জন্য শিক্ষিত লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন এবং মাদরাসা স্থাপন করতেন।[৬৩] মাধ্যমিক শিক্ষা দেয়া হত মসজিদ ও উপাসনালয়ে আর উচ্চশিক্ষা কেন্দ্রীভূত ছিল প্রধানতঃ বিখ্যাত পন্ডিতদের হাতে। মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্রের পাঠ্যসুচীতে ছিল প্রধানত ব্যাকরণ, যুক্তিবিদ্যা, ধর্মতত্ত্ব, অধিবিদ্যা, সাহিত্য, আইনশাস্ত্র ও বিজ্ঞান।[৬৪] মুঘল যুগের (১৫২৬-১৭৫৭) শিক্ষার উন্নতির বিষয় উল্লেখ করে আবুল ফযল (১৫৫১-১৬০২) বলেছেন, যুবকদের শিক্ষার জন্য প্রত্যেক সভ্য জাতির মধ্যে বিদ্যালয় রয়েছে কিন্তু, হিন্দুস্থানের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছে।[৬৫] জেনারেল স্লিম্যান মুঘল যুগের শিক্ষার প্রশংসা করে বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার যেরূপ ব্যাপক প্রসার হয়েছে পৃথিবীর খুব কম সম্প্রদায়ের মধ্যে সেরূপ হয়েছে।[৬৬] হান্টারও মুসলমানদের সুসংগঠিত ও উৎকৃষ্টতর শিক্ষার প্রশংসা করেছেন। কোম্পানী

---

[৬১] E. Thompson, *The Life of Charles Lord Metcalfe* (London: 1937).
[৬২] M.A. Rahim, *The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D 1754-1947* (Dhaka: University of Dhaka, 1978), p. 44.
[৬৩] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 149.
[৬৪] *Imperial Gazzetteer of India*, Bengal, Vol. 1, p. 408.
[৬৫] Narendra Nath Law, *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule* (Green: Longmans, 1916), p. 161.
[৬৬] S.M. Ikram, *History of Muslim Civilization in India and Pakistan: A Political and Cultural History* (Lahore, Pakistan : Institute of Islamic Culture, 1993), p. 469.

এদেশের শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করার পর সময়ের ব্যবধানে তারা বিভিন্ন সংস্কারকার্যে মনোনিবেশ করে। আর এ সংস্কার কার্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার তথা পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন। শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে George D. Bears বলেন -

> Munro and Elphinstone gave the greatest attention to the development of Indian education as the chief means by which Britain may enlighten Indians and prepare them for their future political role.[৬৭]

মুঘল আমলের শুরু থেকে কোম্পানী আমলের দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ফার্সিই ছিল সরকারি ভাষা এবং ফার্সি ভাষা ছিল ধর্মনিরপেক্ষ ভাষা অর্থাৎ ফার্সি হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে সকলেই শিখতো অন্যদিকে আরবী ছিল পুরোপুরি মুসলমানদের ভাষা। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক ১৮৩৭ সালে রাজভাষা ফার্সির পরিবর্তে ইংরেজী এবং স্থানীয় ভাষা বাংলা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে রাজ ক্ষমতাচ্যুত মুসলমান সমাজ চরমভাবে হতাশ হন এবং মুসলিম সমাজের চরম অবনতি ঘটতে থাকে। ভারতীয় মুসলমানরা সবচাইতে বেশি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে শিক্ষাক্ষেত্রে। ব্রিটিশ কর্তৃক প্রবর্তিত শিক্ষা নীতির সাথে তারা কখনও আপোষ করতে পারেনি। তারা অনুভব করে যে, ধর্মনিরপেক্ষ জ্ঞান, যা তাদের ধর্ম থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, তা অর্জন করলে তাদের সন্তানরা ধর্ম বিমুখ হয়ে পড়বে। মুসলমানদের সন্দেহ সম্পূর্ণ অমূলক ছিলোনা। সরকারি কর্ম-কর্তাদের অনুসৃত মিশনারী তৎপরতা মুসলমানদেরকে নতুন শিক্ষানীতিতে আগ্রহী হতে বাধা দিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় মিশনারি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তাতে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। উচ্চ পদস্থ সরকারি কর্মকর্তারা এসব স্কুলে এসে ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করেন এবং খ্রিস্টান ধর্মানুসারে উত্তর দিতে পারলে তাদের পুরস্কৃত করেন।[৬৮] প্রথম দিকে শহরে যে সব বড় বড় কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাতে আরবি, ফারসি, সংস্কৃত, ফিক্‌হ, হাদীস ইত্যাদি পড়ানো হতো এবং তৎসঙ্গে ইংরেজীও পড়ানো হত, ঐসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচার ছিলনা। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে শাহ আব্দুল আযীয বলেন যে, উক্ত প্রেক্ষাপটে এগুলোতে শিক্ষা গ্রহণ করা শরীয়ত মতে অবৈধ নয়। পরে শিক্ষানীতি এবং পাঠ্যপুস্তকের আমূল পরিবর্তন করা হলো। এমতাবস্থায় জনসাধারণ বিশেষত মুসলমানেরা সন্দেহ পোষণ করতে লাগল যে, ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন করাই সরকারের লক্ষ্য।[৬৯] পক্ষান্তরে এর বিপরীত পক্ষ হিন্দুরা আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে পরিণত হয়। এমনকি রাষ্ট্রীয় উচ্চপদলাভ সহ বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা লাভ করে। জে.এন ফারকুহার তার গ্রন্থে উল্লেখ করে বলেন-

> The Hindus, Who took advantage of the new educational system introduced by the British, gained in knowledge and steadily acquired wealth and position. While the Muslims in all walks of life.[৭০]

---

[৬৭] George D. Bears, *British Attitudes towards India 1784-1858* (London: Oxford University Press, 1961), p. 144.

[৬৮] সৈয়দ আহমদ খান, *ভারতে বিদ্রোহের কারণ*, মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (অনু.) (ঢাকা: ১৯৭৯), পৃ. ২১।

[৬৯] *তদেব*, পৃ. ২৩।

[৭০] J.N Farquharr, *Modern Religious Movements in India* (Montana, USA: Kessinger Publishing, 2003), p. 91.

ব্রিটিশ ক্ষমতা এবং তাদের ভাষা ও শিক্ষানীতি হিন্দুদের জন্য প্রভূ পরিবর্তনের ন্যায়, ফলে তারা এ পরিবর্তন অতি সহজে গ্রহণ করে। কিন্তু দেশের প্রাক্তন শাসক হিসেবে মুসলমানরা এই পরিবর্তন গ্রহণ করতে অতি ধীরে অগ্রসর হয়। মুসলমানদের থেকে ব্রিটিশদের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরকে মুসলমানরা বেশি অপমানজনক মনে করে এবং সাম্রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে পুরো সম্প্রদায়টিই ডুবে যায়।[৭১]

কোম্পানি ক্ষমতা গ্রহণ করে সাথে সাথে শিক্ষাব্যবস্থা সংস্কারে মনোনিবেশ না করে দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা বহাল রাখে[৭২] এবং আধুনিক নাকি পাশ্চাত্য শিক্ষায় জাতিকে শিক্ষিত করা হবে এ প্রশ্নে কোম্পানির মধ্যেই দুটি ভাগ দেখা গেল।

ক. প্রাচ্যবাদী

খ. পাশ্চাত্যবাদী

প্রাচ্যবাদীদের সমর্থক গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংস দেশীয় প্রচলিত শিক্ষার প্রতি উদারতা প্রদর্শন করে এবং দেশীয় শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দেরকে অনুরক্ত করার প্রয়াস চালিয়ে ১৭৮২ সালে কলকাতায়[৭৩] কলকাতা আলিয়া মাদরাসা নামে একটি মাদরাসা স্থাপন করে এবং এর ব্যয় নির্বাহের জন্য সরকারি কোষাগার থেকে অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করে। সুফিয়া আহমেদ এর মতে

> Waren Hastings in response to Muslim appeals in Calcutta, founded the first government college in India, The Calcutta Madrassa.[৭৪]

কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার একদশক পর ১৭৯১/৯২ সালে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট জোনাথন ডানকান বেনারসে একটি সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া স্থানীয় জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি কোম্পানির কর্মচারীদের বাংলা, হিন্দী, ফার্সিসহ বিভিন্ন বিষয় শিক্ষা দেয়ার জন্য ১৮০০ সালে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীতে অবশ্যই ঔপনিবেশিক শক্তি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন করে। এক্ষেত্রে প্রশাসনিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে শিক্ষার মাধ্যম ইংরেজী না ফারসী হবে এ বিষয়ে কোম্পানির মাঝে মতবিরোধ দেখা দিলে ও জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির সভাপতি লর্ড মেকলে (১৮০০-১৮৫৯) ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যেসকল রাজনৈতিক সুবিধার সৃষ্টি হবে সেগুলোর প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, ইংরেজী শিক্ষার ফলে ভারতে এক শ্রেণীর লোক সৃষ্টি হবে যারা রক্তমাংসে হবে ভারতীয় এবং রুচি, নৈতিক জ্ঞান, চিন্তাধারা ও বুদ্ধিবৃত্তিতে হবে

---

[৭১] Sufia Ahmed, *Muslim Community in Bengal (1844-1912)* (Oxford University Press, Bangladesh, 1974), p. 08.

[৭২] A. R Mallick, *op. cit.* p. 166.

[৭৩] *Ibid.*, p. 169.

[৭৪] Sufia Ahmed, *op. cit.*, p. 07.

ইংরেজ।[৭৫] অর্থাৎ, তার ভাষ্য হল- ভারতে এমন এক ধরণের শিক্ষার বিস্তার করতে হবে যার ফলে এদেশে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থায়ী হয়। ১৮৩১ সালে কোর্ট অব ডাইরেক্টর্স এর এক আদেশে সর্বত্র ইংরেজী শিক্ষার উন্নয়নের ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ইংরেজীকে সরকারি দফতরের কাজ কর্মের ভাষা হিসাবে প্রচলন করার আদেশ করা হয়। এ আদেশের দ্বারা আরবী এবং ফারসির আধিপত্যের অবসান সূচিত হয়। মুসলমানদের জন্য এ নির্দেশ ছিল তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও শিক্ষার প্রতি মৃত্যু শোকের আঘাত স্বরূপ।[৭৬] কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরিবর্তন এত দ্রুত বাস্তবায়িত করা হয় যে, পূর্বের ধারণা মতো এক বিরাট সংখ্যক মুসলমান তাদের চাকুরী হারিয়ে সবাই অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। কারণ এরা সবাই সম্পূর্ণভাবে সরকারি বেতনের উপর নির্ভরশীল ছিল।[৭৭] ভারতীয় শিক্ষার প্রতি রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গৃহীত পদক্ষেপ ও সরকারি উদ্যোগের মধ্যে মুসলিম জাতি তাদের যথাযথ মর্যাদা ও যথাযথ বিবেচনা পায়নি।[৭৮]

বড়লাট উইলিয়াম বেন্টিংক, মেকলে এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য শিক্ষাপন্থীদের সাথে একমত পোষণ করে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এই প্রস্তাবে বলা হয় যে, ভারত সরকার ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষায় উৎসাহ দান করবে এবং শিক্ষাখাতের বরাদ্দ হতে অর্থ শুধু ইংরেজী শিক্ষায় ব্যয় করবে।[৭৯] জনশিক্ষা সাধারণ সমিতি কলকাতা মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজ উঠিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করলেও হিন্দু মুসলমানদের অবদানের ফলে এর অস্তিত্ব বজায় থাকে। কিন্তু, এর ছাত্রদের যে বৃত্তি দেয়া হত তা বন্ধ করে দেয়া হয়।[৮০] ১৮৩৬ সালে সরকার কলকাতায় একটি মেডিকেল কলেজ স্থাপন করে। এ কলেজে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৩৯ সালে মেডিকেল কলেজ সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন ক্লাস শুরু হয়। সরকার ১৮৩৬ সালে মুহসিন ফান্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপন করেন। ১৮৪২ সালে শিক্ষার তত্ত্বাবধানের জন্য জনশিক্ষা সাধারণ সমিতির স্থলে এডুকেশন কাউন্সিল গঠিত হয়।[৮১] ইংরেজি শিক্ষার প্রসার ও গুরুত্বের জন্য ১৮৪২-৪৩ সালে একটি প্রজ্ঞাপন জারী করে বলা হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থায় চাকুরী পরীক্ষা ইংরেজী মাধ্যমে হবে। লর্ড হেনরি হার্ডিঞ্জের আমলে (১৮৪৪-৪৮) ইংরেজী শিক্ষার প্রসার লাভ করে। এসময় কৃষ্ণনগর কলেজ এবং বর্ধমান, বাকুঁড়া, বারাসাত ও বগুড়া জেলা স্কুল স্থাপিত হয়। ১৮৩৫ সালে ইংরেজী ভাষায় আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের নীতি গৃহীত হলেও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট কাঠামো ছিল না। ১৮৫৪ সালে ইংল্যান্ডে অবস্থিত Court of Directors এর চেয়ারম্যান ভারতবর্ষের শিক্ষাখাতে কি কি করণীয় এ বিষয়ে একটি বৃহৎ পরিকল্পনা নিয়ে একটি পত্র লিখেন যা তার নামানুসারে উড ডেসপ্যাচ নামকরণ করা হয়। এ পত্রে তিনি শিক্ষা বিস্তারের জন্য যে পরিকল্পনা করেন তা হল-

---

[৭৫] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 96.
[৭৬] মুহাম্মদ আজিজুল হক, *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, পৃ. ১১।
[৭৭] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 55.
[৭৮] *Ibid.*, p. 198.
[৭৯] *Ibid.*, p. 201.
[৮০] এম. এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৭।
[৮১] *তদেব*।

ক. তিনটি প্রেসিডেন্সির প্রত্যেকটিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

খ. শিক্ষার বিস্তার ও তত্ত্বাবধানের জন্য একটি স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

গ. প্রাথমিক শিক্ষার জন্য যে পাঠশালা রয়েছে সেগুলোর উন্নতি সাধন করতে হবে।

ঘ. দরিদ্রদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করতে হবে।

ঙ. নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও নারী শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে।

১৮৫৪ সালের এই ডেসপ্যাচ কে ভারতে ইংরেজী শিক্ষার ম্যাগনা কার্টা বলে অভিহিত করা হয়েছে।[৮২]

এভাবে ১৮৫৫ সালের পর থেকে কোম্পানি সরকার প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করতে শুরু করে। এছাড়া শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৮৫৭ সালে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়।

ব্রিটিশ শিক্ষানীতি প্রবর্তনে মুসলমানদের উপর প্রভাব

কোম্পানির আমলে মুসলমানগণ শিক্ষাক্ষেত্রে খুব পিছিয়ে পড়ে যায়। রাজ্য হারানোর পর মুসলমানদের চাকুরী জমিদারী, জায়গীর প্রভৃতিও হারাতে হয়। এতে তাদের আর্থিক ঐশ্বর্য নষ্ট হয়ে যায়।[৮৩] মক্তব, খানকাহ, মাদ্রাসাহ ও অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি ও বেসরকারি সাহায্যের উপর নির্ভর করে চলত। এগুলোর জন্য লাখেরাজ বা নিষ্কর জমির ব্যবস্থা ছিল। লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করায় দরিদ্র মুসলমানদের পক্ষে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। ১৮০৭-১৪ সালের বুকানন হেমিল্টন ও ১৮৩৫-৩৮ সালে উইলিয়াম অ্যাডাম বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দিয়েছেন তাতে তারা এটি আলোচনা করেছেন।[৮৪]

আর্থিক অস্বচ্ছলতা সত্ত্বেও মুসলমানগণ তাদের শিক্ষার ঐতিহ্য বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। তারা প্রাথমিক শিক্ষা কিছুটা বজায় রাখতে সমর্থ হলেও মাদরাসা ও উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। মাদরাসা শিক্ষায় সরকার কিছু বৃত্তির ব্যবস্থা করলেও ১৮৩৫ সাল নাগাদ তা বন্ধ করে দেয়া হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা দারুন অসুবিধায় পড়ে। এ ছাড়া সরকার হাজী মুহাম্মদ মুহসীনের (১৭৩৫-১৮১২) ওয়াকফ সম্পত্তির আয় আসল উদ্দেশ্যে ব্যবহার না করে অন্য উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়। হাজী মুহাম্মদ মুহসীন মুসলমানদের উন্নতির জন্য তার সম্পত্তি দান করে গেলেও মুসলমানগণ এখান থেকে কোন সাহায্য পায়নি। সরকার কর্তৃক মুহসীন ফান্ডের অপব্যবহারের সমালোচনা করে হান্টার লিখেছেন এ আত্মসাতের অভিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা বড়ই কষ্টদায়ক। কারণ, এ অভিযোগ অস্বীকার করা অসম্ভব।[৮৫] এভাবে উনবিংশ

[৮২] Anil Saxena (ed.), *Encyclopaedia of Indian History*, Vol. 27 (New Delhi: Anmol Publication Ltd., 2006), p. 260.
[৮৩] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৯।
[৮৪] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০।
[৮৫] *তদেব*, পৃ. ১৭৩-৭৫।

শতাব্দীর প্রথমদিকে মুসলমানদের শিক্ষাব্যবস্থার অবনতি হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে তারা হিন্দুদের পিছনে পড়ে যায়। যা কোম্পানি আমলে আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ক্ষমতা গ্রহণ করে মুসলমানদের থেকে আবার মুসলমানদের নিকটই ক্ষমতা হারানোর আশংকা করে। সঙ্গত কারণেই তারা চায়নি মুসলমানরা আর কোনভাবেই মাথা চাড়া দিয়ে উঠুক। বক্সার যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কোম্পানী ভূমি ব্যবস্থাপনায় সংস্কার প্রণয়ন করার ফলে এবং লাখেরাজ ভূমি বাজেয়াপ্তির কারণে মুসলমান জাতি এমনিতেই একটি হতদরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত হয়। পাশাপাশি ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা ব্যতিত মুসলমানদের শিক্ষার স্বার্থে আর কোন প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করা হয়নি। যে প্রতিষ্ঠান গুলো কোম্পানী সরকার ও মিশনারীদের প্রচেষ্টায় নির্মিত হয়েছিল সেগুলো আবার ছিল পাশ্চাত্যবাদী তথা ইংরেজী শিক্ষার প্রতিষ্ঠান। আর এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে মুসলমানদের শিক্ষার অধিকার স্বীকৃত ছিলনা। অন্যদিকে চাকরি বাকরি সহ বিভিন্ন কর্মস্থলে ইংরেজী জানা লোকদেরই কেবল নিয়োগ দেয়া হত। চাকুরির পরীক্ষা ইংরেজী মাধ্যমে হবে বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল। কলকাতা মাদ্রাসার সিলেবাস সংস্কার করে Anglo Persian Department খোলা হল। ১৮৩৭ সালে সরকার অফিস আদালতে ফারসি ভাষার পরিবর্তে ইংরেজী এবং দেশীয় ভাষা বাংলা ও উর্দু চালু করে। বাংলার উচ্চশ্রেণীর মুসলমানরা উর্দু ভাষা ব্যবহার করতেন। তবে অবশ্য লক্ষ্ণৌ বা দিল্লীর অধিবাসীদের ন্যায় খাঁটি উর্দু নয়। এ শ্রেণীর মুসলমানরা প্রজাদের ভাষা কে ঘৃণার চোখে দেখেন। আই এইচ কোরেশি বলেন-

১৮৩৭ সালে দফতরি ভাষা হিসেবে ইংরেজি ও দেশীয় ভাষা গ্রহণ করার ফলে সরকারি চাকুরীতে মুসলমানদের প্রবেশ সুদূর পরাহত হয়ে যায়। সরকারের বিচার বিভাগে তখনো কর্মরত হাজার হাজার মুসলমানদেরকে হঠাৎ অশিক্ষিত ঘোষণা করা হয়। ফলে তারা চাকুরী ও জীবিকার উপায় থেকে বঞ্চিত হয়।[৮৬]

কোম্পানির উপরোক্ত পদক্ষেপের কারণে মোটামুটি বুঝাই গেল যে মাদ্রাসার Product আর কোন চাকরি পাবেনা। কারণ তখনো সমাজে মুসলমানদের আরবীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধ বেশি ছিল তারা ইংরেজী শিক্ষার প্রতি অনীহা প্রকাশ করল আর ইংরেজী শিক্ষার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন মুসলমানদের হাতে তা ছিলনা। আর মুসলমনারা নিজেদের অভিজাত মনে করে কোম্পানির অধীনে কোন ছোট খাট চাকরিতে তাদের সন্তানদের প্রেরণ করেনি। আর যারা পূর্বে কোন চাকরিতে ছিল তারাও অবসরে যেতে থাকল। ফলে এক সময় অফিস আদালতে কোন মুসলমান খুঁজে পাওয়া গেলনা। ১৮৫০ এর দশকে দু একটি ছাড়া আর কোন অভিজাত মুসলমানদের পরিবার খুজে পাওয়া যায়নি। যাদের কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়েছে সেই মুসলমানদের প্রতি অবিশ্বাস এবং তাদের প্রতি উদাসীনতা ও সমবেদনাহীন মনোভাব ইংরেজদের পক্ষে ছিল স্বাভাবিক, তেমনিভাবে যারা মুসলমানদের নিকট থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিতে ব্রিটিশদের সহযোগিতা করেছে সেই হিন্দুদের প্রতি তাদের ছিল তোষণনীতি।[৮৭] ১৮১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হিন্দু কলেজ ইংরেজী ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আর এ কলেজ থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত

[৮৬] I.H. Qureshi, *op. cit.*, p. 131.
[৮৭] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 191.

ব্যক্তিরাই রাষ্ট্রের বিভিন্ন উচ্চপদে নিয়োজিত হয় এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর এ শিক্ষা ব্যয়বহুল হওয়ায় মুসলমানরা ইংরেজী শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

১৮৫৭ সালের General Report on Public Instruction in Bengal এর তথ্য অনুযায়ী হিন্দু কলেজ ৪২৬ জন হিন্দু ছাত্র ছিল, একজনও মুসলমান ছাত্র ছিল না। ১৮৪১ সালে স্কুল কলেজের ৪০৩৪ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ৭৫১ জন ছিল মুসলমান যার অধিকাংশই কলকাতার হুগলী মাদ্রাসার ছাত্র ছিল। ১৮৪৪ সালের ১০ অক্টোবর যে প্রস্তাবে সরকারি চাকুরীতে ইংরেজীর জ্ঞানকে প্রাধান্য দিতে বলা হয়, তাতে মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী পরিচালিত প্রার্থীদের নির্বাচনী পরীক্ষার প্রতিবেদনে এর সত্যতা ধরা পড়ে। ১৮৪৫ থেকে ১৮৫২ সাল পর্যন্ত বছরগুলোতে প্রস্তুত সফলকাম পরীক্ষার্থীর তালিকায়ও কোন মুসলমানের নাম নেই। বস্তুত এসব পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার ফলে মুসলমানদেরকে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়।[৮৮]

১৮৪৬ সালে ৪৫৩৭ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান ছিল ৬০৬ জন এবং ঢাকা কলেজ ও স্কুলে ২৮১ জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র ১৮ জন ছিল মুসলমান। আবার ১৮৫৫ - ৫৬ সালে মোট ৭২১৬ জন ছাত্রের মধ্যে ৭৩১ জন ছিল মুসলমান এদের মধ্যে ১৮৫ জন কলকাতা মাদ্রাসার ১৭৫ জন হুগলী মাদ্রাসার ৭ জন হুগলী কলেজের ছাত্র ছিল। এভাবে দেখা যায় উনবিংশ শতকের ৬০ এর পর্যন্ত কোম্পানির "ইংরেজী সরকারিকরণ" নীতি ভারতের মুসলমানদেরকে শিক্ষা দীক্ষা থেকে প্রায় বঞ্চিত করে তুলেছিল। যে কারণেই হোক মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে দুর্ভাগ্যবশত এমন সময় অবহেলা দেখানো হল, যখন ক্রমবর্ধমান দারিদ্র এ সম্প্রদায়কে পেছনে ঠেলে দিয়েছে এবং যখন রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল ধ্বংসের পথে। কোর্ট অব ডিরেক্টরের নির্দেশ মোতাবেক সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের শিক্ষার প্রতি নজর দেয়।[৮৯]

৩.২ কোম্পানি সরকারের গৃহিত নীতির প্রতি মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া

১৭৫৭ সালের পলাশী যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে ইংরেজরা দীর্ঘদিনের মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে সমগ্র ভারত বর্ষকে ইংরেজ শাসনের উপনিবেশে পরিণত করে। মুঘল রাজত্বের ধ্বংসস্তুপের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ রাজত্ব। ফলে, রাজনৈতিক পরিবর্তনের পাশাপাশি দেশের শাসনতন্ত্র, সমাজ ও ক্ষমতা বিন্যাসে পরিবর্তন আসে। সাড়ে পাঁচশত বছর ক্ষমতায় থাকা মুসলমানরা শাসন ক্ষমতা হারিয়ে স্বভাবতই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এসময় তারা আর্থিক জীবনে সমৃদ্ধ ছিল এবং শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত ছিল। শাসন ক্ষমতা হারিয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যে তারা দরিদ্র ও অনুন্নত হয়ে পড়ে।[৯০] এসব পরিবর্তনে ভারতীয়দের বিশেষ করে মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল সেসব বিষয়ে বিংশ শতকের গোড়ার দিক পর্যন্ত কোন গবেষণা হয়নি। কারণ, ঐ সময়ের ইতিহাস চর্চা ছিল রাজকীয় ইতিহাস চর্চা। ব্রিটিশ শাসকের প্রতি শাসিত জাতির প্রতিক্রিয়া চিত্রায়ন ছিল তাদের জন্য অপ্রিয়

---

[৮৮] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 56.
[৮৯] *Ibid.*, p. 199.
[৯০] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।

ও অনুপযোগী।[৯১] আধুনিক গবেষকদের মতে, দেশবাসী সমকালীন রাজনৈতিক পরিবেশে সম্পূর্ণ উদাসীন কিংবা নির্লিপ্ত ছিল না। বরং, প্রয়োজন বোধে সরকারি নীতির প্রতিরোধ এমনকি সশস্ত্র সংগ্রামে পর্যন্ত লিপ্ত হতে তারা দ্বিধা করেননি। মুসলমানদের এসব আন্দোলন ছিল অনেকটা সশস্ত্র এবং বিচ্ছিন্নভাবে সংগঠিত। এসব আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন পীর, ফকির, উলামা, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। নিম্নে এর একটি বিবরণ দেয়া হল।

৩.২.১ মহীশূরের যুদ্ধ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ তিন দশক ধরে চলা মহীশূরের যুদ্ধ ভারত উপমহাদেশের একটি পালাক্রমিক যুদ্ধ; যা মহীশূর রাজ্য এবং প্রধানত মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধিদের মধ্যে সংঘটিত হয়। এই ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধে যারা নেতৃত্ব দেন তারা হলেন, মহীশূরের রাজা হায়দার আলী (১৭৬১ - ১৭৮২) ও তার পুত্র টিপু সুলতান (১৭৮২-১৭৯৯)। মহীশূর রাজ্যকে কেন্দ্র করে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে তাদের চারটি যুদ্ধ হয়। প্রথম তিনটি যুদ্ধে ইংরেজরা তেমন সুবিধা করতে না পারলেও চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে হায়দার আলী ও টিপু সুলতানের পতন ঘটে এবং ব্রিটিশ ও তাদের জোট নিজেদের মধ্যে রাজ্যটি বণ্টন করে নেয়। প্রথম ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৭৬৭ সালে। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় ইতিহাসে বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে হায়দার আলী ও টিপু সুলতান বিখ্যাত বীর ও দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হিসেবে অমর হয়ে আছেন।[৯২] তিনি অশিক্ষিত হলেও আত্মপ্রত্যয়, অদম্য সাহস, সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি গুণে গুণান্বিত ছিলেন। হায়দার আলীর শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরেজরা ঈর্ষান্বিত হয়েছিল। হায়দার আলী ইংরেজদের প্রধান প্রতিপক্ষ ফরাসীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখে চলতেন। তৃতীয় কর্ণাটের যুদ্ধের সময় ১৭৬৩ সালে হায়দার আলী চার হাজার অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে ফরাসীদের সাহায্য করেছিলেন। বস্তুতঃ ফরাসীদের সঙ্গে হায়দার আলীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কই ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অন্যতম কারণ ছিল। হায়দার আলীর দ্রুত শক্তিবৃদ্ধিতে মারাঠা, নিযাম ও ইংরেজগণ ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠেছিল। ১৭৬৭ সালে ইংরেজ ও নিযামের মিলিত বাহিনী মহীশূর আক্রমণ করে। কিন্তু; হায়দার আলী ইংরেজ ও নিযামের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করে ইংরেজ অধিকৃত মাদ্রাজ অধিকার করতে উদ্যত হন। এ যুদ্ধকে প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ বলা হয়। বিজয়ী হায়দার আলী মাদ্রাজের সন্নিকটে সসৈন্যে উপস্থিত হলে ১৭৬৯ সালে ইংরেজ ও হায়দার আলীর মধ্যে মাদ্রাজ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির (Treaty of Madras) শর্তানুসারে ইংরেজ ও মহীশূরের পরস্পরের বিজিত স্থানসমুহে প্রত্যাবর্তন এবং বন্দী বিনিময় করেন। আরও ঠিক হয় যে, অন্য কোন শক্তি মহীশূর আক্রমণ করলে ইংরেজগণ মহীশূরকে সাহায্য দানে বাধ্য থাকবে। এভাবে প্রথম মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়। দ্বিতীয় মহীশূরের যুদ্ধ হয় ১৭৮০ সালে। ১৭৭১ সালে মারাঠাগণ মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করলে ইংরেজগণ ১৭৬৯ সালে স্বাক্ষরিত মাদ্রাজ সন্ধির শর্তানুসারে সামরিক সাহায্য

---

[৯১] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮।

[৯২] এ.কে এম আব্দুল আলীম, *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস* (ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স, ২০১১), পৃ. ৩২৬।

নিয়ে মহীশূর রক্ষায় এগিয়ে আসেননি। ফলে, হায়দার আলী ইংরেজদের প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট হন এবং তাদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সংকল্পবদ্ধ হন। তারপর ১৭৭৯ সালে মহীশূরে ফরাসিদের শক্তিশালী বাণিজ্য বন্দর "মাহে" বন্দর ইংরেজরা দখল করে নিলে ক্ষুদ্ধ হায়দার আলী এর প্রতিবাদ জানান এবং ১৭৮০ সালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন। ফলে, ২য় মহীশূর যুদ্ধের শুরু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস তার কূটনীতির দ্বারা নিযাম ও মারাঠাদের হায়দার আলীর নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করলেও হায়দার আলী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান। ১৭৮১ সালে পোর্টনোভার যুদ্ধে হায়দার আলী ইংরেজ সেনাপতি আরকুয়েটের হাতে পরাজিত হন। অবশেষে ১৭৮২ সালে তিনি কর্কট রোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরেজগণ ও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।[৯৩] হায়দার আলীর মৃত্যুর পর তার সুযোগ্য পুত্র টিপু সুলতান (১৭৮২-৯৯) ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং ইংরেজ বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৪ সালে টিপু সুলতানও ইংরেজদের মধ্যে ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি (Treaty of Mangalore) স্বাক্ষরিত হলে উভয় পক্ষই পরস্পরের অধিকৃত স্থান প্রত্যার্পণ করতে স্বীকৃত হয়। এই সন্ধি ছিল টিপু সুলতানের জন্য কূটনৈতিক বিজয়। ১৭৯০ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিশ ও টিপু সুলতানের মধ্যে তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূরের যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৮৪ সালে ম্যাংগালোর সন্ধির শর্তাদি উপেক্ষা করে কর্ণওয়ালিশ টিপু সুলতানকে তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করে। ইংরেজদের প্রতিহত করাই ছিল টিপু সুলতানের একমাত্র লক্ষ্য। কর্ণওয়ালিশ মারাঠা ও নিজামের সাথে এক 'ত্রয়ী শক্তি মৈত্রী' চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

ফলে টিপু সুলতানকে একাই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। তিনি ১৭৯০-৯২ সাল পর্যন্ত দুই বছর ধরে একাই বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম চালিয়ে যান। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তিনি সফল হতে পারেননি। দীর্ঘদিন তাঁর রাজধানী অবরোধের পর টিপু সুলতান ১৭৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করেন এবং মার্চ মাসে শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হন। উক্ত সন্ধির দ্বারা টিপু সুলতানের রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরেজ, মারাঠা, নিজাম ত্রিসংঘ কর্তৃক অধিকৃত হল।[৯৪] শ্রীরঙ্গপত্তমের সন্ধির অপমানজনক শর্ত মেনে চলা টিপু সুলতানের ন্যায় স্বাধীনচেতা দেশপ্রেমিক সুলতানের সম্ভব ছিল না। ফলে, সেনাবাহিনীর সংখ্যা বৃদ্ধি ও এটাকে উন্নত ধরণের সামরিক প্রশিক্ষণ দান করে টিপু সুলতান নিজ রাজ্যকে পুনরায় সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করে গড়ে তোলেন। এছাড়া কাবুল, তুরস্ক ও ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের নিকট ইংরেজ বিরোধী সাহায্য চেয়ে আবেদন করেন। টিপু সুলতানের এসব কার্যকলাপে তৎকালীন বড় লাট লর্ড ওয়েলেসলির (১৭৯৮-১৮০৫) মনে আশংকার সৃষ্টি হয়েছিল। তিনি টিপু সুলতানকে তাঁর প্রবর্তিত “অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি” গ্রহণের আহবান জানান। টিপু সুলতান এ প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে, ১৭৯৯ সালে ইংরেজ সেনাবাহিনী বিভিন্ন দিক থেকে মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করে। এটি চতুর্থ ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধ মাত্র কয়েকমাস স্থায়ী হয়েছিল। কয়েকটি যুদ্ধে পরাজয়ের পর টিপু

[৯৩] এ.কে এম আব্দুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২৭।
[৯৪] আব্দুল আলীম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৭।

সুলতান শ্রীরঙ্গপত্তমের যুদ্ধে বীরের মত যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দেন। তার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহীশূর রাজ্যের পতন ঘটে এবং মহীশূরের অধিকাংশ অংশ ইংরেজদের অধীনে চলে যায়।

এভাবে দেখা যায় যে, মহীশূরের যুদ্ধে হায়দার আলী ও তার পুত্র পরাজিত হন এবং তারা ইংরেজদের অধীনতার বিরুদ্ধে আমৃত্যু লড়াই করেছেন। এটি ছিল ইংরেজদের দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। বস্তুতপক্ষে টিপু সুলতান ছিলেন ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনচেতা সুলতান। রাজনৈতিক দূরদর্শিতা, সামরিক দক্ষতা, রণনিপুণতা ও কূটকৌশলে সমসাময়িক দেশীয় নৃপতিগণের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ। মারাঠা ও নিজামরা ইংরেজদের পক্ষে যোগদান করলেও তিনি ব্রিটিশদের সাথে এককভাবে যুদ্ধ চালিয়েছেন। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তিনি বীরত্ব সহকারে যুদ্ধ করেন। তার শৌর্যবীর্যের কারণে তিনি শের-এ মহীশূর (মহীশূরের বাঘ) নামে খ্যাত ছিলেন।[৯৫]

৩.২.২ ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৬০-১৮০০)

ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সুত্রপাতের মাত্র সাত বছর পরে দীর্ঘ ৩৭ বছর ব্যাপী বাংলার গ্রামাঞ্চলের বিশাল এলাকা জুড়ে যে সশস্ত্র সংগ্রাম ব্রিটিশদের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল ইতিহাসে তাই ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ নামে পরিচিত। বাংলায় ব্রিটিশ বেনিয়াদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ছিল প্রথম সশস্ত্র প্রতিবাদ। তথ্যপঞ্জী থেকে জানা যায় ফকীরগণ ছিলেন সিরিয়ার প্রখ্যাত সূফী সাধক বদীউজ্জামান শাহ ইমাদার প্রতিষ্ঠিত মাদারীয় শ্রেণীর সূফী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত। অন্যদিকে হিন্দুগণ ছিলেন বৈদিক হিন্দু যোগী। ইংরেজদের অপশাসনে প্রচন্ড বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে এ বিদ্রোহ দেখা দেয়। দেশ জোড়া অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য যে সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন তা ফকীর সন্ন্যাসী বিদ্রোহীদের ছিলনা।[৯৬]

১৭৬০ সালে এ আন্দোলন শুরু হয় এবং চার দশকের অধিক কাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে।[৯৭] ফকীর ও সন্ন্যাসীদের এই অব্যাহত প্রতিরোধের নানাবিধ কারণ রয়েছে। সম্ভবতঃ কোম্পানি প্রবর্তিত রেগুলেশন দ্বারা মুসলিম ফকীর ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা বিভিন্নভাবে ব্যাহত ও বাধাগ্রস্ত হয়। ফকির ও সন্ন্যাসীরা প্রধানত গ্রামাঞ্চলে তাদের অনুসারী ও সহকর্মী জনসাধারণের নিকট থেকে দান গ্রহণ করে জীবন ধারণ করত। ইংরেজ সরকার তাদের অবাধ গতিবিধিতে বাধা সৃষ্টি করে ভিক্ষা ও মুষ্টি সংগ্রহকে বেআইনি ঘোষণা করে এবং তাদেরকে ডাকাত দস্যু বলে আখ্যায়িত করে।[৯৮] ইতিপূর্বে কোন সরকার তাদের কর্মকান্ডে এমন বাধার সৃষ্টি করেনি। এসকল কারণে ফকীর সন্ন্যাসীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলেন। এ প্রতিরোধ আন্দোলন দেশের কৃষকশ্রেণীর স্বতঃস্ফুর্ত সমর্থন লাভ করে। প্রায় ৫০ হাজার মানুষ এ বিদ্রোহে

---

[৯৫] Mohibul Hasan Khan, *History of Tipu Sultan* (New Delhi: Aakar Books, Twelve Chapter, 2005).

[৯৬] জুলফিকার হায়দার, *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম* (ঢাকা: এর্ডনপাবলিকেশন, ২০০৪), পৃ. ৩৪।

[৯৭] সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.), *বাংলাপিডিয়া*, ৬ষ্ঠ খন্ড (ঢাকা: এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ২০০৩), পৃ. ৯২।

[৯৮] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৯।

অংশগ্রহণ করে। উত্তরবঙ্গের মাদারীয় সম্প্রদায়ের ফকীর এবং পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহের গিরি গোঁসাই এবং নাগা সন্ন্যাসীরা প্রথমেই বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেয়। পরে ক্ষমতাচ্যুত জমিদার, ছাটাই হওয়া সৈনিক এবং বিতাড়িত কৃষক এ বিদ্রোহে যোগ দেয়। ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সংগঠক ও নেতা ছিলেন মাদারীয়া তরীকার সূফী সাধক ফকীর মজনু শাহ বুরহানা (মৃত্যু-১৭৮৭)।[৯৯]

বিচ্ছিন্নভাবে ফকীর বিদ্রোহ শুরু হলেও ১৭৬৩ সালে বিদ্রোহ পূর্ণাঙ্গ রূপ নেয় এবং জোরদার হয়ে ওঠে। ১৭৬৩ সালে শুরু হয়ে বিদ্রোহ ক্রমান্বয়ে দাবানলের মত মালদহ, রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় ছড়িয়ে পড়ে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যস্থল ছিল কোম্পানির কুঠি, জমিদারদের কাচারী এবং আমলাদের বাসস্থান। বিদ্রোহী ফকিররা ১৭৬০ সালে বাকেরগঞ্জে কোম্পানির বাণিজ্য কুঠি আক্রমণ করে। ওই বছরেই অতর্কিত আক্রমণ করে তারা ঢাকা কুঠি দখল করে নেয়। অবশ্য পরের বছর ক্যাপ্টেন গ্রান্ট কুঠি পুনরুদ্ধার করেন। একই বছর বিদ্রোহীরা রাজশাহীতে কোম্পানির ফ্যাক্টরীতে আক্রমণ করে এবং ফ্যাক্টরীর প্রধান মি. বেন্টেককে বন্দী করে এবং পাটনা নিয়ে পরে তাকে হত্যা করা হয়। ১৭৬৭ সালের দিকে রংপুর, রাজশাহী, কুচবিহার, জলপাইগুড়ি ও কুমিল্লা জেলায় বিদ্রোহীদের আক্রমণ তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৭৭১ সালে ফকীর মজনু শাহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ব্যাপী এক বড় রকমের ব্রিটিশ বিরোধী তৎপরতা শুরু করেন। ১৭৬৮-৭০ সালে প্রধানতঃ বিহার, বেনারস, পূর্ণিয়া, রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী, কুমিল্লা ও চট্টগ্রাম জেলায় ফকীর সন্ন্যাসীদের আক্রমণ অব্যাহত ছিল। ১৭৭২ সালে ২ হাজার সশস্ত্র অনুসারী নিয়ে মজনুশাহ রাজশাহী আক্রমণ করেন। ১৭৬৫ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস ফকীর - সন্ন্যাসীদের দমন করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ১৭৭৬-১৭৮৬ সালের মধ্যে রংপুর, দিনাজপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ জেলার ফকীর মজনু শাহর বাহিনীর সঙ্গে কোম্পানির সৈন্যের বহু সংঘর্ষ হয়। ঐসব সংঘর্ষে মজনু শাহের রণকৌশল ছিল অতর্কিত আক্রমণ ও নিরাপদে পলায়ন। অবশেষে ১৭৮৭ সালে মজনু শাহের মৃত্যু হয়। তার মৃত্যুর পর ফকীরদের নেতৃত্ব দেন মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সুবহান শাহ, মাদারবক্স, করিম শাহ, রওশন শাহ প্রমুখ ফকীরগণ। মজনু শাহের মৃত্যুর পর ফকীরদের মধ্যে নেতৃত্বের কোন্দল, সাংগঠনিক দুর্বলতা, নেতাদের অভিজ্ঞতার অভাব, সঠিক পরিকল্পনার অভাব, যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং সাম্প্রদায়িক অনৈক্য প্রভৃতি কারণ ফকীর প্রতিরোধ আন্দোলনকে ক্রমশ দুর্বল করে তোলে। অবশেষে ১৮০০ সাল নাগাদ ফকীর আন্দোলন চূড়ান্তভাবে পরাজিত হয়।

এভাবে বলা যায় যে, ফকীর সন্ন্যাসী আন্দোলন ব্যর্থ হলেও এটি ছিল কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ। কিছু পন্ডিতদের মতে, এই বিদ্রোহ ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুদ্ধসমূহের অন্যতম। পরবর্তী আন্দোলন সমূহে এর প্রভাব অপরিসীম। এই বিদ্রোহকে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলে

---

[৯৯] *বাংলাপিডিয়া*, ৬ষ্ঠ খন্ড, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩।

অভিহিত করা হলেও উইলিয়াম হান্টার এই বিদ্রোহকে সর্বপ্রথম কৃষক বিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছেন। যদিও লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস একে হিন্দুস্থানের যাযাবর ও পেশাদার ডাকাতদের উপদ্রব বলে চিহ্নিত করেছিলেন। এছাড়া তাদের পেশাগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য তারা সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল। দেশরক্ষা বা জাতীয়তাবাদ তাদের লক্ষ্য ছিল না।[১০০]

৩.২.৩ তিতুমীরের আন্দোলন

বাংলাদেশে কৃষক বিদ্রোহের ইতিহাসে তিতুমীর একটি উজ্জ্বল অধ্যায়ের নির্মাতা। ওয়াহাবী আন্দোলনের অন্যতম গ্রামীণ খুঁটি হল তিতুমীরের বিদ্রোহ। সীমান্ত থেকে এই জিহাদী লড়াই ছড়িয়ে পড়েছে বাংলার গ্রাম গ্রামান্তরে। যমুনা আর ইছামতি নদীর দু'ধার ধরে আঠারো বা বিশ মাইল দৈর্ঘ্য আর চৌদ্দ মাইল প্রস্থ ব্যাপী এলাকা ছিল তিতুমীরের বিদ্রোহের আয়তন। স্যার সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) শিক্ষা ও আদর্শ ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগ্রামী অনুসারীদের জন্ম দেয়। এ অনুসারীবৃন্দ সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পরও অকুতোভয়ে তাঁর আদর্শ ও জিহাদ পরিচালনা করেন। এদের এক অগ্নিপুরুষ ছিলেন চব্বিশ পরগণার বারাসাত মহকুমার মীর নিসার আলী ওরফে তিতুমীর।[১০১] পশ্চিমবঙ্গের বারাসাত মহকুমার চাঁদপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে বাংলা ১১৮৮ সালের ১৪ মাঘ/[১০২]১৭৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুন্সী আমীর নামক স্থানীয় ভূস্বামীর কন্যাকে বিবাহ করেন। তিতুমীর কলকাতার একজন বিখ্যাত মল্লযোদ্ধা ছিলেন।[১০৩] তিনি ছিলেন হাফেজে কুরআন। এছাড়া বাংলা, আরবী ও ফারসী ভাষায় ছিলেন দক্ষ। তিতুমীর ১৮২২ সালে দিল্লীর রাজপরিবারের জনৈক ব্যক্তির সাথে মক্কায় হজ্জ করতে যান। মক্কায় থাকাকালে তিনি বিখ্যাত ইসলামী ধর্মসংস্কারক ও বিপ্লবীনেতা সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সান্নিধ্য লাভ করেন। সৈয়দ আহমদ তাকে ভারতবর্ষের মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতির অনুশীলন এবং বিদেশী শক্তির পরাধীনতা থেকে মুক্ত করার কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ১৮২৭ সালে তিতুমীর দেশে ফিরে আসেন এবং হায়দারপুরে বসতি স্থাপন করে সমাজ সংস্কারে আত্মনিয়োগ করেন। অল্পকালের মধ্যেই প্রায় ৪০০ লোক তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। প্রাথমিক পর্যায়ে তার আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার। তার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল না। মুসলিম সমাজে শিরক, বিদআতের অনুশীলন নির্মূল করা এবং দৈনন্দিন জীবনে ইসলামের অনুশাসন অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করাই ছিল তার আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য।[১০৪] চব্বিশ পরগণা ও নদীয়া জেলার বহু কৃষক তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলনে যোগ দেন। এর ফলে, তার নেতৃত্বে এক প্রবল আন্দোলন গড়ে ওঠে। মুসলিম প্রজাগণ সংঘবদ্ধ হচ্ছে দেখে হিন্দু জমিদারগণ ভয় পেয়ে যান এবং তারা তিতুমীরের অনুচরদের শক্তিবৃদ্ধির পথ বন্ধ করতে

---

[১০০] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৬১।
[১০১] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২০।
[১০২] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ৫, পৃ. ৪৭৩।
[১০৩] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৯।
[১০৪] *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭৩।

সচেষ্ট হন। আর তিতুমীর শিষ্যদের অপমান করার জন্য জরিমানা স্বরূপ তাদের উপর দাড়ি কর বসান। দাড়ির উপর করারোপই ছিল বিদ্রোহের সর্বশেষ এবং তাৎক্ষণিক কারণ।[১০৫]

শান্তিপূর্ণ উপায়ে জমিদারদের অত্যাচারের প্রতিকার না হওয়ায় তিতুমীর প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য অস্ত্রের আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। বিদ্রোহ আরম্ভের সময় তিতুমীরের বয়স ছিল পঞ্চাশ বছর। তিনি এবং তার অনুসারীরা নারিকেল বাড়ীয়া গ্রামের ময়জুদ্দিন বিশ্বাসের বাড়িতে ১৮৩১ সালের অক্টোবর মাসে তাদের সদর দপ্তর স্থাপন করেন। তিতুমীরের অনুচরগণ নারিকেল বাড়ীয়ায় সমবেত হন তারা সেখানে এক দুর্ভেদ্য বাঁশেরকেল্লা নির্মাণ করেন এবং রসদ জমা করেন। তিতুমীর তার মুজাহিদ বাহিনী নিয়ে বিপুল সংখ্যায় মুজাহিদ নিয়োগ করেন এবং তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দান করেন। অচিরেই মুজাহিদদের সংখ্যা ৫ হাজারে উপনীত হয়।[১০৬] চব্বিশপরগণা ও নদীয়ার অনেকগুলো গ্রামে তিতুমীরের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

তিতুমীরের পক্ষে নির্যাতিত প্রজারা যোগদান করে। আরও যোগ দেয় কতিপয় সশস্ত্র ফকির দল। সবার সক্রিয় সমর্থনে ১৮৩১ সালে ৬ নভেম্বর একটি হিন্দু মন্দির আক্রমণের মধ্যে দিয়ে তিতুমীর জমিদার ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম শুরু করেন। প্রথমদিকে তিতুমীর জয়ী হন। ১৭ নভেম্বর তাঁর বিরুদ্ধে উন্নত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি সামরিক অভিযান প্রেরণ করা হয়। তিতুমীর ও তাঁর অনুসারীগণ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন বটে কিন্তু, ব্রিটিশ বাহিনীর কামান ও গোলার মুখে সহজেই পর্যুদস্ত হন। তবে, ব্রিটিশদের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে তিনি যুদ্ধে শাহাদাত বরণ বেছে নেন। ১৯শে নভেম্বর তিতুমীর তাঁর চল্লিশজন সহচরসহ নিহত হলে এ আন্দোলনের চূড়ান্ত পতন ঘটে। তিতুমীরের বাহিনীর অধিনায়ক গোলাম মাসুমকে ফাঁসি দেয়া হয় এবং এগার জনের যাবজ্জীবন আর ১২৮ জন ভক্তকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়। তিতুমীরের আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার হলেও তিনি ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের পতন ঘটাতে চেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর মতে, ধর্মীয় দিক দিয়ে অধঃপতনই মুসলমানদের পতনের মূল কারণ। এ আন্দোলনের স্বরূপ উত্তর পশ্চিম ভারতে সৈয়দ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে হয়েছে রাজনৈতিক বা ব্রিটিশবিরোধী ভূমিকায়। অপরদিকে বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে আন্দোলন হয়েছে সামাজিক বা জমিদারবিরোধী ভূমিকায়।

তিতুমীরের সংস্কার আন্দোলন এভাবে কৃষক বা প্রজা আন্দোলনে পরিণত হয়। কৃষকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে তাঁর নেতৃত্বে দেশীয় শোষক এবং নীলকুঠির জুলুমবাজ কুঠিয়ালদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হয়। তিতুমীরের প্রজা আন্দোলন ছিল একটি গণবিপ্লব। কৃষক ও তাঁতীগণ এ আন্দোলনে যোগ দিয়ে জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছে। অত্যাচার, অবিচার, অপমান আর শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তিতুমীরের সংগ্রাম সেদিন ব্যর্থ হলেও তা পরবর্তীকালে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যুগিয়েছিল। এম.এ রহিম বলেন

---

[১০৫] Narahari Kaviraj, *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal* (India: People's Pub. House, 1982), p. 34.
[১০৬] *বাংলাপিডিয়া*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৭৩।

> The movement demonstrated the solidarity of the Muslim peasentry to stand against oppression. It was a mars movement had appeal to the common Muslims.[১০৭]

৩.২.৪ ফরায়েজী আন্দোলন

মুসলমানদের আরেকটি সংস্কার আন্দোলন যা পরবর্তীতে প্রজাবিদ্রোহের রূপ লাভ করে তাহল ফরায়েজী আন্দোলন। ধর্মীয় সংস্কারের উদ্দেশ্য সূচিত হলেও পরবর্তীতে এটি কৃষক আন্দোলনে রূপ লাভ করে। ফরায়েজী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা হাজী শরীয়ত উল্লাহ (১৭৮১-১৮৪০) মাত্র ৩৮ বছর বয়সে ফরিদপুর ও তার আশেপাশের অঞ্চলে ধর্মীয়-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেছিলেন।[১০৮] শান্তিময় রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

> Two movements in Bengal proper, having close resemblance with the Wahabi movement, assumed a political cum economic complexion. The first was the Faraizi movement founded by Shariatullah born in 1781 A.D.[১০৯]

ধর্মীয় সংস্কারের পাশাপাশি কৃষকদেরকে জমিদার, নীলকরদের অত্যাচার ও শোষণ হতে মুক্ত করাই ছিল এ আন্দোলনের লক্ষ্য। ফরায়েজী শব্দটি আরবী ফরজ (অবশ্য পালনীয়) শব্দ থেকে উদ্ভৃত হয়েছে।[১১০] যারা এ ফরজ পালন করেন তারাই ফরায়েজী। ফরায়েজী আন্দোলনের প্রবক্তা হাজী শরীয়তউল্লাহ ১৭৯৯-১৮১৮ সাল পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করেন এবং সে যুগের বিখ্যাত পন্ডিত তাহের সাম্বলের নিকট ধর্ম শিক্ষালাভ করেন। দীর্ঘ ২২ বছর যাবত সংস্কার আন্দোলনের পর ১৮৪০ সালে তিনি ইন্তেকাল করেন। হাজী শরীয়তউল্লাহর আন্দোলন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা পরবর্তীতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে। ভারত উপমহাদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিপর্যয় ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, চাকুরী, জমিদারী, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যাপক বৈষম্যের শিকার মুসলমানদের মধ্যে আত্মসচেতনতা সৃষ্টি ও ধর্মীয় বিষয়গুলো ঠিকমত পালন করানোর লক্ষ্যে হাজী শরীয়ত উল্লাহ ফরায়েজী আন্দোলন শুরু করেন। তিনি মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্মচর্চা প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাপক অধঃপতন লক্ষ্য করেন। শরীয়তউল্লাহ উপলব্ধি করেন মুসলমানরা ইসলামের বিধানগুলো ঠিকমত পালন না করলে তাদের সার্বিক অবস্থার উন্নতি হবে না। মুসলমানদের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধি করে ব্রিটিশদের অন্যায় অপ শাসনের প্রতিবাদ করার জন্য তাদেরকে তৈরী করা ছিল তার লক্ষ্য। তিনি কৃষকদের ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন।[১১১]

---

[১০৭] M.A. Rahim, *op. cit.*, p. 96.
[১০৮] Muinuddin Ahmed Khan, *History of the Faradi Movement in Bengal* (Karachi: Pakistan Historical Society, 1965), p. 141.
[১০৯] Santimoy Ray, *Freedom Movement and Indian Muslims* (India: People’s Publishing House, 1983), p. 4.
[১১০] *বাংলাপিডিয়া*, ৮ম খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১১), পৃ. ১৪১।
[১১১] এম.এ রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৫।

ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসনে মুসলমানদের ধর্মীয়, সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে চরম দুর্দশাকর অবস্থার সৃষ্টি হলে হাজী শরীয়তউল্লাহ বিভিন্নভাবে তার আন্দোলন ও সংগঠন পরিচালনা করেন। তিনি যা যা করেছিলেন তার সারাংশ হল:-

প্রথমতঃ মুসলমানদের ধর্মীয় বিধিনিষেধের গুরুত্ব বোঝানোর চেষ্টা করে ফরজ সমূহ পালনের তাগিদ দেয়া।

দ্বিতীয়তঃ মুসলমানদের অধঃপতনের পেছনে কুসংস্কার কি কি ভূমিকা রাখতে পারে তা বুঝিয়ে পরিহার করতে উৎসাহিত করা।

তৃতীয়তঃ নীলকরদের অত্যাচারে সর্বস্বান্ত কৃষকদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা করা।

চতুর্থতঃ মুসলমানদের সার্বিক অবনতির কারণ যে ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দুঃশাসন তা তিনি জনগণকে বোঝানোর চেষ্টা করেন।

পঞ্চমতঃ ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নির্বিচারে শ্রমিকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করছে, অপরাধীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে এসব বিষয়ে তিনি জনসচেতনতা তৈরী করেন। ইংরেজ শাসিত ভারতবর্ষকে তিনি "দারুল হারব" বলে ঘোষণা করেন। ফরায়েজীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, এখানে জুমু'আ ও ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হতে পারে না।[১১২]

১৮৪০ সালে হাজী শরীয়তউল্লাহর মৃত্যুর পর ফরায়েজী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তার একমাত্র এবং সুযোগ্য পুত্র মুহসিন উদ্দীন আহমদ ওরফে দুদু মিয়া (১৮১৯-১৮৬২)।[১১৩] পিতার মত তিনি একজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না বটে কিন্তু, সংগঠক হিসেবে পিতাকে অতিক্রম করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।[১১৪] এ.সি ব্যানার্জি তার গ্রন্থে বলেন-

> After his death in 1840 A.D. his son Mohammed Mohsin (1819 A.D. - 1862 A.D.) better known as Dudu Mian followed the footsteps of his great father and earned for him a distinctive place in the struggle for India's freedom.[১১৫]

দুদু মিয়া ফরায়েজী আন্দোলনকে রাজনৈতিক আন্দোলনে রূপ দান করেন। তিনি এ আন্দোলনকে সংঘবদ্ধ ও সুসংহত করেন। আন্দোলনকে শক্তিশালী ও গতিশীল করার জন্য জালালুদ্দিন মোল্লা নামক[১১৬]এক লাঠিয়াল

---

[১১২] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৬৪), পৃ. ৪৬।

[১১৩] *History of the Freedom Movement,* pp. 548-49.

[১১৪] এম. এ. রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস* (ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০০৩), পৃ. ৩৮০।

[১১৫] A.C. Banerji, *Two Nations, The Philosophy of Muslim Nationalism* (New Delhi: Concept Publishing Company, 1981), p. 66.

[১১৬] এম.এ. রহিম ও অন্যান্য, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৮০।

বীরকে সেনাপতি করে বিশাল লাঠিয়াল বাহিনী গঠন করেন। তিনি বাংলাকে কয়েকটি অঞ্চলে বিভক্ত করে প্রতিটি অঞ্চলের দায়িত্ব অর্পণ করেন একজন খলীফার উপর। তিনি অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম আরম্ভ করেন। এভাবে দুদু মিয়ার নেতৃত্বে ফরায়েজী আন্দোলন সংস্কার আন্দোলনের গন্ডি পেরিয়ে রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। অবশেষে ১৮৬২ সালে দুদু মিয়া ঢাকায় ইন্তেকাল করেন। মুঈনুদ্দিন আহমেদ খান বলেন -

> Although a less accomplished scholar than his father, he played a role in the history of the faraidi movement which was second to none rather in certain respects he even excelled his father noteably in organizing the faraidi brotherhood into a well-knit and powerful society.[১১৭]

দুদু মিয়ার মৃত্যুর পর জমিদারদের অত্যাচার এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে ফরায়েজী আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে। এভাবে প্রভাব প্রতিপত্তিশালী নীলকরদের এই অসমসাহসিক ফরায়েজী নেতার সংগ্রামের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক রোমাঞ্চকর অধ্যায়।[১১৮] শরীয়তউল্লাহর এ আন্দোলন পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। এ.আর. মল্লিক এর ভাষায়-

> While Shariat Ullah and Dudu Mian were controlling discipline in Eastern Bengal other reformers were stirrring up in other districts of Bengal.[১১৯]

তিনি শুধু একজন ধর্মীয় সংস্কারক নন, শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠারও দিশারী। কৃষক, তাঁতী তথা শ্রমজীবী মানুষকে যুগের শোষণ, বঞ্চনা ও বিদেশী শাসন শৃংখল থেকে মুক্ত করার জন্য পরিচালিত তার এ আন্দোলন পরবর্তী মুক্তি সংগ্রামে প্রেরণা যুগিয়েছে।

৩.২.৫ ওয়াহাবী আন্দোলন

ভারতের মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে উনিশ শতকের ইংরেজদের বিরুদ্ধে ওয়াহাবী আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ.আর. মল্লিক বলেন-

> More important than the movements of Sariatullah and Titumir was that started by Sayyid Ahmad commonly known as the Wahabi, appostle of India.[১২০]

তথাকথিত এই ওয়াহাবী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে মুসলমানদের জাগরণের সূচনা হয় বলা যেতে পারে।[১২১] পলাশীর বিপর্যয়ের পর থেকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ইংরেজ বিরোধী যে প্রতিরোধ

---

[১১৭] Muinuddin Ahmed Khan, *History of the Faradi Movement in Bengal* (Karachi: Pakistan Historical Society, 1965), p. 170.
[১১৮] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৭।
[১১৯] A.R. Mallick, *op. cit.*, p. 76.
[১২০] *Ibid.*, p. 96.
[১২১] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ৩।

দেখা দিয়েছিল সাধারণত তা ছিল কোন রাজা বা জমিদারকে কেন্দ্র করে। ইংরেজদের সাথে টিপু সুলতানের যুদ্ধ, ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষ এবং বহুলাংশে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ রাজা বা জমিদারের স্বার্থে বা নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। ওয়াহাবী আন্দোলন কিন্তু এর ব্যতিক্রম।[১২২] ধর্মশাস্ত্রবিদ মুসলিম আলিম সমাজের নেতৃত্বে পরিচালিত এ আন্দোলন বিধর্মী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়েছিল। কিয়ামুদ্দিন আহমেদ তার গ্রন্থে বলেন-

> The Wahabi movement had two main features socio-religius and political. The former involved the refarmation of the Muslim society while the letter related to the fight against the english.[১২৩]

ভারতে পরিচালিত এই আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করা হলেও আন্দোলনকারীরা নিজেদেরকে কখনও ওয়াহাবী বলে পরিচয় দেয়নি। এমনকি আন্দোলনকারীরা মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাবকে (১৭০৩-১৭৯২) তাদের নেতা বলেও স্বীকার করেননি। সৈয়দ আহমদ শহীদ ব্রেলভী পরিচালিত এই আন্দোলনের নাম দেয়া হয় তরীকা-ই- মুহাম্মদীয়া আন্দোলন। যার মূল লক্ষ্য ছিল মহানবী (সাঃ) প্রচারিত ইসলাম ধর্মে ফিরে যাওয়া। তথাপি ব্রিটিশ সরকার উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এ আন্দোলনকে ওয়াহাবী আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে। অধ্যাপক হাবীবুল্লাহ বলেন, নেহায়েত রাজনৈতিক সুবিধার জন্য এই আন্দোলনকে ওয়াহাবী আখ্যা দেয়া হয়েছে। হান্টার ও তার গ্রন্থে মুসলমানদের এই প্রতিরোধ আন্দোলনকে ওয়াহাবী নাম দেন।[১২৪]

১৭০৭ সালে সম্রাট আওরঙ্গজেবের (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পর ভারত উপমহাদেশের সাধারণ মুসলমানদের জীবনে এক নিদারুন অমানিশার যুগ শুরু হয়।[১২৫] তাঁর মৃত্যুর পর অভ্যন্তরীণ গোলযোগের দরুন মারাঠা এবং শিখদের এবং সর্বোপরি ভারতবর্ষে ক্রমশ ইংরেজ শক্তির আধিপত্য বিস্তারের ফলে মুসলমানদের অবস্থা সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। অন্যদিকে মুসলমানদের নৈতিক অধঃপতন এবং ধর্মীয় ও সামাজিক অবক্ষয়ের ফলে তারা তাদের পুরোনো আত্মবিশ্বাস হারিয়ে ফেলে হীনমন্যতার শিকার হয়। পীর ও ওলীদের কবর পূজা করা, মাজারে গিয়ে তাদের কাছে সন্তান কামনা করা ও বিপদাপদ দূর করার জন্য দোয়া করা মুসলমানদের রীতিতে পরিণত হয়।[১২৬] হিন্দুদের আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি, মুসলমানদের ধর্মীয় ও সমাজজীবনে প্রবেশ করে। মুসলমানদের শরীয়তসিদ্ধ বিধবা বিবাহ প্রথাও মুসলিম সমাজে গর্হিত, নিন্দনীয় ও কৌলিন্য পরিপন্থী গণ্য হতে থাকে। মুসলমানদের সমাজ ও ধর্মের এই চরম অবনতি হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (রহঃ)

---

[১২২] আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ১১৭।
[১২৩] Qeyamuddin Ahmed, *Wahabi Movement in India* (n.d.), p. 335.
[১২৪] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৩।
[১২৫] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪।
[১২৬] *তদেব*, পৃ. ৪।

লক্ষ্য করেন এবং যুগধর্মী সংস্কার আন্দোলনের গোড়াপত্তন করেন।[১২৭] তিনি একজন বুদ্ধিজীবী ছিলেন।[১২৮].তার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইসলামী সংস্কার সাধন করে ইসলামকে তার প্রাথমিক পবিত্রতা ও জীবনী শক্তিতে ফিরিয়ে আনা এবং দেশের ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তিকে ধ্বংস করে পুনরায় ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করা। এ কারণেই শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহাবের ন্যায় মুসলমানদের অনৈসলামিক রীতিনীতি কুসংস্কার ও অত্যাচারের মূলোচ্ছেদের চেষ্টা করেন। তিনি সাহসিকতার সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দুর্বল মুঘল শাসকদের সমালোচনা করে খোলা চিঠি লিখেছেন। জি.এল্লানা বলেন -

> His analytical mind began to analyze the causes that had brought about this sad state of affairs, and he was already formulating bold policies which he planned to place before the Muslims to follow, if they wanted to bring about their spiritual and material regeneration.He began to write open letters to the Mughal rulers bitterly criticizing them for their inefficiency.[১২৯]

সমাজ থেকে যাবতীয় কু-সংস্কার দুর করার লক্ষ্যে তিনি বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রায় ৪০টি বই লিখেছেন।[১৩০] এসব বইয়ের মাধ্যমে তিনি মুসলমানদেরকে কলমের মাধ্যমে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছেন। K.K. Datta বলেন-

> In the eighteenth century Shah Waliullah of Delhi (1703 A.D. -1762 A.D.) had initiated a powerful movement for the revival of Muslim religious learning in India.[১৩১]

তিনি বলেন, মুসলমানদের মধ্যে যতদিন জিহাদের মানসিকতা বজায় ছিল ততদিন পর্যন্ত তাদের বিজয় ও সম্মান বর্তমান ছিল আর যখন থেকে এ মানসিকতা দূর হয়েছে তখন থেকে তারা সর্বত্র অপমানিত ও ঘৃণিত হয়েছে।[১৩২] এছাড়া তিনি বিভিন্ন বিধর্মী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। এভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর বিপ্লবী চিন্তাধারাকে সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে দেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহকে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতীয় ইতিহাসে মন্ত্রগুরু বলা যায়। আল্লামা ইকবাল বলেন শাহ ওয়ালীউল্লাহ ছিলেন ইসলাম এবং মুঘল সামাজ্যের সর্বশেষ মহা ধর্মতত্ত্ববিদ।[১৩৩] এছাড়াও তাকে "নব যুগের আলোকবর্তিকা" হিসেবেও গণ্য করা হয়। আই এইচ কোরেশী বলেন-

> Shah-Wali-Ullah was too balanced a thinker to hope that the Muslim community could be restored to health within his lifetime.[১৩৪]

---

[১২৭] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।
[১২৮] S.M. Ikram, *op. cit.*, p. 10.
[১২৯] G. Allana Eminent, *Muslim Freedom Fighters* (Delhi: Neeraj Publishing House, 1983), pp. 41-42.
[১৩০] মুহাম্মদ ইনাম উল হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭।
[১৩১] K.K. Datta, *Comprehensive History of India,* Vol. XI (India: People's Publishing House, 1985), pp. 748-749.
[১৩২] G.N. Jelbani, *Life of Sah Waliullah* (Delhi: 1980), p. 62.
[১৩৩] A.C. Banerji, *op. cit.,* p. 46.
[১৩৪] I.H. Qureshi, *op. cit.*, p. 193.

অন্যদিকে ফারুক আরগলী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন এভাবে-

> Hazrat Shah Waliullah's Mohadis Delhvi'spersonality can be called not only inIndia but throughout the world. The very first leader of the world wide national freedom and revolution of the nations. Because Hazrat presented before the world the real sample of Islamic Jihad and modern revolution, whereas the French revolution (1789) took place after fifty years. Which is known as a very first world wide national revolution. Shah Walliullah has presented principles of politics and economics on the lands of India which are referred world wide as guidance for all the nations. These ideas were proposed hundred years before the birth of Karl Marx and Engel.[১৩৫]

অবশেষে ১৭৬১ সালের পানিপথের ৩য় যুদ্ধে মারাঠাদের পরাজয়ের পরের বছর অর্থাৎ, ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে শাহ ওয়ালীউল্লাহর ইন্তেকাল করার পর তার ১৭ বছর বয়স্ক পুত্র শাহ আব্দুল আযীয পিতার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। দায়িত্বভার গ্রহণ করে শাহ আব্দুল আযীয ধর্ম ও সমাজসংস্কারে এগিয়ে আসেন এবং পিতার দর্শনকে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা চালিয়ে যান। এছাড়া তিনি মুজাদ্দেদী তরীকা গ্রহণের কারণে একজন গুরুত্বপূর্ণ Spritual Leader এ পরিণত হন। তার সময়ে ইংরেজ কোম্পানি বাংলায় আধিপত্য বিস্তারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলা করে ভারতকে "দারুল হারব" বলে ফতওয়া দেন এবং মুসলমানদেরকে জিহাদ করে দারুল হারবকে দারুল ইসলামে রূপান্তর করতে অথবা হিজরত করে অন্যত্র গমন করতে নির্দেশ প্রদান করেন। যা মুসলমানদের মনেপ্রাণে জিহাদের এক দুর্দমনীয় প্রেরণার সৃষ্টি করে। সাইয়্যেদ অবুল হাসান আলী নদভী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন

> The Shah had written: *I see these Britons, well- heeled, Provoking sedition between Delhi and Kabul.*The Shah was the first scholar, so far as we are aware to declare India under analien rule as the Dar ul Harab (Abode of the war)[১৩৬]

শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী দিল্লীর বিদগ্ধ সমাজকে তার চিন্তাধারার সাথে পরিচিত করে তুলেছিলেন। শাহ আব্দুল আযীয মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সে চিন্তাধারা এবং শিক্ষারপ্রসার করে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিলেন এবং তার অভীষ্ট কাজে সফলকাম হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি "সিরাজুল হিন্দ" বলে আখ্যায়িত হয়েছিলেন।[১৩৭] শাহ ওয়ালীউল্লাহর পিতার দ্বারা পরিচালিত মাদ্রাসাটিই শাহ আব্দুল আযীযের আন্দোলনের কেন্দ্র ছিল। এ মাদরাসায় শিক্ষাপ্রাপ্তদের অনেকেই ১৮৫৭ সালের মহাবিপ্লবে শুধু সক্রিয় অংশগ্রহণই করেননি বরং নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। সাইয়্যেদ অবুল হাসান আলী নদভী বলেন-

---

[১৩৫] ফারুক আরগলি, *ফিকরে ওয়াতান* (দিল্লী: ফরীদ বুক ডিপো, ২০১১), পৃ. ৫৪-৫৫।

[১৩৬] Syed Abul Hasan Ali Nadvi, *Saviours of Islamic Spirit* (Nadwa, Lucknow: Islamic Research and Publications, 2004), p. 266.

[১৩৭] ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তাহার রাজনৈতিক চিন্তাধরা*, নূরউদ-দীন আহমেদ (অনু.) (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ৪৪।

> Shah Abdul Aziz, continued the reformatory work started by the Shah Waliullah, but directed his political endeavors against the British rulers who had, by his time, became the greatest danger to the sovereignty and independence of the country.Shah Abdul Aziz was one of the most erudite scholars of his time hailed by some ofhis contemporaries as the Siraj-al- Hind (Light of India).[১৩৮]

শাহ আব্দুল আযীয এবং তাঁর সহচরবৃন্দের প্রচেষ্টায় সংস্কার আন্দোলন যখন তুঙ্গে ঠিক তখনই রায়বেরেলীর সৈয়দ শাহ ইলমূল্লাহ বংশের যুবক সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১) তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন এবং ১৮০৮ সালে তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাহ আব্দুল আযীযের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী সমাজ সংস্কারের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হন এবং "তরীকায়ে মুহাম্মাদীয়া" নামে সংস্কার আন্দোলন প্রতিষ্ঠা করেন।[১৩৯] এই আন্দোলনই ইতিহাসে ওয়াহাবী আন্দোলন নামে পরিচিত। যা ছিল একাধারে ইসলামী ও আযাদী আন্দোলন। কিয়ামুদ্দিন আহমেদ বলেন–

> The Wahabi movement was not only politically directed against the English. But in common with many other revivalist movements one of the essential elements of its teaching was a emphasis on the restoration of the Idyllic past.[১৪০]

সৈয়দ আহমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল মুসলমানদেরকে প্রকৃত মুসলমান হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের মধ্যে ইসলামের তপ্রাথমিক যুগের মুসলিমদের ন্যায় জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহর উদ্দীপনা জাগ্রত করা এবং ভারতে বিশুদ্ধ ইসলামী শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা। মুসলমানদের সামাজিক ও ধর্মীয় জীবন সংস্কারের জন্য গৃহীত সকল আন্দোলন সমূহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলন হল ১৮৩১ সালের রায়বেরেলীর সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের নেতৃত্বে আন্দোলন।[১৪১] সৈয়দ আহমদ শহীদের আহবানে সাড়া দিয়ে মুসলমানরা দলে দলে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন। সৈয়দ আহমদ তাঁর শিষ্যদের নিয়ে ১৮১৬-১৮১৭ সালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বক্তৃতা করে বেড়ান। ভারতের তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলনের এটাই ছিল প্রথম পদক্ষেপ।[১৪২] সৈয়দ আহমদের সংস্কার আন্দোলনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে আব্দুল হাই, শাহ ইসমাইল ও সৈয়দ আহমদ কর্তৃক ১৮১৮-১৯ সালে সম্পাদিত সিরাতুল মুস্তাকীম নামক পুস্তকে। সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে নানাবিধ সংস্কারের প্রয়াস পান। তিনি মাজহাব ও তরীকা সমূহকে চূড়ান্ত গণনা না করে ইজতেহাদ ও সুন্নাহর উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি উত্তর ভারত, কলকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁর মতবাদ প্রচার করেন। এসময় শিখদের অত্যাচারে পাঞ্জাবের মুসলমানদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। এদের মুক্তির জন্য সৈয়দ আহমদ শিখদের বিরুদ্ধে প্রথম জিহাদের ডাক দেন। ইতোপূর্বে তিনি উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকাকে তাঁর জিহাদ পরিচলনার কেন্দ্রস্থল হিসেবে বেছে নেন। ব্যাপক প্রস্তুতির মধ্যে দিয়ে ১৮২০ সালের ২৬ শে

---

[১৩৮] Syed Abul Hasan Ali Nadvi, *op. cit.*, p. 251.
[১৩৯] এম.এ. রহিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৮।
[১৪০] Qeyamuddin Ahmed, *op. cit.*, p. 338.
[১৪১] N. Choprap, *Role of Indian Muslims in the Struggle for Freedom* (New Delhi: Light and Life Publishers, 1979), p. 4.
[১৪২] হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ১৩২।

ডিসেম্বর প্রথম প্রত্যক্ষ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম দিকে মুজাহিদ বাহিনী জয়লাভ করে এবং পেশোয়ার দখল করে সেখানে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীতে পাঠান ও সৈয়দ আহমদ শহীদের বাহিনীর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দের সুযোগে শিখ যুবরাজ শের শিং পাঞ্জাবের অন্তর্গত হাজারা জেলার সৈয়দ আহমদ শহীদের সামরিক কেন্দ্র, বালাকোটে ১৮৩১ সালের ৬ই মে সামরিক অভিযান প্রেরণ করেন। এখানে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে সৈয়দ আহমদ ও তাঁর প্রধান শিষ্যসহ ১৭০ জন শহীদ হন।[১৪৩]

তবে, সবার লাশ পাওয়া গেলেও সৈয়দ আহমদের লাশটি রহস্যময় কারণে পাওয়া যায়নি। এই তথাকথিত ওয়াহাবী আন্দোলন ১৫০০ মাইল বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশসহ বাংলা, বিহার, মীরাট, হায়দারাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে ব্যাপক আকার ধারণ করে। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এ সম্পর্কে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী তার গ্রন্থে বলেন

> Syed Ahmed Shahid waged the war against the Sikhs because they did not only persecute Muslims, in the Punjab but they were also a friend of the English. Lastly the Syed Ahmed movement was democratic in nature and not personal or dictatorial.[১৪৪]

১৮৩১ সালের পর ওয়াহাবী আন্দোলন

১৮৩১ সালে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তাঁর অনুসারীরা দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একাংশ শান্তিপ্রিয় বা ব্রিটিশ অনুগত ওয়াহাবী। তারা মনে করে যে, আপাতত যুদ্ধের পরিবেশ নেই তাই তারা বাংলা এবং অন্যত্র ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কারে মনোনিবেশ করে। এই অংশের নেতৃত্ব দেন প্রধানতঃ মৌলভী কেরামত আলী জৈনপুরী। অন্য অংশ তখনও জিহাদে মনস্থির রাখেন। এ অংশে নেতৃত্ব প্রদান করেন প্রসিদ্ধ ভ্রাতৃদ্বয় পাটনার অধিবাসী মৌলভী বেলায়েত আলী (মৃত্যু-১৮৫২) এবং মৌলভী এনায়েত আলী (মৃত্যু-১৮৫৮)। তারা তাদের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন পাটনায়। ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিং মৃত্যুবরণ করার পর শিখ আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু, সৈয়দ আহমদ শহীদের অনুগামীরা নিরলসভাবে ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষে এক দুর্নিবার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।[১৪৫] শান্তিময় রায় তার গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

> The second phase of the Wahabi movement was definitely anti-British. The leadership was assumed by Wilayat Ali and Enayat Ali of Patna. After 1847 A.D.when the whole of Panjab went to the direct occupation of British Raj, the Wahabi movement assumed its anti-British imperialist color. Wahabi’s started full preparation for a total war against the British rule in India from their base camp at Sitana.[১৪৬]

---

[১৪৩] মাহতাব সিং, *তাওয়ারিখে হাজারা-গোলাম রসুল মেহের*, হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত, পৃ. ৬৫৫।
[১৪৪] হুসাইন আহমদ মাদানী, *নকশ-ই-হায়াত*, খণ্ড ২ (দেওবন্দ: মাকতাবা ই দ্বীনিয়াত, ১৯৯৯), পৃ. ১৮।
[১৪৫] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯।
[১৪৬] Santimoy Ray, *Freedom Movement and Indian Muslims* (India: People’s Publishing House, 1983), p. 14.

অধ্যাপক অমলেন্দু দেব এর মতে ১৮৪৭ সালের পর ওয়াহাবী আন্দোলন সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়। এবং ১৮৪৭ সালের পর থেকেই কতিপয় হিন্দু সম্প্রদায় এ আন্দোলনের প্রতি সহমর্মিতা ও সমর্থন জানায় তবে তা হিন্দুদের সকল পর্যায়ের সংশ্লিষ্টতা ও সম্পৃক্ততা ছিলনা। কিন্তু তাদের সহমর্মিতা ছিল একেবারেই পরিস্কার। যার কারণে ব্রিটিশ সরকার উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল এবং কতিপয় হিন্দু ব্যক্তিবর্গকে গ্রেফতার করেছিল।[১৪৭] কিন্তু, উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এই ওয়াহাবী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ওয়াহাবী আন্দোলন স্থিমিত হয়ে যাওয়ার পর সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান নেতৃবৃন্দ দুইভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি দেওবন্দপন্থী এবং অপরটি আলীগড়পন্থী।

সর্বোপরি বলা যায় যে, কাঙ্ক্ষিত সফলতা লাভে ব্যর্থ হলেও এ ওয়াহাবী আন্দোলন ভারতীয় মুসলমানদেরকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলে। এর মাধ্যমে যেমন সমাজ থেকে কুসংস্কার ও ধর্মীয় অনাচার দূরীভূত হয়েছিল অন্যদিকে তেমনি রাজনৈতিক নেতৃত্ব সৃষ্টির পথ সুগম হয়েছিল। এ আন্দোলন সর্বভারতীয় আন্দোলনের রূপ লাভ করেছিল। ১৮৫৭ সালের পর মুসলমানদের একাংশ ক্রমশ ওয়াহাবী প্রেরণা হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও ভারতের সংগ্রামী মুসলমানদেরকে এটি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। এই অনুপ্রেরণা বিংশ শতাব্দীর শুরুতে সমস্ত আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় যা ধীরে ধীরে ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে রূপ নেয় বলে মনে করা হয়। এ.আর. মল্লিক বলেন-

> Thus although the ultimate aim of Sayyid Ahmad is assumed to have been the formation of an Islamic state to pull the Muslims out of their degenerate condition. It is however wrong to hold as means have done that the Wahabi from the very beginning of the movement under Sayyid Ahmad were by action or profession anti-British.[১৪৮]

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা একটি সর্বভারতীয় সংগঠনের গোড়াপত্তন করে এবং ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। কারও কারও মতে, ভারতের জনসাধারণ দ্বারা সংগঠিত ও পরিচালিত আন্দোলন ওয়াহাবীদেরই।[১৪৯]

---

[১৪৭] Santimoy Ray, *op. cit.*, p. 20.
[১৪৮] A. R. Mallick, *op. cit.*, p. 114.
[১৪৯] হবিবুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৭।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ও ব্রিটিশ রাজের শাসন প্রকৃতি

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের মধ্যে ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা যা মীরাটে ১০ই মে[১] সিপাহীদের বিদ্রোহের মাধ্যমে সূচিত হয়েছিল। যেহেতু বিষয়টি ভারতের মুসলমানদের ভাগ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট সেহেতু এটি পৃথক আলোচনার দাবি রাখে। উল্লেখ্য যে তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে কতিপয় উদ্যমী নেতাদের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় জনগণের অংশগ্রহণে খুব শীঘ্রই একটি শক্তিশালী বিপ্লবে পরিণত হয়েছিল। এ বিদ্রোহ ছিল দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ ও শোষণমূলক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ। তবে এ বিদ্রোহ সফলতা লাভ করেনি। কিন্তু ভারতীয় জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত করতে এর ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। এই বিপ্লব ছিল দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রায় একটি জাতীয় বিপ্লব। এ আন্দোলনকে সিপাহী বিদ্রোহ বলা হয় তবে এর নামকরণ বিতর্কিত। ব্রিটিশদের নিকট এটি সিপাহী বিদ্রোহ নামে পরিচিত আবার ভারতীয় ঐতিহাসিকগণ এ বিদ্রোহ কে মহাবিদ্রোহ, প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন, জাতীয় আন্দোলন এবং আযাদী আন্দোলন বলেও অভিহিত করেছেন। এ বিদ্রোহ সামরিক অভ্যুত্থানরূপে সূচিত হলেও এর পশ্চাতে অতীতের বহু ঘটনা সক্রিয় ছিল। এ বিদ্রোহ সংঘটিত হওয়ার কারণ, বিদ্রোহের ব্যাপকতা, বিদ্রোহ পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্নভাবে বিস্তারিত তুলে ধরেছেন। তবে আমি এ বিষয়গুলো অত্যন্ত সংক্ষেপে তুলে ধরার পাশাপাশি এ বিদ্রোহে মুসলমান ও আলিম সমাজের সম্পৃক্ততা, বিদ্রোহ পরবর্তী মুসলমান ও আলিম সমাজের প্রতি ব্রিটিশ নীতি কি ছিল এবং এ আলিমগণই যে পরবর্তীতে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা তথা দেওবন্দ আন্দোলন সংঘটনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল সে বিষয়টি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি।

৪.১ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতি ঐতিহ্যগত বিরোধিতার চরম পরিণতি হিসেবে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের সৃষ্টি হয়েছিল, যে বিদ্রোহে অংশগ্রহন করেছিল লক্ষ লক্ষ কৃষক, শিল্পী ও সৈনিকরা। ১৮৫৭ সালের বিপ্লব ছিল বিটিশ রাজত্বের মূলে চরম আঘাত। লর্ড ক্যানিং (১৮৫৮-১৮৬২) এদেশে বড়লাট হয়ে আসার প্রাক্কালে বিলাতে বিদায়কালীন ভোজসভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে উদ্বিগ্নকণ্ঠে বলেছিলেন- আমি দেখতে পাচ্ছি ভারতের রাজনৈতিক গগনে একখন্ড ঘনক্লিষ্ট মেঘ দেখা দিয়েছে, কে জানে এ কোন দুর্যোগময় পরিণতি বয়ে আনবে? ভারত থেকে বহুদূরে এসেও লর্ড ক্যানিং সেদিন ভবিষ্যৎ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। লর্ড ডালহৌসি (১৮৪৮-১৮৫৬) তার কলমের এক খোঁচায় প্রথমে অযোধ্যা রাষ্ট্র পরে একের পর এক দেশীয় রাজ্য গ্রাস করে চলেছিলেন তার পক্ষে এটা একটু দুঃসাহসের কাজই হয়েছিল, কেননা এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে যে মারাত্মক দুর্যোগ দেখা দিতে পারে সেটা অনুমান করা কঠিন।

---

[১] Santimoy Ray, *op. cit.*, p. 20.

এই প্রচণ্ড যুদ্ধের তাৎক্ষণিক কারণ হিসেবে নতুন কার্তুজের প্রবর্তনকে উল্লেখ করা হয়। এ কার্তুজ রাইফেলে ভরবার পূর্বে দাঁত দিয়ে কাটতে হতো। কার্তুজে শুকর ও গরুর চর্বি মেশানো ছিল বলে অভিযোগ করা হয়। যা পরে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের সিপাহীদের ধর্ম নষ্ট করে তাদেরকে সহজে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার অপপ্রয়াস থেকে এ চর্বিযুক্ত কার্তুজের উদ্ভাবন। কোম্পানি শাসনামলের কতিপয় সমাজ সংস্কারমূলক তৎপরতা হিসেবে সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবা বিবাহের আইন, হিন্দু সন্তান ধর্মান্তরিত হলেও সম্পত্তির উত্তরাধিকার হবার বিধি প্রণয়ন, স্ত্রী শিক্ষার প্রচলন ইত্যাদি ব্যবস্থায় হিন্দু সিপাহীরা বিক্ষুদ্ধ হয়।[২]

কিন্তু এই ব্যাপক অভ্যুত্থানের পেছনে আরো কিছু কারণ সক্রিয় ছিল। তার একটি ছিল তখনকার ভূমি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ। সাধারণ জনগণের মধ্যে যেমন এই বিক্ষোভ ছিল, তেমনি ছিল ভূস্বামীদের মধ্যেও। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির ফলে অনেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। অযোধ্যার তালুকদারের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছিল। দেশ শাসনে সাধারণ লোকের অংশগ্রহণ ছিলনা। এ্ কারণটি ও বিক্ষোভ সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল। তদুপরি মুঘল বাদশাহ ও অযোধ্যার নবাবের ক্ষমতাচ্যুতি যেমন মুসলমানদেরকে বেদনাবিদ্ধ করে বিক্ষুদ্ধ করে তুলেছিল তেমনি নানা সাহেব ও ঝাঁসীর রানীর প্রতি কোম্পানির অন্যায় আচরণ ও হিন্দু সম্প্রদায়কে সমভাবে বিক্ষুব্দ করে ব্রিটিশ বিরোধী করে তুলেছিল।[৩] তাছাড়া সিপাহীরা তাদের আত্মশক্তিতে প্রবল বিশ্বাসী ছিল। তারা মনে করতো তাদের বাহুবলে ইংরেজরা এদেশে রাজত্ব কায়েম করেছে তাই তাদের দাবি দাওয়া মেনে নিতে সরকার বাধ্য। সৈন্যদের বিদ্রোহের ফলে আশান্বিত হয়ে কোম্পানি আমলে ক্ষতিগ্রস্ত সামন্তরা এবং দেশপ্রেমিক স্বাধীনতাকামী কর্মীরা এ বিদ্রোহে যোগ দেয়। তখনি তা ব্যাপক গণবিদ্রোহে পরিণত হয়।[৪]

স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতে হিন্দু - মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করা, বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করা, খ্রিষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার প্রবণতা, শিক্ষানীতির পরিবর্তন করা, লাখেরাজ জমি বাজেয়াপ্ত করা, জমিদারি নিলাম করা, স্টাম্প প্রথার প্রবর্তন করা ইত্যাদি পাঁচটি মৌলিক কারণে এ বিদ্রোহ হয়েছে।[৫] এ পাঁচটি মৌলিক কারণ ছাড়া আরও রয়েছে প্রজাদের হাল-হকিকত, দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের উপেক্ষার মনোভাব, অনীহার দৃষ্টিভঙ্গি, দায়িত্বপালনে সরকারের উদাসীনতা, সৈন্য বিভাগে অব্যবস্থা ও বিশৃঙ্খলা, হিন্দু -মুসলিম সৈন্য সমন্বয়ে পল্টন গঠন ইত্যাদি।[৬] সংক্ষেপে বলা যায় বিজাতীয় শাসন বিলোপ করার উদ্দেশ্যে জাতি কোন হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নি।[৭]

---

[২] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৬৪), পৃ. ৪৮-৪৯।
[৩] *তদেব*।
[৪] *তদেব*
[৫] স্যার সৈয়দ আহমদ খান, *ভারতে বিদ্রোহের কারণ*, সারসংক্ষেপ [Causes of the Indian Revolt 1858, English Translate-1873] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ (অনু.) (ঢাকা: ১৯৭৯)।
[৬] *তদেব*, পৃ. ৫।
[৭] *তদেব* ।

নীলম রাণী তার গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেছেন-

> There were certain political and economic factors in 1857 which were sufficient in themselves to bring about a countrywide upheaval, but it was the socio-religious causes which played a decisive role in the events of that year.[৮]

এদেশে আবহমান কাল থেকে প্রজারা রাজাদের সঙ্গে রাজভক্তি ও আনুগত্যের সূত্রে বাঁধা। রাজমহিমায় আঘাত পড়লে এবং তাদের সম্পদ ও মর্যাদা ক্ষণ্ন হলে সেই আঘাত তাদের বুকেও এসে বাজে। বিদেশী শাসকদের এই অতর্কিত আক্রমণ তাদের মনে ও বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করে তুলেছিল। দেশের বহুসংখ্যক লোক এই সমস্ত রাজা ও ভূ-স্বামীদের অধীনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে এসেছে। সর্ব ব্যাপারে তাদের উপরেই এদের নির্ভর করতে হত। এমন অনেক লোক ছিল যারা তাদের অধীনে সৈনিক হিসেবে কাজ করে এসেছে। বংশানুক্রমে যুদ্ধবৃত্তিই ছিল যাদের পেশা, তাদের সামনে জীবিকা অর্জনের অন্য পথ খোলা ছিল না। এছাড়া ধর্মীয় নেতারা, শিক্ষাদাতা পন্ডিত ও আলিমরা, পুরোহিত ও মোল্লা-মৌলভীরা, লেখক, কবি ইত্যাদি জ্ঞানী-গুণী লোকেরা এবং কুশলী শিল্পীরা এই সমস্ত রাজা ও ভূ-স্বামীদের পৃষ্ঠপোষকতার উপর নির্ভর করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করতেন। এই সমস্ত রাজা ও ভূ-স্বামীদের তাদের ভূ-সম্পদ ও ক্ষমতা থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে তাদের উপর নির্ভরশীল ঐ সমস্ত লোকেরাও বেকার ও অসহায় হয়ে পড়ল। তাই বিদ্রোহের প্রবল স্রোতে এরাও আকৃষ্ট হয়ে চলে এসেছিল।

ব্রিটিশ বাণিজ্য লিপ্সার মত্ত হস্তী এদেশের সনাতনপন্থী গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে পদদলিত করে সবকিছু ভেঙ্গে তছনছ করে চলেছিল। যন্ত্রশিল্পে উন্নত ইংল্যান্ড থেকে অবাধে আমদানী করা মালের প্রতিযোগিতার সামনে এদেশের শান্তিপ্রিয় কুটির শিল্পীরা কেমন করে দাঁড়াবে? ফলে দেশের অর্থনৈতিক জীবনের অন্যতম বুনিয়াদ কুটির শিল্পগুলো একের পর এক ধসে পড়ছিল। ফলে লোকেরা দলে দলে বেকার হয়ে পড়তে লাগল। এই জন্য যারা দায়ী সেই ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ, দিশেহারা এসব দুর্ভাগারা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করবে তাতে আর বিচিত্র কী? বিদ্রোহের সম্ভাবনা ও ব্যাপকতা এ ক্ষেত্রেই অনুমান করা যেতে পারে।

৪.২ বিদ্রোহের তীব্রতা

১৮৫৭ সালের মত ঘটনা ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আর কখনো ঘটেনি। অতীতে দেশের ভিতরে বহু যুদ্ধ - বিগ্রহ হয়েছে, বারবার বাইরে থেকে আক্রমণকারী দল এসে হানা দিয়েছে। যুগে যুগে রাজ শক্তির ধারক হিসেবে বহু জাতি ও বংশের উত্থান ও পতন ঘটেছে। কিন্তু তার ফলে সারাদেশে এমন সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়নি। নাদির শাহ ও আহমদ শাহ আব্দালীর আক্রমণে নিরীহ মানুষের রক্তে নগর ও পল্লীর মাটি সিক্ত হয়ে উঠেছিল, তা সত্ত্বেও ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে শান্তি ব্যাহত হয়নি। এর বিন্দু মাত্র প্রতিক্রিয়া সেখানে দেখা

[৮] Neelam Rani, “Muslim Attitudes Towards British Raj: 1820-1920”, Unpublished Thesis, Maharshi Dayanand University, Rothak, 2014, p. 69.

দেয়নি। ইংরেজরা বাংলা জয় করল নবাব সিরাজ-উদ-দৌল্লার পতন ঘটল, কিন্তু লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, লাহোর, হায়দ্রাবাদ, পুনে, মাদ্রাজের স্বাভাবিক অবস্থার কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেল না। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যে সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে , সেগুলি পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাদের প্রভাব সেই সমস্ত অঞ্চল বিশেষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের চরিত্র সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এই বিদ্রোহে সংঘটিত ঘটনাবলীর ঘাত-প্রতিঘাতে ও ধ্বনি-প্রতিধ্বনিতে সারাদেশ স্পন্দিত ও আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল এবং আক্রমণকারী ও আক্রান্ত উভয় পক্ষই এক চরম বিপর্যয়ের মুখে দাঁড়িয়েছিল। সরকারি বিবরণে এটিকে নিছক সিপাহী বিদ্রোহ বলা হলেও বস্তুত এটি ছিল ভারতবাসীর সম্মিলিত সংগ্রাম। ব্যারাকপুর সেনানিবাস থেকে বিদ্রোহ সূচিত হয়। তার খুব অল্প সময়ের মধ্যে গোটা ভারতে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে এবং আলিম উলামা, হিন্দু, মুসলিম রাজন্যবর্গ, জমিদার, সৈনিক, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও প ্তিদের সকলে বিদ্রোহীদের দলে সমবেত হন। প্রায় একবছর পর্যন্ত এ সংগ্রাম আব্যাহত থাকে। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য ডিজরেলীভারতীয়দের এ অভ্যূত্থানকে মানব ইতিহাসের যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করেছেন। ডঃ মজুমদার এটিকে ব্রিটিশ শাসককগণের প্রতি ভারতীয়দের ব্যাপক ক্ষোভ ও প্রত্যক্ষ চ্যালেঞ্জ বলে অভিহিত করেছেন।[৯] বিপ্লবী আলিমগণ গোপনে আন্দোলনের প্রস্তুতির পর দেশব্যাপী একযোগে মহাবিদ্রোহ তথা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের লক্ষ্যে ৩১ মে ধার্য করলেও ২৯ মার্চ মঙ্গলবার মঙ্গল পান্ডে নামক জনৈক সিপাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে হঠাৎ বিদ্রোহ শুরু হয় এবং মুহুর্তের মধ্যে তা গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।[১০]

ভারতের অধিকাংশ অঞ্চল প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক এ বিদ্রোহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিল। কোন কোন অঞ্চলে বিরাট আকারে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ঘটেছিল, লক্ষ লক্ষ মানুষ ও হাজার হাজার সৈন্য সেই যুদ্ধের সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েছিল। শিশু কিশোরগণ ও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল। এমনকি মহিলারাও কোন অংশে এ যুদ্ধে পিছিয়ে ছিল না।[১১] শিখ ও পারসিক ব্যতিত ভারতবাসী সকলেই এ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে।[১২]এই বিশাল দেশের কোন অঞ্চলেই ইংরেজরা নিরুদ্বেগে জীবন যাপন করতে পারেনি। এমন কোন স্থান ছিল না যেখানে বিদ্রোহ সৃষ্টির আশংকা দেখা দেয় নি। একথা বললে ভুল হবে না যে, নানা কারণে এই বিদ্রোহ মোটামুটিভাবে সর্বসাধারণের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এদের মধ্যে একমাত্র ব্যাতিক্রম ছিল নতুন জেগে ওঠা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তবে এদের অস্তিত্ব প্রেসিডেন্সী শহরগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। ইংরেজী শিক্ষার বদৌলতে এদের ভাগ্যে কিছু চাকরি জুটেছিল। ভবিষ্যতে ইংরেজদের মতো সরকারি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং ইংরেজদের সঙ্গে সমমর্যাদা লাভ করার উচ্চাশার দিকেও তাদের দৃষ্টি প্রসারিত ছিল। শুধু তাই নয় ইংরেজী শিক্ষার মধ্য দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও

---

[৯] অতুলচন্দ্র রায়, *ভারতের ইতিহাস* (কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১), পৃ. ২৭০।

[১০] সাইয়িদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী*, ৪র্থ খ ্ (দিল্লী: কিতাবিস্তান, ১৯৮৫), পৃ. ৭৮-৭৯।

[১১] খাজা হাসান নিযামী, *বেগমাতকে আঁস্ত* (দিল্লী: খাজা আওলাদ কিতাব ঘর, ১৯৫২), পৃ. ১২৬।

[১২] খালিক আহমাদ নিযামী, *সন্নে-এ-আঠারা সাও সাতাওয়ান কা তারিখী রোজ নামচা* (করাচী: নাফীস একাডেমি, ১৯৫৮), পৃ. ৭-৮।

সংস্কৃতির যে বিপুল ঐশ্বর্য ভান্ডারের দ্বার তাদের সামনে উন্মোচিত হয়েছিল, তা তাদের মুগ্ধ ও সম্মোহিত করে ফেলেছিল। তাদের মধ্যে অনেকে পড়াশুনা এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছিল। এ কারণেই বাংলার শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ এই বিদ্রোহের ডাকে সাড়া দেয়নি।

প্রথম অভ্যুত্থান ঘটল উত্তর ভারতের মীরাটে। ১৮৫৭ সালের ১০ মে মীরাটের সৈন্যরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে মীরাট অধিকার করে বসল। তারা সম্রাট বাহাদুর শাহকে এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানাল। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ প্রথমে এ গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাকে রাজী হতে হলো। স্বাধীন দিল্লী মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রে পরিণত হলো এবং বিদ্রোহ সর্বভারতীয় রূপ গ্রহণ করলো। পরে ইংরেজদের আক্রমণে দিল্লী পতনের পর বিদ্রোহের কেন্দ্র অযোধ্যায় স্থানান্তরিত হলো। মহিমাময়ী অযোধ্যার বেগম হযরত মহল বিদ্রোহের মূল নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক সচেতনতা, সংগঠন ও নেতৃত্বের দিকে দিয়ে স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবার মতো যোগ্যতা বা প্রস্তুতি তাদের ছিল না। ফলে ব্যাপক আত্মবিসর্জন ও ধ্বংস যজ্ঞের ওপর এই মর্মান্তিক বিয়োগান্তক নাটকের যবনিকাপাত ঘটল। আজীমূল্লাহ খান, বিদ্রোহে প্রথম আত্মদানকারী মঙ্গল পান্ডে, ফৈজাবাদের মৌলবী আহম্মদ শাহ, অযোধ্যার বেগম হযরত মহল, ঝাঁসীর রাণী লক্ষীবাঈ, পাটনার পীর আলী কুনওয়ার সিং ,তাতীয়া টোপী, শাহজাদা ফিরোজ শাহ, ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মদ আলী খাঁ, নাজিম মহম্মদ হাসান শঙ্করপুরের বেনী মাধো এ বিদ্রোহে নেতৃত্বের ভূমিকা গ্রহণ করেন। বাংলার ব্যারাকপুর সেনানিবাসে গোলযোগ আরম্ভ হওয়ার পূর্বে ছাউনিগুলোতে অকস্মাৎ আগুন লেগে যায়। সমস্ত কাচাঁ ঘর জ্বলে যায়। চর্বি মিশ্রিত টোটা ব্যবহার নিয়ে সৈন্যদের মধ্যে অসন্তুষ্টির ভাব ধূমায়িত হলে হঠাৎ এক রাত্রে আম্বালা সেনানিবাসে আগুন লেগে যায়। প্রত্যেক রাত্রে ইউরোপীয় সেনানিবাস, মালগুদাম, চিকিৎসালয়, সিপাহীদের আবাসগৃহ সমস্তই ভস্মীভূত হয়। সরকারি কর্তৃপক্ষ সচকিত হন এবং এ নিয়ে অনেক অনুসন্ধান হয়। কিন্তু কাউকে দায়ী সাব্যস্ত করতে কর্তৃপক্ষ ব্যর্থ হয়।[১৩]

এভাবে রাতের পর রাত শত শত গৃহ ভূস্মীভূত হয়। কিন্তু কর্তৃপক্ষ নির্বাক দর্শকের ভূমিকা পালন ছাড়া কিছুই করতে পারেন নি। এর মধ্যে গুজব রটে যে, হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাস শিথিল করার জন্য সরকার চিনি, ময়দা ও লবনে অস্থিচূর্ণ এবং ঘি এর মধ্যে চর্বি মিশিয়েছে. এছাড়াও জনসাধারণ যেসব কূপের পানি পান করে ওগুলোতে গাভী ও শুকরের মাংস ফেলেছে। সুতরাং অবিলম্বে সব সম্প্রদায়ের লোকই ধর্মচ্যুত হবে।[১৪]

এ সব গুজব ব্যারাকপুর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হয়ে কানপুর, মীরাট ইত্যাদি সেনানিবাস গুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে রুটি বা চাপাতি চালানোর ঘটনা এসে পড়ে। এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে এই চাপাতি ঘুরতে থাকে। গ্রামের প্রধান এই চাপাতি অন্য গ্রামে পাঠিয়ে দেয় কেউ এটা নষ্ট করে না। সরকার অনুসন্ধান করে এর

---

[১৩] রজনীকান্ত গুপ্ত, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, ২য় ভাগ (কলকাতা: নবপত্র প্রকাশনা, ১৮৯৩), পৃ. ৬২-৬৩।
[১৪] *তদেব*।

কোন হদিস বের করতে ব্যর্থ হয়। তবে অধিকাংশ লোক এ মত পোষণ করতে শুরু করে যে, এই চাপাতি দেশের মুসলমানদেরকে একসূত্রে গ্রন্থিত করেছে এবং শীঘ্রই সকলে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হবে।[১৫]

এসব ঘটনা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ কোনো হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া ঘটনা নয়। বাংলাদেশের ব্যারাকপুরে ও বহরমপুরে চর্বি মিশ্রিত কার্তুজ ব্যবহারের অস্বীকৃতি থেকে সূচিত বিদ্রোহ ক্রমশ মীরাটে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিদ্রোহীরা সেখানকার ইউরোপীয়দের হত্যা করে। ক্রমশ এটা উত্তর ভারতের প্রায় সব সেনা ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু - মুসলমান নির্বিশেষে দেশীয় সিপাহী ব্রিটিশ রাজ্যের পরিসমাপ্তি ঘটাবার জন্য অস্ত্র ধরে। গভর্ণর জেনারেল উপলব্দি করেন যে ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমান সকলেই একত্রিত হয়ে তাদের বিরোধিতা করছে এবং তাদের অনিষ্ট সাধনে উদ্যত হয়েছে।[১৬] সিপাহীদের একদল দিল্লীতে এসে ক্ষমতাসীন মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহকে সারা ভারতের মুঘল সম্রাট বলে ঘোষণা করে। ফলে দিল্লীর লালকেল্লা এ বিদ্রোহ বিপ্লবের প্রাণকেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। ক্রমে ক্রমে এ বিদ্রোহ রোহিলাখন্ড কানপুর, লক্ষ্ণৌ, ঝাঁসি, বেনারস, ঢাকা ও চট্টগ্রামে বিস্তার লাভ করে। ব্যক্তিগত স্বার্থক্ষুন্ন হবার কারণে, ওয়াজেদ আলী শাহ, রাণী লক্ষীবাঈ ও নানা সাহেব বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দেন এবং ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবকে শক্তিশালী করে তোলেন।

বিদ্রোহ সম্প্রসারণের নিয়ামক

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের চরিত্র, দৃষ্টিভঙ্গি ও যোগ্যতার দিক দিয়ে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল এবং বিদ্রোহের পরিচালনার ব্যাপারে তাদের পরস্পরের বিরোধিতা পদে পদেই প্রকট হয়ে উঠত। তবে তাদের প্রচার যন্ত্র বেশ কুশলতার সঙ্গেই কাজ করে ছিল। একথা প্রচারিত হয়ে গিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামে প্রদেশ থেকে প্রদেশে সমস্ত ভারতময়। হিন্দু মুসলমান সকলের মধ্যেই একথা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছোট বড় সবাই একথা জানত, হাটে মাঠে ঘাটে সর্বত্র এ আলোচনা চলত যে, পলাশী যুদ্ধের একশ বছর পরে, ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের ২৩ই জুন ফিরিঙ্গীদের রাজত্ব খতম হয়ে যাবে দেশ আবার দেশের মানুষদের হাতে ফিরে আসবে। এ চিন্তা মানুষের প্রাণে এক অদ্ভুত আশা ও প্রেরণা সৃষ্টি করে তুলল। তাই দেখা গেল ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের সূচনা থেকেই ভারতের মানুষ যেন রুদ্ধ আবেগে দুলে দুলে উঠছিল। একটা বিরাট পরিবর্তন আসছিল, দূর থেকে তার অস্ফুট পদধ্বনি শোনা যাচ্ছিল।

ফকির, সন্ন্যাসী, দরবেশ বা জ্যোতিষী সেজে এ সমস্ত প্রচারকের তাঁবুতে তাঁবুতে, কেল্লায় ঘুরে যেখানে যেটুকু সুযোগ পেতেন তারই মধ্য দিয়ে প্রচারের কাজ চালিয়ে যেতেন। এরা পোশাকের আড়ালে অস্ত্র নিয়ে চলতেন। বিপদে পড়লে গোপন ঝোলা থেকে শাণিত তলোয়ার ঝকমক করে উঠত। সব সময়ই এদের প্রাণ হাতে নিয়ে চলতে হত। ধরা পড়লে অনিবার্য মৃত্যু। মৃত্যুর আশংকা সম্মুখে নিয়েই এই দুঃসাহসিক প্রচারকের দল

---

[১৫] রজনীকান্ত গুপ্ত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭৩-৭৪।
[১৬] *তদেব*, পৃ. ৬৫।

ব্যারাকপুর থেকে মীরাটে, মীরাট থেকে এলাহাবাদ বা কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আম্বালা, পেশোয়ার যেখানে যেখানে সেনানিবাস আছে সর্বত্র ঘুরে ঘুরে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহের বীজ ছড়িয়ে গিয়েছেন বা এক জায়গার গোপন খবর অন্য জায়গায় পৌছে দিয়েছেন।[১৭] সমুদয় কার্যক্রমে প্রচন্ড গোপনীয়তা রক্ষা করা হত। সকল কাজ সাধারণত সংকেত ও ইংগিতমূলক বক্তব্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।[১৮]

হিন্দু মুসলমান সিপাহীরা দলে দলে ধর্ণা দিত, ভক্তিতে গদগদ হয়ে ধর্মোপদেশ ও তত্ত্ব কথা শুনত। এই ধর্মকথার অন্তরালে লোক বুঝে বুঝে তারা বিদ্রোহের বীজমন্ত্র দান করতেন। দেশী সিপাহীদের মধ্যে ধর্মচর্চার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে মৌলভী ও পুরোহিত নিযুক্ত করা হতো। শোনা যায়, বিদ্রোহীদের পক্ষের অনেক লোক মৌলভী ও পুরোহিতদের ছদ্মবেশে তাদের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলেন।

৪.৩ ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলিম সম্পৃক্ততা

সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ব পরিকল্পনার পশ্চাতে তরীকা-ই-মুহাম্মদীয়া পন্থীদের অবদান অনস্বীকার্য। বিদ্রোহী সৈন্যদের সর্বাধিনায়ক বখত আলী খান এ ভাবধারায় অনুপ্রাণিত ছিলেন। তাঁর গুরু সরফরাজ আলী ছিলেন কেরামত আলী জৌনপুরীর শিষ্য। বিদ্রোহীদের আরও দু'জন নায়ক শাহজাদা ফিরোজশাহ ও মৌলভী আহমদ উল্লাহ ও ওয়াহাবী ছিলেন। এই বিদ্রোহে হাজার হাজার ওয়াহাবী সেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছিলেন।[১৯] ঐতিহাসিকরা নানা সাহেব, তাতিয়া তোপি, কুনওয়ার সিং, ঝাঁসির রাণী লক্ষীবাঈদের মত দুঃসাহসী বীরদের নাম উল্লেখ করেছেন, মঙ্গল পান্ডে যিনি বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তাদেরকে অবশ্যই ভোলা যাবে না এটা সত্য কিন্তু মুসলমান নেতৃবৃন্দ যারা ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা খুব অল্পই স্মরণ করা হয় অথচ ফয়েজাবাদের মৌলভী আহমদ উল্লাহ শরীফ[২০] যিনি এই বিদ্রোহ সংঘটনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন এবং যার নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা ব্রিটিশদের এমন চরম ক্ষতি করতে সক্ষম হয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকার তাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ৫০,০০০ রুপি পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের জন্য পুভেন (Powain) এর রাজা তাঁর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাঁকে গুলি করে মারা হয়েছিল এবং তাঁর শিরচ্ছেদ করে ইংরেজ মনিবদের নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল।[২১] আরেকজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব মহান রাজনীতিবিদ আজিমুল্লাহ খান যিনি ১৮৩৪ সালে কানপুরের নানা সাহেবের উকিল হিসেবে কাজ করেছিলেন।[২২] তিনি ভারতীয়দের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রচারণা চালিয়েছিলেন এবং ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাই ১৮৫৭ সালে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে ভারতীয়

---

[১৭] সত্যেন সেন, *ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা* (ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০১৩), পৃ. ২২-২৩।
[১৮] মুহাম্মদ মুশতাক আহমাদ, *শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানীঃ জীবন ও কর্ম*, পৃ. ৫৬।
[১৯] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮-৪৯।
[২০] Ray Santimoy, *op. cit.*, p. 21.
[২১] *Ibid.*, p. 21.
[২২] *Ibid.*, p. 22.

সৈন্যদের বিদ্রোহে শাহ আব্দুল আযীযের শিষ্য ও অনুসারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা কাসেম নানতুবী এবং মাওলানা রশীদ আহমেদ গাঙ্গুহী।[২৩] ১৮৫৬ সালে ভারতের দিল্লীতে সকল জ্যেষ্ঠ উলামাদের সম্মেলন ডাকা হয়, যেখানে মাওলানা কাসেম নানতুবী তার বক্তৃতায় বলেন[২৪] ব্রিটিশরা আমাদের ঠিক মাথার উপর বসে রয়েছে এ ব্যাপারে তোমরা কি সচেতন নও? সমগ্র দেশে তারা তাদের শাসনের জাল বিস্তৃত করেছে। তাদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আমাদের কেটে টুকরা টুকরা করা হলেও আমরা শেষ পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাব। ব্রিটিশদের এই দেশে বসবাস আমরা কোন ভাবেই বরদাশত করবনা। নানতুবীর এই দৃঢ় সিদ্ধান্তই ভারতকে ব্রিটিশদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্দীপ্ত করেছিল।[২৫]

ব্রিটিশ সরকার কতৃক বর্ণিত এই ওয়াহাবী দল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গম বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। তারা সেই সময় থেকে স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাঁচিয়ে রেখেছিল। নীলম রাণী তার গবেষণাকর্মে উল্লেখ করেন

> The ulama not only inspired and gave moral support to the uprising of 1857 but also joind it actively.[২৬]

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের সময় কিছু কিছু লোক বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেছিল। কিন্তু এই বিদ্রোহকে সম্পূর্ণভাবে চূর্ণ করে দেওয়ার পর জিহাদের মধ্য দিয়ে দেশকে স্বাধীন করার সম্ভাবনা বহুদূর পিছিয়ে গেল। উলামাদের মধ্যে একটি দল ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। তারা উত্তর মুজাফফরনগর জেলার শামলীতে তাদের কেন্দ্র করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া বলেন-

> Tomson, a British army general who fought against Muslims in the 1857 revolt, wrote in his memoir (Rebellion Clerics:P-49). “If to fight for one’s country, planned and mastermined wars against occupying mighty powers are patriotism, then undoubtedly maulvis (read Ulama) were the loyal patriots to their country and succeeding generations will remember them as heroes.[২৭]

১৮৫৭ সালের ইংরেজ বিরোধী এই যুদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মূলতঃ দুটি কেন্দ্র থেকে এর একটি ছিল দিল্লীর সন্নিকটে থানা ভবনে যার নেতৃত্বে ছিলেন হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (রহঃ), রশীদ আহমদ গাঙ্গোহী (রহঃ) ও কাসেম নানতুবী (রহঃ)।[২৮] বারবারা ডি মেটকাফ এর মতে-

---

[২৩] Hussain S. Abid, *The Destiny of Indian Muslims* (Bombay: Asia Publishing House, 1965), p. 42.
[২৪] Diyaur Rahman Farooqi, *The Ulama of Deoband Their Majestic Past* (Karachi: Pakistan: Zamzam Publishers, 2006), pp. 33-34.
[২৫] Diyaur Rahman Farooqi, *op. cit.*, pp. 33-34.
[২৬] Neelam Rani, *op. cit.*, p. 74.
[২৭] সাইয়্যেদ মোহাম্মেদ মিয়াঁ, *উলামা-ই-হিন্দ কি শান্দার মাযী* (দিল্লীঃ কিতাবিস্তান, ১৯৮৫), পৃ. ৪৩৩।
[২৮] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০।

> It is possible that the nationalist's accounts are correct and that some of the Ulama did play an important role in the Thana Bhawn disorders.[২৯]

বিদ্রোহ ভেঙ্গে যাওয়ার পর তাঁরা কোনোমতে ইংরেজদের ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা পেয়ে সাহারানপুর জেলার দেওবন্দে চলে এলেন। মাওলানা সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ এর মতে-

> As far as I know, after the failure of uprising of 1857, it was decided to establish a centre (institution) where people could be trained to overcome the failure of 1857.[৩০]

বস্তুত পক্ষে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহের আগে থেকেই স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। বর্তমান উত্তর প্রদেশের রায়বেরেলির সৈয়দ আহমেদের নেতৃত্বে মুজাহিদ বাহিনী ১৮২৬ সাল থেকে অর্ধ শতাব্দীকাল ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে জেহাদ চালিয়ে আসছিল, তাকে অবশ্যই স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলতে হবে। বিদেশী ইংরেজদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর হৃত-গৌরব ফিরে পাবার জন্য মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব খুবই প্রবল ছিল। মুজাহিদ বাহিনীর এই দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের সেই ব্রিটিশ বিরোধিতা আরো প্রখর হয়ে উঠেছিল। এই অনুকূল পরিবেশেই ১৮৫৭ সালের মহা বিদ্রোহ বিস্ফোরিত হয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনীর সেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এই বিদ্রোহের উপর কিছুটা প্রভাব অবশ্যই বিস্তার করেছিল। আর একথা ও আমরা জানি, সৈয়দ আহমদের অনুবর্তী সেই বীর যোদ্ধারা এই বিদ্রোহে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। এই দুটি সংগ্রাম পৃথকভাবে গড়ে উঠলেও যে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন এমন কথাও বলা যায় না। বারবারা ডি মেটকাফ বলেন-

> The overall role of the Ulama in the revolt was at best fragmentary and devided.[৩১]

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক বর্ণিত এই ওয়াহাবী দল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের দুর্গম বন্ধুর পার্বত্য অঞ্চলকে ঘাঁটি করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিল। Senry Mead ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকে ইসলামী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৩২] বস্তুতঃ বালাকোটের যুদ্ধে হযরত সাইয়্যেদ আহমদ (রহঃ) ও হযরত ইসমাঈল (রহঃ) শাহাদত বরণ করার পর এই আন্দোলনের কর্মী বাহিনী সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে এবং আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনটি কেন্দ্রে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি কেন্দ্র ছিল দিল্লীতে। এটিই ছিল মূল কেন্দ্র। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী। অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবোধের ভিত্তিতে তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। কিন্তু, ইংরেজ সরকার শাহ ইসহাককে সন্দেহের চোখে দেখছে

---

[২৯] Barbara D. Metcalf, *Islamic Revival in British India: Deoband:1860-1900* (New Jerrsey: Princeton University Press, 1982), p. 83.
[৩০] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners of Malta*, translated by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications Pvt. Ltd., 2005), p. 7.
[৩১] Barbara D. Metcalf, *op. cit.*, p. 83.
[৩২] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *হিন্দুস্থানী মুসলমান* (লক্ষ্ণৌ: নদওয়াতুল উলামা, ১৯৭৪), পৃ. ১৪৫।

বিষয়টা অনুমান করে ১৮৪৪ সালে তিনি মক্কায় হিজরত করেন। তখন সার্বিক দিক বিবেচনা করে মাওলানা মামলুক আলী (১৭৮৭-১৮৫১), মাওলানা কুতুবুদ্দিন দেহলভী, মাওলানা মুজাফফর হুসাইন কান্দলভী ও মাওলানা শাহ আব্দুল গাজী মুজাদ্দেদীর সমন্বয়ে গঠিত চার সদস্যের বোর্ডের উপর নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। এ আন্দোলনের সার্বিক মর্যাদায় দিল্লী কেন্দ্রের সাথে সংশ্লিষ্ট উলামা মাশায়িখ, ছাত্র ও মুরীদদের ছাড়াও বিশেষ ভূমিকায় ছিলেন মাওলানা আহমাদুল্লাহ মাদ্রাজী। মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম নানতুবী, মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী প্রমুখ।[৩৩] এই উলামাগণ জনসাধারণকে উৎসাহিত করেছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে এবং তারা ভারতকে দারুল-হারব ঘোষণা করেছিল। এই ঘোষণার কারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল। এটি এতটাই বেপরোয়া ছিল যে তারা ১৮৫৭ সালে বিদ্রোহকালীন সময়ে বিপ্লবীদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করেছিল। তাঁদের অব্যহত চেষ্টার ফলে উত্তর ও মধ্য ভারতে ইংরেজ বিরোধী চেতনা ও আন্দোলন ব্যাপকতা লাভ করে এবং সর্বত্র ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিতাড়নের জন্য যুদ্ধ ও শাহাদাত বরণের তীব্র আবেগ ও আকাঙ্খা আন্দোলিত হতে থাকে।

সাইয়্যেদ মাহবুব রিজভী তার গ্রন্থে বলেছেন

> Muslim freedom fighters kept on fostering anti-imperialism revolt all over the country.In 1857 another edict for Jihad (call for war as religious obligation for Muslims) was issued.The edict carried the signature of 34 Ulama.Prominent among them were Maulana Qasim Nanautavi, the founder of Darul Uloom Deoband, Maulana Rased Ahmad Gangohi and Hafiz Zamin Shaheed who fought the British army under the leadership of Haji Imdadullah at Shamli field (Sharanpur,UP).[৩৪]

অন্য একটি কেন্দ্র ছিল পাটনায়। এ কেন্দ্রের নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা এনায়েত আলী, মাওলানা বিলায়েত আলী ও মাওলানা ফারহাত আলীর ন্যায় স্বাধীনতাকামী বলিষ্ঠ প্রত্যয়ী মহান তিন ব্যক্তিত্ব। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে দক্ষিণ ভারতের গোটা অঞ্চলে স্বাধীনতার চেতনা সম্প্রসারিত হয়।

আর একটি কেন্দ্র ছিল আফগান ও সীমান্ত অঞ্চলে। সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রভাবে সিত্তানা অঞ্চলে যে চেতনা সম্প্রসারিত হয়েছিল, তাই ক্রমান্বয়ে ঘনীভূত হয়ে সিত্তানাকে কেন্দ্র করে এই তৃতীয় কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিল। এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা বেলায়েত আলী, মাওলানা ফয়েজ আলী, ইয়াহইয়া আলী , আকবর আলী নামের খ্যাতনামা আত্মত্যাগী মুজাহিদবৃন্দ। এদের প্রচেষ্টায় আফগান সীমান্ত অঞ্চল, সিন্ধু ও বেলুচ প্রভৃতি অঞ্চলে স্বাধীনতার চেতনা দানা বেঁধে উঠেছিল। এভাবেই এ সকল উলামায়ে কেরামের প্রচেষ্টায় সারা দেশের আনাচে

---

[৩৩] মুহাম্মদ মুশতাক আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬।

[৩৪] S.M. Rizvi, *History of Darul Uloom Deoband*, English Translated by M.F Quraishi, *Idara-E Ihtemam* (India: Dar Al Ulum, Deoband, 1980) (Abstruct).

কানাচে কোম্পানির দুঃশাসনের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ চরম রূপ ধারণ করে। গোপনে গোপনে সারা দেশে চূড়ান্ত লড়াইয়ের প্রস্তুতি চলতে থাকে। এ বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা পালন কারী আলিমগণই পরবর্তীতে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় জড়িত ছিলেন। বারবারা ডি মেটকাফ বলেন-

> A group of Ulama in Delhi, many of them employees of the British, signed a fatwa in support of the rebels. The list of signatures was headed by one other than that of maulana Fazl-I Haqq khairabadi.[৩৫]

শেষ পর্যন্ত এ বিদ্রোহ, এ সংগ্রাম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এক বছরের মধ্যে সরকার এ বিদ্রোহ দমন করে দেশে ব্রিটিশরাজ কায়েম করে। এ বিপ্লবের ব্যর্থতার কারণ হিসেবে সংগ্রামী পরিচালকদের সাংগঠনিক দুর্বলতা, সার্বিক ঐক্য সৃষ্টিকারী নেতার অভাব, ব্রিটিশ কোম্পানী কর্তৃক এদেশবাসীর বিরুদ্ধে এদেশবাসীকে লেলিয়ে দেওয়ার কূটকৌশল, সর্বোপরি বিপ্লবীদের চেয়ে ইংরেজদের উচ্চমানের অস্ত্রশস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করতেই হয়। এতদসত্ত্বেও ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে এটিই সর্বপ্রথম গণবিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। আর এ গণঅভ্যুত্থান, গণবিদ্রোহের পশ্চাতে মুসলমাদের ভূমিকা যে সক্রিয় ও প্রধান ছিল এতেও সন্দেহ নেই।[৩৬]

৪.৪ বিদ্রোহ পরবর্তী আলিমদের উপর নির্যাতন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের দায়-দায়িত্ব ও প্রতিক্রিয়া

ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা বা নীতির দ্বারা ভারতের মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদন্ড ভেঙ্গে দেওয়া হয়। জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবার কোন অবস্থা তাদের মধ্যে অবশিষ্ট রাখা হয়নি। তার উপর এসে পতিত হয় ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব। ১৮৫৭ সালের ভারতের ইতিহাস ছিল রক্তক্ষয়ী ঘটনায় পরিপূর্ণ। এই সময়ের ঘটনাসমুহের কথা বর্ণনা করলে, লোম শিহরিত হয়ে ওঠে। ইংরেজদের প্রতিশোধে এই বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল।সর্বত্র ছিল হত্যা ও নির্যাতনের কালো থাবা। বিশেষ করে মুসলমানরা ছিল ইংরেজদের প্রধান শিকার। তাদের শিল্প কারখানা ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল। তাদেরকে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করা হত। এমনকি তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস ও ছিল হুমকির মুখে। স্যার আলফ্রেড ল্যাল এর মতে, ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর, "ইংরেজরা মুসলমান সমপ্রদায়ের প্রতি আরো হিংস্র হয়ে উঠল যেন তারাই তাদের প্রকৃত শত্রু এবং সবচেয়ে ভয়ংকর প্রতিযোগি। তাই যুদ্ধে পরাজয় হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের জন্য ছিল বেশী দুর্ভাগ্যজনক।[৩৭] ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের পর আলিম উলামাদের উপর ইংরেজদের নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যায়। আই.এইচ কোরেশীর ভাষায়-

---

[৩৫] Barbara D. Metcalf, *op. cit.*, pp. 81-82.

[৩৬] আনিসুজ্জামান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১।

[৩৭] Tara Chand, *History of Freedom Movement in India*, Vol. 4 (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, ১৯৭২), p. 349.

> The British believed that the Muslim were responsible for the anti-british uprising of 1857 and therefore they were subjected to ruthless punishment and mere illness vengeance. In every department of life where government patronage was essential, the doors were closed on Muslims.[৩৮]

ইংরেজদের মতে, সিপাহী বিদ্রোহে মূল আন্দোলনকারী হলেন মুসলমানগণ। এ কারণে ইংরেজদের প্রতিশোধ গ্রহণ করার মূল লক্ষ্যবস্তু ছিলেন মুসলমান। ফলে ইংরেজরা মুসলমানদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করেছে। অন্ততঃ সাতাশি হাজার মুসলমানকে ফাঁসি দিয়েছে। অনেক মুসলমানের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে।[৩৯] স্বাধীনতা যুদ্ধের পর দশ থেকে পনের বছর ধরে ব্রিটিশরা এ উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর ধ্বংসলীলা চালায়। ব্রিটিশদের নিষ্ঠুর নির্যাতনের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে, খালিক আহমেদ নিজামী তার গ্রন্থে বলেন -

সামান্য সন্দেহের কারণে হাজার হাজার মুসলমানকে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত। হাজার হাজার গৃহস্থের খাবার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল এবং শত শত সম্ভ্রান্ত পরিবার দারিদ্রতার কাছে অসহায় আত্মসমর্পণ করেছিল।[৪০] ফিল্ড মার্শাল লর্ড রবার্ট তার 'ভারতে ৪১ বছর' বইতে ১৮৫৭ সালের হৃদয়বিদারক ঘটনা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেনঃ বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ২৭০০০ জন মুসলমান বিদ্রোহী কে ফাঁসিতে ঝুলতে হয়। এছাড়া জবাই করে গণহত্যা করা হয় অগণিত মানুষকে।[৪১] এক্ষেত্রে নারী, পুরুষ, বয়স্ক ও শিশুদেরকেও রেহাই দেয়া হয়নি। বিপ্লবের পরে গণনায় দেখা গেছে যে, মুসলমান জনসংখ্যা আগের চার ভাগের এক ভাগ মাত্র। এই বিপর্যয় ও পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে ১৮৫৭ সালের ঘটনার ফলে। মুঘল সাম্রাজ্যের যবনিকাপাত ঘটে; ব্রিটিশরা এর মাধ্যমে সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়েছিল, তারা বনে গিয়েছিল জাতির ভাগ্য নির্ধারক। চলছিল গণহারে মুসলিম হত্যা। উলামাদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হত। দিল্লী ধ্বংসের সাথে সাথে একটার পর একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে দেয়া হয়েছিল। বারবারা ডি মেটকাফ এর মতে-

> British revenge was extensive in the countryside, but it was worse in Delhi. The entire population of the city was expelled for a time. The mosques of the city were occupied; The Jami Masjid for five years and the Fatehpuri Masjid for twenty.[৪২]

এটা সত্য যে এই ব্যাপক বিদ্রোহের জন্যে মুসলমানরা একা দায়ী নয় এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ছড়াবার ব্যাপারেও তারা একা দায়ী নয়, তবে এই বিদ্রোহ তাদের আবেগ অনুভূতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে তারা প্রবল উৎসাহে এতে অংশগ্রহণ করে।[৪৩] পরবর্তী ঐতিহাসিকগণ আশ্চর্য হয়ে যায় যে,

---

[৩৮] I. H. Qureshi, *The Struggle for Pakistan* (Pakistan: University of Karachi, 1969), p. 17-18.
[৩৯] এ.এইচ.এম. মুজতবা হোসাইন, "শায়খুল হিন্দ ও তার রাজনীতি", অপ্রকাশিত পি-এইচ.ডি. থিসিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৮ পৃ. ৪০।
[৪০] Ziaur Rahman Siddiqui, *Freedom Movement and Urdu Prose* (Kanpur: Vikas Pakistan, 2004), p. 18.
[৪১] *Ibid.*, p. 19.
[৪২] Barbara D. Metcalf, *op. cit.*, p. 84.
[৪৩] I.H Qureshi, *The Cause of the War of Independence: History of the Freedom Movement,* Vol. II, p. 231.

ব্রিটিশ প্রতিহিংসার সমস্ত রোষ ক্রোধ মুসলমানদের ওপর পড়ে। ঘটনা বিশ্লেষণ করে তারা বলেন, যুদ্ধ চলাকালে এবং তার পরপর যুদ্ধের ব্যাপারে মুসলমানদেরকে একক দায়ী করে যে, ব্রিটিশ মনোভাব গড়ে উঠেছে তার পেছনে তেমন কোনো যুক্তি নেই। অবশ্যই ব্রিটিশদের এ প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃপ্রবৃত্ত। তারা সর্বদাই মুসলমানদেরকে সন্দেহের চোখে দেখে এসেছে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান বলেন "১৮৫৭-৫৮ সালের পর এমন কোনো অত্যাচার সংঘটিত হয়নি যার দোষ মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানো হয়নি। যদিও সত্যিকারের অপরাধী ছিল রামদিন বা মাতাদিন। একজন প্রাচ্যদেশীয় কবি ঠিকই বলেছেন স্বর্গ হতে এমন কোনো দুর্ভাগ্য আসেনি যেটা মুসলমানদের ঘর-বাড়িতে নিপতিত না হয়ে মাটি স্পর্শ করেছে।"[৪৪]

ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী অধিকারের পর পাইকারী হারে হত্যা, গৃহদাহ ও লুটতরাজের ফলে দিল্লীর পুরাতন ঐতিহ্য ধুলিসাৎ হয়ে যায়। ব্রিটিশদের বিবাদ ছিল বিদ্রোহীদের সঙ্গে, কিন্তু অংশতঃ সাধারণভাবে ভারতীয়দের মনে ভীতি সঞ্চারের জন্য এবং অংশত বিদ্রোহীদের হাতে ইউরোপীয় শিশুদের হত্যার ক্ষোভে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তারা জনগণের উপর যুদ্ধের কুকুর লেলিয়ে দেয়। তাছাড়া ইংরেজদের প্রতি শিখ সৈন্যদের সমর্থন প্রদর্শনের জন্য পাঞ্জাবী অফিসাররা প্রাচীনগল্প-উপাখ্যান বর্ণনা করে ধর্মীয় উন্মাদনা বৃদ্ধি করে তাদেরকে উত্তপ্ত করে তোলে। ফলে মন্ত্রমুগ্ধ শিখ সৈন্যরা এমন বর্বরতা প্রদর্শন করে যা ব্রিটিশদের নিষ্ঠুরতাকেও হার মানায়।[৪৫]

দিল্লীতে যে অত্যাচার-অবিচার, লাঞ্ছনা পরিচালিত হয় তা ছিল অবর্ণনীয়, কল্পনাতীত। দিল্লী অধিকারের বেশ কিছুদিন পর পর্যন্ত বেসামরিক লোকদের দেখা মাত্রই গুলি করা হতো। তারপর সামরিক আইনের আওতায় বিচার করা হতো। অনুগ্রহ প্রাপ্তির আশায় কোনো অভিজাত বা ভালো লোকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের সাক্ষ্য দিলেই তা সহজে বিশ্বাস করা হতো। দিল্লীর ঐ সমস্ত ব্যক্তি যাদের নাম, স্যার সৈয়দ আহমদ তাঁর আসার উল সানাদিদ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন তারা ছিল হয় মৃত অথবা বাঁচাবার তাগিদে পলাতক। দিল্লীর লাল কিল্লা ও জুম্মা মসজিদের মধ্যবর্তী মুঘল অভিজাত শ্রেণীর আবাসিক বিরাট এলাকা ধুলিসাৎ করে ফেলা হয়। সম্রাট শাহজাহানের বিশাল জুম্মা মসজিদ সেনাবাহিনী দখল করে এবং ইঙ্গ ভারতীয় পত্র-পত্রিকা তুমূল বাকবিতণ্ডায় লিপ্ত হয় যে, একে ধ্বংস করা হবে না গির্জায় রূপান্তরিত করা হবে।[৪৬] পরাজিত মুসলমানদের প্রতি বিজয়ী ব্রিটিশ সরকারের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আপোষহীন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা পালনে ব্রিটিশদের প্রতিক্রিয়া ছিল অত্যন্ত তীব্র। ফলশ্রুতিতে বিপ্লবোত্তর কালে মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের অত্যাচার, উৎপীড়ন, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ছিল বর্ণনাতীত ও কল্পনাতীত।

---

[৪৪] L. Col. Graham, *The Life and Work of Sayed Ahmed Khan* (Delhi, Reprint, 1974), pp. 59-60.
[৪৫] S.M. Ikram, *Modern Muslim India and the Birth of Pakistan: 1858-1951* (India: Renaissance Publishing House, 1991), p. 31.
[৪৬] *Ibid.*, pp. 31-32.

ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশদের এটি ছিল সত্যি একটি কলঙ্কময় অধ্যায়। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সমাপ্তির পর ভারতের ব্রিটিশ ভাইসরয় তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদেরকে যুদ্ধ পরবর্তীতে ভারতে কিভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং কেন এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং কারা এই বিদ্রোহকে উস্কে দিয়েছিল এ সম্পর্কে এ বিষয়ের উপর একটি প্রতিবেদন প্রদানের অনুরোধ জানান। ফলে,ভারতের নেতৃত্ব প্রদানকারী একজন রাজনীতিবিদ Dr.William Yur ভাইসরয়ের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করেন। এতে তিনি উল্লেখ করেন- ভারতীয় জনগোষ্ঠীর মধ্যে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশি তেজস্বী, বীর এবং সাহসী। মূলতঃ যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে মুসলমানদের দ্বারাই। যতদিন পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে জিহাদী চেতনা উজ্জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত আমরা তাদের উপর শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারব না। একারণে সর্বাগ্রে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই চেতনা বাধ্যতামূলকভাবে অপসারিত করতে হবে। আর এই চেতনা ধ্বংস করার একমাত্র পন্থা হচ্ছে উলামাদেরকে কারারুদ্ধ করা এবং কোরআন বাজেয়াপ্ত করা।

Dr.William Yur এর পরামর্শের ভিত্তিতে ১৮৬১ সালে পবিত্র কুরআন বিরোধী প্রচারণা শুরু করে এবং কুরআনের ৩০,০০০ কপি বাজেয়াপ্ত করে। এ ছাড়া তারা কুরআনের মূলোৎপাটনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে। এ রিপোর্টের ভিত্তিতে শুরু হয় আলিম-উলামা নিধনের মহোৎসব। ইতিহাসের সবচেয়ে লোমহর্ষক নির্যাতনের শিকার হয় উপমহাদেশের আলিম উলামাগণ। সে সময় প্রায় অর্ধলক্ষের চেয়ে বেশী আলিম উলামাকে ফাঁসী দিয়ে হত্যা করা হয়। আন্দামান, মালটা, সাইপ্রাস ও কালাপানিতে দ্বীপান্তর করা হয়। হাজার হাজার আলিম উলামাদের সহায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ঘর-বাড়ি আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রপথিক হাজী ইমদাদুল্লাহ তার একান্ত শিষ্য মাওলানা কাসেম নানতুবী এবং মাওলানা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহীর বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরওয়ানা জারি করা হয় এবং তাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। এছাড়া অনেক আলিমকে আন্দামান, মাল্টা ও সাইপ্রাসে নির্বাসন দেয়া হয়। মূলত তখন দিল্লীর অলিগলি হত্যাকান্ডের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। আর ঘরবাড়ী পরিণত হয়েছিল জেলখানায়। এভাবে রাজনৈতিক নির্যাতনের পাশাপাশি অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও নির্যাতন করা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পঙ্গু করে দেয়া হয়। এছাড়াও ধর্মীয় শিক্ষার মূলোৎপাটন, ধর্মান্তরিত করার অপচেষ্টা, মসজিদকে গীর্জায় রূপান্তরিত করণের চেষ্টা এবং পারস্পরিক আত্মকলহ সৃষ্টি ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে অবদমিত করার চেষ্টা করা হয়। এম. বুরহান উদ্দিন কাসমী তার গ্রন্থে উল্লেখ করেন-

> The word ‘Maulvi’was synonymous to ‘rebel’ in the British eyes.out of 200,000 people martyred during the revolt, more than 51,200 were Ulama.Edward Timus admitted that in Delhi alone 500 Ulama were hanged to death.[৮৭]

[৮৭] Burhanuddin Qasmi, *Darul Uloom Deoband: A Heroic Struggle against the British Tyranny* (Mumbai: Markazul Ma’arif, (n.d.), p. 6.

আলিম-উলামা নিধনের এই অভিযানের ফলে নেতৃত্ব দেয়ার মতো কোন আলিম তো দুরের কথা দাফন কাফন করার মতো নূন্যতম জ্ঞানের অধিকারী কোন আলিম ও অবশিষ্ট থাকেনি। আলিম উলামাদের জীবন হয়ে উঠে দুর্বিসহ। রাজনৈতিক ময়দানে নেমে আসে এক ভয়াল নৈঃশব্দ অবস্থা। কাজেই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য নতুন লোক তৈরীর পরিচল্পনার ভিত্তিতে শুরু হয় একাডেমিক আন্দোলন। মহাবিদ্রোহের জের থেকে জন্ম নেয় দেওবন্দ আন্দোলন।[৪৮] প্রতিষ্ঠা করা হয় দারুল উলূম দেওবন্দ। মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশদের এ নির্যাতন নিপীড়ন ও শোষণের নীতি ১৮৭০ সাল পর্যন্ত অপরিবর্তিত থাকে। তবে ১৮৭০ সাল পরবর্তী মুসলমানদের প্রতি ব্রিটিশ নীতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসতে থাকে। আই এইচ কোরেশির ভাষায়-

> From 1857 up to about 1870 nearly all British politicians, authors and administrators unhesitatingly blamed the Muslims for the "Mutiny". But in the 1870's a change in British opinion was visible men like Sir Richard temple, sir John Strachey and W.H.Gregory came forward to argue that muslim India was not disloyal and that the unpleasant past should be forgotten.[৪৯]

৪.৫ সিপাহী বিদ্রোহ নাকি প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ লোকের মুখে মুখে “সিপাহী বিদ্রোহ” নামে প্রচলিত হয়ে এসেছে এই নামটা আমরা পেয়েছিলাম ইংরেজদের কাছ থেকে। ব্রিটিশ সরকার এর নাম দিয়েছিল (Sepoy Mutiny) অর্থাৎ সৈন্য বিদ্রোহ। এ গণঅভ্যুত্থান পুর্বপরিকল্পিত ছিল কি না এটা বিতর্কের বিষয়, তবে ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের পর ভারতীয় বিশেষত মুসলমানরা ১৮৫৭ সালের যুদ্ধ সম্পর্কে নতুনভাবে চিন্তাভাবনা আরম্ভ করে, তারা একে স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অবশ্য হিন্দু ঐতিহাসিকগণ পূর্বেই একে মহান বিপ্লব হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

ডি.আর. গয়্যাল বলেন-

> The ulama were the first to give warning against the threat to Indian’s political power and cultural life. From the British who came seeking trade facilities and through cunning manipulation of contradictions among local rulers and chieftains, became the rulers over the rich country. It was their inspiration in the main that resulted the first great uprising in 1857 which the British called the Mutiny and patriotic Indians terms as the first war of independence.[৫০]

১৮৫৭ সালে দেশীয় সৈন্যরাই বিদ্রোহে প্রথম এবং প্রধান সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। এই সমস্ত কারণেই এই বিদ্রোহকে সৈন্য বিদ্রোহ বলে মনে করাটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। এখানে এ সম্পর্কে কয়েকজন বিশিষ্ট

---

[৪৮] M. Burhanuddin Qasmi, *op. cit.,* p. 58.

[৪৯] Ishtiaq Husain Qureshi, *The Struggle for Pakistan* (Pakistan: University of Karachi, 1969), p. 18.

[৫০] D.R. Goyal, *Maulana Hussain Ahmad Madani: A Biographical Study* (New Delhi: Anamika Publishers and Distributors, 2004), Preface.

রাজনীতিবিদ ও চিন্তাবিদদের মন্তব্য তুলে ধরছি। বিখ্যাত ব্রিটিশ রাজনৈতিক ডিজরেলি সর্বপ্রথম এই সত্যটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালের ২৭ জুলাই তারিখে পার্লামেন্টের হাউস অব কমন্স সভায় ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি সু-স্পষ্টভাবে তার এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে, একে সামরিক মিউটিনি বললে ভুল বলা হবে। এ হচ্ছে জাতীয় বিদ্রোহ। এরপর অ্যালামবুরি সভায় প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, আমার বিশ্বাস এখন এ বিষয়ে সকলেই একমত হয়েছেন। ভারতের এই দুভার্গ্যজনক ও অসাধারণ ঘটনাটি সম্পর্কে প্রথমে যে আখ্যা দেওয়া হয়েছিল সমস্ত অবস্থা বিচার করে তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। দিনের পর দিন আমাদের বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ঘটনটিকে আমরা প্রথমে কতগুলি তুচ্ছ কারণের অথবা দুর্ঘটনার ফলে সৃষ্ট বলে মনে করেছিলাম। প্রকৃত পক্ষে এটি এমন এক জাতীয় ঘটনা যার ফলে ইতিহাসে যুগ পরিবর্তন ঘটে যায়। রাজনীতিবিদগণ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখলে এর মূল কোথায় তা উপলদ্ধি করতে পারবেন।

এ প্রসঙ্গে হ্যসটিন ম্যাকারফি লিখেছেন, প্রকৃত ঘটনাটি হচ্ছে এই ভারতের উত্তর ও উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের ব্যাপক এলাকা জুড়ে দেশীয় জাতিগুলো ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। এটাকে নিছক সামরিক মিউটিনি বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে সৈন্যদের অসন্তোষ, ইংরেজদের প্রতি ঘৃণ্য মনোভাব এবং ধর্মান্ধতা, এই কারণগুলির সংমিশ্রণের ফলেই এই ঘটনার সৃষ্টি হয়েছিল। দেশীয় রাজ্য ও দেশীয় সৈন্যরা এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল। খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়ে মুসলমান ও হিন্দুরা তাদের নিজেদের বিরোধিতা ও বাদ বিবাদের কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহ সম্পর্কে চার্লস বল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন। অবশেষে এই বন্যা প্রবাহ দুকূল ভাসিয়ে সমগ্র ভারতবাসীর জীবন প্লাবিত করে দিয়ে গেল। তখন আশংকা করা গিয়েছিল, এই মহাপ্লাবনকালে এ দেশ থেকে ইউরোপীয়দের নাম নিশানা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। তখন এটাও মনে হয়েছিল এই বিদ্রোহের বন্যা অবসানের পর যখন স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে তখন দেশপ্রেমিক ভারত বিদেশী শাসকদের পরিবর্তে কোন এক দেশী রাজার আনুগত্য স্বীকার করবে।

এই বিদ্রোহের চরিত্র কি? নামে সিপাহী বিদ্রোহ হলেও আমরা এতকাল একে স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেই জেনে এসেছি। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস এ সম্পর্কে মতানৈক্য ও বিতর্কটা দেখা দিলে সর্বপ্রথম ১৯৫৭ সালে, ভারতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবাষির্কী উদযাপন উপলক্ষে। আমাদের দেশের ঐতিহাসিক ও চিন্তাবিদদের মধ্যে একদল একে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিতে রাজি নন। তাদের মতে এটা দেশীয় রাজা ও ভূস্বামীদের হৃতসম্পদ ও অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা মাত্র। তাঁদের মতে ভারত তখনও একটি নেশন বা জাতি হিসেবে গড়ে ওঠেনি কাজেই তারা জাতীয়তার মনোভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে তাদের কাছ থেকে এটা আশা করা বৃথা। যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য তাদের নিজ নিজ প্রভুর অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্যই সংগ্রাম করেছিল। কাজেই এই অবস্থায় এই বিদ্রোহের কোনমতেই জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা চলে না।

ভারত তখনও নেশন বা জাতি হিসবে গড়ে ওঠেনি সে কথা মেনে নিলাম কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের এক বিরাট অঞ্চলের এই ব্যাপক বিদ্রোহকে কি স্বাধীনতা সংগ্রাম নাম দেওয়া যেতে পারে না? খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আলেকজান্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিলন, তখন ভারতের বিভিন্ন রাজারা যদি মিলিতভাবে তাকে প্রতিরোধ করতেন তখন তাদের সেই সংগ্রামকে স্বাধীনতার সংগ্রাম আখ্যা দিলে কি ভুল বলা হতো? অনুরূপভাবে হিন্দু ও মুঘল যুগে বহিরাগত মুসলমান ও ব্রিটিশ আক্রমণ কারীদের বিরুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজারা যদি মিলিতভাবে সংগ্রাম করতেন তাহলে আমরা তাকে স্বাধীনতার সংগ্রাম বলতে দ্বিধা করতাম কি? তাছাড়া এটাও স্মরণ রাখতে হবে যে, শুধু রাজা, ভূস্বামী ও সৈন্যরাই নয়, সাম্রাজ্যবাদের শাসন ও শোষণে জড়িত এদেশের সাধারণ মানুষও সেদিন তাদের হৃত অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের দেশকে ইংরেজদের হাত থেকে মুক্ত করার জন্য বিদ্রোহের ঝান্ডা তুলেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে সংঘটিত প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ যাকে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা সিপাহী বিদ্রোহ বলে আখ্যায়িত করেন। এই স্বাধীনতা যুদ্ধ দেশব্যাপী জনগণের প্রথম ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন; যার সূচনা হয়েছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং ফরায়েজী সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে। এই স্বাধীনতা আন্দোলন ছিল পূর্ববর্তী আন্দোলনগুলোর ফলশ্রুতি এবং এই আন্দোলনে হিন্দু-মুসলমান সবাই সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বাহাদুর শাহের অধীনে একত্রিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হয়। অবশ্য আলীগড়পন্থী মুসলমানদের মতে এটাই ছিল মুসলমানদের ক্ষমতা দখল সংগ্রামের সর্বশেষ প্রচেষ্টা।

৪.৬ প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন পরবর্তী ব্রিটিশ রাজের ভারত শাসন নীতির প্রকৃতি

১৭৭৩ সালের রেগুলেটিং আইন থেকে শুরু করে ১৮৫৩ সালের সনদ আইন পর্যন্ত বিধিবদ্ধ বিভিন্ন আইন দ্বারা কোম্পানির ডিরেক্টরদের ক্ষমতা হ্রাস করে প্রায় নামমাত্র পর্যায়ে নিয়ে যায়। ১৮৫৩ সালের সনদ আইনে উল্লেখ ছিল যে, পার্লামেন্ট অন্য কোন বিধান না করা পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজা বা রাণীর 'অছি' হিসেবে কোম্পানীই ভারতীয় ভূখণ্ড ও রাজত্বের উপর কর্তৃত্ব ভোগ করতে পারবে। এর মধ্যেই কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অবসান ঘটায়। রাজা বা রাণীর হাতে এর রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর কেবল সময়েরই ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ভারতে দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার ফলে প্রশাসনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ লর্ড ক্যানিং অত্যন্ত স্থিরচিত্তে সুপরিকল্পিত উপায়ে বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হন। লর্ড ক্যানিং ব্রিটিশ শাসনকে মজবুত করার জন্য বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করেন।

ক. ব্যয় সংকোচন ও আয় বৃদ্ধি নীতি

খ. ভূমি নীতি, তার ভূমি নীতির অংশ হিসেবে ১৮৫৯ সালে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন পাস হয়

শেষ পর্যন্ত সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড পামারস্টোন ১৮৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে দ্বৈত শাসনব্যবস্থার অবসানকল্পে এবং ভারতের শাসনভার রাজপ্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত করার জন্য কমন্সসভায়

একটি বিল উত্থাপন করেন। এই আইন বোর্ড অব কন্ট্রোল এবং কোর্ট অব ডাইরেক্টরসের দ্বৈত শাসনের অবসান ঘটায়। রাণীর পক্ষে ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করার জন্য একজন ভারত সচিব নিযুক্ত করা হয়। আর তাকে ভারতীয় রাজ্যে পরামর্শ দেয়ার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি কাউন্সিল গঠন করা হয়।[৫১] জাতীয় কাউন্সিলের জন্য ভারতীয় বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ দেয়া হয় এবং তাদেরকে সুনির্দিষ্ট ক্ষমতা দেয়া হয়। এছাড়াও ভারতের রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ে তাদের সম্মতি বাধ্যতামূলক করে দেয়া হয়।[৫২] তবে, জরুরী ও গোপনীয় বিষয়ে ভারত সচিবকে তার সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা দেয়া হয়। গভর্ণর জেনারেল এবং কাউন্সিলর নিয়োগদানের ক্ষমতাও ভারত সচিবকে দেয়া হয়। এছাড়া গভর্ণর জেনারেলের উপাধি দেয়া হয় ভাইসরয় বা রাজ প্রতিনিধি। বস্তুতঃ ১৮৫৮ সালের আইনের মাধ্যমে শুধু শাসকের পরিবর্তন মনে হলেও এর দ্বারা বেশকিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার একজন সদস্য ভারত সচিব উপাধি নিয়ে গভর্ণর জেনারেল ও ভাইসরয়ের মাধ্যমে ভারতবর্ষ শাসন করা শুরু করেন। এভাবে ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন ভারতের ইতিহাসে এক নতুন যুগের সুচনা করে। যার ফলে ভারতে কোম্পানির শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে এবং ব্রিটিশ রাজ শাসনের সূচনা হয়; যেটি ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। ১৮৫৩ সালের আইনের মাধ্যমে যার সূচনা ঘটেছিল ১৮৫৮ সালের আইনের মাধ্যমে তা পূর্ণতা লাভ করে। লর্ড পামারস্টোন পদত্যাগ করলে তার স্থলাভিষিক্ত হন লর্ড ডারবি। যদিও এ বিলটি বাতিল হয়ে যায়।

১৮৫৮ সালের এপ্রিল মাসে পার্লামেন্টে প্রতিবাদ সত্ত্বেও কয়েকটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে ভারতে উৎকৃষ্টতর শাসনের জন্য একটি নতুন বিল পাস হয় যা ১৮৫৮ সালের ভারত শাসন আইন নামে পরিচিত। এ আইনের মাধ্যমে ভারত শাসন ক্ষমতা কোম্পানির হাত থেকে ব্রিটিশ রাজের হাতে অর্পিত হয়। কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজকীয় শাসনের যুগ শুরু হয়। আই.এইচ কোরেশীর মতে-

> The greatest contstitutional change brought about by the war of 1857 was the transfer of power from the East India Company to the British crown. For the first time the British parliament was given full authority and responsibility for governing India. The British Indian Empire was officially established.[৫৩]

কোম্পানী বিলুপ্ত হওয়ার কারণে এর সম্পত্তিও রাজ প্রতিষ্ঠানের নিকটে হস্তান্তর করা হয়। কোম্পানির স্থল ও নৌ-বাহিনীর সৈন্যদেরকে ব্রিটিশ রাজের নিকট হস্তান্তর করা হয়। এ আইনের মাধ্যমে Board of Control এবং Court of Director এর বিলুপ্তি ঘোষণা করে উভয় পরিষদের ক্ষমতা ভারত সচিব এবং ভারতীয় পরিষদ বা কাউন্সিলের নিকট অর্পিত হয়। এ আইনের মাধ্যমেই সর্বপ্রথম ভারত সচিবের পদ সৃষ্টি করে তার উপর ভারত সরকারের সকল কার্যাবলী পরিদর্শন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। আইন

---

[৫১] *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড ১, পৃ. ৪৭২।

[৫২] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ১৬২।

[৫৩] I.H. Qureshi, *op. cit.,* p. 21.

প্রণয়ন বিষয়ে ভারত সচিবকে সাহায্য করার জন্য একজন পার্লামেন্টারী আন্ডার সেক্রেটারী এর পদও সৃষ্টি করা হয়। ভারত সচিবকে ভারতীয় বিষয়ে তথ্য ও পরামর্শ প্রদান করে সাহায্য করার জন্য ১৫ সদস্য বিশিষ্ট ভারতীয় পরিষদ বা কাউন্সিল নামে একটি সংস্থা গঠন করা হয়। Vincent A.Smith এর মতে

> To supply the local knowledge which the directors claimed to give a council of India was setup. This consisted of Fiften members, appointed first for life but later for periods of between ten and fifteen years. Eight members were appointed by the crown and seven of first by the directors and aftert wards by co-option by the council itself. This body tended to represent official experience and since the members were usually men who had retires from a life time of service in India, embodied the official experience of the past generation.[৫৪]

১৮৫৮ খ্রিঃ ২ আগষ্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এক আইন পাস করে ভারতের শাসনভার মহারাণী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পণ করেন। বোর্ড অব কন্ট্রোলের স্থলে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্য হতে একজনকে ভারত সচিবের পদে নিযুক্ত করা হয়। ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত একটি কাউন্সিলের সাহায্যে ভারতের শাসনকার্য পরিচালনা করবেন এরূপ স্থির করা হয়। ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্ণর জেনারেলকে ভাইসরয় বা রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হয়। ১৮৫৮ সালের ১ নভেম্বর মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে স্বত্ববিলোপ নীতি পরিত্যক্ত হয়। দেশীয় রাজন্যবর্গকে এ মর্মে আশ্বাস দেয়া হয় যে তারা দত্তকপুত্র গ্রহণ করতে পারবেন এবং তাদের সাথে পূর্বে সম্পাদিত সন্ধি মান্য করা হবে। ব্রিটিশ সরকার ভারতে রাজ্য বিস্তার নীতি পরিত্যাগ করবেন। দেশীয় রাজ্যগুলোতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ উপস্থিত হলে গভর্ণর জেনারেলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। দেশীয় রাজ্যগুলোর অভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ব্রিটিশ সরকার দায়ী থাকবে।

মহারাণী এ ঘোষণাপত্রে আরও বলেন যে ব্রিটিশ নাগরিক ও প্রজাদের হত্যাকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভিন্ন অপর সকলকে শাস্তি প্রদান হতে নিস্কৃতি দেয়া হবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী ভারতবাসীকে উচ্চরাজকার্যে নিযুক্ত করা হবে। ভারতে একটি নতুন আইনসভা গঠন করা হয়। এ আইনসভায় পাতিয়ালার মহারাজ, বেনারসের রাজা এবং স্যার দিনকর রত্তিকে বেসরকারি সভ্য রূপে গ্রহণ করা হয়। বিভাগ ও বিভেদ নীতি অবলম্বনে প্রেসিডেন্সি সেনাবাহিনীকে পৃথক করে রাখা হয়। ইউরোপীয় সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। গোলন্দাজ বাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয়। সীমান্ত রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার ভার ইউরোপীয় সামরিক কর্মচারীদের উপর অর্পণ করা হয়। ব্রিটিশ বিরোধী এবং যারা ভারত শাসন করার দাবী করতে পারেন এমন সকল ব্যক্তিকে দৃশ্যপট থেকে অপসারণ করা হয়। বস্তুত বিদ্রোহের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার প্রতিক্রিয়াশীল নীতির আশ্রয় নেন। স্যার লেপেল গ্রিফিন বলেন- এ বিদ্রোহ ভারতীয় আকাশকে মেঘমুক্ত করে। এর ফলেই এক অলস, অত্যাদরে লালিত সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এর ফলেই এক

[৫৪] Vincent A Smith, *The Oxford History of India*, 3rd edition (Oxford: 1919), pp. 673-674.

অগ্রগতিশীল, স্বার্থপর ও বাণিজ্যভিত্তিক প্রশাসন ব্যবস্থার স্থলে এক উদার ও বিজ্ঞ প্রশাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়।[৫৫] ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন ব্রিটিশ শক্তির কৌশলের নিকট বিপর্যস্ত হলেও এ আন্দোলন ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির প্রতি মারাত্মক আঘাত। ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী পূর্ব থেকেই মুসলমানদের প্রতি বিভিন্ন নিপীড়ন মূলক নীতি গ্রহণ করার কারণে তাদের এই চিন্তা বদ্ধমূল ছিল যে এ বিদ্রোহের সকল ইন্ধন মুসলমানদের থেকে এসেছে। যার কারণে মুসলমানদের উপর যে ভয়াবহ নির্যাতন পরিচালিত হয়েছে তা ১৮৭০ সাল পর্যন্ত পুরো মাত্রায় অব্যহত ছিল।

[৫৫] Vincent A Smith, *op. cit.*, p. 332.

পঞ্চম অধ্যায়

দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ও বিকাশ

৫.১ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট

দ্বাদশ শতাব্দী হতে ভারতীয় উপমহাদেশের ক্ষমতার কেন্দ্রে ছিলেন মুসলিম শাসকগণ। প্রশাসনিক উচ্চ পদগুলোতে সাধারণতঃ মুসলমানরা আসীন হলেও হিন্দুরা সুবিধা বঞ্চিত হননি, বরঞ্চ মুঘল আমলে মুঘলদের রাজপুত নীতির কারণে হিন্দুদের প্রভাব আরো বৃদ্ধি পায়। বাংলায় মুসলিম শাসনের মূল ঝান্ডার পতন ঘটেছিল ১৭৫৭ সালেই তদুপরি নবাব মীরকাসিম এর শেষরক্ষা করতে চাইলেও সফলকাম হতে পারেননি। মুঘল সম্রাট শাহ আলম এর পরবর্তী একশত বছর মুঘল সম্রাটরা দেশ পরিচালনার ক্ষমতার অধিকারী না হলেও তাদের গৌণ উপস্থিতিই ছিলো মুসলিম জনগোষ্ঠীর আশা ভরসার স্থান। ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে ইংরেজদের হাতে মুসলমানদের পরাজয় মুসলিম সম্প্রদায়কে একেবারে প্রদীপের আলো হতে অন্ধকার গহবরে নিক্ষেপ করেছিল। মিরা হামিদ তার গ্রন্থে বলেন-

> However, in the period of political stability under the Mughals from the 16th century until the decline of Muslim power of India in the 18th, men of religious knowledge consistently occupied a very important position.[১]

এ হেন শাসন ও অভিজাত শ্রেণীর উচ্চ স্থান থেকে ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে ইংরেজরা মুসলমানদের অকস্মাৎ দরিদ্র শ্রেণীতে পরিণত করে। সম্রাট ও নবাবগণ পরিণত হন ইংরেজদের ভাতাভোগীতে। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী তথা জমিদারদের তাদের তালুক, জমিদারী ও অন্যান্য আয়ের উৎস হতে বঞ্চিত করা হয়। মিরা হামিদ বলেন-

> By 1803 they had taken on the rule of protectors of the new titular Mughal king. As they consolidated their rule, the British introduced their policies that had a deep impact on many aspects of Muslim life, including role of ulama.[২]

মুসলমানদের হাত হতে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার কারণ, তারা যাতে ঐ অপহৃত ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করার জন্য মেরুদন্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারে আর এজন্য ইংরেজরা মুসলমানদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাবে পঙ্গু করার জন্য যে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায় সে বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। মুসলমানরাও এ পরিবর্তনকে স্বাভাবিকভাবে মাথা নত করে মেনে নেননি। সুপ্ত আগ্নেয়গিরির মত তাদের ভেতরেও পুঞ্জীভূত হচ্ছিল হতাশা ও ক্ষোভের উত্তাপ। এসময় মুসলমানদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাভাবে বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এসব মাদ্রাসা মক্তবই ছিলো মুসলমানদের ঈমান-আকিদা সুন্নাহ শিক্ষণের মাধ্যমে ধর্মীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার রক্ষাকবচ। ভারতে মুসলিম রাজশক্তি ও শাসক গোষ্ঠীর রাজনৈতিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি সামাজিক ও ধর্মীয় অবক্ষয় সামগ্রিকভাবে মুসলমানদেরকে এক অতি শোচনীয় অবস্থায়

---

[১] Myra Hamid, “The Political Struggles of the Ulama of Dar-Ul Uloom Deoband: Identifying and Operationalizing The Traditionalist Approach to Politics”, Unpublished Ph.D. Thesis, University of Maryland, College Park, 2005, p. 08.

[২] *Ibid.,* p. 11.

নিক্ষেপ করে। দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের স্থানে স্থানে মুসলিম সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানা বিদআত বা শরীয়তবিরোধী অনৈসলামিক আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানের অনুপ্রবেশ এবং ভ্রান্ত সূফী মতবাদের প্রভাবের ফলে এই অবক্ষয় ঘটে।[৩] এই অবস্থা হতে উত্তরণের উদ্যোগ মুসলিম শাসকশ্রেণীও গ্রহণ করেননি। মুর্শিদাবাদের মতিঝিল প্রাসাদে শাহমত জঙ্গ ও শওকত জঙ্গ এবং মনসুরগঞ্জ প্রাসাদে সিরাজ-উদ-দৌলা আনন্দ সহকারে 'হোলি' উৎসব পালন করতেন।[৪] ধর্মীয় শিক্ষা ও ইসলামী মূল আকীদা প্রচারের অভাবে মুসলিম সমাজে কবর পূজা, পীরপূজা, মানত, তাবিজ-কবচ মাদুলিতে বিশ্বাস, হিন্দুদের হোলী ও দেওয়ালী উৎসব উদযাপন প্রভৃতি কুসংস্কার ধর্মের মূল রীতিনীতিকে কলুষিত করেছিল। মুসলমানদের শরীয়তসিদ্ধ বিধবা বিবাহ প্রথাও মুসলিম সমাজে গর্হিত, নিন্দনীয় ও কৌলিন্য পরিপন্থী বলে গণ্য হতে থাকে।[৫]

মুসলিম সমাজকে এই অবনতি হতে পুনরুদ্ধার করার জন্য সমাজ সংস্কারক রূপে আবির্ভূত হন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী। তার পিতা শাহ আবদুর রহিম ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় আলিম। শাহ আবদুর রহিম দিল্লীর 'মেহেন্দিয়া' কবরস্থানের পাশে 'রহিমীয়া' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ পিতার প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসায় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করার পর উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে হারামাইন শরীফে গমন করেন। হারামাইন শরীফে অবস্থানের সময় তিনি বিশ্বের মুসলিম দেশসমূহের নৈতিক অবস্থা ও আন্তর্জাতিক অবস্থান সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত হন। সেখান থেকেই তিনি উদ্ভূত পরিস্থিতিতে পবিত্র কুরআন-হাদীসের আলোকে সকল সমস্যা মোকাবেলা করার কর্মপন্থা গ্রহণে অনুপ্রাণিত হন।[৬] শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর দেশে ফিরে তিনি দেশে মুসলিমদের অবস্থা দেখে ব্যথিত হন এবং ভারতে ইসলামকে পুনর্জীবন দানের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত সংস্কার কর্মসূচি ঘোষণা করেন।

১) কুরআন প্রদত্ত রীতিনীতি অনুসরণে ইসলামী আকীদার প্রচলন।

২) হাদীস ও সুন্নাহর বাণী সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপক হারে প্রচার।

৩) ইসলামী শরীআহকে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন দর্শন রূপে জনগণের কাছে উপস্থাপন।

৪) খোলাফায়ে রাশেদীনের খিলাফত প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দানের মাধ্যমে ইসলামী শাসনব্যবস্থায় খিলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা।

৫) সমকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্যোগের কবল হতে মুসলিম শাসনকে রক্ষা ও তা রক্ষার্থে প্রয়োজনে জিহাদী ভূমিকা গ্রহণ।

৬) ইসলামী শিক্ষা ও দারসের মাধ্যমে ভবিষ্যত আন্দোলনের উদ্দেশ্যে কর্মী গঠন যাতে ইসলাম ধর্মের প্রচার ও প্রসার অব্যাহত থাকে।[৭]

---

[৩] মুহাম্মদ ইনাম-উল-হক, *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০৯), পৃ. ২।

[৪] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৬৪), পৃ. ১৫।

[৫] গোলাম রসুল মেহের, *হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ*, বাংলা অনুবাদ-আবদুল জলীল ও মতিউর রহমান নূরী (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮১), পৃ. ১১০।

[৬] আতাউর রহমান কাসিমী, *আলওয়াহ-উস-সানাদিদ*, ভলিউম ১, তা.বি. পৃ. ১১০।

[৭] সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী, *তারীখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত* (লক্ষ্ণৌ: মজলিসে তাহকিকাত ওয়া নশরিয়্যাতে ইসলাম, ১৯৭৯), পৃ. ১২।

শাহ মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহ ক্ষমতাসীন মুসলিম শাসকদের ও জনসাধারণকে খিলাফতের পতাকা তলে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান। তার মহান কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য যোগ্য নেতৃত্ব ও কর্মী গড়ে তোলার কেন্দ্র হিসেবে তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর জোর দেন।

১৭৬২ সালে শাহ মুহাম্মদ ওয়ালীউল্লাহর মৃত্যুর পর তার অসমাপ্ত কাজ কাঁধে তুলে নেন তার সুযোগ্য পুত্র শাহ আবদুল আযীয। শাহ ওয়ালীউল্লাহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদ আব্দুল আযীযকে ইমাম হিসেবে মেনে নেয় এবং পিতার সংস্কারমূলক আন্দোলনের মূলনীতিগুলো শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করে।[৮] রহিমীয়া মাদ্রাসার কার্যক্রম পরিচালনা থেকে পিতার রাজনৈতিক চেতনার প্রসার পর্যন্ত দায়িত্ব তিনি সুচারু রূপে পালন করেন। এসময় ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত হতে থাকে।

দিল্লীতে যখন ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কলেজ স্থাপন করে তখন মুসলমানরা সে কলেজে শিক্ষা গ্রহণ করতে ইতঃস্তত করাতে ইংরেজী ভাষা শিক্ষার সমর্থন করে আব্দুল আযীয এক ফতওয়া প্রচার করেন। ইংরেজের অধীনে তিনি চাকুরী করা সমর্থন করেন এবং এ বিষয়ে মুসলমানদের উৎসাহ দেন।[৯] কিন্তু পরবর্তীতে শাহ আব্দুল আযীযের এ মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম কোম্পানির ইংরেজ অধিকৃত অঞ্চলকে "দার-উল-হারব" বা বিধর্মী শাসিত দেশ বলে অভিহিত করেন।[১০] তার মতে, শুধু মুসলিম অধ্যুষিত বা নামে মাত্র মুসলিম শাসিত হওয়াই কোন দেশের "দার-উল-ইসলাম" হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। দেশে বিদ্যমান মুসলিম শাসককে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হবার সাথে সাথে কুরআন ও সুন্নাহর অনুশাসন বলবৎ এবং মুসলিম প্রজাদের জান-মাল ও ধর্মের নিরাপত্তা বিধান করতে না পারলে ঐ দেশকে "দার-উল-ইসলাম" বলা যাবে না। এজন্য ভারতীয় উপমহাদেশ ও দার-উল ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই ভারতের বসবারত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের সামনে দুটি পথ খোলা আছে-

ক. জিহাদের/ বল প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা নতুবা
খ. অন্য কোন ইসলামী রাষ্ট্রের হিজরত করা।

দার- উল হরবে অবস্থানরত প্রত্যেক মুসলমানদের জন্য এটি হচ্ছে 'মাজহাবী কর্তব্য' অর্থাৎ ফরজ। এ ব্যাপারে উদাসীন থাকা হারাম। শাহ আব্দুল আযীয তার এ ফতওয়া মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন এবং এর সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে থাকেন। M.Burhanuddin Qasmi বলেন-

> With this proclamation (Fatwa) of Shah Abdul Aziz Dehlavi, the long drawn (1803-1947) India's freedom struggle began.[১১]

---

[৮] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ ও তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা*, বাংলা অনুবাদ-নূর উদ্দিন আহমদ (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ১৯৮২), পৃ. ৩৭।

[৯] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস* (ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪), পৃ. ১৩০।

[১০] আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য* (ঢাকা: লেখক সংঘ প্রকাশনী, ১৯৬৪), পৃ. ২২।

[১১] M. Burhanuddin Qasmi, *Darul Uloom Deoband A Heroic Struggle against the British Tyranny* (Mumbai: Markazul Ma'arif, 2001), p. 05.

শাহ আব্দুল আযীয ও তার ভ্রাতাদের পরিচালনায় তাঁর পিতামহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর 'রহিমীয়া' মাদ্রাসাটি এসময় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে এবং ইসলামী শাস্ত্র সম্পকে জ্ঞানার্জনের অন্যতম কেন্দ্রস্থল হয়ে ওঠে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র রচিত গ্রন্থগুলো এখানে পড়ানো হতে থাকে। এর ফলে শাহ ওয়ালীউল্লাহর মতাদর্শ আরো বিস্তৃতি লাভ করে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুসলিম ছাত্ররা এবং আফগানিস্তান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত থেকে বহু শিক্ষার্থী এখানে পড়তে আসতো। এখানে শিক্ষা প্রাপ্ত ছাত্ররাই পরবর্তীকালে বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মশিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার ছোট বড় বহু কেন্দ্র গড়ে তোলেন। রহিমীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রিক নেতৃবৃন্দ একাধারে তদানীন্তন আলিম সমাজ এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তারা পরাজিত মুসলমানদের রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষমতা পুনরুদ্ধারে নানা প্রকার পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়ে আন্দোলনকে বেগবান করেন, তাদের ফতোয়ায় উদ্ধুদ্ধ ভারত ও বাংলার মুজাহিদগণ ইংরেজবিরোধী সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন।[১২] সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এই মাদ্রাসায় শিক্ষাপ্রাপ্ত অনেকেই ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের অংশগ্রহণের পাশাপাশি নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ফজলে হক খায়রাবাদী যিনি পরে রেঙ্গুনে নিবার্সিত হন, তিনি ছিলেন শাহ আব্দুল আযীযের সরাসরি শিষ্য। পরবর্তীতে দারুল উলুম দেওবন্দে যে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয় তার প্রতিষ্ঠাতা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, মুহাম্মদ কাসিম নানতুবী ও বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিলেন। এরা সবাই শাহ ওয়ালীউল্লাহর মাদ্রাসায় শিক্ষা পেয়েছিলেন।[১৩]

দার-উল-হারব হতে দেশকে দার-উল-ইসলামে উন্নীত করার জন্য জনগণকে জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত করার লক্ষ্যে শাহ আবদুল আযীয প্রচেষ্টা চালান। এজন্য তাঁর প্রয়োজন ছিল রণনিপুণ সাংগঠনিক যোগ্যতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তিত্ব। তিনি এ লক্ষ্যে তাঁর অন্যতম ছাত্র সৈয়দ আহমদকে নির্বাচন করেন এবং এ বিষয়ে তাকে পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করান। ইংলিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ও তার প্রতিভূ ওয়ারেন হেষ্টিংস দ্বারা নির্যাতিত উত্তর ভারতের রোহিলাদের দ্বারা সৈয়দ আহমদ গঠন করেছিলেন তার বাহিনী।[১৪] অত্যন্ত অল্পকালের মধ্যেই রোহিলাখন্ড থেকে পাটনা পর্যন্ত সৈয়দ আহমদের অসামান্য জনপ্রিয়তা ও প্রভাব বিস্তৃত হয় এবং তারই ভিত্তিতে তিনি প্রায় একইসঙ্গে একদিকে শিখদের বিরুদ্ধে ও অন্যদিকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। শাহ আব্দুল আযীযের প্রেরণায় লখনৌ ও পাটনায় যে ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল তা বহু ইসলামী ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয়। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে পাটনার বেলায়েত আলী ও এনায়েত আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওঃ কেরামত আলী জৌনপুরী, মুফতী সদরুদ্দীন, মুফতী এলাহী বখশ, আহমদ উল্লাহ প্রমুখ সকলে উনিশ শতকের মুসলমান আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে ও দলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।[১৫]

---

[১২] রফিক আহমদ, *মাসিক আত-তাওহীদ* (চট্টগ্রাম: আল জামে আতুল ইসলামিয়াঁ, এপ্রিল ১৯৮৭), পৃ. ২১।
[১৩] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২৯।
[১৪] রুস্তম আলী, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট* (ঢাকা: ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪), পৃ. ১৮৮।
[১৫] আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩০।

১৮৩১ সালে বালাকোটের যুদ্ধে বারো হাজার শিখ বাহিনীর বিরুদ্ধে নিজ বাহিনীর কিছু লোকের বিশ্বাসঘাতকতায় সৈয়দ আহমদ শহীদ ও শাহ ইসমাইল সহ ১৭০ জন মুজাহিদ শহীদ হন। অবশিষ্ট তিন হাজার মুজাহিদ পাহাড়ী অঞ্চলে আত্মগোপন করেন।[১৬] সৈয়দ আহমদের মৃত্যুর পর তার অনুসারীগণ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মৌলভী কেরামত আলী জৌনপুরীর নেতৃত্বে একদল জিহাদের পরিবর্তে সৈয়দ আহমদের সংস্কারমূলক কার্যক্রমকে প্রাধান্য দিয়ে সামাজিক সংস্কারে মনোনিবেশ করে। অপরদিকে মৌলভী ইনায়েত আলী ও মৌলভী বেলায়েত আলীর নেতৃত্বে একদল মুজাহিদ পাটনাকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ চালিয়ে যাবার সংকল্প নেন। তাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তার অনুসারীদের মধ্যে জিহাদের নতুন প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। M.Burhanuddin Qasmi বলেন-

> Even after this setback, companions of these great martyrs carried on the struggle for nearly half a century. Ulama of Sadiqpur continued their relentless struggle and went on fighting in the Frontier region for more than two decades between the year 1845 and 1871.[১৭]

শিখদের বিরুদ্ধে তাঁরা অতঃপর আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়। W.W Hunter বলেন, এ আন্দোলন তখন কোন নেতার বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং সাইয়্যেদ আহমদের মৃত্যুকে ও তার কর্মীরা আন্দোলন অব্যাহত রাখার একটি শক্ত উপকরণে পরিণত করে।[১৮]শিখ নেতা রণজিৎ সিংহের মৃত্যুর পর মুজাহিদরা পাঞ্জাবসহ সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরের বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রাধান্য বিস্তার করে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত সিত্তাহ ও মূল্‌কায় ছিল মুজাহিদদের ঘাঁটি। ১৮৪৯ সালে ইংরেজরা পাঞ্জাব পুনঃ অধিকার করে নিলে পাঠান তথা মুজাহিদ বাহিনীর সমস্ত রোষ ইংরেজদের বিরুদ্ধতায় পর্যবসিত হয়।[১৯] সৈয়দ আহমদের শাহাদাতের পর স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র এবার একটির স্থলে ২টি তে পরিণত হয়। তন্মধ্যে একটি ছিল দিল্লীর রহিমিয়া মাদ্রাসায় আর অপরটি পাটনার সাদিকপুরে।[২০]

কেন্দ্রদ্বয়ের মূল লক্ষ্য অভিন্ন হলেও উভয় কেন্দ্রের পদ্ধতি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। দিল্লীতে প্রধানতঃ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতাবোধের প্রচার এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রতি বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। পক্ষান্তরে সাদিকপুরে সৈয়দ আহমদের প্রবর্তিত মূলনীতি তথা জিহাদ, হিজরত ও মুক্তিযুদ্ধ এই তিনটিই কর্মপন্থা হিসেবে বিবেচিত থাকে।[২১]এ নীতির আলোকে সাদিকপুরী আলিমগণ যে বিশাল আন্দোলন গড়ে তোলেন ইংরেজ লেখকদের ভাষায় সেটি ওয়াহাবী আন্দোলন নামে অভিহিত হয়। ওয়াহাবীদের

---

[১৬] গোলাম রসুল মেহের, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৫৫।

[১৭] M. Burhanuddin Qasmi, *op. cit.*, p. 06.

[১৮] হান্টার, *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস*, আব্দুল মওদুদ (অনু.) (ঢাকা: ১৯৭৪), পৃ. ৩৪।

[১৯] Mahmood Hossain, *The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of the Freedom Movement,*Vol. II, Part I (Delhi: Ranaissance Publishing House, 1984), p. 149.

[২০] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী* (দিল্লী: কিতাবিস্তান এম ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৭।

[২১] *তদেব*, পৃ. ৮।

লড়াই ভারতবর্ষের আদিতম এবং সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী ও কট্টর ব্রিটিশবিরোধী লড়াইগুলার অন্যতম। গোটা উনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল সাদিকপুর কেন্দ্রিক ব্রিটিশ বিরোধী এ লড়াই। ব্রিটিশরা এ সংগ্রামকে সাধারণ মুসলমানদের সংশ্লিষ্টতা হতে বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য একদল ব্রিটিশপন্থী আলিম ভাড়া করে তাদের ওয়াহাবী বা বিদআতপন্থী / সন্ত্রাসবাদী হিসেবে আখ্যা দেয়।

এই মুজাহিদদের ব্রিটিশ বিরোধী কর্মকান্ড সম্পর্কে W. Hunter বলেন,

"সব সময়ে জিহাদীরা সীমান্তের আদি জাতিগুলোকে ব্যস্ত রেখেছিল ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে বিরামহীন সংগ্রাম-সংঘর্ষে। একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখে বিষয়টার সবই বলা হয়ে যাবে। ১৮৫০ সাল থেকে ১৮৫৭ সালের মধ্যে আমরা ষোলবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি এবং তার জন্য দরকার হয়েছে তেত্রিশ হাজার স্থায়ী সৈন্যের। আর ১৮৫০ সালে থেকে ১৮৬৩ সালের মধ্যে আমরা কুড়িবার যুদ্ধ চালাতে বাধ্য হয়েছি এবং তার জন্য দরকার হয়েছে ষাট হাজার স্থায়ী সৈন্যের। তাছাড়া অস্থায়ী সৈন্য আছে এবং পুলিশ তো আছেই। এই সময়ে সিতানা বসতি যদিও স্থায়ীভাবেই সীমান্তে ধর্মান্ধতা জাগিয়ে রেখেছিল তবু আমাদের সৈন্যের সঙ্গে সামনাসামনি যুদ্ধ তারা চালাকির সংগে এড়িয়ে গেছে। তারা হয়তো আদি জাতিগুলোকে সাহায্য দিয়েছে, কারণ তারাই এই জাতিগুলোকে আমাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত রেখেছে; তবুও আদি জাতিদের হয়ে তারা সরাসরি যুদ্ধে নামেনি। কিন্তু ১৮৫৭ সালে তারা প্রকাশ্যে আমাদের বিরুদ্ধে একজোট হয়ে গেল তাদের যাকাত আদায় করে দিতে। আমাদের অস্বীকারে তারা জ্বলে উঠল এবং তীব্র গতিতে আমাদের এলাকার হামলা করে সহকর্মী লেফটেন্যান্ট হর্ন সাহেবের শিবিরে রাত্রিকালে এমন আক্রমণ চালালো যে, তিনি অতিকষ্টে পলায়ন করেন প্রাণে বাঁচলেন। অতঃপর প্রতিশোধ না নিয়ে আর থাকা যায়না। এবং জেনারেল স্যার সিডনি কটন পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করলেন। আমাদের সীমান্তে জিহাদী বসতির এটাই প্রথম সংঘর্ষ। এজন্য এ বিষয়ে আর বিশদ আলোচনা না করে ১৮৬৩ সালে যে দ্বিতীয় সংঘর্ষ হয়েছিল দৃষ্টান্ত হিসেবে তারই বর্ণনা দেয়া যাক। কিছুটা অসুবিধার আমাদের সৈন্যদল বিদ্রোহী জাতিগুলোর গ্রাম জ্বালিয়ে দেয়; তাদের দুটি প্রসিদ্ধ কিল্লা উড়িয়ে দেয় এবং সিত্তানার বিদ্রোহী বসতি ধ্বংস করে দেয়। বিদ্রোহীরা কিন্তু মহাবন পর্বতের জঙ্গলে আত্মগোপন করে রইলো এবং তাদের শক্তি এমনই অক্ষুন্ন থেকে গেল যে, স্থানীয় আদি জাতি তাদেরকে মূলকায় একটি নতুন বসতি করবার অনুমতি ও দিল।"[২২]

W. Hunter এর এ বক্তব্য স্পষ্ট করে দেয় সৈয়দ আহমদ পরবর্তী মুজাহিদদের সাফল্যের কারণ ছিল সম্মুখ যুদ্ধের পরিবর্তে গেরিলা যুদ্ধের পন্থা অবলম্বন। এই গেরিলা যোদ্ধারা গোপনীয় ভাবে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় সংঘবদ্ধ হয়ে ব্রিটিশদের অস্থির করে তোলে। এই মুজাহিদরা মানুষকে ইসলামের বিশুদ্ধ জীবনাদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে এবং মানবতার কল্যাণ ও মুক্তির কাজে নিজেদের সবকিছু উৎসর্গ করতে উদ্বুদ্ধ করে।

---

[২২] হান্টার, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬-১৭।

নিজেদের সার্বিক নিরাপত্তার সুবিধার্থে তারা নিজস্ব বহু পরিভাষা, সামরিক সংকেত, ইঙ্গিতমূলক বক্তব্য ও কথাবার্তার প্রচলন করেছিল।[২৩]

বালাকোট যুদ্ধের পর দিল্লী কেন্দ্রের প্রধান লক্ষ্য ছিল ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ সৃষ্টি করা। এ কেন্দ্রের দায়িত্বশীল হযরত শাহ ইসহাক দেহলভী অসাম্প্রদায়িকতা ও মানবতা বোধের ভিত্তিতে আন্দোলন পুনর্গঠনের চেষ্টা করেন। সাদিকপুরী আলিমদের মত তার আন্দোলন ও ছিল লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে। পার্থক্য এতটুকু যে , সাদিকপুরিদের কার্যক্রম দেরীতে হলেও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় কিন্তু দিল্লী কেন্দ্রের কার্যক্রম গোয়েন্দাদের পক্ষে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তবে ইংরেজ সরকার শাহ ইসহাককে সন্দেহ করায় মুহাম্মদ ইসহাক ও তার ভাই মুহাম্মদ ইয়াকুব ১৮৪৪ সালে হিজরত করে স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য মক্কা শরীফ চলে যান। তখন বিভিন্ন দিক চিন্তা করে ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলন চালিয়ে যাবার লক্ষ্যে ৪ সদস্যের একটি পরিষদের ওপর আন্দোলনের নেতৃত্ব অর্পণ করা হয়। পরিষদে ছিলেন মাওলানা মামলুক আলী, মাওলানা মুযাফ্ফর হোসাইন কান্দলভী, মাওলানা কুতুব উদ্দীন দেহলভী, ও মাওলানা শ্হ আব্দুল গণী মুজাদ্দেদী।[২৪] আব্দুল গণী এই বোর্ডের পক্ষ থেকে রহিমিয়া মাদ্রাসার প্রধান নির্বাচিত হন। আব্দুল গণী ছিলেন শাহ আব্দুল আযীযের অন্যতম শিষ্য। এ সময় হতেই প্রথমবারের মত রহিমিয়া মাদ্রাসা এমন ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত হতে থাকে যারা শাহ ওয়ালী উল্লাহর বংশধর নয় বরং অনুসারী। এই বোর্ডের সদস্যদের মধ্যে কেবল নাজির হোসেন ছাড়া সকলেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে মুঘল শাসকদের সমর্থন দিয়েছিলেন, কেবল নাজির হোসেন এ ব্যাপারে নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করেন।

দিল্লী কেন্দ্রিক আন্দোলনে আরো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারীদের মধ্যে ছিলেন মাওলানা আহমদউল্লাহ মাদ্রাজী, মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মৌলভী ইমাম বখশ সাহবায়ী, মুফতী সদরুদ্দীন, কাজী ফছেত উল্লাহ দেহলভী, মাওলানা ফয়েজ আহমদ বাদায়ুনী, সাইয়্যিদ মুবারক শাহ রামপুরী, মুফতী ইনায়েত আহমেদ কাকুরী, হাজী ইমদাদুল্লাহ, মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী প্রমুখ।[২৫] ভারতে শাহ ওয়ালী উল্লাহ, শাহ আব্দুল আজিজ ও সৈয়দ আহমদের অক্লান্ত পরিশ্রমে গড়ে তোলা আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত চললেও উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর শেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখা যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহে। পরবর্তীতে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব আসে হাজী ইমদাদুল্লাহর হাতে। ওয়ালীউল্লাহ আন্দোলনের ঝান্ডা উত্তোলনকারী এই নতুন মুজাহিদ হাজী ইমদাদুল্লাহ মোহাজেরে মক্কীর জন্ম ১৮১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর সাহারানপুরে।

---

[২৩] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ* (লাহোর: মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৭৫), পৃ. ৫৬।
[২৪] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭৮।
[২৫] হুসায়ন আহমেদ মাদানী, *নকশে হায়াত* (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো, ১৯৫৪), পৃ. ৪৬০।

১৮৪৪ সালে মক্কায় হজ্বব্রত পালন করার সময় তিনি শাহ মুহাম্মদ ইসহাক মুহাদ্দিসে দেহলভীর সাথে পরিচিত হন। মক্কায় তারা ছিলেন একে অপরের প্রতিবেশী। তাঁর সমর্থন ও আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে ইমদাদ হোসাইন মদীনায় রাসূল (সাঃ) এর রওজা মোবারক জিয়ারত করে এক আশ্চর্য প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন। আরো কিছুদিন শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের সাহচর্যে মক্কা থাকার পর তার আদেশে ১৮৪৬ সালে তিনি ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। হজ্ব হতে ফিরে আসলেও তার মনপ্রাণ যেন মক্কাতেই পড়ে রইল। তিনি মনস্থির করেন যে একদিন তিনি হিজরত করবেন এবং সেখানে ফিরে যাবেন। হজ্ব থেকে ফিরে আসার পর তিনি থানাভবনের নিকটবর্তী সাহারানপুরে তার পৈতৃক বাড়িতে বসবাস করতে থাকেন। এসময় মাওলানা কাসিম নানতুবী, মাওলানা রশিদ আহমেদ গঙ্গোহী তার সাথে নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ করতে থাকেন এবং এক পর্যায়ে তাঁর কাছ হতে বাইআত গ্রহণ করেন। হাজী ইমদাদুল-াহর নেতৃত্বে দিল-ী কেন্দ্রিক স্বাধীনতাকামী মুজাহিদদের আন্দোলন ধীরে ধীরে দানা বাঁধতে থাকে। অসাম্প্রদায়িক ধর্মীয় চেতনার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মুসলমানদের সাথে সাথে হিন্দু ব্রাহ্মন ও পন্ডিত শ্রেণী সহ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণী ও ভারতীয় সিপাহীরাও এতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। আন্দোলনের সমস্ত কার্যক্রম ও যোগাযোগ অত্যন্ত গোপনে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা বক্তব্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হতো। এ বিদ্রোহের কিছুদিন পূর্বে গোয়েন্দাদের কাছে কিছু কিছু সংকেত (যেমন-সিপাহীদের কাছে উলামা, দরবেশ ও সন্ন্যাসীদের অধিক যাতায়াত, স্তূপীকৃত চাপাতি রুটি/তাজা পদ্ম ফুল হাতে হাতে ইউপি থেকে শুরু করে পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বাংলা প্রভৃতি অঞ্চলে পৌঁছান ইত্যাদি) ধরা পড়েছিল কিন্তু এ সংকেতগুলোর অর্থ কি, এগুলো কোথা থেকে আসে, কে বা কারা সরবরাহ করে এসবের কিছুই এসবের কিছুই গোয়েন্দারা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়নি।[২৬]

বিদ্রোহী আলিমগণ গোপনে আন্দোলনের প্রাথমিক কাজ সমাপ্ত করার পর দেশব্যাপী সকল মহল থেকে একসময়ে ও একযোগে মহাবিদ্রোহ তথা স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনের লক্ষ্যে ১৮৫৭ সালের ৩১ মে দিনটি ধার্য করেন এবং সে অনুসারে অবশিষ্ট কাজ চূড়ান্ত করতে থাকেন।[২৭]কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ব্যারাকপুরে ২৯ শে মার্চ মঙ্গল পান্ডে নামক জনৈক সিপাহীর ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে হঠাৎ বিদ্রোহ শুরু হয় এবং অত্যন্ত দ্রুত গোটা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। শায়খুল ইসলাম মাদানীর ভাষ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত সময়ের প্রায় ২ মাস পূর্বে ব্যারাকপুরে মঙ্গল পান্ডের হাতে এ আগুন জ্বলে উঠে। অথচ অন্যান্য স্থানে তখনো পরিকল্পনা অনুসারে প্রস্তুতির কাজ চূড়ান্ত হয়নি। ফল দাঁড়ায় যে, দিল্লীতে যথানিয়মে যুদ্ধ শুরুর পূর্বেই বাংলার বিপ্লব প্রায় শেষ হয়ে যায়। তারপর পাঞ্জাবে বিপ্লব এমন সময় শুরু হয় যখনইংরেজ সরকার দিল্লী ও কানপুর পুনরুদ্ধারে সক্ষম হয়ে গিয়েছে। মাদ্রাজ, বোম্বাই, হায়দ্রাবাদ তথা দক্ষিণ ভারতে তখন পর্যন্ত কোন কাজই চূড়ান্ত হয়নি। তাই ঐ সকল সুবায় বিদ্রোহ ঘটেছিল খুবই সামান্য। যার ফলে ইংরেজরা ঐ সুবাগুলি সহজেই পুনরুদ্ধার করে ফেলে এবং সেখানকার সৈন্য বাহিনী উত্তর ভারতের দিকে প্রেরণের সুযোগ পেয়ে যায়।

---

[২৬] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হিন্দ কা শানদার মাযী* (দিল্লী: কিতাবিস্তান এম ব্রাদার্স, ১৯৮৫), পৃ. ৭৮-৭৯।
[২৭] *তদেব*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৮।

মোটকথা নির্ধারিত সময়ে যুদ্ধ শুরু না হওয়াই ছিল ব্যর্থতার প্রধান কারণ।[২৮] নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিপ্লব শুরু হবার কারণে পর্যাপ্ত জটিলতা সৃষ্টি হলেও আলিমগণ হতোদ্যম হয়ে পড়েননি। ১৮৫৭ সালে মে মাসে দিল্লী হতে ১২০ কি.মি দূরবর্তী সাহারানপুরের নিকটবর্তী শামলী জেলার এক ছোট শহর থানাভবনে হাজী ইমদাদুল্লাহ তার সঙ্গীদের নিয়ে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। এতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে মুসলমানদের পক্ষ হতে জিহাদ শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয় এবং এ লক্ষ্যে নেতৃত্ব পরিচালনার জন্য একটি বিপ্লবী সরকার গঠন করা হয়। এ নবগঠিত বিপ্লবী সরকারের আমির বা রাষ্ট্রপ্রধান নির্বাচিত হন হাজী ইমদাদুল্লাহ। প্রধান সেনাপতি মনোনীত হন মাওলানা মোহাম্মদ কাসিম নানতুবী, প্রধান বিচারপতি মনোনীত হন মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী, এছাড়া তাদের অন্যান্য সহকর্মীদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করা হয়। এই সরকারের নেতৃত্বে সিপাহী বিদ্রোহীকালীন সময়ে মুসলিম মুজাহিদগন থানাভবনের পাশ্ববর্তী কিছু এলাকা ব্রিটিশ দখলমুক্ত করেন। এ ঘটনা ব্রিটিশদের সচেতন করে তোলে। ১৮৫৭ সালে ১৪ সেপ্টেম্বর শামলীর রণক্ষেত্রে ইংরেজ ও বিপ্লবীদের মাঝে সংঘটিত প্রচন্ড যুদ্ধে অসংখ্য উলামায়ে কেরাম শাহাদাত বরণ করেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ, কাসিম নানতুবী, রশীদ আহমেদ গঙ্গোহীর বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা গ্রেফতারী পরোয়ানা ও পুরস্কার ঘোষণা করে। দীর্ঘদিনের আত্মগোপন করে থাকার পর ১৮৫৯ সালে হাজী ইমদাদুল্লাহ মক্কায় হিজরত করেন এবং বাকী জীবন সেখানেই অতিবাহিত করেন। এজন্য তাকে মোহাজের-এ-মক্কী বলা হয়। টমসন নামে একজন ব্রিটিশ আর্মি জেনারেল তার স্মৃতিকথায় উল্লেখ করেন যে, শামলীর যুদ্ধের পর ব্রিটিশদের মনে এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহর অনুসারীবৃন্দ এবং তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা সমূহই বিদ্রোহী মুজাহিদ গড়ে তোলার কেন্দ্র এবং সিপাহী বিদ্রোহের ইন্ধনদাতা ও এই আলিম সমাজ। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া বলেন

> If to fight for ones country, plan and mastermind wars against occupying mightly powers are patriots to their country and their succeeding generation will remember them as heroes.[২৯]

ফলে তাদের ক্ষোভের বহিঃ প্রকাশের শিকার হয়ে বহু আলিমদের হত্যা করা হয় এবং মাদ্রাসাসমূহ ধ্বংসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। রহিমিয়া মাদ্রাসার ইট পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দেয়া হয় এবং জায়গাটি জনৈক হিন্দুকে হস্তান্তর করা হয়।[৩০] আলিমদের পেছনে গোয়েন্দাদের লেলিয়ে দেয়া হয় এবং সন্ধানদাতাদের জন্য বিশেষ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।[৩১] ১৮৫৭ সালে সংঘটিত সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতা মুসলমানদের গৌরবোজ্জ্বল সভ্যতাকে পিছু হঠতে বাধ্য করেছিল। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহে হিন্দু মুসলিম যৌথ বিপ্লবের প্রয়াস ইংরেজদের আধুনিক যুদ্ধ ব্যবস্থার কাছে শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলে মুসলমান শ্রেণী ইংরেজদের কাছে "চিহ্নিত শত্রু" রূপে পরিগণিত হয়।

---

[২৮] হুসায়ন আহমেদ মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬০।

[২৯] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩৩।

[৩০] আবদুর রহমান, *তাহরীকে রেশমী রুমাল* (লাহোর: ক্লাসিক, ১৯৬০), পৃ. ১২।

[৩১] দেওয়ান নুরুল আনোয়ার হোসেন চৌধুরী, *আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিস্মৃত ইতিহাস*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১২০-১২১।

I.H. Qureshiএর মতে,

> The events of 1857 have a two-fold significance in the history of modern India.They dealt a final blow to the idea of the Mughal Empire and they put a seal on the decline of the Muslims in all walks of life.[৩২]

আলিমদের প্রতি নির্যাতন সম্পর্কে M.Burhanuddin Qasmi বলেন-

> The revolt of 1857 mentioned in the British History as Mutiny (Ghadar) of 1857 failed. Ulema, thereafter, became the main target of the British oppression and persecution.The word Maulvi was synonyms to rebel in the British eyes.out of 200000 people Martyred during in the revolt, more than 51200 were Ulema. Edward Timus admitted that in Delhi alone 500 Ulama were hanged to death.[৩৩]

১৮৬৫ সালে মাওলানা ইয়াহইয়া আলী, মাওলানা আহমদুল্লাহ আজিমবাদী, মৌলভী আব্দুর রহিম সাদিকপুরী, মাওলানা মুহাম্মদ জাফর থানেশ্বরী, মাওলানা ফজলে হক খায়রাবাদী, মুফতী ইনায়েত আহমেদ ও মাযহার করীম সহ বহু আলিমকে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসিত করা হয়। আলিম উলামা শ্রেণীর বাসগৃহ ক্রোক করে সেখানে সরকারি অট্টালিকা নির্মাণ করা হয়। সকল মুসলমানদের সরকারি চাকুরী হতে বরখাস্ত করা হয় এর অভিজাত মুসলমানদের স্থাবর অস্থাবর সম্পতি বাজেয়াপ্ত করা হয়।

১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ধাপ সম্পূর্ণ হয়। প্রায় দেড় শতাব্দীকাল ধরে চলে আসা গৌরবময় মুঘল ঐতিহ্যর প্রদীপ নিভিয়ে দিয়ে ভারতের ভাগ্য নির্ধারক বিধাতা হয়ে দাঁড়ায় ব্রিটিশরা। বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের ওপর যে হত্যা, ও নির্বাসন, অত্যাচারের খড়্গ নেমে আসে, আলিম শ্রেণী তার শিকার হন সবচেয়ে বেশী। তাদের অনেকেরই বন্দুকের গুলিতে তলোয়ারের আঘাতে জীবনাবসান হয়, অনেককে বাকী জীবন কাটাতে হয় আন্দামানে নির্বাসিত হয়ে সর্বপ্রকার জুলুম ও অবমাননা সয়ে। এতে করে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলমানদের জ্ঞান অর্জনের শেষ প্রদীপটিও নির্বাপিত হয়ে যায়। সাথে সাথে মুসলমানদের হাতে দুর্বল হলেও যে, কণামাত্র ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল, তাও লুপ্ত হয়ে যায়। শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে বন্দী করে নির্বাসনে পাঠান হয়। দিল্লীর লাল কেল্লা জনশূন্য হয়ে পড়ে। দিল্লী জামে মসজিদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়।[৩৪]

Barbara D.Metcalf এর বক্তব্য অনুযায়ী, দিল্লী, লাহোর, আগ্রা, জৌনপুর, গুজরাট, বিহার, মাদ্রাজ এবং বাংলার মুসলিম শিক্ষার কেন্দ্র গুলো বন্ধ হয়ে যায়। এর পেছনে মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক অভাব। কারণ এই প্রতিষ্ঠানগুলো মুঘল শাসকবৃন্দ এবং মুসলিম অভিজাতবৃন্দ কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদানে পরিচালিত হত।

---

[৩২] I. H. Qureshi, *The Struggle for Pakistan* (Karachi: University of Karachi, 1969), p. 17.

[৩৩] M. Burhanuddin Qasmi, *op. cit.*, p. 7.

[৩৪] Mufti Muhammad Zafiruddin Miftaahi, *Dar-al-Ulum Deoband: A Brief Account of Its Establishment and Background,* p. 8.

এছাড়া এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ওয়াকফ সম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়েও পরিচালিত হত। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এসবগুলো আয়ের উৎসই ক্রমান্বয়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

M.Burhanuddin Qasmi এর মতে

> The decline of the royal courts meant a blow to the patronage enjoyed by religious scholars and their institution of learning.Grants to madrassahs became smaller and increasingly unreliable, and existing endowments were confiscated by the new British rulers.[৩৫]

W. W. Hunter তুলে ধরেছেন কিভাবে ব্রিটিশরা দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোকে অর্থনৈতিক সহযোগিতা হতে বঞ্চিত করে যা ছিলো এ প্রতিষ্ঠানগুলোর চালিকা শক্তি। বেশীর ভাগ অভিজাত মুসলিম পরিবারই বিভিন্ন মাদ্রাসা মক্তবের সমগ্র খরচ বহন করতেন যেখানে তাদের ছেলেমেয়েরা অন্য দরিদ্র প্রতিবেশীদের সাথে একত্রে শিক্ষা গ্রহণ করত। এসব পারিবারিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম অভিজাত শ্রেণী ধ্বংসের সাথে সাথে বিলুপ্ত হতে থাকে। কারণ তাদের পৃষ্ঠপোষক নিজেরাই অর্থনৈতিক দুর্দশা ও দারিদ্র নিপতিত হয়েছিল। ইংরেজ শাসনামলে তারা যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিল তাতে ধর্মীয় শিক্ষার কোন স্থান ছিল না। মুসলমানদের দাতব্য সংস্থাগুলো হতে আয়কৃত অর্থ অপব্যবহার করা হচেছ; মুসলমানদের এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করেন Hunter কারণ, যদি এই অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় করা হত তাহলে তা মুসলমানদের উচ্চশিক্ষার নিমিত্তে পরিচালিত প্রতিষ্ঠানগুলোর পরিপোষণ অবশ্যই করত।

মুসলমানদের শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস করার পর ব্রিটিশরা মুসলমানদের ধর্মীয় জীবন এবং একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায় হিসেবে তাদের অস্তিত্ব ধ্বংসের প্রচেষ্টা চালায়। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে পাদ্রী এডমন্ড কর্তৃক কলকাতা থেকে সরকারি চাকুরীজীবীদের নামে একটি চিঠি ইস্যু করা হয়। এই চিঠিতে অখৃষ্টান চাকুরীজীবীদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে, এখন সারা ভারতের এক রাজত্ব (ইংরেজ রাজত্ব) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতএব এদেশের অধিবাসীদের সকলের ধর্ম এক হওয়া বাঞ্ছনীয়। অতএব সকলের খ্রিস্টান হওয়া উচিত। ইংরেজ শাসনামলে প্রচুর পরিমাণে খ্রিষ্টান মিশনারীর আগমন ঘটে। তারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, হাটে-বাজারে চিকিৎসালয়ে, কারাগারে যেখানেই সুযোগ পেতেন খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারে লেগে যেতেন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন প্রলোভন দেখিয়ে কখনো বা ভয়ভীতি প্রদর্শন করে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করা হত। ধর্ম প্রচারে তাদের কর্মকান্ডে সহজে অনুমান করা যেত যে, এর পেছনে ইংরেজ সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা রয়েছে। ইংরেজ সরকার কর্তৃক স্থাপিত মিশনারি স্কুলগুলোতে সুকৌশলে ভারতীয় ছাত্রদের খ্রিস্ট ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা হত। পয়গাম এ-মুহাম্মদ (২৩ অক্টোবর ১৮৯০) এর ভাষ্য অনুযায়ী, অগণিত দেশীয় মিশনারীর পাশাপাশি নয়শতাধিক ইউরোপীয় মিশনারী ভারতে ছিলেন, যারা খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের কাজে নিবেদিত ভাবে নিয়োজিত ছিলেন।

---

[৩৫] M. Burhanuddin Qasmi, *op. cit.*, p. 9.

১৮৫৭ সালে শুরুর দিকে জনগণের মধ্যে এটা প্রচার করা হয় যে, প্রভূ ব্রিটিশদের পক্ষে আছেন এবং তার সহায়তায়ই ব্রিটিশরা ভারতে জয়লাভ করছে। সাধারণ জনগণকে খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার জন্য প্ররোচিত ও উৎসাহিত করা হত। এই প্ররোচনার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয় শিক্ষাব্যবস্থাকে। ইংরেজগণ কর্তৃক শিক্ষাপাঠ্যক্রমের যে রদবদল করা হয় তার প্রভাবের ফলে মুসলমান শিক্ষার্থীগণ ইসলামের নিয়মনীতি, বিধিনিষেধ প্রভৃতির প্রতি অনীহা প্রদর্শন করতে থাকে। তারা ইসলামের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিকে অসভ্য, অসাংস্কৃতিক ও যুগোপযোগী নয় বলে আখ্যায়িত করে। উচ্চ পদস্থ ইংরেজ কর্মকর্তাগণ তাদের অধীনস্থ কর্মচারীদের খ্রিস্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত করার প্রচেষ্টা চালাতেন। স্যার সৈয়দ আহমদ খান বলেন, "মূর্খ, শিক্ষিত, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট সকল লোকই বুঝেছিল যে, আমাদের সরকার (ইংরেজগণ) ও তার অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য হল-জনগণের ধর্ম ও আচার অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করা, হিন্দু মুসলমান সহ সকলকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করা এবং তাদের দেশের প্রচলিত রীতিনীতি পালনে ব্রতী করা।"

ব্রিটিশ শাসকশ্রেণী ধর্মীয় প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে কাজী নিয়োগ দান বন্ধ করে দেয়। এই কাজীরা ছিলেন মুসলিম শরীআহ আইনের ভিত্তিতে পরিচালিত বিচারালয়ের প্রধান। ইংরেজ সরকারের চিন্তা ছিলো এই যে, বিচার বিভাগে কাজীদের নিয়োগ দান জারী রাখা হবে মুসলমানদের ধর্মীয় বিষয়ে গুরুত্বদানের ক্ষেত্রে মৌন সম্মতি দেবার সমার্থক। সিপাহী বিদ্রোহ পূর্ববর্তী কালে ইংরেজদের কর্তৃক মুসলিম বিচার ব্যবস্থায় আনীত বিভিন্ন পরিবর্তনগুলোও মুসলমানদের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হতে বঞ্চিত করে। Barbara d. Metcalf, এর মতে-

> Important issues such as the law of evidence and offenses against the state were based not on Islamic legal sources but on British law.[৩৬]

তাছাড়া ইংরেজদের দমন নির্বাসন ও গ্রেফতারের ফলে মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চল গুলোতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয় তার ফলে কেউ মারা গেলে দাফনকাফনের জন্য বা জানাযা পড়ানোর জন্য আলিম পাওয়া যেতনা। ইংরেজরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্য ধর্মাবলম্বীদের যেমন ক্ষেপিয়ে তোলে তেমনি মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য পুরনো ধর্মীয় বিবাদ যেমন শিয়া-সুন্নী দ্বন্দ্ব, কাদিয়ানী, আহলে কুরআন, আহলে হাদীস প্রভৃতি ফেরকার প্রচারে উস্কানি দেয়। ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী সহীহ তরীকা অনুসরণ নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়ে যায়। এক পন্থার অনুসারীরা অন্য পন্থার অনুসারীদের ভুল ভাবতে থাকে এবং বিচ্ছিন্নতাবাদ সৃষ্টি হয়। ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় বিপর্যয়ের এই অন্তিম লগ্নে মুসলিম ধর্মের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। ব্রিটিশদের অত্যাচারের ফলে একদিকে যেমন আলিম শ্রেণীকে হত্যা বা নির্বাসনের মাধ্যমে নির্মূল করা হচ্ছিল অন্যাদিকে তেমনি মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করে ইংরেজদের প্রণীত মুসলিম বিদ্বেষী পাঠক্রম শিক্ষাদান করে নতুনভাবে উলামা শ্রেণী গড়ে ওঠার পথ বন্ধ করা হচ্ছিল। এর ফলে মুসলিম সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কুসংস্কার বৃদ্ধি

---

[৩৬] Barbara d. Metcalf, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900* (New Jersey: Princeton University Press, 1982), p. 49.

পেতে থাকে এবং নানা বিজাতীয় রীতিনীতি অনুসৃত হতে থাকে এবং ভবিষ্যতে ভারতে ইসলামের মূল আকীদা ও আমল আখলাক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের বিলুপ্তি হবার আশংকা দেখা দেয়। জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে উত্তর ভারতের যে কয়েকজন উলামায়ে কেরাম টিকে ছিলেন তারা এ হতাশাগ্রস্থ অবস্থা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হন। তারা মহান আল্লাহর নির্দেশিত এবং রাসূল (সাঃ) প্রদর্শিত ইসলামের মৌলিক আর্দশের জ্যোতি পুনরায় মুসলমানদের মাঝে ছড়িয়ে দেবার মানসে ব্রতী হন। ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তা চেতনা দ্বারা এদেশের মুসলিম সমাজকে শিরক, বিদআত ও কুসংস্কারের কবল থেকে মুক্ত করে ইসলামকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত করে ভারতে ধর্মীয় পুনর্জাগরণ বা রেঁনেসা করাই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য। এমন এক কঠিন মুহূর্তে মুসলিম ঈমান ও আকীদা রক্ষায় জাতিকে সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্যোগ ছিল সময়ের দাবী।

৫.২ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল সীরাতে মুহাম্মাদীর তালিম ও বাস্তব জীবনে তা অনুশীলনে সচেষ্ট মুসলিম উম্মাহর বিনির্মাণ। যে শিক্ষা ও তালীমের নির্মাণ হবে পরকাল সম্পর্কে সূদৃর বিশ্বাস, বেহেশতের প্রতি অপরিসীম টান, জাহান্নামের প্রতি ভীতি, আল্লাহর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, আল্লাহর সমগ্র সৃষ্টির উপর মহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন, মানব কল্যাণের প্রতি নিবেদীত প্রাণ, অন্যায় অবিচারের প্রতি প্রতিবাদী, সততা, আমানতদারী, সহমর্মীতা ও আল্লাহর রাহে উৎসর্গ হবার চেতনায় উজ্জীবিত হওয়া এবং মানবতার অগ্রদূত রাসূল (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে জীবনের সকল কর্মকান্ড পরিচালনা করাই ছিল দারূল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য। এ শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদেরকে মনমানসিকতার দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদসহ সর্বপ্রকার বাতিলের বিরুদ্ধে সচেতন করা ও প্রতিকারের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সৈনিকরূপে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়।[৩৭] দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে মাওলানা কাসিম নানতুবী বলেন,

> As far as I know, this institution was founded after the defeat of Indians in the famous war of Independence of 1857. Therefore, sole objective of this Madrasa was to prepare freedom fighter that could compenstate the loss of Ghadar of 1857.[৩৮]

মোটকথায়, হারানো স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মোকাবেলা করা এবং খাঁটি ইসলামী শিক্ষা অর্জন ও বিস্তারের উদ্দেশ্য একটি সার্বজনীন ও আদর্শিক উদ্দেশ্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল দারুল উলুম দেওবন্দ। এক নজরে দারূল উলূম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য তুলে ধরা হল –

---

[৩৭] বদিউজ্জামান, *ইসমাইল হোসেন সিরাজী : জীবন ও সাহিত্য*, পৃ. ১৫।

[৩৮] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners of Malta* (Asiran'- E- Malta), Tr. by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications Pvt. Ltd., 2005), p. 7.

১. শিক্ষার ক্ষেত্রে সামগ্রিকতার সৃষ্টি এবং একটি গ্রহণযোগ্য ও যুযোপযোগী শিক্ষা ও সিলেবাসের মাধ্যমে মুসলিম শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণাঙ্গ ও সার্বজনীন করে তোলা এবং শিক্ষার প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে দীনের খেদমত করা।

২. আমল ও আখলাকের প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জীবনে ইসলামী ভাবাদর্শের প্রতিফলন ঘটানো।

৩. ইসলামের ব্যাপক প্রচার প্রসারের উদ্দেশ্যে এবং সমাজের চাহিদা নিরিখে যুগসম্মত কর্মপন্থা অবলম্বন এবং "খাইরুল কুরুন" বা সাহাবায়ে কিরামের যুগের মতো দানের চেতনা সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া।

৪. সরকারি প্রভাবমুক্ত থেকে ইসলামী শিক্ষা দীক্ষা ও চিন্তা চেতনার স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখা।

৫. দ্বীনী শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং সেগুলোকে দারূল উলুম দেওবন্দের সাথে সংশ্লিষ্ট করা।

৬. সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত এবং দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরির মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে দ্বীনী ইলম ও ইসলামী তাহযীব ও তমুদ্দুনকে প্রসারিত ও সংরক্ষণের জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

৫.৩ দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

শাহ ওয়ালী উল্লাহর দর্শনকে সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে এবং উপরের উদ্দেশ্য কে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সাধারণ ক্ষমার সুবাদে হযরত কাসেম নানতুবী ও হযরত রশীদ আহমদ গঙ্গোহী মুক্তভাবে কর্মক্ষেত্রে নেমে এসে কতিপয় বিষয়ে চিন্তা করতে থাকেন –

ক. কিভাবে এদেশের নিরীহ নির্যাতিত মানুষের কাঙ্খিত স্বাধীনতা সহজতর হবে?

খ. বিজাতীয় শিক্ষাও সংস্কৃতির কবল থেকে কিভাবে মুসলিম যুব সমাজকে রক্ষা করা যায়?

গ. সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী যে বিপুল সংখ্যক আলিম শাহাদাত বরণ করে তার অভাব মোচনের জন্য কিভাবে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত আত্মসচেতন, প্রত্যয়ী একদল আত্মত্যাগী সিপাহ সালার তৈরি করা যায়।

থানাভবন সরকারে অন্যতম প্রধান নেতা মাওলানা হযরত কাসিম নানতুবী ও তার চাচাত ভাই মাওঃ ইয়াকুব নানতুবী (রহ) এর শ্বশুরালয় ছিল উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ নামক একটি কসবায়। দেওবন্দ মফস্বল অঞ্চল হলেও এর পরিচিতি ছিল ব্যাপক। মুঘল আমল হতেই এই এলাকার দুই সম্ভ্রান্ত পরিবার উসমানী ও সিদ্দিকী এর যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল। সম্রাট আকবরের অমাত্য লুৎফুল্লাহ উসমানীর প্রাসাদ এবং হজরাতুল হুজ্ব ইব্রাহিমের খানকাহ নামে একটি দূর্গ ও এই এলাকায় মুঘল আমলে সমৃদ্ধির পরিচয় বহন করে। দিল্লীর সম্রাটগণ কর্তৃক এখানে ছয়টি সুরম্য মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল

মসজিদ-ই-ছাত্তা যেটি সূফী হযরত বাবা ফরিদউদ্দিন গঞ্জেশকর এর ধ্যানের স্থান হিসেবে পরিচিত ছিল। অবস্থানগত দিক হতে ও দেওবন্দের গুরুত্ব ছিল। রাজধানী দিল্লী হতে মাত্র নব্বই কিলোমিটার উত্তরপূর্বে অবস্থিত এই শহরটি শেরশাহের নির্মিত গ্রান্ড ট্রাংক রোডের নিকটবর্তী ছিল। মুঘল রাজকর্মচারীদের বাসস্থান থাকার ফলে এই শহরের উন্নয়নে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতাও বিদ্যমান ছিল। শহরের অর্ধেকের বেশী অধিবাসীই ছিল মুসলমান। ফলে ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতির অন্যতম কেন্দ্র ছিল দেওবন্দ।

মুঘল সাম্রাজের পতনের পর দেওবন্দ রোহিলা ও শিখ দস্যুদের লুণ্ঠনের শিকারে পরিণত হয়। সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে এর পরিণতি হয় আরও হৃদয়বিদারক। সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী বছরগুলোতে ব্রিটিশ যে সহিংসতা চালায় দেওবন্দ ও তার শিকার হয়। শহরের তিন চতুর্থাংশ লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হয়। তখনকার সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারগুলোর জমিজমা ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হয়। দেওবন্দের প্রতিবেশী তিনটি গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়। দেওবন্দের ওপর ব্রিটিশদের ক্ষোভের কারণ ছিল এখানকার অধিবাসীদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব। সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ববতী সময়েও এখানকার সম্ভ্রান্ত পরিবার গুলো সৈয়দ আহমদ ব্রেলভীর সংস্কার আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছিল। এই পরিবারগুলোর অন্যতম শেখ নিহাল আহমেদের রাড়িতে সৈয়দ আহমদ বেশ কয়েকবার আতিথেয়তা গ্রহণ করেছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাওঃ রফিউদ্দিনের পিতা এবং চাচাগণ বালাকোটের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তার তিনজন চাচা সে যুদ্ধে শহীদ হন।

দেওবন্দের নিকটবতী কসবাসমূহ যেমন নানতুহ, গঙ্গোহ এবং আম্বাতার উলেমাদের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর মাওঃ কাসিম নানতুবী দেওবন্দে তার এক আত্নীয়ের নিকট ছাত্র এবং শরণার্থী হিসেবে বাস করছিলেন। পরবর্তীতে তিনি ও তার চাচাত ভাই মুহাম্মদ ইয়াকুব নানতুবী দেওবন্দেরই মহল্লা দেওয়ান এর এক মুসলিম পরিবারে বিবাহ করেন। এসময় ভারতীয় মুসলমানদের বিদ্যমান দুরবস্থায় এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় নিয়ে দেওবন্দের সমসাময়িক উলেমা ইসলামিক ব্যক্তিত্বগণ অত্যন্ত চিন্তান্বিত হয়ে পড়েন। তাদের এসকল আলোচনার কেন্দ্রস্থল ছিল বিখ্যাত ছাত্তা মসজিদ। এসব উলেমাবর্গের মধ্যে অন্যতম মাওলানা রফিউদ্দীন ও হাজী মুহাম্মদ আবিদ প্রায় সময় মসজিদেই থাকতেন। হাজী আবেদ হোসাইন ছাত্তা মসজিদের ইমাম ছিলেন। মাওলানা কাসিম নানতুবী এসময় সাধারণ ক্ষমার সুবাদে প্রায়শই দেওবন্দে শ্বশুরালয়ে যেতেন। মসজিদের যাতায়াতের সুবাদে এদের মধ্যে পরিচয় হয় এবং সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাদের আলোচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় সচেতনতা জাগ্রত করা এবং তাদের জাতিগতভাবে ঐক্যবদ্ধ করা। এজন্য একটি ধর্মীয় এবং যুগোপযোগী শিক্ষার সমন্বয়কারী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা ছিল অপরিহার্য।

এরকম একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল স্বপ্নদ্রষ্টা ছিলেন মাওলানা কাসিম নানতুবী। তিনি এবং তার অন্যান্য সহকর্মী মাওলানা যুলফিকার আলী, মাওলানা ফজল আল রহমান, হাজী মুহাম্মদ আবিদ মাদ্রাসার নির্মাণের রূপরেখা ও এর আয়ের উৎস নিয়ে দীর্ঘদিন যাবত চিন্তাভাবনা করতে থাকেন। তবে একটি ব্যাপারে তারা সকলেই ঐকমত্য হন যে, এই প্রতিষ্ঠানের অবস্থান হবে দিল্লীতে নয় বরং দেওবন্দেই।

তবে দেওবন্দে মুসলিম শিক্ষাঙ্গন প্রতিষ্ঠার সময় কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতাগণ এই অঞ্চলে বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা অথবা এর অবস্থানগত বিষয়াদি বিবেচনা করে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তটি নেননি। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচিত হয়েছিল এক ঐশ্বরিক ইশারার মাধ্যমে। সপ্তদশ শতাব্দীতে শায়খ আহমদ সিরহিন্দ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সৈয়দ আহমদ ব্রেলভী উভয়েই মন্তব্য করেছিলেন যে দেওবন্দের মাটিতে রয়েছে “জ্ঞানের সুবাস” বা “খুশবু-ই-ইলম”। মুসলিম শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা নিয়ে মাওলানা কাসিম নানতুবী সহ তার সকল সহকর্মীগণ যখন চিন্তামগ্ন তখন তাদের মধ্যে অন্যতম আলিম মাওলানা রফি উদ্দীন স্বপ্নে দেখেন যে, পবিত্র কাবাগৃহ যেন দেওবন্দের বাগানে অবস্থিত; যেখানে হযরত আলী (রাঃ) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করছেন যার শিক্ষার্থীরা দেওবন্দী নামে পরিচিত হচ্ছে এবং মহানবী রাসূল (সাঃ) শিক্ষার্থীদের স্বহস্তে দুগ্ধপান করাচ্ছেন ও এ প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ধারণ করে দিচ্ছেন। এই স্বপ্নই দিকসন্ধানী উলেমাবৃন্দকে পথনির্দেশনা দান করে। এই অলৌকিক স্বপ্ন কেবল দারুল উলুম প্রতিষ্ঠার স্থান নির্বাচন সংক্রান্ত ঐশ্বরিক অনুমোদনই ছিলো না, বরং এটি এর প্রতিষ্ঠাতাদের তাদের মিশন বাস্তবায়নে গভীর আত্মবিশ্বাস দান করে এবং দেওবন্দেই বহুল আকাঙ্খিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা যোগায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার এলাকা নির্বাচিত হবার পর এটির আয়ের উৎস নিয়ে চিন্তাভাবনা শুর হয়। পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, মুসলিম শাসকদের রাজত্বকালীন সময়ে মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেমন মাদ্রাসা মক্তবগুলো স্থাপিত হতো শাসক, সরকার কর্তৃক এবং তারা ওয়াকফকৃত বা খাস জমি প্রদান করে এদের আয়ের উৎস ও তৈরি করে দিতেন যাতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো নির্বিঘ্নে শিক্ষাদান চালিয়ে যেতে পারে। অভিজাত সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারগুলো হতে স্থাপিত স্কুলগুলোর পৃষ্ঠপোষকতা এসব পরিবার হতেই দেয়া হতো।

কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা এমন একটি সময়ে হয়েছিল যে সময় প্রায় ছয়শতাধিক বছর ধরে চলা ইসলামী শাসনের গৌরবময় আলোক বর্তিকা সম্পূর্ণরূপে নির্বাপিত হয়েছিল। যে শাসনব্যবস্থা শিক্ষার বিষয়ে মুসলিম পরিবারগুলোকে চিন্তামুক্ত রাখতো সেই শাসন ব্যবস্থার পতন একটি বড় প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, সমসাময়িক কালে যেখানে মুসলমানদের জন্য ইসলামী আকীদা টিকিয়ে রাখা, মুসলমান হিসেবে পরিচয় প্রদান করাই জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ সেখানে এই বিরূপ পরিস্থিতিতে কে পরবর্তী প্রজন্মের মুসলিম শিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে এবং এর ব্যয়ভার নির্বাহ করবে? এই সমস্যার সমাধানকল্পে মাওলানা কাসিম নানতুবী এই নব্য প্রতিষ্ঠিতব্য শিক্ষাঙ্গনের আয়ের উৎস নির্ধারিত করেন যাতে পুরাতন নিয়মানুযায়ী কেবল দানকৃত জমির ওপর নির্ভর না করে একটি নতুন উৎস ও নির্বাচন করা হয় যার ভিত্তি ছিল জনসাধারণের

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত দান। সরকারি অথবা ভূ-স্বামী জমিদার শ্রেণীর অনুদান বর্জন করা হয় যাতে এই নব প্রতিষ্ঠিতব্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সরকারি অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বা প্রভাব হতে মুক্ত রাখা যায়।[৩৯]

জনগণের মাধ্যমে দান সংগ্রহ যার মাধ্যমে সূচিত হয় তিনি হলেন হযরত হাজী মুহাম্মদ আবিদ। এ প্রসঙ্গে হাজী ফজলুল হক মাওঃ নানতুবীর সাওয়ান ই মাখতুতাহ গ্রন্থে বলেন, "একদিন এশরাকের ওয়াক্তে (সূর্যোদয়ের বিশ মিনিট পূর্বে) হাজী সৈয়দ মুহাম্মদ আবিদ তার কাঁধের রুমালকে থলে বানিয়ে নিজের পকেট হতে তিন রুপি সেখানে রাখেন এবং একাই ছাত্তা মসজিদে মৌলভী মেহতাব আলীকে দানের আহ্বান জানান। মৌলভী সাহেব অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে ছয় রুপি দান করেন এবং তাঁর আশীর্বাদ প্রদান করেন। মৌলভী ফজল আল রাহমান বার রুপি দান করেন এবং গ্রন্থের মহান লেখক ছয় রুপি প্রদান করেন। সেখান হতে উঠে তিনি মৌলভী যুলফিকার আলীর কাছে যান এবং তিনি তৎক্ষণাৎ বার রুপি প্রদান করেন। সৌভাগ্যক্রমে, মৌলভী সৈয়দ জুলফিকার আলী সানী দেওবন্দীও সেখানে উস্থিত ছিলেন। তিনিও তাঁর পক্ষ হতে বার রুপি প্রদান করেন। ঐ স্থান হতে উঠে হাজী আবিদ মহল্লা আবুল বারকাতে পৌছাঁন। এ সময় পর্যন্ত দুইশত রুপী সংগৃহীত হয়েছিল যা সন্ধ্যায় তিনশত রুপিতে উন্নীত হয়। এ খবর সর্বত্র বাতাসের বেগে ছড়িয়ে পড়ে এবং শহরে আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল শুক্রবার ২রা জিলক্বদ হিঃ ১২৮২।[৪০]

দ্বীনী শিক্ষার চর্চার জন্যে জনগণের এই স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ উদ্দীপনা দেখে হযরত আবিদ হুসাইন মীরাটে অবস্থানরত হযরত মাওলানা কাসিম নানতুবী (রাঃ) কে সেই মর্মে চিঠি লিখলেন যে আমরা মাদরাসার কাজ শুরু করে দিয়েছি, আপনি অবিলম্বে চলে আসুন। মাওলানা নানতুবী এর প্রেক্ষিতে মৌলভী মাহমুদ (রহঃ) কে শিক্ষক হিসেবে দেওবন্দে প্রেরণ করেন। ৩০ শে মে ১৮৬৬ খ্রিঃ ১৫ মুহাররম ১২৮৩ হিজরীতে হযরত শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দীকে ছাত্তা মসজিদ প্রাঙ্গনে একটি ডালিম গাছের ছায়ায় পাঠদানের মাধ্যমে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা ও সূচনা হয়। কাকতালীয়ভাবে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়ের নাম ছিলো মাহমুদ।[৪১]

উসূলে হাশতেগানা বা দারুল উলুম দেওবন্দ পরিচালনার মূলনীতিটি পরাধীন ভারতে ধ্বসে পড়া ইসলামী শিক্ষাকে পুনরুজ্জীবিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণচাঁদার ভিত্তিতে শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নতুন ধারার সূচনা করেছিল। সমস্যা ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে সে ধারাকে সুশৃঙ্খলভাবে টিকিয়ে রাখার এবং তার অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে এসকল দ্বীনী প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে দারুল উলুম দেওবন্দের জন্য বিদগ্ধ আলিমগণের চিন্তার আলোকে প্রণয়ন করা হয়েছিল একটি নীতিমালা, ইতিহাসে ঐ নীতিমালাটিই উসুলে হাশতেগানাহ বা মূলনীতি অষ্টক নামে পরিচিত। উসুল হাশতেগানাহ'র রচয়িতা মহান শিক্ষা সাধক ও সংস্কারক কাসেম-উল-উলুম ওয়াল খায়বাত হযরত কাসেম নানতুবী (রহঃ) উক্ত উসুলে হাশতেগানাহ রচনা করেন।

---

[৩৯] Syed Mahbub Rizvi, *op. cit.*, p. 114.
[৪০] *Ibid.*, 114-115.
[৪১] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামা ই হক*, ভলি. ১ (দিল্লীঃ আল জামিয়াঁত বুক ডিপো, ১৯৪৪), পৃ. ৬৬।

মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যয় নির্বাহের জন্য জনগণের স্বেচ্ছামূলক চাঁদা অথবা দানের পদ্ধতিকে আয়ের উৎস হিসেবে গ্রহণ করার প্রতি জোর দেন। তাঁর গৃহীত এই আটটি মূলনীতি দারুল উলুম কে কেন্দ্র করে প্রণীত হলেও তিনি যে কোন মাদ্রাসা বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই সকল মূলনীতি সমূহ গ্রহণ করা উচিত বলে মনে করেন। এই মূলনীতি সমূহ নিম্নরূপ-

১. এর সর্বপ্রথম মৌলনীতি হল, মাদ্রাসার ভারপ্রাপ্ত ও কার্যনির্বাহক দায়িত্বপ্রাপ্ত গণ যতটা সম্ভব হয় অর্থসাহায্য বা দান সংগ্রহ এবং তা বৃদ্ধির জন্য প্রচেষ্টা চালাবেন। তারা নিজের যেমন ব্যক্তিগতভাবে এ প্রয়াস চালাবেন এবং অন্যদের এতে উৎসাহিত করবেন। মাদ্রাসার শুভাকাঙ্খীদের ও এই ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন থাকতে হবে।

২. মাদ্রাসার শুভাকাঙ্খীগণ মাদ্রাসার ছাত্রদের খাদ্য প্রদানের প্রক্রিয়া চলমান রাখতে সচেষ্ট থাকবেন। মাদ্রাসার ছাত্র বৃদ্ধির সাথে খাদ্যের পরিমাণও বাড়াতে হবে।

৩. মাদ্রাসার উপদেষ্টাগণকে মাদ্রাসার উন্নতি অগ্রগতি এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙখলা ব্যবস্থাপনার দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠায় একগুঁয়েমী যেন কারো সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথাসম্ভব মুক্তমনে পরামর্শ দিতে হবে এবং অগ্রপশ্চাতে মাদ্রাসার শৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। নিজের মতামত প্রতিষ্ঠার মনোবৃত্তি থাকতে পারবে না। এ জন্য পরামর্শ দাতাকে মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে তার মতামত গ্রহণীয় হওয়ার ব্যাপারে অবশ্যই আশাবাদী হওয়া যাবেনা, পক্ষান্তরে শ্রোতাদের মুক্তমনে ও সৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তা শ্রবণ করতে হবে। অন্যের মত যুক্তিযুক্ত ও বোধগম্য হলে নিজের মতের বিপরীত হলেও তা গ্রহণ করার মনোবৃত্তি থাকতে হবে। আর মুহতামিম বা পরিচালকের জন্য পরামর্শ সাপেক্ষে সম্পাদনীয় বিষয়সমূহ উপদেষ্টাগণের সাথে পরামর্শ করে নেওয়া অবশ্যই জরুরি থাকবে। তবে মুহতামিম সাহেব নিয়মিত উপদেষ্টাদের থেকেও পরামর্শ গ্রহণ করতে পারবেন। উপদেষ্টা পরিষদের সকলের সাথে পরামর্শ করার সুযোগ না হওয়ার কারণে প্রয়োজন মাফিক উপদেষ্টা পরিষদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সদস্যদের সাথে পরামর্শক্রমে কাজ করে ফেলবেন যাতে অন্যদের অসন্তুষ্ট হওয়া উচিত হবে না। তবে যদি মুহতামিম সাহেব কারো সাথেই পরামর্শ না করেন তা হলে অবশ্যই উপদেষ্টা পরিষদ আপত্তি করতে পারবেন।

৪. মাদ্রাসার সকল মুদাররিসকে অবশ্যই সমমনা ও একই চিন্তা চেতনার অনুসারী হতে হবে। সমকালীন আলিমদের মতো নিজ স্বার্থ প্রতিষ্ঠা ও অন্যকে হেয় প্রতিপন্ন করার দুরভিসন্ধিতে লিপ্ত হওয়া যাবেনা।

৫. পূর্ব থেকে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারিত রয়েছে কিংবা পরবর্তী সময়ে পরার্মশক্রমে যে পাঠ্যসূচি নির্ধারণ করা হবে তা যেন সমাপ্ত হয়, সে হিসেব মতে পাঠদান করতে হবে।

৬. এ প্রতিষ্ঠানের জন্য যতদিন কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা না করা হয় ততদিন পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি নির্ভরতার বরকতে কুদরতীভাবে চলতে থাকবে ইনশাআল্লাহ। কিন্তু যদি কোন স্থায়ী আয়ের ব্যবস্থা করা হয় তা হলে আল্লাহ্মুখী হওয়ার মূল পুঁজি হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং গায়েবীগণের মাঝে পারস্পরিক বিদ্বেষ ও কলহ দেখা দিবে। মোটকথা আমদানী ও ভবন নির্মাণের বিষয়ে অনেকটাই অনাড়ম্বরতা ও উপায়, উপকরণহীন অবস্থা বহাল রাখার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৭. সরকার ও আমীর উমরাহদের সংশ্লিষ্টতা ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর বলে মনে করা হয়। যথাসম্ভব এমন ব্যক্তিদের চাঁদা প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক বরকতময় হবে বলে মনে হচ্ছে যাদের চাঁদা দানের মাধ্যমে সুখ্যাতি লাভের প্রত্যাশা থাকবেন না। বস্তুত চাঁদাদাতাগণের নিয়ত প্রতিষ্ঠানের জন্য অধিক স্থায়িত্বের কারণ হবে বলে মনে হয়।

৫.৪ দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী

হযরত মাওলানা কাসেম নানতুবী (রহঃ) (১৮৩৩-১৮৮০ ইং)

হযরত কাসেম নানতুবী (রহ.) সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত নানুতা নামক গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শা'বান কিংবা রমজান মাসে ১২৪৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৩২ ইংরেজী গণের জানুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্ম তারিখ অনুসারে তাঁর নাম রাখা হয় খুরশীদ হুসাইন, আর আসল নাম রাখা হয় কাসিম। পরে তিনি কাসিম নানতুবী নামেই প্রসিদ্ধ হন। তাঁর পিতার নাম শায়খ আসাদ আলী সিদ্দীকী (রহঃ), তিনি পিতা- মাতা উভয়ের দিক হতে সিদ্দীকী বংশদ্ভুত ছিলেন। বংশ পরম্পরা ৪৪ তম পুরুষের মাধ্যমে "কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবুবকর সিদ্দীক (রাঃ)" এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়েছে। শৈশব কাল থেকেই তিনি তীক্ষ্ণ মেধাবী, চরিত্রবান, সাহসী উন্নত মনোবল সম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ছিলেন। নানুতার মক্তবেই কুরআন পাঠ শিক্ষা করেন এবং প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন। তারপর দেওবন্দ গিয়ে মাওলানা মাহতাব আলী (রহঃ) এর নিকট আরবী ও ফারসীর বিভিন্ন কিতাব অধ্যয়ন করেন। ১২৫৯ হিজরীতে তিনি মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ) এর সাথে দিল্লী চলে আসেন এবং এখানে তাঁর কাছে উক্ত কলেজের সিলেবাসভুক্ত প্রায় সমস্ত কিতাবই সম্পন্ন করেন। এখানে থাকাকালে ১২৬১ হিজরীতে হযরত রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এর সাথে মিলিত হন এবং উভয়ে একত্রে তাঁর নিকট অধ্যয়ন করেন। এরপর তিনি শাহ আবদুল গণি মুহাদ্দিস এর নিকট সুনানে আবু দাউদ ব্যতীত সিহাহ সিত্তাহর সকল গ্রন্থ ও মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরীর কাছে সুনানে আবু দাউদ অধ্যয়ন করেন। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। বিজ্ঞান ও দর্শনের মত কুরআন ও হাদীস অধ্যয়নেও তিনি স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দান করেন। তিনি সহীহ বুখারীর শেষ পাঁচ পারার টীকা রচনা করেন যাতে তিনি ইমাম বুখারী ও ইমাম আবু হানীফারও সমালোচনা করেন। তিনি এই অংশের টীকায় কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি এবং যৌক্তিক ও অকাট্য প্রমাণ দিয়ে ইমাম আবু হানীফার ওপর আরোপিত সমালোচনার খন্ডন করেন এবং হানাফী মাযহাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এটি হাদীস শাস্ত্রে তার অসাধারণ বুৎপত্তির স্বাক্ষর হিসেবে প্রমাণিত হয়। তিনি হাজী

ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) নিকট বায়আত হন এবং খিলাফত লাভ করেন। প্রথমে দিল্লী কলেজে শিক্ষকতার মাধ্যমে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেন এবং পরে মীরাটে মুন্সী মুমতাজ আলী মুদ্রণালয়ে টীকা লিখন কার্যে যোগদান করেন।

তিনি ছাত্রজীবন থেকেই অত্যন্ত খোদাভীরু, মুত্তাকী ও পরহেজগার ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (র.) এর হাতে বাইয়্যাত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত লাভ করেন। ১৮৫৭ সালে যখন পাশ্চাত্যের লোভাতুর হায়েনারা নিজেদের হীনস্বার্থ চরিতার্থ করতে উপমহাদেশের সকল অধিবাসী বিশেষ করে মুসলমানদের উপর চতুর্দিক হতে সাঁড়াশি আক্রমণ চালাচ্ছিল, তখন তিনি অস্ত্র হাতে তাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং থানা ভবন ও শ্যামলীর রণাঙ্গনে নেতৃত্বদান করেন। ইংরেজদের কুটিল ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে যখন মুসলমানদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, তদস্থলে চাপিয়ে দেয়া বিজাতীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভ্রান্ত হতে শুরু করে মুসলিম যুবসমাজ, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী চেতনায় উদ্বুদ্ধকারী উলামা সমাজ শিকার হয় ইংরেজদের নির্মম হত্যাযজ্ঞের। এমনি এক কঠিন মুহূর্তে, ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ঈমান-আকীদার বিকৃতির ঘৃণ্য প্রয়াস রোধে, তিনি কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীর আলোকে যুগ জিজ্ঞাসার জবাব প্রদান করে, এক নতুন আঙ্গিকে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতাদর্শ তুলে ধরেন ও এর সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ও স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত ও দ্বীনি চেতনায় উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সিপাহসালার তৈরীর মহান উদ্দেশ্যে মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান "দার"ল উলূম দেওবন্দ" প্রতিষ্ঠা করেন। যা ছিল তাঁর স্বপ্নেরই বাস্তবায়ন। তিনি ছাত্রজীবনে একবার স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি কাবা ঘরের ছাদে বসে আছেন আর তাঁর পায়ের নিচে থেকে হাজার হাজার নদী প্রবাহিত হচ্ছে। মাওলানা মামলুক আলী (রহ.) এর ব্যাখ্যা করেন যে, ভবিষ্যতে তোমার দ্বারা ইসলামী জ্ঞানের প্রসার হবে। বস্তুত হয়েছেও তাই। পৃথিবীর অধিকাংশ ভূখন্ডের লোক কাসেম নানতুবী (রহ.) এর ইলমী ফয়েজ লাভে ধন্য হয়েছে। আমৃত্যু তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে পাঠদান সহ বিভিন্ন মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠায় নিয়োজিত ছিলেন।

এই অনুসরণীয়, অনুকরণীয় মহান আদর্শবান ব্যক্তি এপ্রিল ১৮৮০ খ্রিঃ ৪৯ বছর বয়সে এই ক্ষণস্থায়ী জগৎ থেকে বিদায় নিয়ে পরম বন্ধু মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে মিলিত হন। দারুল উলূম দেওবন্দের অদূরে মাকবারায়ে কাসেমীতে মাগরিবের নামাজের পর তাঁকে সমাহিত করা হয়।

হযরত মাওলানা ইয়াকুব নানতুবী (রহ.) (১৮৩৪ -১৮৮৫ইং)

মাওলানা ইয়াকুব নানতুবী (রহ.) ১২৪৯ হিঃ/১৮৩৪ সালে নানুতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ)। তিনি ছিলেন দিল্লী সরকারি কলেজের আরবী বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। মাওলানা কাসেম নানতুবী ও ইয়াকুব নানতুবী (রহঃ) একই বংশধারার লোক ছিলেন। বয়সেও অল্প ছোট বড় ছিলেন। তিনি ১২৫৯ হিজরীতে পিতার সাথে দিল্লীতে আসেন এবং সেখানে তিনি কাসেম নানতুবী (রহঃ) এর সাথে স্বীয় পিতার নিকট অধ্যয়ন করেন ও দিল্লী সরকারি কলেজ থেকে আরবী বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রী লাভ

করেন। শাহ আব্দুল গণি (রহঃ) এর নিকট হতে তিনি হাদীসের সনদ লাভ করেন। তিনি অনেক বড় সুপ্রাজ্ঞ আলিম ছিলেন। ইলম-আমল ও মেধায় তিনি মাওলানা কাসিম নানতুবী ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (রহঃ) এর সমপর্যায়ের ছিলেন। সর্বপ্রথম তিনি ইংরেজ সরকারের শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর পদে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। তাঁর বেতন ছিল একশত পঞ্চাশ টাকা। কিন্তু দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর তিনি এই দেড়শত টাকা বেতনের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে সেখানে চলে আসেন এবং মাত্র পঁচিশ টাকা বেতনে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সদরুল মুদাররিসীন পদে সমাসীন হন। ১২৮৩ হিঃ/১৮৬৭ খ্রিঃ হতে ১৩০২ হিঃ/১৮৮৬ খ্রিঃ পর্যন্ত তিনি এ পদে বহাল থাকেন। তিনি ১২৮৩ হিঃ/১৮৬৭ খ্রিঃ হতে ১৩০১ হিঃ/১৮৮৫ খ্রিঃ পর্যন্ত দারুল উলুমের ফতওয়া বিভাগের প্রধান মুফতীও ছিলেন। যাহিরী ও বাতিনী জ্ঞান বিজ্ঞানে তিনি শাহ আবদুল আযীযের স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। এছাড়াও তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজীরে মক্কী (রহঃ) নিকট বায়আত হন এবং খিলাফত লাভ করেন। তাঁর প্রসিদ্ধতম ছাত্রদের মধ্যে হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (রহঃ), শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান (রহঃ) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ইন্তেকাল করেন।

মাওলানা যুলফিকার আলী (রহঃ) (১৮১৯-১৯০৪ ইং)

হযরত মাওলানা জুলফিকার আলী সাহেব (রহ.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট আলিম ও দেওবন্দ মাশায়েখদের অন্যতম। তিনি ১৮১৯ খ্রিঃ দেওবন্দে জন্মগ্রহণ করেন। দিল্লী এ্যারাবিক কলেজে মাওলানা মামলূক আলী (রহঃ) এর নিকট এবং মুফতি সদরুদ্দিন সাহেব (রহঃ) এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। শিক্ষা সমাপ্তের পর তিনি প্রথমে বেনারস কলেজে অধ্যাপক হিসেবে যোগদান করেন ও কয়েক বছর পর পদোন্নতি হয়ে কলেজসমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হন। চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করার পরও তিনি অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিয়োজিত থাকেন। অলংকারশাস্ত্র ও আরবী সাহিত্যে তাঁর বিশেষ প্রাজ্ঞতা ছিল এবং উর্দু ও ফারসী ভাষায়ও তিনি বিশেষ বুৎপত্তি অর্জন করেন। তাঁর রচিত কিতাব সমূহ ছিল-ইতরুল ওয়ারদা, আল ইরশাদ, তাসহীলুদ্ দিরাসা, তাস্হীলুল বয়ান, আত-তালীকাত, মিয়ারুল বালাগাত, আল-হাদ্য়াতুস সন্নিয়াহ প্রভৃতি। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠা, তাঁর অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও পরামর্শের ক্ষেত্রে তিনি অগ্রগামী ছিলেন এবং দীর্ঘ চল্লিশ বছর উক্ত প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ছিলেন। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র ও পরবর্তীতে দেওবন্দ আন্দোলনের দিশারী শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান (রহঃ) ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ৮৫ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। মাওলানা কাসিম নানতুবী (রহঃ) এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা ফজলুর রহমান উসমানী (রহঃ) (১৯০৭ ইং)

হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান উসমানী (রহঃ) দেওবন্দের উসমানী শায়খদের মধ্যে অন্যতম। তিনি হযরত উসমান (রা.) এর বংশধর ছিলেন। দিল্লী এ্যারাবিক কলেজে মাওলানা মামলুক আলী (রহঃ) এর নিকট তিনি অধ্যয়ন করেন। তিনি অত্যন্ত উঁচুমাপের একজন আলিম ছিলেন। ফতহুল মূলহিমের রচয়িতা আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহঃ) ছিলেন তাঁরই সুযোগ্য সন্তান। শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পর তিনি অধ্যাপনা শুরু করেন।

এরপর এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের মাদ্রাসা সমূহের ডেপুটি ইন্সপেক্টর হন। দারুল উলুমের আর্থিক সহযোগিতা দানকারী ও প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। এবং শেষ জীবন পর্যন্ত মজলিসে শুরার রুকন ছিলেন। তিনি স্বীয় উত্তরাধিকারী হিসেবে মাওলানা আজীজুর রহমান দেওবন্দী, মাওলানা হাবিবুর উসমানী, মাওলানা শাব্বির আহমদ উসমানী (রহঃ)- এর ন্যায় বিশ্ব বরেণ্য আলিম রেখে ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে ইন্তেকাল করেন।

হাজী আবিদ হুসাইন (রহ.) (১৮৩১-১৯১২ ইং)

হাজী সাহেব (রহ.) দেওবন্দের একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে ১৮৩৪ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত খোদাভীরু, পরহেজগার ও বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন। জীবনের শুরু থেকেই তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনায় মনোনিবেশ ছিল। সাহারানপুর জেলার অন্তর্গত রামপুরের একজন বিশিষ্ট বুযুর্গ মিয়াজী করিম বখশ (রহঃ) এর হাতে তিনি চিশতিয়া তরীকায় বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং খেলাফত লাভ করেন। এছাড়াও তিনি হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহঃ) এর খলিফা ছিলেন। দারুল উলূম দেওবন্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন এবং প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম চাঁদাদানকারী ও চাঁদা উত্তোলন কারী ছিলেন। তিনি দারুল উলূমের রুকন বা প্রেসিডিয়াম সদস্য হওয়া ছাড়াও তাঁর উপর তিন তিনবার ইহতিমামের দায়িত্ব অর্পিত হয়। প্রথমবার ভিত্তি স্থাপনের দিন থেকে ১২৮৩ হিঃ/১৮৬৭ খ্রিঃ মোতাবেক ১২৮৪ হিঃ/১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। আর দ্বিতীয়বার ১২৮৬ হিঃ/১৮৭০ খ্রিঃ থেকে ১২৮৮ হিঃ/১৮৭২ খ্রিঃ পর্যন্ত। এবং তৃতীয়বার ১৩০৬ হিঃ/১৮৮৯ খ্রিঃ থেকে ১৩১০ হিঃ/১৮৯৩ খ্রিঃ পর্যন্ত। দেওবন্দের জামে মসজিদ তারই প্রচেষ্টা ও মেহনতের ফসল। শেষ অবস্থায় অত্যাধিক ব্যস্ততার চাপে তিনি পরিচালনার দায়িত্ব থেকে অবসর নেন। তাঁর প্রভাব ও সম্মানের দ্বারা দারুল উলূমের অনেক উন্নতির পথ খুলে যায়। অবশেষে এই মহান ব্যক্তি ৮১ বছর বয়সে ১৯১২ সালে ইন্তেকাল করেন। মাকবারায়ে কাসেমীর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়।

মাওলানা রফীউদ্দিন (রহ.)(১৮৩৬ - ১৮৯২ ইং)

হযরত রফীউদ্দিন (রহ.) ১৮৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অত্যন্ত বুযুর্গ ও খোদাভীরু ব্যক্তি ছিলেন। শাহ আব্দুল গণী মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহ.) এর অন্যতম খলিফা ছিলেন। কিতাবী এলেমে যদিও পন্ডিত ছিলেননা কিন্তু প্রশাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী ছিলেন। দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর যাবৎ দারুল উলূমের মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সময়ে দারুল উলূমের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়। প্রথম পর্যায়ের বিল্ডিংগুলোর অধিকাংশই তাঁর মুহতামিমের আমলে নির্মিত। ১২৯২ হিজরীতে যখন নওদারার ইমারতের ভিত্তি স্থাপন আরম্ভ করা হয় তখন তিনি স্বপ্নে দেখতে পান যে, নবী করীম (সঃ) ভিত্তি স্থাপনের ঐ নির্ধারিত স্থানে তাশরীফ আনয়ন করেছেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বলেছেন যে, এই জায়গাটুকু খুবই ছোট অতঃপর আপন লাঠি মোবারক দ্বারা নিজেই সীমানা ও বিল্ডিং এর নকশা এঁকে দিলেন এবং বললেন এই নকশা মত নির্মাণ করা চাই। অতঃপর উক্ত নকশার উপরেই নির্মাণ কার্য শুরু করা হয়। শাহ রফীউদ্দীনের খলিফাদের

মধ্যে মুফতী আযীযুর রহমান এবং মাওলানা সাইয়্যিদ মুরতাযা হাসান ছিলেন অন্যতম। তিনি হাজী আবিদ হুসাইন এর পর দারুল উলুমের মুহতামিমের পদ অলঙ্কৃত করেন। তিনি হিজরী ১২৮৪-১২৮৫ পর্যন্ত একবার এবং হিজরী ১২৮৮-১৩০৬ পর্যন্ত দ্বিতীয়বার এই দুই মেয়াদে মুহতামিমের দায়িত্ব পালন করেন।

এই মহান ব্যক্তি যার মধ্যে দ্বীনদারী ও আমানতদারীর সাথে সাথে প্রশাসন পরিচালনার নযীরবিহীন যোগ্যতার সমাবেশ ঘটেছিল তিনি ১৩০৬ হি. হিজরতের উদ্দেশ্যে মদীনা মুনওয়ারার শরীফে তাশরীফ নিয়ে যান, এবং সেখানেই ২ বছর পর ১৩০৮ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল বাকীতে সমাধীস্থ করা হয়।

৫.৫ শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশে দেওবন্দ মাদ্রাসার অবদান

দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে ভারতবর্ষে ইসলামী সভ্যতার শুদ্ধিকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তা কেবল মাত্র একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। দারুল উলুমের সূচনালগ্ন হতেই এটি ভারতের গতানুগতিক মাদ্রাসাগুলো হতে ব্যতিক্রম ছিলো। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ প্রচলিত গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ব্রিটিশদের প্রচলিত শাখা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পদ্ধতির অনুসরণ করেন। ব্রিটিশদের স্বনামধন্য কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলোর নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন অঞ্চলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হতো যার পাঠ্যক্রম এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থা মূল প্রতিষ্ঠানটি দ্বারা পরিচালিত হত। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতাগণ এই পদ্ধতি সম্পর্কে পরিচিত ছিলেন কারণ তাদের মধ্যে অনেকেই সরকারি চাকুরীজীবী ছিলেন এবং তিনজন ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডেপুটি ইন্সপেক্টর। তারা এসকল ব্রিটিশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনার পদ্ধতিকে কাছ হতে নিরীক্ষণ করেন এই পদ্ধতিকে কাজে লাগাতে মনস্থ করেন।[৪২] এভাবে প্রতিষ্ঠার পর দেওবন্দ একটি আরবী ইসলামিক মাদ্রাসা রূপে পরিচিত হলে ও পরবর্তীতে এটি "উম্মুল মাদারিস" রূপে পরিচিত হয়। দেওবন্দ মাদ্রাসার নেতৃত্বে কিছুদিনের মধ্যেই সাহারানপুরে আরেকটি মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হয়। স্বল্প কালের ভেতরে এভাবে একের পর এক মাদ্রাসার স্থাপনা হতে থাকে যার মধ্যে মানবা-উল-উলুম, মুরাদবাদে মাদ্রাসা শাহী এবং দার উল-উলুম দ্বারভাঙ্গার মাদ্রাসা-ই-ইমদাদিয়া ছিলো এদের মধ্যে অন্যতম। ১৮৮০ সালে যেখানে এরকম ১২টি মাদ্রাসা ছিলো এ শতকের শেষপ্রান্তে এর সংখ্যা তিনগুণে উন্নীত হয়। এ সবগুলো মাদ্রাসাই দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে কোন না কোন প্রকারে জড়িত ছিল এবং সবগুলোই মাওলানা কাসিম নানতুবীর জীবদ্দশায়ই স্থাপিত হয়েছিল।

দারুল উলুম এর প্রতিষ্ঠা লগ্নে যেমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের অপ্রতুলতা ছিল তেমনি ছিল শিক্ষাদানের স্থানাভাব, যে কারণে এটি ছাত্তা মসজিদের ডালিম গাছের ছায়ায় মাত্র একজন ছাত্র ও একজন শিক্ষক নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু অতি সত্বর যেমন জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়তে থাকে, তেমনি বাড়তে থাকে, এতে

[৪২] Barbara D. Metcalf, *op. cit.*, p. 30.

স্বেচ্ছাদানের পরিমাণ। মোল্লা মাহমুদকে মাত্র ১৫ টাকা মাস মাহিনায় নিয়োগ করা হয়েছিল, তার জ্ঞান ও মেধার তুলনায় এই সম্মানী ছিল অত্যন্ত অপ্রতুল। এই স্বল্প বেতন প্রদানের কারণ ছিল প্রতিষ্ঠানের আর্থিক তহবিলের অনটন।[৪৩] কিন্তু প্রতিষ্ঠার স্বল্প কালের মধ্যেই দেওবন্দ মাদ্রাসা যে জনপ্রিয়তা ও সাফল্য অর্জন করে তা ছিল এর প্রতিষ্ঠাতাদের আশাতীত। মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা লগ্নে এটি ছিল ধারনাতীত, যে এতো দ্রুত এর ছাত্র সংখ্যা এবং চাঁদার পরিমাণ এতোটা বৃদ্ধি পাবে। সূচনায় স্বল্প কিছু ছাত্রের আগমন প্রতিষ্ঠাতাদের মনোবলকে কমিয়ে দিয়েছিল আর তারা ভেবেছিলেন যে, শুধু আরবী ভাষায় ইসলামী জ্ঞান শিক্ষার জন্য কজন ছাত্রই আর জড়ো হবে? কিন্তু আল্লাহর অপরিসীম কৃপায় মাদ্রাসার কার্যক্রম ভালোভাবে শুরু হবার পূবের্ই পাশ্ববর্তী অঞ্চল এবং দূরের অঞ্চল গুলো হতে এমনভাবে ছাত্রের আগমন ঘটতে থাকে যেনো তারা এতদিন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল। সাহারানপুর এবং তার আশপাশের অঞ্চল ভারতের পশ্চিমাঞ্চল সহ পাঞ্জাব, কাবুল এবং সুদুর আফগানিস্তান হতেও ছাত্রদের আগমন ঘটতে থাকে।

প্রতিষ্ঠানের ছাত্র বৃদ্ধির সাথে সাথে শুভানুধ্যায়ীদের চাঁদার পরিমাণও বাড়তে থাকে। ইতোপূর্বে যারা চাঁদা দেননি তারাও এই কল্যাণকামী প্রতিষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহে অকুণ্ঠচিত্তে এগিয়ে আসেন। দেওবন্দের বাইরের অঞ্চলের মুসলমানদের কাছ হতেও আর্থিক সহায়তা আসতে থাকে। প্রতিষ্ঠার কিছুকাল পর যখন মাদ্রাসার ভবন নির্মাণ শুর“ হয় তখন শুধু উত্তর ভারতই নয়, পাঞ্জাব, বিহার এমনকি দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল তথা হায়দ্রাবাদ হতেও চাঁদা সংগ্রহ ও মাদ্রাসার উন্নয়নে সহায়তা আসতে থাকে।[৪৪]

ফলে ছাত্রদের থাকা খাওয়ার সমস্যার সমাধান হয় এবং তারা চিন্তামুক্ত স্বাধীনচিত্তে কুরআন হাদীসের জ্ঞান অর্জনে মনোনিবেশ করে যা মাদ্রাসার সুনাম এবং সমৃদ্ধি বাড়িয়ে তোলে। মাদ্রাসার যে সকল শুভানুধ্যায়ীগণ এযাবতকাল পর্যন্ত চাঁদা দিয়ে আসছিলেন তারাও এর উন্নতি দেখে অভিভূত হন এবং দানের পরিমাণ বৃদ্ধি সহ তাদের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের ও এ পূণ্যকর্মে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর উদ্দেশ্য ছিল মৌলিক ধর্মীয় জ্ঞানের প্রচার এবং এই জ্ঞানদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পেশাদারী জীবনের গঠনের প্রশিক্ষণ দান যা ছিল দার“ল উলুম দেওবন্দের মূল উদ্দেশ্যের সাথে এক অভিন্ন। অন্যান্য স্কুল গুলোর মধ্যে হাজী শিহাবুদ্দীন কর্তৃক মুজাফফরনগরের কায়রানায় একটি স্কুল স্থাপিত হয় যার শিক্ষকগণ ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার গ্রাজুয়েট। বুলন্দশহর জেলার গালৌটিতে মুন্সী সৈয়দ মেহেরবান আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় দেওবন্দের গ্রাজুয়েট ছাত্রবৃন্দের তত্ত্বাবধানে আরেকটি স্কুল গড়ে উঠেছিল। মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর ভক্ত মাওলানা ফখরুল হাসান গঙ্গোহী, বিজনৌর এর নাগিনা অঞ্চলে আরেকটি স্কুল স্থাপন করেন। এছাড়া দানপুর, রুরকী, খুরজাহ সহ মীরাট ও মুজাফফর নগর এর বড় বড় শহরগুলোতে আরো বেশ কিছু স্কুল স্থাপিত হয়।

---

[৪৩] Syed Mahbub Rizvi, *op. cit.*, p. 119.

[৪৪] সাইয়্যেদ মানাযির হাসান গিলানী, *সাওয়ানিহ এ কাসিমী* (লাহোরঃ মাকতাবা রহমানিয়া, ১৯৬৭), পৃ. ৩২৬।

এসব স্কুলের অধিকাংশই প্রশাসনিক এবং পাঠক্রমের দিকে হতে "উম্মুল মাদারিস" দেওবন্দকে মডেল হিসেবে অনুসরণ করতো। মাওলানা কাসিম নানতুবী স্বয়ং মোরাদাবাদের মাদ্রাসা-ই-শাহীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং মূলনীতি নির্ধারণ করেন। দেওবন্দের মত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিও জনসাধারণের দান ও চাঁদার ওপর নির্ভর করে প্রতিষ্ঠা হয় যার প্রথম দাতা ছিল একজন পানির ভিস্তি বাহক। এর অন্যতম শিক্ষক মাওলানা সাঈদ হাসান আমরোহী ছিলেন মুহাম্মদ কাসিম নানতুবীর প্রিয় ছাত্রদের অন্যতম। দারুল উলুম দেওবন্দের সাথে জড়িত সবচেয়ে বৃহৎ এবং সফলকাম মাদ্রাসা ছিল সাহারানপুরে অবস্থিত মাজাহির ই-উলুম। এর আকার ও প্রভাবের দিক থেকে সমগ্র উপমহাদেশে এর অবস্থান ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের পরেই অর্থাৎ দ্বিতীয় অবস্থান। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার মাত্র ছয় মাস পরে প্রতিষ্ঠিত এই মাদ্রাসাটি নিজেকে পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠিতব্য মাদ্রাসা সমূহের কাছে মডেল হিসেবে অনুকরণীয় করে তোলে। দেওবন্দ হতে মাত্র ২০ মাইল দূরে হলেও সাহারানপুর এর বিস্তার এবং অধিবাসীদের জ্ঞানপিপাসার প্রেক্ষিতে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপনের দাবী রেখেছিল। যার ফলশ্রুতিতে মাজহার-ই-উলুমের জন্ম হয়।

দেওবন্দ মাদ্রাসার অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় স্থাপিত এ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলোর মধ্যে আন্তঃ সম্পর্ক ছিলো অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। এক মাদ্রাসা হতে আরেক মাদ্রাসার শিক্ষকগণ চাকুরী বদল করতেন। উদাহরণ স্বরূপ মাওলানা রশিদ আহমদের শিষ্য মাওলানা খলিল আহমেদ যিনি দেওবন্দ ও মাজাহির উভয় মাদ্রাসারই ছাত্র ছিলেন; তিনি দেওবন্দের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে মাজাহির-ই-উলূম এ প্রধান শিক্ষক পদে যোগদান করেন। তার স্থানে আসেন মোরাদাবাদের মাদ্রাসার-ই-শাহীর শিক্ষক মাওলানা আব্দুল আলী। এ ধরনের আন্তঃ চাকুরী পরিবর্তন প্রতিষ্ঠান গুলোর বিদ্যমান নৈকট্যের ছবি পরিস্ফুট করে। দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দ অনেকেই এসকল মাদ্রাসার শিক্ষকতা করতেন যা তাদের মধ্যকার হৃদ্যতা ও এ নৈকট্যকে আরো নিবিড় করে। মাওলানা আমিনউদ্দিনের নেতৃত্বে যখন মাদ্রাসা-ই-আমীনিয়া স্থাপিত হয় তখন মাওলানা আমিনউদ্দিন এর বিভিন্ন দায়িত্ব গ্রহণের জন্য তার অনেক প্রাক্তন ছাত্রদের আমন্ত্রণ জানান। তাদের অন্যতম মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী যিনি পরবর্তীতে দেওবন্দের প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত হন, তিনি বিজানৌরের সরকারি চাকুরীর নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের মোহ ত্যাগ করে এ পদ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেন।

দেওবন্দের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যয়নরত ছাত্রদের মধ্যে যে অনন্য সূফী ভ্রাতৃত্ববোধ পরিলক্ষিত হয় তার বিশিষ্টতা ছিলো বিভিন্ন অঞ্চল হতে আসা ছাত্রদের সমারোহ। দেশের বাহির হতেও এতে প্রচুর ছাত্র আসতো যার সিংহভাগই ছিল বাংলা হতে আগত। বাঙ্গালী ছাত্ররা পরিমাণে এত বেশী ছিল যে তাদের সংখ্যা ছিল গোটা উত্তর প্রদেশের ছাত্রদের সমপরিমাণ। এছাড়া, সাহারানপুর, আওরঙ্গবাদ, সুরাট, পেশওয়ার ও এডেন সহ ভারতীয় উপমহাদেশের বাইরের বিভিন্ন দেশের ছাত্ররাও কুরআন ও ফিকহ শিক্ষার জন্য এখানে সমবেত হয়েছিল। যখন এসকল ছাত্ররা উচ্চতার ডিগ্রী অর্জন করে প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করত তখন তাদের সঙ্গী হত বিশুদ্ধ

ধর্মীয় অনুশীলনের অঙ্গীকার, নিজ ভাষা ছাড়া ও একটি ভাষার জ্ঞানার্জন, শিক্ষক ও ছাত্রদের প্রতি মমতা ও প্রীতির বন্ধন এবং একই অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রেরণার অনুভূতি।

দারুল উলুম দেওবন্দের উলামাবৃন্দ ও তাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো "দেওবন্দী" নামে অভিহিত হয়। ক্রমশঃ দেওবন্দ নামটি ভারতীয় ইসলামে একটি নতুন পথের দিশারী হয়ে উঠে। ১৮৮০ সাল পর্যন্ত প্রায় এক ডজন স্কুল নিজেদের "দেওবন্দী" হিসেবে চিহ্নিত করে যার সংখ্যা শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বেড়ে গিয়ে তিনগুণে উপনীত হয়। ১৯৬৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দের শততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে প্রায় ৮৯৩৪ টি দেওবন্দী স্কুলের অস্তিত্ব আছে বলে জানা যায়।[৪৫] দেওবন্দ মাদ্রাসা সমকালীন সময়ে অল্পকালের মধ্যেই এত প্রসিদ্ধি অর্জন করে যে দেশ ছাড়িয়ে বিদেশেও এর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রমাণ স্বরূপ, দেওবন্দ হতে আট হাজার মাইল দূরবর্তী অটোমানদের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল এর 'আল-জাওয়াইত" নামে একটি সংবাদপত্র দেওবন্দের ছাত্রদের জন্য সৌজন্য সংখ্যা ইস্যু করে।[৪৬] এছাড়া, কনষ্টান্টিনোপল এর অসাধারণ বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুপরিচিত আল্লামা আহমদ হামদী আফান্দি 'আন-নাজমুদ দারারী ফী ইরশাদিস সারী' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন যা প্রকাশনার পূর্বে তিনি গ্রন্থের মূল কপি হতে তিনটি অনুলিপি তৈরী করেন। এই অনুলিপি সমূহ গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে প্রেরণ করা হয় যার মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ ও ছিল অন্যতম। গ্রন্থের লেখকের নিজের বক্তব্য অনুসারে

> I have sent three copies to Constantinople and Egypt. I am sending 1 copy to Darul Uloom Deoband, the fountainhead of knowledge.My main intentionbehind writing this book is to preserve the memory of our illustrious ancestors.[৪৭]

তুরস্কের রাষ্ট্রদূত তুর্কী সরকারের পক্ষ হতে নিজে এই অনুলিপিটি দেওবন্দ মাদ্রাসায় প্রদান করেন। এ থেকেই দারুল উলুম দেওবন্দের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। ১৮৭৮ সালে দেওবন্দের বার্ষিক রিপোর্টে এর উল্লেখ করা হয়।[৪৮]

---

[৪৫] Barbara D. Metcalf, *op. cit.*, p. 136.
[৪৬] সাইয়্যেদ মানাযির হাসান গিলানী, *প্রাগুক্ত*, ভলি. ২, পৃ. ৩২৬।
[৪৭] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners of Malta* (Asiran'- E- Malta), Tr. by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications Pvt. Ltd, 2005), p. 6.
[৪৮] সাইয়্যেদ মানাযির হাসান গিলানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২০।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা

৬.১ দেওবন্দ আন্দোলন পরিচিতি

১৮৫৭ সালে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রাম যখন ব্যর্থ হয় তখন ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারতে অবস্থান করে পরিকল্পনা করেন যে, শাহ আব্দুল আযীযের দিল্লীর মাদরাসার অনুকরণে এমন একটি মাদরাসা স্থাপন করতে হবে যা, পরবর্তীতে ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের কেন্দ্র হয়। এ আন্দোলনকে এমনভাবে আরম্ভ করতে হবে যেন, ইসলামী চেতনা ও মুসলিম সভ্যতা সংরক্ষিত থাকে এবং বৃটিশ সরকারের সন্দেহভাজন না হতে হয়। এর সর্বোত্তম পন্থা হল দেশের অভ্যন্তরে ধর্মীয় মাদরাসা স্থাপন করে এমন আলিম তৈরী করতে হবে যারা ধর্মীয় কর্তব্যরূপে সামাজিক কাজের সাথে রাজনীতিতেও অংশগ্রহণ করতে পারেন। এ উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে দারুল উলুম দেওবন্দ, মাদরাসা শাহী মুরাদাবাদ, মাদরাসা মাজাহির-ই-উলুম সাহারানপুর ইত্যাদি স্থাপিত হয়। এ মাদ্রাসা গুলোর মধ্যে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা বহু দার্শনিক,আলিম, হাদীসবেত্তা সর্বোপরি স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধার জন্ম দিয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কূটনৈতিক কর্মকান্ড এবং ভারতের মুসলিম সমাজে কুসংস্কার অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে তাদের আপোসহীন সংগ্রাম ছিল দেওবন্দ মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থারই প্রত্যক্ষ ফল। এই মহান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বপ্নদ্রষ্টা এবং নির্মাতা হাজী ইমদাদুল্লাহ ও মাওলানা কাসিম নানতুবী তরুণ সমাজকে সঠিক ইসলামী জ্ঞান প্রদান করার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন যাতে পাশ্চাত্য সভ্যতা, সংস্কৃতির আগ্রাসন ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অত্যাসন্ন লড়াইয়ে তাদের ইসলামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলা যায়। তাদের লালিত স্বপ্ন বাস্তব রূপ লাভ করে যখন দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর মত বিপ্লবী উলামাবৃন্দ ব্রিটিশ বিরোধী রাজনীতির পটে আবির্ভূত হন। এসব উলামাবৃন্দের মধ্যে মাওলানা মাহমুদ হাসান ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে কেন্দ্রীয় ভূমিকা রাখেন।[১] তাঁর দিকনির্দেশিত পথেই উলামাবৃন্দের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকান্ডসমূহ আবর্তিত হয়েছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসায় বিপ্লবী চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটানোর কৃতিত্ব মাওলানা মাহমুদ হাসান ও তাঁর দুই শিষ্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর। এ সংগঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিপ্লবী আন্দোলন ছিল "রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র"। এরা ওয়ালীউল্লাহী মতাদর্শের ধারক ও বাহক হয়ে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় অবস্থার উত্তরণ, স্বার্থ সংরক্ষণ সর্বোপরি ভারতবাসীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ব্রিটিশ বিরোধী যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তাই দেওবন্দ আন্দোলন নামে পরিচিতি লাভ করে।

সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়কাল মুসলিম বুদ্ধিজীবী নেতৃবৃন্দকে তিনটি স্বতন্ত্র দলে ভাগ করে দেয়। স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে এদের একটি দল ব্রিটিশদের আপোষকামীতা ও তাদের তোষণের মাধ্যমে নিজেদের

---

[১] Farhat Tabassum, *Deoband Ulama's movement for the Freedom of India* (New Delhi: Manak Publication Pvt Ltd, 2006), p. 98.

উন্নয়নের পথ গ্রহণ করে। অপর দলটি এই আন্তরিকতাবিহীন ব্রিটিশ আনুগত্যের বিরোধীতা করে। শেষোক্ত এই দলটি আবার দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটি অংশ দেওবন্দের উলামাশ্রেণীর মত কংগ্রেসে যোগ দান করে; অপর অংশ কংগ্রেস Anglo-Hindu Organization হওয়ার কারণে এতে যোগদান হতে বিরত থাকে। আর মুসলমানদের আরেকটি অংশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে দেখতে চায়; এরপর কি ঘটে?

মুসলমানদের এই দলগুলোর মধ্যে নীতিগতভাবে পার্থক্য থাকলেও ইসলাম-ই ছিল এ সমস্ত দলের চিন্তা, চেতনা ও দৃষ্টিভঙ্গির মূল ভিত্তি। তারা ইসলামকে বিভিন্ন দিক হতে নিজ দৃষ্টিভঙ্গির সপক্ষে ব্যাখ্যা করলেও ইসলামের মৌলিক নীতিমালার কোন বিচ্যুতি ঘটাননি। তাঁরা শুধু ধর্মের আলোকে নিজেদের মতাদর্শের নিরিখে দেশের বিদ্যমান রাজনৈতিক সংকট সমাধানের প্রয়াস চালান।

৬.২ শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের দারুল উলুম দেওবন্দে যোগদান

১৫ই মুহাররম ১২৮৩ হিজরী/১৮৬৬ ইং সনে হাজী সায়্যিদ আবিদ হুসাইন, মাওলানা মাহতাব আলী এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামের পৃষ্ঠপোষকতায় দারুল উলুম দেওবন্দের ভিত্তি স্থাপিত হয়।[২] উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রথম শিক্ষক নির্বাচিত হন মাওলানা মোল্লা মাহমুদ এবং প্রথম শিক্ষার্থী ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান।[৩] ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে দারুল উলুমের শিক্ষা সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শায়খুল হিন্দ সর্বশেষ সনদ ও দস্তারে ফযীলত লাভ করেন। দারুল উলুম দেওবন্দে অধ্যয়নরত অবস্থাতেই শায়খুল হিন্দ ১৮৭১-৭২ সনে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহকারী শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভ করে পাঠদান করতে থাকেন।[৪]

শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধির ফলে দারুল উলুম দেওবন্দের পরিচালকবৃন্দ স্থায়ী শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করেন। দারুল উলুম থেকে চূড়ান্ত সনদ প্রাপ্ত যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মুহতামিম মাওলানা শাহ রফিউদ্দিন শিক্ষক হিসেবে মাওলানা মাহমুদ হাসানকে মনোনীত করেন। তিনি ১৮৭৫ সনে উক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত স্থায়ী চতুর্থ শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন।[৫] তাঁর কৃতিত্বের কারণেই ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সদর মুদাররিস পদে সমাসীন হন। তিনি সদর মুদাররিসের পদ অলংকৃত করার সাথে সাথে শায়খুল হাদীস পদেও অধিষ্ঠিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় তেত্রিশ বছর সদর মুদাররিস ও শায়খুল হাদীস উভয় পদেই সমাসীন ছিলেন। তার এ সময়কালেই উক্ত মাদরাসা চরম উন্নতির শিখরে আরোহন করতে সক্ষম হয় এবং দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসা মুসলিম বিশ্বের অন্যতম সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।[৬]

---

[২] সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন, *হায়াতে শায়খুল হিন্দ* (লাহোর: ইদারা ইসলামিয়াঁত, ১৯৭৭), পৃ. ১৮।
[৩] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হক্*, ১ম খণ্ড (দিল্লী: আলজামিয়াঁত বুক ডিপো, ১৯৪৪), পৃ. ৬৭।
[৪] আশিক ইলাহী মীরাঠী, *তাযকিরাতুল খলীল* (সাহারানপুর: মাকতাবায়ে খলীলিয়া, ১৯৭৭), পৃ. ১১০।
[৫] মুফতী আযীযুর রহমান, *তাযকিরা শায়খুল হিন্দ* (বিজনৌর: মদনী দারুত তালীফ, ১৯৬৫), পৃ. ৬২।
[৬] সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০।

৬.৩ মাওলানা মাহমুদ হাসানের ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার অভ্যুদয়

যেহেতু দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ছিল শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে তাদেরকে মনমানসিকতার দিক থেকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদসহ সর্বপ্রকার বাতিলের বিরুদ্ধে সচেতন করা এবং প্রতিকারের জন্য জীবন উৎসর্গকারী সৈনিকরূপে গড়ে তোলার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী ও মাওলানা কাসিম নানতুবী ও হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কীর সংস্পর্শে থাকার কারণে অতি অল্প বয়সেই মাওলানা মাহমুদ হাসানের মধ্যে বিপ্লবী চেতনা জাগ্রত হয়েছিল। একারণে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে দখলদার ইংরেজদের বিতাড়িত করার অনুপ্রেরণা মাদ্রাসার প্রথম ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান দারুল উলুম দেওবন্দ হতেই লাভ করেছিলেন। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের সশস্ত্র বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল দেশে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে ইংরেজ কবলমুক্ত এলাকা থেকে আক্রমণ তথা উপমহাদেশে ব্রিটিশদের উপর বহিরাক্রমণ করা।[৭] মাওলানা জিয়াউর রহমান ফারুকীর বর্ণনা মতে,

> Mahmudul Hasan who came as a student turned out to become oneof the leading figures in Indian history and also in the movements for the freedom of India.[৮]

সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি হিসেবে শায়খুল হিন্দ প্রথমে আন্দোলনের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে জনগণকে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করার প্রয়াস চালান। এ সাংগঠনিক তৎপরতার মধ্যে ছিল সামরাতুত তারবিয়াত স্থাপন, জমইয়াতুল আনসার গঠন, বিভিন্ন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা, নাযারাতুল মা'আরিফ এর পৃষ্ঠপোষকতা এবং চূড়ান্তভাবে ভারতকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য রেশমী রুমাল আন্দোলনের মত সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনা করা। নিম্নে তার এ সকল সাংগঠনিক তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হল।

সামরাতুত তারবিয়াত

দারুল উলুম দেওবন্দে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ লাভের পর পঞ্চম বছরে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ শায়খুল হিন্দ উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামরাতুত তারবিয়াত নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ খ্রিঃ "সামরাতুত তারবিয়াত" প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাওলানা মাহমুদ হাসান মুসলিম জাতীয়তাবাদের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ তার গ্রন্থে বলেন-

> The founding of Samrat-ul-Tarbiat in the year 1878 A.D. by Maulana Mahmoodul-Hassan marked the beginning of a new chapter in the history of Muslim nationalism. This organization, which was meant to train the revolutionaries against the British force, was to become a forerunner to various other revolutionary organizations that were to spring up on the national scenario later. [৯]

---

[৭] এ.এম.এম. আবদুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ* (ঢাকা: ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃ. ৪০।

[৮] Diyaur Rahman Farooqi, *The Ulama of Deoband Their Majestic Past* (Karachi, Pakistan: Zamzam Publishers, 2006), p. 54.

[৯] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামা-ই-হক আউর উনকি মুজাহিদীনে কারনামে*, ভলিউম ১ (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো., ২০০৮), পৃ. ২৪।

সামরাতুত তারবিয়াত অর্থ প্রশিক্ষণের ফল।[১০] এ সংগঠনের প্রকাশ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল দারুল উলুমের উন্নতিকল্পে অত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যাক্তিবর্গের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অপ্রকাশ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের কবল থেকে মুক্ত করার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা।[১১] এ অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য কোন অবস্থাতে ফাঁস হয়ে পড়লে দারুল উলুমসহ সংগঠনটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকেই বৃটিশ শাসক শক্তি সমূলে বিনাশ করে দিবে এ আশংকা ছিল, কারণ ব্রিটিশ সরকার ভক্ত একদল বিজ্ঞ, বিচক্ষণ গোয়েন্দাসংস্থা সদা সজাগ ও সতর্ক থাকত।[১২] এজন্য এই সংগঠনের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত গোপনে পরিচালিত হত।

দারুল উলুমের সর্বপ্রথম যে সকল শিক্ষার্থী চূড়ান্ত সনদ লাভ করেন তাদের অধিকাংশই ছিলেন পাঞ্জাব ও আফগানিস্তানের অধিবাসী। ১৮৬৬ সালে দারুল উলুম প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পাঞ্জাব ও আফগানিস্তান থেকে প্রচুর শিক্ষার্থী আসত। ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ তাদের মাঝে ভারতকে ইংরেজদের কবল থেকে মুক্ত করার স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন। কেননা, এদের মাধ্যমে ইংরেজ কবলমুক্ত এলাকা আফগানিস্তান ও সীমান্ত থেকে ভারতের উপর বহিরাক্রমণ করা সম্ভব হবে। সামরাতুত তারবিয়াত এর মাধ্যমে তারা সশস্ত্র সংগ্রামের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। এ প্রশিক্ষণ লাভ করে তারা সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং সীমান্তবর্তী উপজাতীয় জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা জাগ্রত করার প্রয়াস পান।[১৩] ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লবী ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এ সংগঠন পরবর্তীকালে জাতীয় প্রেক্ষাপটে উদিত হওয়া বিভিন্ন বিপ্লবী সংস্থার অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করেছিল।[১৪]

প্রায় ৩০ বছর ধরে চলা এ সংগঠনটি যদিও ফলাফল বিচারে তার কাঙ্খিত সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর ব্যর্থতার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল ১৮৮০ সালে এর অন্যতম পৃষ্ঠপোষক মাওলানা কাসিম নানতুবীর মৃত্যু এবং এর ফলে মাওলানা মাহমুদ হাসানের হতোদ্যম হয়ে পড়া। এর ফলে প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব প্রদানে যে শূন্যতা সৃষ্টি হয় তা এর প্রত্যাশিত লক্ষ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করে।[১৫]

৬.৪ ভারতের রাজনীতিতে পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দলের উদ্ভব

ব্রিটিশ সরকারের ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যর্থ হবার পর ইংরেজগণ আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক পন্থা গ্রহণ করলেও পরবর্তীকালে ইংরেজরা বুঝতে পারে, ভারতীয়দের সহযোগিতা

---

[১০] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *তাহরীকে শায়খুল হিন্দ* (লাহোর: মাকতাবা রশীদিয়া, ১৯৭৫), পৃ. ৬১।
[১১] M. Burhanuddin Qasmi, *Darul Uloom Deoband : A Heroic Struggle Against Ther British Tyranny* (Mumbai: Markazul Ma'arif, 2001), p. 19.
[১২] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরান-এ মাল্টা* (দিল্লী: আল জমইয়াত বুক ডিপো., ১৯৭৬), পৃ. ৯।
[১৩] *তদেব*, পৃ. ৮-৯।
[১৪] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামা-ই-হক আউর উনকি মুজাহিদীনে কারনামে*, ভলিউম ১ (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো., ২০০৮), পৃ. ২৪।
[১৫] M. Burhanuddin Qasmi, *op. cit.*, p. 19.

ছাড়া ভারতে টিকে থাকা সম্ভব নয়। এজন্য তারা কিছু সংখ্যক ভারতীয়দের লোভ দেখিয়ে, অর্থসম্পদ এবং সামাজিক মর্যাদা, বিভিন্ন উপাধি যেমন- খান সাহেব, রায় সাহেব, খান বাহাদুর, রায় বাহাদুর, রাজা, মহারাজা, স্যার, শামসুল উলামা প্রভৃতি প্রদান করে নিজেদের পক্ষে টেনে নেয়। কিন্তু জনতার একটি বড় অংশকেই তারা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ভারতের মুক্তিকামী জনগণকে এত সহজে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ও ছিলনা। ফলে ১৮৫৭ সালের তিক্ত পরাজয়ের কয়েক বছর পরেই হিন্দু মুসলমান উভয়পক্ষ হতেই ব্রিটিশ বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিতে থাকে।

১৮৭৬ সালে বাংলায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, এর দুই বছর পর দেওবন্দে সামরাতুত তারবিয়াত, ছয় বছর পর মাদ্রাজে মহাজনসভা ইত্যাদি উগ্র জাতীয়তাবাদী দল প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব দলের বহিরাবরণ জনকল্যাণমূলক হলেও মূলত এদের কার্যক্রম ছিল রাজনৈতিক। অচিরেই ইংরেজরা এসব দলের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য সম্পর্কে অনুমান করতে পারে এবং সাথে এটাও বুঝতে পারে যে ভারতবাসীদের মৌলিক অধিকার হতে বঞ্চিত করে তাদেরকে বেশিদিন দমিয়ে রাখা যাবেনা। তাই, তারা কৌশলের অংশ হিসেবে ভারতবাসীর সকলের জন্য একটি দল গঠন করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। যার মাধ্যমে ইংরেজদের নিকট উপমহাদেশের জনগণ নিজেদের মনের আবেগ প্রকাশ ও দাবি দাওয়া পেশ করতে পারবে। এ কারণে একজন ব্রিটিশ কর্মকর্তা এলান অক্টেভিয়ান হিউম এর মাধ্যমে ১৮৮৫ সালে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস নামে একটি দল গঠন করা হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর কংগ্রেস হিন্দু-মুসলমানদের এক ও অভিন্ন দাবি আদায়ের প্লাটফর্মে পরিণত হয় যা ছিল ইংরেজদের প্রত্যাশার সম্পূর্ণ বিপরীত। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন 'পুনে' তে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ;

(ক) উপমহাদেশে বিভিন্ন গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও জাতিকে এক ও অভিন্ন জাতিতে গঠন করা।

(খ) বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে ভারতীয় যে জাতির সৃষ্টি হবে সে জাতির মজ্জাগত, চরিত্রগত এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা পুনরুজ্জীবিত করা।

(গ) ভারতবাসীর জন্য যে অবস্থা ও পরিস্থিতি ক্ষতিকারক ও অন্যায় তা সংস্কার ও সংশোধন করা এবং এ পদ্ধতিতে ভারত ও ইংল্যান্ডের মধ্যে ঐক্য ও সাদৃশ্য সুদৃঢ় করা।

লর্ড ডাফরিনের উদ্দেশ্য ছিল- এ সাম্রাজ্যে এমন একটি দল গঠিত হবে যে দল বৃটিশের পদলেহনকারী, চাটুকার এবং চিরস্থায়ীভাবে তাদের রাজত্ব স্থায়িত্বে সহায়ক হয়। এদলটি ব্রিটিশদের দেখানো পথে চলবে, ব্রিশিদের শেখানো কথাই বলবে। কিন্তু ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর তাদের উদ্দেশ্য সফল না হবার ফলে তারা হিন্দু মুসলিম ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য 'ভাগ কর এবং শাসন কর' এ নীতিতে সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখার পলিসি পন্থা অবলম্বন করে। কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদান করা নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করে। আবার ১৮৩৭ সালে ভারতের সরকারি ভাষা ফারসীর স্থলে ইংরেজীকে সরকারি ভাষায়

পরিণত করার পর ১৯০০ সালের এপ্রিলে আদালত ও কোর্ট কাচারিতে হিন্দী অক্ষরে লিখিত আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে। এতে হিন্দুরা সন্তুষ্ট হয় এবং মুসলমানগণ বিভিন্ন সভা সমিতি করে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে। অন্যদিকে মুসলমানদের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে ইংরেজরা তাদের মধ্যে হীনমন্যতার সৃষ্টি করে। এভাবে হিন্দু-মুসলিমের মাঝে মৈত্রী বিনষ্টের উদ্দেশ্যে ইংরেজরা একের পর এক চক্রান্ত অব্যহত রাখে। আর এ চক্রান্তের অংশ হিসেবে উপমহাদেশের অন্যতম সমৃদ্ধ প্রেসিডেন্সি বাংলার হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে খর্ব করার জন্য ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ বিভাগগুলোকে আসামের সাথে যুক্ত করে একটি নতুন প্রদেশ গঠন করার পরিকল্পনা করে। বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ এ পরিকল্পনায় মোটেই সম্মত হয়নি। তারা এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন সভা সমিতির মাধ্যমে প্রতিবাদ অব্যহত রাখে। অসংখ্য বাঙ্গালীর স্বাক্ষরযুক্ত প্রতিবাদপত্র ও স্মারকলিপি বড়লাট সমীপে দেয়া হয়। কিন্তু, এসব প্রতিবাদপত্র তাদের নিকট অগ্রাহ্য হয়। ব্রিটিশ শাসকবর্গ তাদের সিদ্ধান্তে অটল থেকে ১৯০৫ সালের ৫ ই জুলাই বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা প্রকাশ করে এবং ওই সালের ১৬ ই অক্টোবর তা কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গ করার পর তা হতে যখন মুসলমানরা সুফল লাভ করতে থাকে তখন হিন্দুদের অব্যহত আন্দোলনের চাপে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করা হয়। তখন পুনরায় মুসলমানরা হতাশ হয়ে পড়ে।

১৯০৬ সালে ভারত সচিব লর্ড মর্লি ভারতে আসন্ন সাংবিধানিক সংস্কারের ঘোষণা করলে, এতে মুসলিম নেতৃবৃন্দ শঙ্কিত হয়ে পড়েন এ ভেবে যে, ভারতে নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হলে, হিন্দুরাই সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করবে, ফলে মুসলিম নেতারা নতুন সংবিধানে মুসলমানদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বড় লাট লর্ড মিন্টোর কাছে এক প্রতিনিধি দল পাঠানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর আগা খানের নেতৃত্বে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট এক মুসলিম প্রতিনিধি দল সিমলায় ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এটিই ঐতিহাসিক সিমলা ডেপুটেশন নামে খ্যাত। ডেপুটেশন স্থানীয় সংস্থা এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইন পরিষদ গুলোতে মুসলমানদের পর্যাপ্ত সংখ্যক আসন লাভের জন্য দাবিনামা পেশ করে; মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনই ছিল ডেপুটেশনের মূল উপজীব্য বিষয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্ব প্রশ্নে ডেপুটেশন ভাইসরয়ের নিকট হতে অনুকূল সাড়া লাভে সমর্থ হয়; এ সাফল্যে মুসলিম নেতৃবৃন্দ রাজনীতিতে আরও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। ডেপুটেশনের অন্যতম সমস্যা হিসেবে নওয়াব মুহসীন উল মুলক, আগা খানের নিকট লিখিত এক পত্রে মুসলমানদের জন্য একটি সর্বভারতীয় সমিতির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেন।

ইতোমধ্যে নবাব সলিমুল্লাহ তাঁর রাজনৈতিক নবাব আলী চৌধুরীর সিমলায় প্রতিনিধি বৃন্দের কাছে মুসলিম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনার এক খসড়া পাঠিয়ে দেন। ১৯০৬ সালের ২৭ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়। নবাব ভিকার উল মূলক, শরীফুদ্দীন (পাটনা), পাতিয়ালার খলিফা মুহাম্মদ হোসেন, হাসান ইমাম, লক্ষ্ণৌর রাজা নওশাদ আলী খান, খান বাহাদুর

মুহাম্মদ হোসেন, নওয়াব আলী চৌধুরী, মুহাম্মদ আলী, ভূপালের মৌলভী নিযামুদ্দিন, নবাব মুহসীন উল মুলক, ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমদ, কুমিল্লার আলী নওয়াব চৌধুরী, চৌধুরী কেরামত উল্লাহ, মাওলানা শওকত আলী, মৌলভী আওলাদ হাসান, সৈয়দ হোসেন, অমৃতসরের খাজা মুহাম্মদ ইউসুফ শাহ, খাজা মুহাম্মদ আফজাল, শাহজাদা আফতাব আহমদ খান প্রমুখ প্রতিনিধিগণ এ অধিবেশনে যোগদান করেন। এদের অনেকে সিমলায় বড়লাটের নিকট প্রেরিত প্রতিনিধি দলে ছিলেন।

শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশন সমাপ্ত হলে ১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর নবাব ভিকার উল মুলকের সভাপতিত্বে রাজনৈতিক অধিবেশন শুরু হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন যে, "মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ করে কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি তারা লক্ষ্য করেছেন এবং তা বঙ্গ ভঙ্গের সময় সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রয়োজন এবং ব্রিটিশ সরকার তা দিতেও সম্মত হয়েছন। তিনি মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা, ব্রিটিশ সরকার ও মুসলমানদের মধ্যে সুসম্পর্ক এবং সকল সম্প্রদায়ের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি হাকীম আজমল খান, নবাব মুহসীন উল মুলক এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সমর্থন কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। অতঃপর ১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ঢাকায় 'নিখিল ভারত বা সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ' নামক একটি রাজনৈতিক দল জন্মলাভ করে।

১৯০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠালগ্নে এর তিনটি লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য স্থির করা হয়। এগুলো নিম্নরূপঃ

১) ব্রিটিশ সরকারের প্রতি ভারতের মুসলমানদের আনুগত্য বৃদ্ধি করা এবং ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গৃহীত কোন ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের কোন ভুল ধারণা সৃষ্টি হলে তা দূর করা।

২) ভারতের মুসলমানদের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা এবং তার অগ্রগতি সাধন এবং তাদের অভাব অভিযোগ ও আকাঙ্খার কথা শ্রদ্ধার সাথে সরকারের কাছে উত্থাপন করা।

৩) মুসলিম লীগের উপরোক্ত উদ্দেশ্য দু'টি অব্যাহত রাখার পাশাপাশি ভারতীয় অন্যান্য সম্প্রদায়ের প্রতি মুসলমান জনগণের মধ্যে যেন বিদ্বেষভার সঞ্চার না হয়, তার ব্যবস্থা করা এবং তাদের সাথে সদ্ভাব গড়ে তোলা।

৬.৫ সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি ও জমইয়াতুল আনসার গঠন পর্ব

১৯০৫ সালে মাওলানা রশীদ আহমেদ গঙ্গোহীর মৃত্যুর পর মাওলানা মাহমুদ হাসান দারুল উলুমের মুহতামীম নিযুক্ত হন। নতুন এ দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েই তিনি তার বিপ্লবী কর্মসূচীর পরিকল্পনা শুরু করেন। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেস এবং ১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত মুসলিম লীগ উভয় দলই যখন রাজনৈতিক অঙ্গনে নিজেদের অবস্থান সুসংহত করতে ব্যস্ত, ঠিক তখনি মাওলানা মাহমুদ হাসান ব্রিটিশ শাসন উৎখাতের উদ্দেশ্যে তাঁর বিপ্লবী কর্ম পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের লক্ষ্যে দুটি ভিন্ন ক্ষেত্র হতে আন্দোলন শুরু করেন, যথা-

১) অভ্যন্তরীণ (দেশীয়)

২) আন্তর্জাতিক।

দুটি সশস্ত্র আন্দোলনই একসাথে পরিচালিত হতে থাকে। দেশীয় ক্ষেত্র হতে ভারতীয় আন্দোলন পরিচালনায় তাঁর প্রধান কেন্দ্র ছিল দেওবন্দ এবং এর শাখা দিল্লী, দীনাপুর, আমরোট, কারান্জি, খেদা এবং চাকওয়াল প্রভৃতি এলাকায় বিস্তৃত ছিল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের বাইরে প্রথম পর্যায়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী একটি ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য "ইয়াগিস্তান" কে কেন্দ্র করে তিনি সশস্ত্র আন্দোলনকে সংগঠিত করেন।[১৬] ১৯০৯ সালে মাওলানা মাহমুদ হাসান তার বিপ্লবী অনুসারীদের একত্র করেন এবং "জমইয়াতুল আনসার" নামে একটি নতুন বিপ্লবী সংগঠনের পতাকাতলে সমবেত করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল পুরনো সংগঠন "সামরাতুত তারবিয়াত" এরই নতুন রূপ, যার সূচনা হয়েছিল প্রায় ৩০ বছর আগে ১৮৭৮ সালে।[১৭] জমইয়াতুল আনসার-কে বাহ্যিকভাবে দেওবন্দ হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রাক্তন ছাত্রদের পুনর্মিলনী সংগঠন এবং এর উদ্দেশ্য আলীগড় ওরিয়েন্টাল কলেজ এবং দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষক ও বিদ্যার্থীদের মধ্যে বন্ধুসদৃশ সম্পর্ক স্থাপন করা বলে অভিহিত করা হলেও প্রকৃতপক্ষে জমইয়াতুল আনসার গঠনের একটি অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল তা হল এর মাধ্যমে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে একটি মুজাহিদ বাহিনী গঠন করা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়া। এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে মাওলানা হাবিবুর রহমান বলেন,

> The object of *Jamiat-ul-Ansar* was defined to be preaching of *Quran* and *hadis*, to introduce reform in the faith and activities of the Muslims and to hold regular deliberations for preservation and propagation of Islamic Sciences.[১৮]

৬.৫.১ জমইয়াতুল আনসার ও মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন পরিচালনার জন্য মাওলানা মাহমুদ হাসান একজন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ কর্মীর সন্ধানে ছিলেন। তার প্রাক্তন ছাত্র মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন তেমনই একজন ব্যক্তিত্ব। তারা চাঁদ বলেন

> Maulana Mahmood-ul-Hassan was in search of motivated revolutionaries and Ubaidullah Sindhi, a converted from the Sikh community was such revolutionary.[১৯]

মাওলানা সিন্ধী দেওবন্দে শিক্ষাজীবন অতিবাহিত করাকালীন মাওলানা মাহমুদ হাসানের সংস্পর্শে আসেন এবং বিপ্লবী চেতনায় প্রভাবান্বিত হন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বিশিষ্ট বিপ্লবী

---

[১৬] Tara Chand, *History of Freedom Movement in India*, Vol. III (New Delhi: Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, 1972), p. 255.

[১৭] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।

[১৮] Habib-ur-Rahman in *Risala Al-Qasim*, 1912.

[১৯] Tara Chand, *op. cit.*, Vol. III, p. 255.

নেতা। যিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে থেকে সাফল্যের সাথে বিপ্লবী কর্মকান্ড পরিচালনা করেন। সিন্ধী ছিলেন বহুমুখী ব্যক্তিত্বের অধিকারী। তিনি শুধু অসাধারণ শাস্ত্রীয় জ্ঞানের অধিকারী-ই ছিলেন না,পাশাপাশি একজন মহান বিপ্লবীও ছিলেন। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জ্ঞান অর্জন করার পর তিনি ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী কর্মকান্ডকেই জীবনের লক্ষ্য নির্ধারিত করেন। মাওলানা সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের লেখনীসমূহ তাঁর বিপ্লবী চরিত্র গঠনের আদর্শ হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিল।[২০]

১৯০৯ সালে শায়খুল হিন্দ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে সিন্ধু থেকে দেওবন্দে ডেকে আনেন এবং এখানে অবস্থান করে জমইয়াতুল আনসার প্রতিষ্ঠা ও এর সাংগঠনিক কাজ করার নির্দেশ দেন।[২১] মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দেওবন্দে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় জমইয়াতুল আনসারের সেক্রেটারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে শুরু করেন। জমইয়াত এর কার্যক্রম পরিচালনায় মাওলানা মুহামাদ সাদিক করাচভী, মাওলানা আবু মুহাম্মাদ আহমদ লাহোরী ও মৌলভী আহমদ আলী মাওলানা তাকে সহায়তা করেন।

মাওলানা সিন্ধী চার বছর যাবৎ জমইয়াতুল আনসার পরিচালনা করেন। জমইয়াতের মূল উদ্দেশ্য গোপন রেখে ১৯১০ সালে দার ল উলুম দেওবন্দে 'দস্তারবন্দী' (পাগড়ি পরিধান অনুষ্ঠান) এর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে দারুল উলুম দেওবন্দের ডিগ্রিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল প্রায় ছয়শত। এ অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে আনুমানিক ত্রিশ হাজার মুসলিম সুধী উপস্থিত হয়েছিলেন। তাদের অধিকাংশই ছিলেন আলিম। উক্ত অনুষ্ঠান থেকে 'মাসিক আল কাসিম' পত্রিকা প্রকাশের ঘোষণা দেয়া হয়।[২২] এই দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠান থেকে মাওলানা সিন্ধী জমইয়াতুল আনসারের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষণা করেন।

ক. কুরআন মাজীদ ও হাদীসের গূঢ় রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্যভিত্তিক ইসলামী বিষয়সমূহ সর্বসাধারণ মুসলমানের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দিতে হবে।

খ. মুসলিম জনগণের ঈমান আক্বীদা ও আমল সংশোধনের জন্য সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে হবে এবং এ সকল অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের জন্য আলোচনা, সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

গ. ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান সংরক্ষণ, প্রচার ও প্রসারের উপকরণ হিসেবে এবং দেশের বিভিন্ন স্থানে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্যে আলোচনা ও পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হতে হবে।

উল্লেখিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ সফল হবে যদি বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন স্থানে জমইয়াতুল আনসারের পক্ষ থেকে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আর এসকল সম্মেলনে মুসলমানদের পার্থিব ও পারলৌকিক কল্যাণের কথা ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। আল্লাহ ও তার রাসুলের প্রকৃত শিক্ষাসমূহ এবং বুযুর্গ ও ওলীদের উদ্যমী,

---

[২০] Farhat Tabassum, *op. cit.*, pp. 125-126.
[২১] এস.এম. ইকরাম, *মওজে কাওসার* (লাহোরঃ ফীরোজ সন্স, ১৯৫৮), পৃ. ২০৩।
[২২] মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৮।

উৎসাহব্যঞ্জক, উদ্দীপক এবং বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস আলোচনা করা হয় যাতে জাতির মৃত অন্তরসমূহ জীবিত হয়ে ওঠে।[২৩]

৬.৫.২ জমইয়াতুল আনসারের সম্মেলন ও গৃহীত কর্মসূচী

প্রথম কনফারেন্স

দস্তারবন্দী সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সাব্যস্ত করা হয় যে, জমইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্স মোরাদাবাদে অনুষ্ঠিত হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোরাদাবাদে তিনদিনব্যাপী এক বিরাট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়।[২৪] ১৫-১৭ এপ্রিল ১৯১১ তারিখে অনুষ্ঠিত এ কনফারেন্সে জমইয়াতুল আনসার ও তার অনুসারীদের করণীয় সম্পর্কে যে ঘোষণা দেয়া হয় তা নিম্নে উল্লেখ করা হল;

ক. জমইয়াতুল আনসার সর্বদা দারুল উলুম দেওবন্দের সকল কাজে সহায়তা করবে।

খ. দারুল উলুমের প্রাক্তন ডিগ্রিধারীরাই জমইয়াতুল আনসারের সদস্য হবে।

গ. মাওলানা কাসেম নানতুবীর রচনাবলী, শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও তার পরিবারস্থ মনীষীগণের লেখা গ্রন্থাবলী ও মুজাদ্দিদে আলফে সানীর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ মাকতুবাত এ সংগঠনের সকল সদস্যের পাঠ্যসূচী হবে।

ঘ. দারুল উলুম দেওবন্দে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলা হবে। এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য হবে বক্তা ও খতীব সৃষ্টি করে তাদের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা সংস্কৃতিতে অবদান রাখা।

ঙ. এ সংগঠন থেকে এমন তর্কবাগীশ তৈরী করা হবে যারা রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে নাস্তিক, মুশরিক ও বিদ'আতীদেরকে দমিয়ে প্রকৃত ইসলামকে জনগণের সামনে পেশ করতে সক্ষম হবে।

চ. সাধারণ মুসলমানদের ঈমান, আকীদা ও আমল সংশোধনকল্পে সম্মেলন করে প্রবন্ধ পাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার-প্রসার ও ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের লক্ষ্যে আলোচনা ও পরামর্শসভা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রস্তাব গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে হবে।

ছ. যে জেলার জনগণ 'জমইয়াতুল আনসার' এর তত্ত্বাবধানে সম্মেলন করতে আগ্রহী হয় এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে তথায় এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।[২৫]

মোরাদাবাদে জমইয়াতুল আনসারের তিনদিনব্যাপী প্রথম সম্মেলনে প্রায় দশ হাজার লোকের সমাগম হয়। উক্ত সম্মেলনে যেসব প্রস্তাবনা গৃহীত হয় সেগুলো হল-

ক. সরকারি স্কুল ও কলেজের মুসলিম শিক্ষার্থীদের সপ্তাহে একদিন হলেও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক। তাদের আবাসিক হলসমুহে মুসলিম ছাত্রদের ইসলামী মূল্যবোধ ও চরিত্র গঠনের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একজন করে শিক্ষক নিয়োগ করা হোক। যার যাবতীয় দায়ভার অত্র সংগঠন বহন করবে।

---

[২৩] হাবীবুর রহমান, "জমইয়াতুল আনসার কে মাকাসিদ", *মাসিক আল কাসিম*, ১৩২৯ হি. রবি্উল আউয়াল সংখ্যা, পৃ. ৬।
[২৪] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হক্ব*, ১ম খণ্ড (দিল্লী: আলজামিয়াঁত বুক ডিপো., ১৯৪৪), পৃ. ১৩২।
[২৫] হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮-১০।

খ. সরকারি স্কুল ও কলেজ নূন্যতম পঁচিশভাগ শিক্ষার্থী, যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবীকে গ্রহণ করেছে তাদের জন্য জমইয়াতুল আনসার বৃত্তি প্রদান করবে এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ব্যবস্থা করবে।

গ. অসহায়, নিঃস্ব, অনাথ, দরিদ্র গ্রাজুয়েট ও প্রি-গ্রাজুয়েট শিক্ষার্থী যারা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে আরবী গ্রহণ করেছেন তাদের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষার একটি ব্যবস্থা করা হবে এবং এসব ছাত্রদেরকে জমইয়াতুল আনসার মাসিক ত্রিশ টাকা করে বৃত্তি প্রদান করবে।

ঘ. ইসলাম বিদ্বেষীগণ ইসলামের বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, আপত্তি ও মতবিরোধ করবে তার জবাব দেয়ার জন্য দারুল উলুম দেওবন্দে একটি বিভাগ খোলা হবে।

ঙ. কোন এলাকার লোকেরা তাদের মসজিদের জন্য ইমাম প্রার্থনা করলে জমইয়াতুল আনসার এমন একজন আলিম ইমামের ব্যবস্থা করবে যে সূচারুরূপে ওয়ায ও ইমামতি করতে সক্ষম হবে।

চ. কুরআন মাজীদ ও ধর্মীয়গ্রন্থ মুদ্রণ ও মুদ্রিত ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যবসার জন্য মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এসকল বিষয়ে অমুসলিমদের উপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে।

ছ. ইসলামী আকীদা বিষয়ক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বই প্রচুর পরিমাণে ছাপতে হবে; যা জনসাধারণকে শিক্ষা দেয়ার জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে।[২৬]

দ্বিতীয় কনফারেন্স

তিনদিনব্যাপী জমইয়াতুল আনসারের দ্বিতীয় কনফারেন্স ৭-৯ রবীউস সানি ১৩৩০ হিজরী মোতাবেক ১৬-১৮ এপ্রিল ১৯১২ খৃষ্টাব্দে মীরাটে মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনের উপস্থিত শ্রোতার সংখ্যা ছিল দশ সহস্রাধিক। সম্মেলনে মাওলানা আশরাফ আলী থানভী, মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী এবং দেশ বরেণ্য আলিমগণ বক্তব্য রাখেন। এ সম্মেলনে মোরাদাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয় ঃ-

ক. দেশের বিভিন্ন স্থানে জমইয়াতুল আনসার এর ফান্ড থেকে নৈশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হোক।

খ. আল-আনসার নামক জমইয়াতুল আনসারের একটি মুখপত্র বের করা হোক।[২৭]

শায়খুল হিন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় এবং মাওলানা সিন্ধী সাধারণ সম্পাদকের পদ অলংকৃত করায় এ সংগঠন প্রভূত অবদান রাখতে সক্ষম হয়। এ সংগঠনের মাধ্যমে দারুল উলুমের খ্যাতি ও পরিচিতি শুধু উপমহাদেশেই নয় বহির্বিশ্বেও ছড়িয়ে পড়ে। শায়খুল হিন্দ দারুল উলুমের ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রদেরকে জমইয়াতুল আনসারের অন্তর্ভুক্ত করে একই মঞ্চের আওতাধীনে আনতে সক্ষম হন। উপমহাদেশের আলিমগণ যেভাবে এ মোর্চার অন্তর্ভুক্ত হন তদ্রুপ আফগান, সীমান্ত এলাকা এবং তুর্কীর আলিমগণও এর অন্তর্ভুক্ত হন। এসময়কালে দারুল উলুমের

---

[২৬] হাবীবুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪-১৫।
[২৭] *তদেব*, পৃ. ৩৫।

শিক্ষার প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয় এবং এর পক্ষ হতে উসমানীয় খেলাফতের সহায়তা করা হয়। ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর প্রমুখ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসকে সহযোগিতা করা হয়। এগুলোই ছিল জমইয়াতুল আনসারের সে সময়কার উল্লেখযোগ্য অবদান।[২৮]

আসীরান-এ-মাল্টা গ্রন্থের লেখক সাইয়েদ মুহাম্মাদ মিয়াঁ নিজেও ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার ছাত্র এবং জমইয়াতুল আনসারের-র অন্যতম সদস্য। তৎকালীন সময়ের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় চল্লিশ বছর পর আমি দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া করি। সে সময়ে দারুল উলুমের তীক্ষ্মধীশক্তি, বিচক্ষণ, মেধাবী শিক্ষার্থীরা মনে করতো, প্রত্যেক আত্মসম্মানজ্ঞানসম্পন্ন মুসলমান যারা ইসলামী শাসনের প্রতিষ্ঠা কামনা করে তাদের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী দাসত্বের কবল হতে মুক্তিলাভের প্রচেষ্টা চালানো। একারণে শিক্ষার্থীগণ এ প্রেরণাকেই জীবনের একমাত্র অবলম্বন বলে মনে করত। প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিবেক বুদ্ধি অনুযায়ী ব্রিটিশদের উচ্ছেদকল্পে পরিকল্পনা স্থির করত এবং স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মুক্তিযোদ্ধার দল গঠন করত। আর এ প্রেরণা সামরাতুত তারবিয়াত সংগঠন স্থাপিত হওয়ার পর থেকে পর্যায়ক্রমে স্তরে স্তরে চলতে থাকে।

সায়্যিদ মুহাম্মাদ মিঁয়া আরও বলেন, ’আমরা বিপ্লবী চারজন ছাত্র এক সভায় মিলিত হয়ে একটি গোপন মুক্তিযোদ্ধা দল গঠন করি। এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করি এবং এর জন্য শপথ নিই। হলফনামা লিখিত আকারে অতি সতর্কতার সাথে সংরক্ষণ করি। এ গোপন সভায় আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, আমাদের গোপন মুক্তিযোদ্ধা দলের কথা আমরা চারজন ছাড়া আর কেউ জানবে না এবং এই চারজন সদস্য প্রত্যেকে আরো চারজন বিশ্বস্ত লোক অন্তর্ভুক্ত করে আরেকটি দল গঠন করবে এবং অত্যন্ত গোপনে তা পরিচালনা করবে। এটি ছিল ১৯২০ সালের ঘটনা কিন্তু গুপ্ত দলগুলো কোন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নেবার পূর্বেই দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে। চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার ফলে স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে স্থবিরতা নেমে আসে। ব্রিটিশ সরকার এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে বিভেদ সৃষ্টি কারী দলগুলোকে উসকানি দেয়। ফলে একদিকে যেমন ‘শুদ্ধি সংগঠন’ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তেমনি ‘তাবলীগ’ তাদের প্রচারের প্রসার ঘটাতে থাকে। যার ফলে এ সংগঠন স্থিরীকৃত লক্ষ্য অর্জনে পরিপূর্ণভাবে সক্ষম হয়নি।[২৯]

---

[২৮] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *শাহ ওয়ালিউল্লাহ অউর উনকি সিয়াসী তাহরীক* (লাহোর: কুতুবখানা পাঞ্জাব, ১৯৪২), পৃ. ২০৯।

[২৯] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners Of Malta* (Asiran’-E-Malta), Tr. by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications Pvt. Ltd, 2005), pp. 8-9.

জমইয়াতুল আনসারের মাধ্যমে ভারতের রাজনীতিতে উলামাশ্রেণীর উত্থানের প্রচেষ্টা অচিরেই ইংরেজদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বল্প সময়ের মধ্যেই দুটি মহাসম্মেলন এবং তাতে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষের সমাবেশ ব্রিটিশদের সন্দিহান করে তোলে। তারা সন্দেহ করতে থাকে যে মুসলমানরা ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। ১৮৫৭-১৮৫৮ সালের মহাবিদ্রোহের তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে তারা আর কোন ঝুঁকি নিতে চাইছিলনা। এ কারণে সরকার দেশের বৃহত্তর ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উলামাদের মাধ্যমে একটি বড় প্লাটফর্মে সম্মিলিত হবার সুযোগ দিতে একেবারেই অনিচ্ছুক ছিল। সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তারা জমইয়াতুল আনসার এর উপর নজরদারি করার ব্যবস্থা করে। জমইয়াতুল আনসারের প্রথম কনফারেন্সের সভাপতি মাওলানা আহমদ হাসানকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় এবং মাওলানা মাহমুদ হাসানের উপর উচ্চ হারে করারোপের মাধ্যমে তাঁকে জরিমানা করা হয়।[৩০] এসকল কারণে দারুল উলুমের তৎকালীন নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের আশঙ্কায় প্রকাশ্যে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর বিরোধিতা করতে থাকেন। তারা কয়েকটি ধর্মীয় মাস'আলায় তার সাথে অনৈক্য পোষণ করেন এবং বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে দারুল উলুমের সাথে উবায়দুল্লাহর সম্পর্ক ছিন্ন করেন। কিন্তু, গোপনে শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসানের সাথে তার সম্পর্ক অটুট থাকে। রাতের আঁধারে দেওবন্দ এলাকার বাহিরে তাঁরা উভয়ে একত্রিত হয়ে পরামর্শ করতেন এবং প্রয়োজনীয় কার্যাবলীর নির্দেশনা দিতেন।[৩১] Maulana Ghulam Rasul Mehr বলেন

> "When the political activities in India were for the name sake, the country was not prepared for any aggressive movement. The Muslims were downtrodden and in a fix what to do for the loss of their political dominance and decline to the lowest order. They were not in a position to find out a solution. In that situation, there were very few people who could be prepared for any sacrifices and on whom trust could be made. Apart from this Mahmud Hasan was keen not to damage the infant Dar-ul-ulum and he was not willing to invite Government displeasure or wrath, on this institution"[৩২]

৬.৬ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কতৃক নাযারাতুল মা'আরিফ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

মাওলানা সিন্ধীকে দারুল উলুমের কর্তৃপক্ষ দারুল উলুম থেকে সরিয়ে দিলে তিনি জমইয়াতুল আনসারের পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং দারুল উলুম ত্যাগ করে দিল্লীতে অবস্থান করতে থাকেন। এরপর থেকেই জমইয়াতুল আনসারের বিলুপ্তি না হলেও তা জড়পদার্থের মত অসাড় হয়ে পড়ে।[৩৩] দিল্লীতে অবস্থান করে তিনি আলীগড়ীয় আধুনিক ইংরেজী শিক্ষা ও দেওবন্দের ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন।

---

[৩০] মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৩।

[৩১] সাইয়েদ হুসাইন আহমদ মাদানী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড (দল্লী : আল-জমইয়াত বুক ডিপো, ১৯৫৪), পৃ. ১৪৪।

[৩২] গোলাম রসুল মেহের, *সারগুজাস্ত ই মুজাহিদীন* (লাহোর: কিতাব মনজিল, ১৯৫৬), পৃ. ৫৫২-৫৫৩।

[৩৩] মৌলভী সিরাজ আহমদ, "জমইয়াতুল আনসার সে মওলানা সিন্ধী কা ইসতিফা", *মাসিক আল কাসিম*, সফর সংখ্যা, ১৩৩২ হি., পৃ. ৫।

ব্রিটিশদের প্রদত্ত আধুনিক শিক্ষার ফলে মুসলমানদের মনে ইসলাম সম্পর্কে যে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, উবায়দুল্লাহ তা নিরসনের চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে তিনি ১৩৩১ হি. /১৯১৪ সালে দিল্লীর ফতহপুরী মসজিদে মাদরাসাতুল নাযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া সংক্ষেপে নাযারাতুল মা'আরিফ প্রতিষ্ঠা করেন। নাযারাতুল মা'আরিফ ছিল মূলতঃ কুরআন শিক্ষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। তিনি এ প্রতিষ্ঠানে কুরআন শিক্ষা এমনভাবে দেয়ার চিন্তা করেন যেন ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সকল প্রকার সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব সমূলে বিনষ্ট হয়।

'নাযারাতুল মা'আরিফ' এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী বলেন "পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তরুণদের দৈনন্দিন জীবনে খারাপ অভ্যাস ও অসৎকর্ম দূরীভূত করে কোরআন ও সুন্নাহ'র ছাঁচে ঢেলে তাদের জীবনকে নতুন রূপ দান করাই ছিল নাযারাতুল মা'আরিফের প্রধান লক্ষ্য।[৩৪] মাওলানা সিন্ধী উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে 'কলীদে কুরআন' এবং 'তালীমে কুরআন' নামক দুটি পুস্তক প্রকাশ করেন। এতে (গ্রন্থদ্বয়ে) সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে ভারত উপমহাদেশকে উদ্ধারকল্পে চেতনাহারা মুসলিম সম্প্রদায়কে দলমত নির্বিশেষে মুক্তিসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রতি বিপুলভাবে উৎসাহিত করা হয়। এ কারণে ইংরেজ সরকার সিন্ধীর প্রতি ক্ষিপ্ত হয়ে গ্রন্থ দুটি বাজেয়াপ্ত করে এবং প্রকাশনা বন্ধ করে দেয়। এতদসত্ত্বেও পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং সীমান্ত প্রদেশে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যে দূর্গ কায়েম হয়েছিল এবং যে রোষাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়েছিল এসব কিছুর ক্ষেত্রে এ প্রতিষ্ঠানের প্রভাবই ছিল সব থেকে বেশী।[৩৫] ব্রিটিশরা যে এ প্রতিষ্ঠানটিকেও তাদের সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি হিসেবে অনুধাবন করতে পারে তা তাদের `The petition of the British Queen vs Maulana Obaidullah Sindhi' নামক ব্রিটিশ সি.আই.ডির একটি রিপোর্ট হতেই স্পষ্ট বোঝা যায়। যাতে বলা হয়েছে,

> Maulana Obaidullah Sindhi could not use Darul Ulom Deoband as a training camp for his missionaries (Mujahideen). He therefore decided to establish a Madrasa (Nizaratul Maarif) in Delhi to achieve this purpose. As is evident from its name, the Madrasa was established to interpret the Qur'an and its teachings in a correct perspective. It also taught the Arabic language.[৩৬]

এ রিপোর্টে আরো বলা হয়

> Besides these teachings which Nizaratul Maarif used to impart, what was unlawful, it also used to be a secret meeting place for the conspirators. [৩৭]

ব্রিটিশরা এটাও অভিযোগ করে যে, নাযারাতুল মা'আরিফ ক্রমেই সেসব ব্রিটিশ বিদ্রোহী মুসলমানদের সভাস্থল ও কেন্দ্র হয়ে উঠছে যারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাতে বদ্ধপরিকর। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন

---

[৩৪] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০-৯১।

[৩৫] মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *আজাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী* (ঢাকা: মুহাম্মদ মামুনুর রশীদ প্রকাশিত, ১৯৯২), পৃ. ৮।

[৩৬] The petition of the British Queen vs Maulana Obaidullah Sindhi, Section 17.

[৩৭] The petition of the British Queen vs Maulana Obaidullah Sindhi, Section 20.

হাকীম আজমল খান, ডঃ মুখতার আহমেদ আনসারী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা মোঃ আলী জাওহার, মাওলানা জাফর আলী খান এবং মাওলানা আবুল কালাম আজাদ। শায়খুল হিন্দ দিল্লী গমন করে এ সকল নেতৃবৃন্দের সাথে মাওলানা সিন্ধীর পরিচয় করিয়ে দেন। এভাবে দিল্লীতে মুসলিম ভারতের উচ্চ পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও রাজনীতির সাথে মাওলানা সিন্ধীর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[৩৮]

৬.৭ উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল থেকে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্যোগ

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা, মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠন ভারতীয় জনগণের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং এ লক্ষ্যে তাদের কার্যক্রম বিভিন্ন সভা, স্মারকলিপি প্রদান প্রভৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ দাবি আদায়ে তৎপর। অপরদিকে বিপ্লবী দলসমূহ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় স্বকীয়ভাবে বিপ্লবাত্মক কার্যসিদ্ধিতে উদগ্রীব। এসময়ে শায়খুল হিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে বৃটিশ কবলমুক্ত করতে চেয়েছিলেন। তার পরিকল্পিত বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে বহিরাক্রমণের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা। তিনি যে ক্ষেত্রদুটির (অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক) হতে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রয়াস চালাচ্ছিলেন সেই ক্ষেত্রদুটির কাজও ছিল ভিন্ন। একটি অংশের কাজ ছিল মুক্তিযোদ্ধা সংগ্রহ করা এবং মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোতে শক্ত সামরিক ঘাঁটি তৈরী করা। অন্য অংশের দায়িত্ব ছিল ভারতে বাহির হতে বহির্বিশ্বের সহায়তা ও সমর্থন লাভ করে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ চালানো। মুসলিম সেনা ও যোদ্ধাদের ব্রিটিশবিরোধী প্রচারকর্ম চালানো এবং সরকারকে সবসময় উত্যক্ত করার মাধ্যমে ব্যতিব্যস্ত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, মাওলানা মাহমুদ হাসানের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করা। এটি ছিল মাওলানা কাসিম নানতুবীর সেই লালিত স্বপ্ন যা মাওলানা মাহমুদ হাসানের মাধ্যমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছিল।

১৯১২ সালে মুসলিম বিশ্ব এক নতুন বিপদের সম্মুখীন হয়। বৃটিশ সরকার ও তার সহযোগী রাষ্ট্রসমূহ তুরস্কের বিরুদ্ধে বলকান অঞ্চলের রাজ্যগুলোকে যুদ্ধ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। জার্মানী ও ইটালী জেনারেল ফ্রাংকের মাধ্যমে স্পেনে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রকে ধ্বংস করার জন্য যা করতে চেয়েছিল তা তারা বলকানীদের মাধ্যমে তুরস্কের বিরুদ্ধে করার প্রয়াসী হয়। তদুপরি বৃটিশ সরকার ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে কানপুরের একটি রাস্তাকে সোজা করতে গিয়ে একটি মসজিদকে ধ্বংস করে দেয়। মুসলমানগণ এর তীব্র প্রতিবাদ করলে ইংরেজদের গুলিতে অনেক মুসলমান শাহাদাতবরণ করেন। এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় যে ইউরোপীয় খৃষ্টান শক্তিবর্গ তুর্কীদের শত্রু আক্রমণকারীদেরকে সহায়তা করে ইসলামী খেলাফত সমূলে উচ্ছেদের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

---

[৩৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী: জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ২০।

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান তুর্কী খিলাফত রক্ষায় নিরলসভাবে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং এই সংগৃহীত অর্থ বলকান ও ত্রিপোলীর যুদ্ধে প্রেরণ করেন। সৈয়দ হুসাইন আহমদ মাদানী এ সম্পর্কে বলেন, "বলকান ও ত্রিপোলীর ঘটনায় তাঁর হৃদয় এতটাই বেদনার্ত হয় যে এটি তাঁকে তাঁর পূর্বসূরী কাসিম নানতুবীর পথে চলতে অনুপ্রাণিত করে (মাওলানা কাসিম নানতুবী ও সোভিয়েত-তুর্কী যুদ্ধের সময় খিলাফতের সহযোগিতা করেছিলেন)। ইসলামের স্বার্থে নিবেদিত প্রাণ মাওলানা মাহমুদ হাসান তুর্কী খিলাফতকে টিকিয়ে রাখার জন্য তাঁর পক্ষে সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালান। খিলাফতের জন্য দান তহবিল সংগ্রহ করা ছাড়াও তিনি তুরস্কে ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন, যার মধ্যে একটির নেতৃত্ব দেন তিনি নিজে। কিন্তু নিজের করা সাহায্য সম্পর্কে তিনি সম্পর্কে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। এর প্রধান কারণ, বলকান যুদ্ধের ফলাফল তাঁকে হতাশ করেছিল। কারণ তিনি জানতেন যে, ইউরোপীয় শ্বেতাঙ্গরা ইসলামের আলো বিকিরণকারী জ্বলন্ত মশালকে নির্বাপিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। তদুপরি ব্রিটিশ শাসকদের বিশ্বাসঘাতকতা, রাশিয়া কর্তৃক মুসলমানদের উপর নৃশংসতা এবং তুরস্কের বিভাজন তাঁর এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করে।[৩৯]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। এই যুদ্ধে মিত্র শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইটালি, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও জাপান। কেন্দ্রীয় শক্তিবর্গের মধ্যে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক। ঐ যুদ্ধের সুযোগে উপমহাদেশের বাইরে নানা স্থানে ভারতীয় প্রবাসীদের উদ্যোগে স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের আন্দোলন শুরু হয়। এ অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে শায়খুল হিন্দ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ভারতকে ব্রিটিশ কবলমুক্ত করতে মনস্থ করেন। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সশস্ত্র বিপ্লব ব্যতিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়ানো সম্ভব নয়। তাই, ইসলামী খেলাফত ও পবিত্র স্থানসমুহের সংরক্ষণকল্পে মাওলানা মাহমুদ হাসান দারুল উলুমের শিক্ষার্থীদের বায়আত করানোর সময় তাদের নিকট থেকে জিহাদ করার বায়'আতও গ্রহণ করতেন।[৪০] অতঃপর তিনি তাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলতেন, যেখানেই তোমরা অবস্থান করবে সেখানেই মাদরাসা স্থাপন করে শিক্ষার্থীদেরকে ইসলামী শিক্ষা দেয়ার সাথে সাথে জিহাদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করবে। এই বায়'আতপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীগণ যেখানেই অবস্থান করতেন সেখানেই মাদরাসা স্থাপন করে ইসলামী শিক্ষার পাঠ দেয়ার সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জিহাদের প্রেরণার বীজও বপন করে দিতেন। তাদের প্রচারণার ফলে দেওবন্দ, দিল্লী, দিনাপুর, আমরোট, খাদ্দ (করাচী), চাকওয়াল (পাঞ্জাব) এবং বাংলায় এ ধরণের বহু মাদরাসা স্থাপিত হয় এবং বিশেষ করে ইয়াগিস্তানে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠিত হয়।

শায়খুল হিন্দের পরিকল্পনা ছিল ইয়াগিস্তানে বিপ্লব ঘটানোর মাধ্যমে বিদ্রোহের সূত্রপাত করা। কারণ, ইয়াগিস্তানের অধিবাসীদের বৃটিশরা কখনও পুরোপুরি আয়ত্তে আসেনি। যুদ্ধপ্রবণ এই জাতি পরস্পর এক গোত্র অপর গোত্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত থাকত। এজন্য স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের রিক্রুট করার পূর্বে তাদের

---

[৩৯] সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী, *প্রাগুক্ত*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪০।
[৪০] *তদেব*, পৃ. ২০৩।

একত্রে ঐক্যবদ্ধ করা ছিল জরুরী। শায়খুল হিন্দ দিল্লী থেকে মাওলানা সাইফুর রহমান, পেশোয়ার থেকে মাওলানা ফযলে রাব্বী ও ফযল মাহমুদকে ইয়াগিস্তানে প্রেরণ করেন। তারা ইয়াগিস্তানের বিবাদমান গোত্র ও দলগুলোকে বিবাদ ভুলে একতাবদ্ধ করা এবং সেখানকার জনগণকে বৃটিশবিরোধী করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালান। সীমান্ত এলাকায় শায়খুল হিন্দের অসংখ্য ছাত্র ছিলেন যারা শায়খুল হিন্দের আদর্শে পূর্ব থেকেই অনুপ্রাণিত ছিলেন।

শায়খুল হিন্দ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে উপজাতীয় স্বাধীন এলাকাসমূহের অবস্থান নিরূপণ, যোগাযোগের রাস্তা আবিষ্কার ও সামরিক ছাউনি নিরূপণের দায়িত্ব দেন। সিন্ধী দীর্ঘ সাত বছর পরিশ্রম করে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহিমের সহযোগিতায় সে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। মাওলানা মুহাম্মদ মিয়া মনসুর আনসারীকেও তিনি সীমান্তের উপজাতিদের মধ্যে জিহাদের চেতনা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণদানের উদ্দেশ্যে পাঠান। শায়খুল হিন্দ মনে করতেন, ভারতের সর্বস্তরের স্বাধীনতাকামী জনগণ মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহ বিশেষ করে আফগানিস্তান, ইরান এবং তুরস্কের উসমানী খিলাফতকে একত্রিত করে সম্মিলিতভাবে ব্রিটিশদের উপর আক্রমণ করা ব্যতিত এশিয়াকে ইউরোপের আগ্রাসন থেকে মুক্ত করা অসম্ভব। তার পরিকল্পিত বিপ্লব বাস্তবায়নের রূপরেখার মধ্যে ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ সৃষ্টি করে বহিরাক্রমণের মাধ্যমে ভারতকে স্বাধীন করা।[৪১] সে উদ্দেশ্যে তিনি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা অনুসারে তুর্কী সামরিক বাহিনী কাবুলের ভিতর প্রবেশ করে সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে ব্রিটিশ ভারতে আক্রমণ চালাবে। একই সময় ভারতের অভ্যন্তরে বিদ্রোহ ঘটানো হবে।

এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি যে দু'জন বিশ্বস্ত ও অনুগত সহকর্মীকে নির্বাচিত করেছিলেন তারা হলেন মাওলানা উবায়দল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুর আনসারী। এছাড়া ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী, হাকীম আব্দুর রাজ্জাক এবং সীমান্ত প্রদেশের সাহসী যুবক খান আব্দুল গাফফার খান প্রমুখ ও এই পরিকল্পনায় জড়িত ছিলেন।[৪২] সীমান্তে অবিসংবাদিত নেতা হাজী তুরঙ্গযয়ী, মোল্লা সান্ডাকের ন্যায় প্রসিদ্ধ বীর মুজাহিদগণও তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রধান সদস্য ছিলেন। এছাড়া মাওলানা ফযলে রাব্বী, মাওলানা ফযল মাহমুদ ও মাওলানা মুহাম্মাদ, মাওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী, মাওলানা খলীল আহমাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ আহমাদ চাকওয়ালী, মাওলানা মুহাম্মাদ সাদিক, শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম রান্দেরী, মাওলানা গোলাম মুহাম্মাদ দীনপুরী, মাওলানা তাজ মাহমুদ আমরোঠী প্রমুখ তাঁর আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এছাড়া শায়খুল হিন্দের কাছ থেকে থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ও জিহাদের বায়'আতকৃত বহু ছাত্রও দেশের অভ্যন্তরে এবং বাইরে তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তৎপর ছিলেন।

---

[৪১] এ.এম.এম. আব্দুল জলীল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জিহাদ* (ঢাকা: ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩), পৃ. ১০৫।
[৪২] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরান-এ মাল্টা* (দিল্লী: আল জমইয়াত বুক ডিপো., ১৯৭৬), পৃ. ২০, ২১।

এছাড়াও মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা জাফর আলী খান, হাকীম আজমল খান, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, নওয়াব ভিকারুল মূলক এবং মাওলানা হাসরত মোহানীর ন্যায় শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ শায়খুল হিন্দের সশস্ত্র বিপ্লবের সাথে ঐক্যমত পোষণ করে তাঁর সহায়ক ও পরামর্শদাতা ছিলেন। দেশের শীর্ষস্থানীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দ পাশাপাশি হিন্দু ও শিখরাও নেতৃবৃন্দরাও তাঁর সাথে আলাপ করে সলাপরামর্শ করত। আগত হিন্দু, মুসলিম ও শিখদের থাকার জন্য তিনি তাঁর বাসভবনের নিকটেই একটি বাসভবনের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এখানে প্রত্যেক ধর্মের লোকদের নিজ নিজ রুচি অনুযায়ী থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা থাকত। শায়খুল হিন্দ তার বাসভবনের এক গোপন কক্ষে আগত নেতৃবৃন্দের সাথে অতি গোপনে দেখা সাক্ষাত ও মতবিনিময় করতেন।[৪৩]

শায়খুল হিন্দ হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ীকে ইয়াগিস্তানে গমন করে জিহাদের পতাকা ধারণ করে জিহাদ পরিচালনা করার অনুরোধ জানালে তিনি সম্মত হন এবং তাঁর উপস্থিতিতে প্রচুর মুজাহিদদের সমাগম হয়। জিহাদী চেতনায় উদ্দীপিত মুজাহিদগণ কয়েকটি এলাকা দখল করে নেয়। এহেন অবস্থা দেখে ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা এ ব্যাপারে জরুরী ভিত্তিতে সরকারকে অবহিত করে। অবস্থার গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার সেখানে সেনা প্রেরণ করে এবং ইংরেজ সৈন্যরা মুজাহিদদের উপর আকস্মিক হামলা চালায়। মুজাহিদগণও আক্রমণের পালটা জবাব দিয়ে কয়েক প্লাটুন সৈন্যকে ধ্বংস করে দেয়। ইংরেজরা তাদের এ পরাজয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে সীমান্তে আরো শক্তি নিয়োগ করে।

৬.৮ বিপ্লবী মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশদের বিভক্তির প্রচেষ্টা

সীমান্ত প্রদেশের মুজাহিদদের কাছে পরাজিত হয়ে ইংরেজরা আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহ খানকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ উৎকোচ প্রদান করে যার বিনিময়ে তাকে সীমান্ত বিদ্রোহীদের সাথে সম্পর্কে ছেদ করতে হয়। ব্রিটিশরা এটাও প্রচারণা চালায় যে, ইসলামী শরীআহ অনুযায়ী বাদশাহের অনুমতি ব্যতিরেকে জিহাদ করা বৈধ নয়। পরোক্ষভাবে বোঝানো হয় যে, এ অঞ্চল যেহেতু আমীর হাবিবুল্লাহ খানের অধীনে সুতরাং মুসলমানরা তার নেতৃত্বেই ঐক্যবদ্ধ হবে এবং যখন আমীর মুসলমানদের যুদ্ধ করার নির্দেশ দেবেন তখনই তার পালন করা মুসলমানদের জন্য শরীআহ সম্মত হবে।

এরপর মুসলমানদের তুর্কী খিলাফতের প্রতি সমর্থন বিনষ্ট করার জন্য ব্রিটিশরা প্রচার করে যে, তুরস্ক নিজ থেকেই ১ম বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করেছে এবং এই যুদ্ধ ধর্মীয় নয় বরং সম্পূর্ণ রাজনৈতিক। তারা ভারতের মুসলমানদের এই বলে আশ্বস্ত করে যে, ব্রিটিশরা মুসলমানদের পবিত্র স্থানগুলো রক্ষা করবে এবং মক্কা-মদীনা সহ কোন পবিত্র ধর্মীয় স্থানেই বোমা ফেলা হবেনা। তারা এ ও ঘোষণা করে, তুরস্কের খলিফা যে অধার্মিক

[৪৩] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১।

জীবন যাপন করেন, তাতে তিনি মুসলমানদের নেতা হতে পারেননা। এই ব্যাপারে মুসলমানদের প্রভাবিত করার জন্য তারা মৌলভী আব্দুল হকের মাধ্যমে একটি ফতওয়াও জারি করে যাতে বেশ কিছু ব্রিটিশপন্থী উলামার স্বাক্ষর নেয়া হয়। মাওলানা মাহমুদ হাসানের কাছেও এই ফতওয়া দুইবার স্বাক্ষর করার জন্য পেশ করা হয়। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।[৪৪] তাদের এ প্রচারণা অনেক মুজাহিদদের মনেই দ্বিধার জন্ম দেয়, যার ফলে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে বিপ্লবী ঐক্যে ফাটল দেখা দেয়।[৪৫]

ব্রিটিশদের রাজনৈতিক কূটচালের কারণে ইয়াগিস্তানের মুজাহিদীনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হলেও মুজাহিদদের একটি বৃহৎ অংশ তখনো জিহাদের উৎসাহে টগবগ করছিলেন। তাদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ শায়খুলহিন্দকে সেখানে আগমন করে মুসলমানদের নতুন করে ঐক্যবদ্ধ করার অনুরোধ জানান এবং যুদ্ধ পরিচালনায় বিপুল পরিমাণ রসদ ও অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। শায়খুল হিন্দ অনুধাবন করতে পারেন যে, জনসাধারণের সামান্য আর্থিক সাহায্যে জিহাদের এত বড় প্রয়োজনীয়তা মেটানো কোন অবস্থাতেই সম্ভব নয়। তদুপরি, এই বিপ্লবী কর্মকান্ডের পেছনে মাওলানা মাহমুদ হাসানের পরোক্ষ তৎপরতা ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার নজরে পড়ে যাওয়ায় তার গ্রেফতার ছিল সময়ের ব্যাপার মাত্র। একারণে তিনি অনুষ্ঠিতব্য সশস্ত্র বিপ্লবে আন্তর্জাতিক সহায়তার প্রয়োজনীয়তা উপলব্দি করে তার পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৬.৯ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ

উদ্ভূত পরিস্থিতে ডঃ মুখতার আহমেদ আনসারী শায়খুল হিন্দকে যত দ্রুত সম্ভব গ্রেফতার এড়াতে ভারত ত্যাগ করার উপদেশ দেন। ভারতীয় বিপ্লবী দলের কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা কমিটি শায়খুল হিন্দের বাসভবনে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারী পূর্ব পরিকল্পিত বিপ্লব ঘটাতে হবে। কমিটি এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে বিপ্লবী দলের সর্বাধিনায়ক শায়খুল হিন্দের হাতে অর্পণ করেন। এ কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন ছিল- ইতিপূর্বে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে তুর্কী ও আফগান সরকারের সাথে ভারতীয় বিপ্লবী দলের যেসব চুক্তি হয়েছিল সেগুলো সামনাসামনি আলোচনা করে অনুমোদন করিয়ে নেয়া। কথা ছিল, শায়খুল হিন্দ স্বয়ং মক্কা হয়ে তুরস্ক গিয়ে তুর্কী সরকার কর্তৃক অনুমোদিত চুক্তি নিয়ে কাবুলে আসবেন এবং আফগান সরকার থেকে ওই চুক্তির অনুমোদন নিয়ে সে সম্পর্কে তুর্কী সরকারকে অবহিত করবেন। তদনুসারে তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করবে। এ কর্মসূচীর অধীনে শায়খুল হিন্দ হিজাযে গমন করার এবং মাওলানা সিন্ধীকে আফগানিস্তানে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত নেন।[৪৬] ১৯১৫ সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে ধীরে ধীরে সংগঠিত করার লক্ষ্যে শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে আফগানিস্তানের কাবুলে প্রেরণ করেন। মুঘল আমলে কাবুল ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজগণও কাবুল দখল করার চেষ্টা চালিয়েও

---

[৪৪] Syed Mohammad Mian, *op. cit.*, pp. 33-34.
[৪৫] *Ibid.*, 32-33.
[৪৬] *Ibid.*, 34-35.

ব্যর্থ হলেও আফগানিস্তানে বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ ইংরেজদের হাতে ছিল। কিন্তু মুসলিম স্বাধীনতাকামীদের সাথে কাবুল ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোর জনগণের সম্পর্ক বজায় ছিল। সৈয়দ আহমদ শহীদের সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসীরা ও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করে ও বিদ্রোহীদের সহায়তা দিয়েছিল। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কাবুল, পাঞ্জাব ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের শিক্ষার্থীগণ ও এ প্রতিষ্ঠানে জ্ঞান অর্জনের জন্য আগমন করেন। শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান কেবল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতা বা শিক্ষাবিদই ছিলেন না বরং, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের শায়খ ও মুরশিদ ছিলেন। কাবুল ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তের শিক্ষার্থীগণ তার নিকট শুধু তরীকতের জন্যই বায়আত হতেন না বরং দেশকে স্বাধীন করার জন্যও বায়আত হতেন। এভাবে পূর্বাহ্নেই এই অঞ্চলগুলোতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরী করা হয় যাতে পরবর্তীতে বিপ্লব সংগঠনের সময় ইংরেজ আওতার বাইরে আফগানিস্তান ও সীমান্ত অঞ্চল হতে ভারতে বহিরাক্রমণ চালিয়ে ইংরেজদের পতন ঘটানো সহজ হয়।

১ম বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে ইংরেজদের দুর্বলতার সুযোগে বিপ্লবী কর্মসূচীকে আনজাম দেয়ার জন্য এই বিক্ষিপ্ত জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বিপ্লবী দলের নেতৃবৃন্দ ইয়াগিস্তানের জনগণকে বৃটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুপ্রাণিত করার প্রয়াস পান। এরই আলোকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মিশনের কর্মপন্থা নির্ধারণ ও আফগান সরকারের সাথে বিপ্লবী দলের চুক্তি অনুমোদন করিয়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে শায়খুল হিন্দ মাওলানা সিন্ধীকে কাবুলে প্রেরণ করেন। মাওলানা মাদানী বলেন, সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া ইংরেজদেরকে ভারত থেকে উৎখাত করা মোটেও সম্ভব নয়। এর জন্য যুদ্ধকেন্দ্র, অস্ত্রশস্ত্র, মুজাহিদদের একান্ত প্রয়োজন। ইয়াগিস্তানকে বিপ্লবী দলের বহিরাক্রমণের যুদ্ধকেন্দ্র নির্ধারণ করা হয়। কেন্দ্রে প্রচুর পরিমাণে যুদ্ধের রসদ, অস্ত্রশস্ত্র, যুদ্ধোন্মাদ নির্ভীক সাহসী সৈন্যের খুবই প্রয়োজন। এছাড়া সীমান্তের যুবকেরা যুদ্ধ করতে অভ্যস্ত এবং সাহসী ও নির্ভীক হয় এজন্য একতাবদ্ধ করা এবং জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন এবং এদের দ্বারাই দেশ মুক্ত করা সম্ভব।[৪৭]

সিন্ধীর কাবুল গমন সফলতা পেয়েছিল মাওলানা মাহমুদ হাসানের অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে। সিন্ধী প্রথমে কাবুলে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন না; কিন্তু দীক্ষাগুরু মাওলানা মাহমুদ হাসানের আদেশ শিরোধার্য মনে করে তিনি কাবুল গমন করেন। এটা ছিল মাওলানা সিন্ধীর বিপ্লবী জীবনের প্রকৃত সূচনালগ্ন।

কাবুল ছিল বিপ্লবী কর্মকান্ড ও বিপ্লবী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উর্বর ক্ষেত্র। মাহলানা মাহমুদ হাসান তাঁর একনিষ্ঠ শিষ্যের মাধ্যমে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের জনগণের পুঞ্জীভূত হতাশা, ক্ষোভ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে কাজে লাগানোর উপদেশ দেন।[৪৮] মাওলানা সিন্ধী প্রথমে এ মিশনের গুরুত্ব সম্যক উপলব্দি করতে না পারলেও পরে

---

[৪৭] Shan Muhammad, *The Growth of Muslim Politics in India (1900-1919)* (New Delhi, 1991), pp. 162-63.
[৪৮] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 127.

তিনি তা বুঝতে পারেন এবং তাকে প্রদত্ত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করেন। এ বিষয়ে মাওলানা সিন্ধীর নিজের ভাষায়, "১৯১৫ সালে শায়খুল হিন্দের নির্দেশে আমি কাবুল গমন করি। বিস্তারিত কোন প্রোগ্রাম আমাকে দেয়া হয়নি। কিন্তু, কোন প্রোগ্রাম ব্যতিরেকে কাবুল গমন করা আমার ভালো লাগেনি। শায়খুল হিন্দের হুকুম পালনার্থে আমি কাবুল যেতে বাধ্য হই। দিল্লীর রাজনৈতিক দলকে বললাম, শায়খুল হিন্দ কর্তৃক কাবুল গমনের জন্য আমাকে মনোনয়ন দেয়া হয়েছে। এ কথা শুনে তারা আমাকে তাদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করার দায়িত্ব অর্পণ করেন। তবে, তারাও আমাকে কোন প্রোগ্রাম দিতে অক্ষম ছিলেন। কাবুল গমন করার পর জানা গেল, শায়খুল হিন্দ যে দলের প্রতিনিধি হয়ে কাজ করতেন সে দলের পঞ্চাশ বছরের শ্রমের ফল আমার সামনে অগোছালো অবস্থায় আছে। এ দলের কর্মীদের জন্য আমার ন্যায় শায়খুল হিন্দের একজন সেবকের প্রয়োজন ছিল। তাই, কাবুলে গমনের জন্য আমাকে মনোনয়ন দেয়ায় আমি গৌরব বোধ করি।"[৪৯]

১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় উপমহাদেশের বাইরে বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় প্রবাসীগণ স্বদেশের মুক্তি সংগ্রামের কাজ আরম্ভ করে দেয়। এদিকে বৃটিশ সরকার ভারতের প্রতিটি রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। চারদিকে ধরপাকড় শুরু হয়। তারা একে একে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জওহর, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে গ্রেফতার করে। এমন সময় মাওলানা সিন্ধীর কাছে শায়খুল হিন্দের আদেশ এসে পৌঁছে যে, তুমি কাবুলের দিকে রওয়ানা দাও এবং আমি হিজাজের পানে ছুটছি।

মাওলানা সিন্ধী এ আদেশ পেয়ে দিল্লী ত্যাগ করে ১৯১৫ সালের এপ্রিলে সিন্ধুতে চলে আসেন এবং এর তিন-চারমাস কাবুলের পথের অনুসন্ধান জেনে শায়খ আব্দুর রহীমকে সঙ্গে নিয়ে কাবুলের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। শায়খ আব্দুর রহীম মাওলানা সিন্ধীকে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেন। মাওলানা সিন্ধী, আব্দুল্লাহ, ফাতিহ মুহাম্মাদ ও মুহাম্মাদ আলী এই তিন ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে বেলুচিস্তান ও ইয়াগিস্তান হয়ে বিনা পাসপোর্টে কাবুলের পথে যাত্রা করেন এবং ১৯১৫ সালের ১৫ আগস্ট আফগান সীমান্তে পৌঁছান। অতঃপর কাবুলে উপনীত হন। পথিমধ্যে আফগানিস্তানের স্থানীয় সরকারগুলো তাকে সহায়তা করেন। তিনি কাবুলে ইতিপূর্বে আগত অনেক স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দেরকে দেখতে পান।

৬.১০ বিভিন্ন দেশে বিশেষ মিশন প্রেরণ

১৯০৫ সাল হতে ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতের মুসলিম বিপ্লবী দলগুলো ভারতে ব্রিটিশ দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে জাপান, চীন, বার্মা ফ্রান্স, আমেরিকায় বিশেষ মিশন প্রেরণ করা হয়। এসব মিশনে যারা নেতৃত্ব দেন তারা হলেন-

---

[৪৯] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *যাতী ডায়েরী* (লাহোর: সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৪৪), পৃ. ১৫।

ক. চীন ও বার্মা- মাওলানা মকবুলুর রহমান এবং মাওলানা শওকত আলী

খ. জাপান - প্রফেসর বরকতউল্লাহ

গ. ফ্রান্স - চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবী

ঘ. আমেরিকা - হরদয়াল

মাওলানা মকবুলুর রহমান এবং মাওলানা শওকত আলী চীনে 'আল ইয়াকীন" নামে একটি পত্রিকা এবং পরবর্তীতে বার্মায় 'ইনসানী বেরাদরী' নামে একটি দল গঠন করেন।[৫০]প্রফেসর বরকতউল্লাহ জাপানে 'Islamic Fraternity' নামে একটি দল এবং একই নামে একটি পত্রিকা চালু করেন। ফ্রান্সে চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবীর নেতৃত্বে 'Gadar Party' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং এ সংগঠনের পক্ষ থেকে 'ইনকিলাব' নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়। হরদয়ালের নেতৃত্বে ও আমেরিকায় 'Gadar Party' নামে একটি দল প্রতিষ্ঠা করা হয় ও একই নামে একটি পত্রিকা বের করা হয়। পরবর্তীতে প্রফেসর বরকতউল্লাহ ও চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবী ও হরদয়ালের সাথে যোগ দেন।

৬.১১ ব্রিটিশ বিরোধী আন্তর্জাতিক মৈত্রী গঠন

ভারতে তৎকালীন বিদ্যমান বিপ্লবী দলগুলি এসকল মিশন প্রেরণের পাশাপাশি ব্রিটিশদের উৎখাত করার লক্ষ্যে তুরস্কের সহায়তা লাভ করে। ভারতের অনেক ছাত্র তখন জার্মানীর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষারত ছিলেন এবং যেসব মুক্তিকামী ভারতীয় নেতা বিভিন্ন দেশে অবস্থানরত ছিলেন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায় তারা ভারত থেকে ইংরেজ উৎখাতের জন্য জার্মান সরকারের সাথে আঁতাত করেন। এ আঁতাতে তুরস্ক সরকারও যোগ দেয়। কারণ, জার্মানী ও তুরস্ক উভয়ই তখন মিত্রশক্তির সাথে যুদ্ধরত ছিল। এ সময়ে হরদয়ালের নেতৃত্বে প্রফেসর বরকতুল্লাহ, ডাক্তার তারক দাস ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীর সহযোগিতায় বার্লিনে জার্মান সরকারের পররাষ্ট্র দফতরের অধীনে 'ইন্ডিয়া ন্যাশনাল পার্টি' গঠিত হয়। তৎকালীন সুপরিচিত স্বদেশী আন্দোলনের নেতা রাজা মহেন্দ্র প্রতাপও ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টিতে যোগ দেন। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টির কর্মকর্তাবৃন্দ জার্মান সরকারকে প্রভাবিত করে বৃটিশ ভারতকে স্বাধীন করার জন্য অনুপ্রাণিত করেন। তুর্কো-জার্মান মৈত্রী গড়তে তাদের অবদান ছিলেন অনন্যসাধারণ।[৫১]

ফলে, জার্মান সরকার তুরস্ক সরকারকে সহায়তার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। কিন্তু তুরস্ক ও জার্মানী এ সম্মিলিত আক্রমণ চালাতে হলে ভারতের মধ্যবর্তী দেশ হিসেবে ইরান অথবা আফগানিস্তানের সাথে আতাঁত করা ও বাধ্যতামূলক। কিন্তু ইরান ও আফগানিস্তান উভয় দেশই তখন ব্রিটিশ প্রভাবাধীনে ছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে

---

[৫০] আবদুর রহমান, *তাহরীকে রেশমী রুমাল* (লাহোর: ক্লসিক, ১৯৬০), পৃ. ১৩৭-১৪০।

[৫১] আবদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১; Vinod Kumar Saxena, *Muslims and the Indian National Congress (1885-1924)* (Delhi, 1985), p. 160.

আক্রমণ চালানোর জন্য আফগানিস্তানকে প্রাধান্য দেয়া হয় কারণ আফগান জনসাধারণ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী। জার্মানী-তুরস্কের যৌথ শক্তি প্রস্তাবে আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহ প্রথমে রাজী না হলে ও তার পরামর্শসভার অধিকাংশ নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার পক্ষে মত দেন। জনসমর্থনের চাপে মত দান করলে ও তিনি আফগান সেনাবাহিনীকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার অনুমতি দানে অস্বীকৃত হন। তবে জনগণের স্বেচ্ছায় যোগদানের ওপর কোন বিধিনিষেধ আরোপ করা হতে বিরত থাকেন। তিনি সম্পূর্ণ আফগানিস্তানকে যুদ্ধের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করার অনুমতি না দিয়ে আক্রমণ চালানোর জন্য চারটি স্থান নির্ধারণ করে দেন।

ক. কালাত ও মাকরান গোত্রসমূহ তুর্কী সৈন্যের নেতৃত্বে করাচী সেক্টরে আক্রমণ চালাবে।

খ. গযনী ও কান্দাহারের গোত্রগুলো তুর্কী সৈন্যের নেতৃত্বে কোয়েটা সেক্টরে আক্রমণ চালাবে।

গ. পেশোয়ার সেক্টরে দুররা-এ খায়বারের মাহমন্দ ও মাসউদী গোত্র সমূহকে নিয়ে তুর্কি সেনাবাহিনী আক্রমণ চালাবে।

ঘ. উগী সেক্টরে কুহিস্তানী গোত্রসমূহ তুরস্কের বাহিনীসহ সম্মিলিতভাবে আক্রমণ চালাবে।

এদিকে ভারতে অনেকগুলো সেক্টরে ভারতের বিপ্লবী উলামা সদস্যগণ পূর্ব থেকেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই কেন্দ্রগুলোর হেড কোয়ার্টার ছিল দিল্লীতে, যেখানে আলী ভ্রাতৃদ্বয়, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, মহাত্মা গান্ধী, ডঃ আনসারী, মতিলাল নেহরু, লালা লাজপত রায়, এবং রাজেন্দ্র প্রসাদ কাজ করে যাচ্ছিলেন। তাদের নির্দেশনায় যে সমস্ত কেন্দ্র কাজ করছিল তাদের মধ্যে আটটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

ক. সুরাট, গুজরাট ও বোম্বের কেন্দ্র ছিল নান্দের-এ। মাওলানা ইব্রাহিম আহমেদ বুজুর্গ ও পুনুন প্যাটেল ছিলেন এ কেন্দ্রের প্রধান কর্মী।

খ. উত্তর প্রদেশের কেন্দ্র ছিল পানিপথ। মাওলানা আহমদ উল্লাহ ছিলেন এ কেন্দ্রের প্রধান।

গ. চাকওয়ালের মাওলানা মুহাম্মদ আহমদের নেতৃত্বে পাঞ্জাবের কেন্দ্র ছিল লাহোর।

ঘ. ভাগলপুরের কেন্দ্র ছিল দীনপুর এবং এর নেতা ছিলেন মাওলানা আবু সিরাজ আবু মোহাম্মদ।

ঙ. মাওলানা তাজ মাহমুদের নেতৃত্বে সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের কেন্দ্র ছিল আমরোট।

চ. করাচী, কালাত ও লাসবেলার কেন্দ্র ছিল করাচী এবং এর নেতা ছিলেন মাওলানা মুহাম্মাদ সাদিক করাচভী।

ছ. সীমান্ত অঞ্চলের উত্তরাংশের কেন্দ্র ছিল আতমানজাই ও এর নেতৃত্বে ছিলেন আব্দুল গাফফার খান।

জ. স্বাধীন উপজাতিগুলোর কেন্দ্র ছিল তুরঙ্গজাই এবং এর নেতৃত্বে ছিলেন মাওলানা ফজলে ওয়াহিদ।

পেশোয়ারের দুররা-এ খায়বার সেক্টরে হাজী তুরঙ্গযয়ী, উগী সেক্টরে মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক নেতৃত্ব দিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বাংলা ও আসাম অঞ্চলেও বিপ্লবের কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল।[৫২] আফগানিস্তানের সম্মতিসূচক সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর আফগানিস্তানে ভারত, তুরস্ক ও জার্মানীর প্রতিনিধির সমন্বয়ে একটি দল

[৫২] আবদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬০।

পাঠানো হয়। এ প্রতিনিধি দলে ছিলেন রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ, প্রফেসর বরকতুল্লাহ, ডক্টর ফ্যান বেন্টিং, ক্যাপ্টেন ফ্যান বেন্ডোনিয এবং ক্যাপ্টেন কাসেম বে প্রমুখ।[৫৩] আফগান সরকারের পক্ষ হতে তাদের উষ্ণ সম্বর্ধনা দেয়া হয় এবং তাদের বাবর বাগের রাজকীয় অতিথিশালায় থাকতে দেয়া হয়।[৫৪]

আমীর হাবিবুল্লাহ পুনরায় প্রতিনিধিদলের প্রত্যেকের সাথে পৃথক পৃথক আলোচনার ব্যবস্থা করেন। তিনদিনব্যাপী এ আলোচনার প্রথমদিন তিনি রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ এবং প্রফেসর বরকতল্লাহর সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন যাতে বিশেষভাবে অস্থায়ী সরকার গঠন সম্পর্কে আলোচনা স্থান পায়। দ্বিতীয়দিন জার্মান প্রতিনিধিদলের সদস্য ফ্যান বেন্টিং এবং ফ্যান বেন্ডোনিয তাদের আলোচনায় আমীরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন, প্রস্তাবিত অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠিত হলে এ সরকারকে জার্মান সরকার সমর্থন ও স্বীকৃতি দিবে এবং অর্থ, সৈন্য, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দ্বারা সাহায্য করবে। বৃটিশরা আফগানিস্তান আক্রমণ করলে জার্মান ও তুরস্ক সরকার আফগানিস্তানকে সহায়তা করবে এবং বৃটিশের উপর পাল্টা আক্রমণ চালাবে। তৃতীয় দিন আমীর তুরস্ক প্রতিনিধি কাসিম বে'র সাথে এক আলোচনায় মিলিত হন। এ প্রতিনিধি আফগানিস্তানকে সর্বপ্রকারের সহায়তা দেয়ার আশ্বাস দেয়। প্রতিনিধিদলের সকল সদস্যের সাথে সম্মিলিত ও পৃথকভাবে আলোচনা করার পর আমীর আশ্বস্ত হয়ে আফগানিস্তান সরকারের পক্ষ থেকে শর'ঈ বিচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাজী আব্দুর রাজ্জাককে প্রতিনিধি দলের প্রধান উপদেষ্টা করে দেন।

৬.১২ কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর কূটনৈতিক তৎপরতা

মাওলানা সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ অক্টোবরে কাবুলে পৌঁছে সেনাপতি মুহাম্মাদ নাদির খান এবং সরকার মাহমুদ খান তরজী ও শর'ঈ বিচার বিভাগের বিভাগীয় প্রধান কাযী আব্দুর রাজ্জাকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। কাযী আব্দুর রাজ্জাক ছিলেন দারুল উলুম দেওবন্দ ও মাওলানা রশীদ আহমাদ গঙ্গোহীর প্রাক্তন ছাত্র। মাওলানা সিন্ধী কাজী আব্দুর রাজ্জাকের সহায়তায় আমীর হাবিবুল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে সক্ষম হন। তিনি তার আগমনের উদ্দেশ্য ও প্রস্তাবসমূহ আমীরের সমীপে উপস্থিত করেন এবং তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। আমীর হাবিবুল্লাহর ভাই এবং আফগান সেনাপ্রধান সরদার নসরুল্লাহ খানের সাথে উবায়দুল্লাহর প্রথম বৈঠক তাঁর পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আরো সহায়তা করে। নসরুল্লাহ খান উবায়দুল্লাহর পরিকল্পনায় অত্যন্ত চমৎকৃত হন। দেশকে বিদেশী শক্তির হাত থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কৃত প্রচেষ্টা সমুহের মধ্যে এটি ছিল প্রথম বৈঠক যা দেশের বাইরে অনুষ্ঠিত হয়। সিন্ধীর পরবর্তী বৈঠক ছিল আফগানিস্তানের বাদশাহ আমীর হাবিবুল্লাহ'র সাথে; এবং তিনিও সিন্ধীর পরিকল্পনা দ্বারা প্রভাবিত হন। এসময় জার্মানী হতে আসা একটি প্রতিনিধি দল আফগানিস্তানে অবস্থান করলেও বাদশাহ'র আচার আচরণে তারা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। সিন্ধী এই তাদের আস্থা অর্জন করতে সক্ষম হন এবং এর বিনিময়ে

[৫৩] আবদুর রহমান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭১।
[৫৪] মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

সহযোগিতার দাবী জানান।[৫৫] আমীর হাবিবুল্লাহ তাকে ভারত-তুর্কী-জার্মান মিশনের সাথে যোগাযোগ করে কাজ করার অনুমতি দেন। মাওলানা সিন্ধী মিশনের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করে বুঝতে পারলেন, মিশনের হিন্দুরা ডিক্টেটরশীপ গ্রহণ করে মিশনকে একচেটিয়া তাদের আয়ত্বাধীনে রেখেছে। এর কারণ, মুসলমানদের নিজেদের হীনমন্যতা বোধ ও নিজেদের সংখ্যালঘু ভাবার নির্বুদ্ধিতা। মাওলানা সিন্ধী রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সাথে বিভিন্ন সময়ে আলাপ আলোচনা করে তাকে তার ডিক্টেটরশীপ থেকে ফিরাতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি রাজা মহেন্দ্রকে মুসলমানদেরকে যথাযথ প্রতিনিধিত্ব দিতে বাধ্য করেন।

৬.১৩ কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা ও কার্যক্রম

রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতুল্লাহ কাবুলে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের পরিকল্পনা করেন।[৫৬] এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯১৫ সালের ২৯ অক্টোবর কাজী আব্দুর রাজ্জাক খানের বাসভবনে বিপ্লবী কাউন্সিলের এক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৫৭] আফগান সরকার এ অস্থায়ী সরকারের অফিসের জন্য কয়েকটি সরকারি ভবন প্রদান করেন। ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর অস্থায়ী সরকারের ঘোষণা দেয়া হয়। এ অস্থায়ী সরকারে তুর্কী ও জার্মান সদস্যও অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ নিজেই অস্থায়ী সরকারের আইন রচনা করেছিলেন এবং তিনি নিজেই এ সরকারের আজীবন প্রেসিডেন্ট হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। এজন্য তার উপরেই এ সরকারের সকল দায়িত্বভার বর্তায়। রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ অস্থায়ী সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং প্রফেসর বরকতুল্লাহ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।[৫৮] কিন্তু মাওলানা সিন্ধীর অবর্তমানে অস্থায়ী সরকার পরিচালনা করা দুরূহ মনে করে তাকে এ সরকারের মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। মাওলানা সিন্ধী হলফনামা সামান্য সংশোধন করে ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। শুরুতে এ তিন সদস্য বিশিষ্ট সরকার গঠিত হয়। ক্রমশঃ এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৯] কয়েকদিন পর মিশনের কর্মসূচী নিয়ে জার্মান সদস্যদের সাথে ভারতীয় সদস্যদের মতানৈক্য ঘটে। মাওলানা সিন্ধী এ মতানৈক্য দূর করার চেষ্টা করেন এবং আফগান আমীরের সামনে এক যুক্তিযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেন। এতে জার্মান ও ভারতীয়দের মধ্যে সমঝোতার সৃষ্টি হয়।

মাওলানা সিন্ধীর কাবুল গমনের পূর্বেই ১৯১৫ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে কাবুলে লাহোরের বিভিন্ন কলেজ থেকে ১৫ জন শিক্ষিত নওজোয়ান আগমন করেন। লাহোর থেকে আগত ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ক গমন করে তুর্কীদের সহায়তায় মিত্রশক্তি বিরোধী যুদ্ধে যোগদান করা। তারা কাবুল থেকে তুরস্কে গমন করার চেষ্টা

---

[৫৫] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 127.
[৫৬] P.C. Bampford, *Histories of the Non-cooperation and Khiiafat Movements* (Delhi, 1974) p. 123; Kamlesh Sharma, *Role of Muslims in Indian Politics (1857-1947)* (New Delhi, 1985), p. 132.
[৫৭] হাফিজ বাবর খান, *বড়-ই সাঘির পাক ও হিন্দ কি সিয়াসত মেঁ উলামা কা কিরদার* (ইসলামাবাদ, ১৯৮৫), পৃ. ১২০।
[৫৮] মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৭; Mahendra Pratap, *My Life Story of Fifty Five Years* (Dehradun, 1947), p. 51.
[৫৯] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল* (লাহোরঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫৫), পৃ. ৬৬-৬৭।

করলে আফগান সরকার তাদেরকে গ্রেফতার করে নজরবন্দী করে রাখে। মাওলানা সিন্ধী নায়েবুস সুলতান সরদার নসরুল্লাহ খানের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদেরকে মুক্ত করেন এবং কাবুলে অবস্থান করে বৃটিশ-ভারত মুক্ত করার জন্য উদ্বুদ্ধ করলে তারা তুরস্ক গমন বাতিল করে দেন। কিছুদিন পর পেশোয়ার থেকে কতিপয় নওজোয়ান কাবুলে পৌছলে পূর্বোক্ত ছাত্র দলের সাথে ঝগড়া বিবাদ শুরু হয়। অপরদিকে, বেকারত্ব উভয় দলের মধ্যেই অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে। মাওলানা সিন্ধী এসব লক্ষ্য করে অস্থায়ী সরকারের মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন বিভাগে সেক্রেটারী এবং অন্যান্য পদে লাহোরী এবং পেশোয়ারী ছাত্রদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি এদের মধ্য থেকে শায়খ মুহাম্মাদ ইবরাহীম, মৌলভী মুহাম্মাদ আলী কাসুরীর ন্যায় বিশেষ কয়েকজন কলেজ শিক্ষার্থীকে আলাদা করে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক শিক্ষা দেন।

অস্থায়ী ভারত সরকারের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক মিশন প্রেরণ

কাবুলস্থ ভারতের অস্থায়ী সরকার আমীর নসরুল্লাহ খানের অনুমতিতে উপমহাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নে বিদেশে তিনটি মিশন প্রেরণ করে। প্রথম মিশনটি প্রেরিত হয় রাশিয়ায়। রাজা মহেন্দ্র রাশিয়ার মিশনে ডক্টর মথুরা সিং-কে পাঠাবার প্রস্তাব করেন। পক্ষান্তরে, মাওলানা সিন্ধী প্রস্তাব রাখেন, ডক্টর মথুরা সিং-এর সাথে একজন নওজোয়ান মুসলমানও থাকবে। এতে উভয়ের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটে। সরদার নসরুল্লাহ খান উভয়ের বক্তব্য শোনার পর মাওলানা সিন্ধীর প্রস্তাব সমর্থন করেন। লাহোরী নওজোয়ানদের মধ্যথেকে খুশী মুহাম্মাদের নাম মীর্যা মুহাম্মাদ আলী রেখে তাকে রাশিয়ান মিশনের প্রতিনিধির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মিশন তাসখন্দে পৌঁছে গভর্ণরের সাথে সাক্ষাৎ করে রাশিয়ার 'জার' এর কাছে অস্থায়ী সরকারের প্রেরিত চিঠিটি প্রদান করেন। এ পত্রে অস্থায়ী সরকারের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং সে দেশের পূর্ণাঙ্গ অবস্থা সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। সে দেশের সরকারের কাছে এ অস্থায়ী সরকারকে সাহায্য করার আবেদন জানানো হয়। এছাড়া আরেকটি পত্র ছিল তাসখন্দের গভর্ণর সমীপে। এ পত্রে মিশনের প্রতিনিধিদ্বয়কে সহায়তা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

রাশিয়ার 'জার' অস্থায়ী সরকারের পত্র পেয়ে বৃটিশের অবহিত করেন এবং তাদের ব্ল্যাকমেল করে বিভিন্ন দাবী দাওয়া পেশ করতে থাকেন। বৃটিশরা এই মিশনের সত্যতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করলে রাশিয়ার 'জার' মিশনকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেন। কিন্তু, তাসখন্দের গভর্ণরের মধ্যস্থতায় মিশনকে গ্রেফতারের সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়। কিন্তু এ মিশন প্রেরণের ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাথে রাশিয়ার সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং রাশিয়া-বৃটিশ ঐক্যে ব্যঘাতের সৃষ্টি হয়।[৬০] ঐক্যের এ ফাটল নিরসনের জন্য বৃটিশ কর্তৃক লর্ড কীর্চনারকে রাশিয়া পাঠানো হয়। মিশনটি রাশিয়া থেকে কাবুলে ফেরত আসলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ মথুরা সিং-কে সরদার নসরুল্লাহ খানের কাছে নিয়ে আসেন। তিনি মিশনের কর্মকান্ড সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ জানতে চাইলে উত্তরে মথুরা সিং বলেন, মিশন স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন হবার কথা জানান। অতঃপর মাওলানা সিন্ধীকে সংবাদ দিয়ে মিশনের

---

[৬০] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৯।

সদস্য মির্যা মুহাম্মাদ আলীকে তলব করেন। তিনি মিশনে যাওয়ার পর থেকে কাবুলে ফিরে আসা পর্যন্ত যাবতীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। এ লিপিবদ্ধ তথ্য তিনি তাকে পেশ করলে এতে সরদার নসরুল্লাহ খান সন্তুষ্ট হন। দ্বিতীয় মিশনটি মাওলানা সিন্ধীর অভিপ্রায়ে ইস্তাম্বুলে প্রেরিত হয়। এ মিশনের প্রতিনিধি ছিলেন আব্দুল্লাহ বারী এবং ডাক্তার সুজা উল্লাহ। এদের ইরান হয়ে ইস্তাম্বুল যাওয়ার কথা ছিল। তৃতীয় মিশনটি প্রফেসর বরকতুল্লাহর প্রস্তাবানুসারে রাশিয়া হয়ে জাপান যাওয়ার কথা ছিল। এ মিশনের প্রতিনিধি ছিলেন শায়খ আব্দুল কাদের ও মথুরা সিং। কিন্তু এ দুটি মিশনই ব্রিটিশদের কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় তা ব্যর্থ হয়।

জুনুদে রাব্বানিয়া গঠন

মুজাহিদীন দলের নেতা মুহাম্মদ বশীরের পরামর্শক্রমে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে অবস্থানকালে জুনুদে রাব্বানিয়া (আল-াহর সৈনিক) নামে একটি কর্মী বাহিনী গঠন করেন। তুর্কী খলিফা, ইরানের শাহ ও আফগানিস্তানের আমীরকে এ সংগঠনের পৃষ্ঠপোষক এবং মাওলানা মাহমুদ হাসানকে 'সেনাপ্রধান' মনোনীত করা হয় এবং মক্কা নগরীকে এই সংগঠনের প্রস্তাবিত হেডকোয়ার্টার নির্বাচন করা হয়। এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার পেছনে অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ইরান, তুরস্ক, আরব প্রভৃতি ইসলামী রাষ্ট্রপ্রধানদের মধ্যে সম্প্রীতি ও মৈত্রী স্থাপন।[৬১] এতে লাহোর থেকে আগত নওজোয়ানরা অংশগ্রহণ করেছিল।[৬২] অস্থায়ী ভারত সরকার সংগঠিত হলে এ বাহিনীকে এ সরকারের হাতে ন্যস্ত করা হয়।

৬.১৪ শায়খুল হিন্দের হিজাজ গমন ও কুটনৈতিক তৎপরতা

ইয়াগীস্তানসহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী মিশনের কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ায় ব্রিটিশ কর্তৃক তার গ্রেফতার হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। তিনি আরবের হিজাজ হয়ে তুরস্ক গমনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। দেওবন্দ হতে তিনি বোম্বে যান এবং ১৮ ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে আকবর স্টিমারে জেদ্দার উদ্দেশ্যে বোম্বে ত্যাগ করেন।[৬৩]

এসময় যে সব বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তার সফরসঙ্গী ছিলেন তারা হলেন

১। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মানসুর আনসারী

২। মাওলানা মুহাম্মাদ সাহুল

৩। মাওলানা মুরতাযা হাসান

৪। মাওলানা উজাইর গুল

৫। হাজী খান মুহাম্মাদ

---

[৬১] উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯-১২০।
[৬২] *তদেব*, পৃ. ৭৪।
[63] Syed Mohammad Mian, *op. cit.,* p. 58.

৬। মাওলানা মতলুবুর রহমান

৭। হাজী মাহবুব খান

৮। হাজী আব্দুল করীম

৯। মাওলানা ওয়াহীদ আহমাদ প্রমুখ।[৬৪]

ব্রিটিশ সরকার এডেনের গভর্ণরকে মাওলানা মাহমুদুল হাসানকে গ্রেফতার করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তাদের পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় কারণ, সংবাদ বাহক ছিল মুখতার আহমদ আনসারীর অনুচর, যে ইচ্ছাকৃতভাবে টেলিগ্রাম প্রেরণে বিলম্ব করে। এরপর ব্রিটিশ সরকার তাকে জাহাজে অবস্থানরত অবস্থায়ই গ্রেফতার করার পরিকল্পনা করলেও তা বাস্তবায়ন হয়নি। মাওলানা মাহমুদুল হাসান ১৯১৫ সালের ৯ই অক্টোবর নিরাপদে মক্কায় পৌছান।[৬৫] ইতোমধ্যে ব্রিটিশ সরকার তাকে গ্রেফতারের জন্য পরোয়ানা জারি করলেও তা সফল হয়নি। তিনি তার সহচরদের নিয়ে নিরাপদেই মক্কায় অবতরণ করেন। হিজাজ গমনের পর শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসানের সাথে মিলিত হন তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিষ্য মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী। তিনি আগে থেকেই সপরিবারে হিজাজে অবস্থান করছিলেন। শায়খুল হিন্দের আগমনের পর তিনি তাঁর সাথে আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯১৫ সালে শায়খুল হিন্দ মদীনায় পৌছে সাইয়্যিদ হুসাইন আহমেদ মাদানী ও মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরীকে একান্তে ডেকে বিপ্লবের বিস্তারিত কর্মসূচী অবহিত করে আন্দোলনে যোগদানের পরামর্শ দিলে উভয়ে এতে সংযুক্ত হন। মদীনার ঐ বৈঠকের পর সাইয়্যিদ হুসাইন আহমেদের জীবনধারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি পবিত্র রওজা শরীফে হাদীস অধ্যাপনার বদলে 'ইংরেজবিরোধী জিহাদকে' জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য স্থির করেন।

শায়খুল হিন্দ যখন হিজাজে যান তখন হিজাজ ছিল তুরস্ক শাসনাধীন। একারণে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে তুর্কীদেরই আধিপত্য ছিল। সমসাময়িক কালে গালিব পাশা ছিলেন মক্কার গভর্ণর। তুরস্ক সরকার তাঁকে সমগ্র হিজাজের ওপর কর্তৃত্বের ভার ন্যস্ত দান করায় মদীনার গভর্ণরের ওপরও তাঁরই আধিপত্য ছিল। শায়খুল হিন্দ মদীনায় পৌঁছে ভারতীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হাফিয আব্দুল জাব্বারের মাধ্যমে গভর্ণর গালিব পাশার সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনাসভায় মিলিত হন। প্রথম দিনের আলোচনা শেষে গভর্ণর তাকে পরদিনও সাক্ষাতের আমন্ত্রণ জানান। ইত্যবসরে গভর্ণর শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী কর্মকান্ড সম্বন্ধে খোঁজখবর নেন এবং পরদিন শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী পরিকল্পনা ও মুক্তি সংগ্রামের মিশন সম্পর্কে মতবিনিময় করেন। মাওলানা মাহমুদ হাসান গালিব পাশাকে ভারতের মুসলমানদের প্রতি স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেবার আহ্বান জানিয়ে একটি বিশেষ বক্তব্য প্রদান করার অনুরোধ জানান।[৬৬]

---

[৬৪] হুসায়ন আহমদ মাদানী, *সফরনামায়ে আসীরে মাল্টা* (বিজনৌর: মদনী দারুত্ তালিফ, ১৯৭০), পৃ. ১৬।

[৬৫] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামা-ই-হক আউর উনকি মুজাহিদীনে কারনামে*, ভলিউম ১ (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো., ২০০৮), পৃ. ৫৮।

[৬৬] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 111.

গালিব পাশা এ মিশনের প্রতি সমর্থন জানিয়ে তুর্কী সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি তাকে ইয়াগিস্তানের বিপ্লব সংগ্রাম কেন্দ্রে প্রত্যাগমন করে এ আন্দোলনকে আরও ব্যাপক ভাবে বিস্তৃত করার পরামর্শ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে শায়খুল হিন্দ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অবস্থানরত তুর্কী সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও সেনাপ্রধান আনওয়ার পাশার সাথে সাক্ষাতের অভিপ্রায় জানান। গালিব পাশা ইস্তাম্বুলে তাকে আনওয়ার পাশার নিকট পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য মদীনার গভর্ণর বসরী পাশাকে লিখিত নির্দেশ দেন। এ ছাড়া তিনি শায়খুল হিন্দের আযাদী মিশন ও বিপ্লবী আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহানুভূতির অনুরোধ জানিয়ে নিজ স্বাক্ষরযুক্ত যে উপদেশ ও নির্দেশ সম্বলিত একটি খোলা চিঠি ও প্রেরণ করেন যা 'গালিব নামা' হিসেবে পরিচিত। আফগানিস্তান সীমান্তবর্তী বিপ্লবী অঞ্চল সমূহের মধ্যে প্রচারের মাধ্যমে তাদের মনোবল বৃদ্ধির জন্যএ 'গালিবনামা' দেয়া হয়েছিল।

এই চিঠির বক্তব্য ছিল,

"হে ভারতবাসী! এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার মুসলমানগণ সর্ববিধ অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে তুর্কী সেনাবাহিনী এবং মুজাহিদীগণ সাফল্যের সাথে এগিয়ে চলেছে। সুতরাং, হে মুসলিমগণ! তোমরা যে ইংরেজ শক্তির লৌহজালে আবদ্ধ রয়েছ, সংঘবদ্ধভাবে একে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলার সর্বপ্রকার চেষ্টা, সামর্থ্য নিয়ে পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে আসো। দেওবন্দ মাদরাসার প্রধান অধ্যাপক মাওলানা মাহমুদ হাসান আফেন্দীর সাথে ঐক্যমত হয়ে তাকে এ বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছি। ধন-জন ও সর্ববিধ সামগ্রী দিয়ে তার সহযোগিতা কর। এতে বিন্দুমাত্রও ইতঃস্ততঃ করো না।"[৬৭]

শায়খুল হিন্দ এ পত্রটি মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুরকে প্রদান করে প্রচারের উদ্দেশ্যে ভারতে পাঠিয়ে দেন। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুর আনসারী ইয়াগিস্তানে পৌঁছে এবং সেখানে ব্যাপকভাবে গালিবনামার প্রচার করেন। এরপর কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর কাছে প্রচারের উদ্দেশ্যে এটি পৌঁছে দেন। ইয়াগিস্তানে ও সীমান্ত এলাকার উপজাতিদের কাছ থেকে এর একটি কপি গোয়েন্দা সংস্থার মাধ্যমে 'রাওল্যাট কমিটি' র হস্তগত হয়। যার মাধ্যমে ব্রিটিশরা প্রথম এ ষড়যন্ত্রের আভাস পায়। আরেকটি পত্র শায়খুল হিন্দ গালিব পাশার নিকট থেকে আফগান সরকারের নামে গ্রহণ করেন। এতে ইতিপূর্বে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপ ও প্রফেসর বরকতল্লাহর মাধ্যমে সম্পাদিত তুর্কী-আফগান চুক্তির অনুমোদন ছিল। ঐ চুক্তির সারমর্ম ছিল- তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত আক্রমণ করবে। তবে তারা আফগানিস্তানের কোন অংশ দখল করবে না। প্রয়োজনে আফগান বিরোধী শক্তির সাথে লড়তে প্রস্তুত থাকবে। এটাকে ইতিহাসে 'গালিব চুক্তিনামা' বলে অভিহিত করা হয়।

গালিব পাশার অনুমতিপত্র নিয়ে শায়খুল হিন্দ মদীনায় গভর্ণর বসরী পাশার নিকট তুরস্ক যাত্রার অভিপ্রায়ে গমন করেন। কিন্তু শায়খুল হিন্দের তুরস্ক যাত্রার পূর্বেই আনওয়ার পাশা রাসুল (সাঃ) এর রওজা মুবারক জিয়ারত

---

[৬৭] রাওলাট রিপোর্ট, পৃ. ১২৭।

করার উদ্দেশ্যে মদীনায় আসেন। আনওয়ার পাশার সম্মানে মসজিদে নববীতে বিশিষ্ট উলামা মাশায়েখের এক সম্মেলন আহবান করা হয়। মদীনার বিশিষ্ট আলিমদের পাশাপাশি শায়খুল হিন্দ ও মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীকেও উপদেশ বাণী শুনানোর অনুরোধ করা হয়। এদের পক্ষ থেকে মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী বক্তৃতা করেন। তিনি তার স্বভাবসিদ্ধ প্রাঞ্জল আরবী ভাষায় কুরআন ও হাদীসের আলোকে যুক্তি ও প্রমাণাদি সহকারে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জিহাদের ফযীলত ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা রাখেন। আনওয়ার পাশা ও জামাল পাশা মাওলানা সাইয়্যিদ মাদানীর আলোচনা শুনে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। এরপর সাইয়্যেদ মাদানীর মধ্যস্থতায় শায়খুল হিন্দের সাথে আনওয়ার পাশার একটি গোপন সাক্ষাত হয় এবং আযাদী আন্দোলন সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনার সুযোগ ঘটে। আনওয়ার পাশা তাকে বৃটিশের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সহায়তার আশ্বাস দেন এবং তাদের মাধ্যমে চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তিপত্রকে ইতিহাসে 'আনওয়ারনামা' নামে অভিহিত কর হয়।[৬৮]এই চিঠির বক্তব্য ছিল প্রায় গালিব নামার-ই অনুরূপ। এতে আন্দোলনে তুর্কী খিলাফতের বস্তুগত সহযোগিতার অঙ্গীকারের পাশাপাশি তুরস্কের সমগ্র জনগণ ও রাজ কর্মচারীগণ কর্তৃক শাযখুল হিন্দের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়।

তুরস্ক সরকার কর্তৃক তিনটি পত্র প্রদান

আনওয়ার পাশা ও জামাল পাশা ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে জরুরী পরামর্শ প্রদান করে দামেস্কে পৌঁছে তুর্কী, আরবী ও ফারসী ভাষায় তিনটি পত্র উভয়ের স্বাক্ষরযুক্ত চুক্তিপত্র মদীনার গভর্ণর বসরী পাশার মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের কাছে প্রেরণ করেন। একটি লেখা হয়েছিল, বিপ্লবী দলের নেতা হিসেবে শায়খুল হিন্দের নামে। এটি ছিল ভারতের বিপ্লবী সরকার ও তুর্কী সরকারের মধ্যে যাকে 'বিপ্লবী-তুর্কী চুক্তি' বলা যায়। দ্বিতীয়টি ছিল ভারতবাসীর প্রতি, যাতে শায়খুল হিন্দকে সহযোগিতা করার নির্দেশ ছিল। তৃতীয়টি ছিল তুরস্ক ও আফগান সরকারের মধ্যে। ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত। এটিকে 'তুরস্ক-আফগান চুক্তি' বলা যেতে পারে।[৬৯] আনওয়ার পাশার প্রথম পত্রটি সম্পর্কে ধারণা করা হয় যে, শায়খুল হিন্দ মক্কার বিদ্রোহী গভর্ণর শরীফ হুসাইন কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার আগ মুহুর্তে (১০ই জুন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ) ধ্বংস করে দেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্রটি মাওলানা হাদী হাসানের মাধ্যমে হিজাজ থেকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। শায়খুল হিন্দ মক্কায় অবস্থান করে তুর্কী গোয়েন্দাদের মাধ্যমে জানতে পারেন তার এবং মাওলানা সিন্ধীর গোপন কূটনৈতিক তৎপরতার খবর সম্পর্কে ব্রিটিশ গোয়েন্দারা অবহিত হয়ে গেছে।

তিনি কাঠের একটা সিন্দুক তৈরি করে সিন্দুকের দুটি কাঠের মধ্যে গোপন প্রকোষ্ঠে চিঠি দুটিকে রেখে কাপড় চোপড় ও অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রী ভর্তি করে সিন্দুকটি খানজাহানপুর এলাকার নেতা মাওলানা হাদী হাসানের নিকট পাঠিয়ে দেন এবং অনুরোধ জানান যে সিন্দুকটি রাথড়ি এলাকার হাজী সাইয়্যিদ নুরুল হাসানের নিকট পৌঁছিয়ে

[৬৮] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী : জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ২৯।
[৬৯] *তদেব*, পৃ. ২৯।

দেবার জন্য চুক্তিনামার কপিগুলো বের করে তিনি যেন আহমাদ মীর্জার মারফত উক্ত তুর্কী সামরিক চুক্তিনামার কাগজগুলো ফটোকপি করে নির্দেশিত স্থানে বিলি করেন।

শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দ ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মদীনা থেকে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন। সেখানে কয়েকদিন অবস্থানের পর তিনি ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে তায়িফ অভিমুখে রওয়ানা হন। আর তার সহচরবৃন্দ সবাই মক্কায় থেকে যান। এসময় হাশেমী বংশীয় শরীফ হুসাইন অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে সৃষ্ট অচলাস্থায় শায়খুল হিন্দ তায়িফে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অবশেষে ১০ই শাওয়াল ১৩৩৪ হিজরী/১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মক্কায় পৌঁছে গোপনীয় পত্র সম্বলিত সিন্ধুক বহনকারী মাওলানা হাদী হাসান সহ ভারতগামী সহচরবৃন্দের কাফেলাকে বিদায় জানানোর উদ্দেশ্যে শায়খুল হিন্দ জেদ্দায় আগমণ করেন।

জেদ্দা বন্দরে সিআইডি পুলিশ শায়খুল হিন্দকে দেখে ধারণা করে যে, ভারতগামী স্টিমারে আরোহন করে তিনি ভারত যাচ্ছেন। তারা সংবাদটি বোম্বের পুলিশকে জানিয়ে দেয়। এদিকে শায়খুল হিন্দ বোম্বের জনৈক বিপ্লবী সদস্যের মাধ্যমে মাওলানা হাদী হাসানের কাছ থেকে মুজাফফর নগর গিয়ে মাওলানা মুহাম্মাদ নবীর কাছে পৌঁছে দেয়ার বন্দোবস্ত করেন। এদিকে পুলিশ শায়খুল হিন্দকে স্টিমারে না পেয়ে তার সহচরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরীকে ৮/১০ দিন অবরুদ্ধ করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। তবে, তিনি শায়খুল হিন্দের ব্যাপারে কোন তথ্য দেননি। অপরদিকে পুলিশ মাওলানা হাদী হাসানকে গ্রেফতার করে নৈনিতাল জেলে বন্দী করে রাখে। তারা তাঁকে শায়খুল হিন্দের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং তার উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং নির্যাতন চালায়। এতদসত্ত্বেও, তারা তার কাছ থেকে কোন তথ্য উদ্ধার করতে পারেনি। মাওলানা মুহাম্মাদ নবীকে ইতিপূর্বে যেকোন পন্থায় শায়খুল হিন্দ সিন্ধুকে রক্ষিত পত্রসমূহ বের করে হাজী নুরুল হাসানের নিকট পৌঁছানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন।

এদিকে সিআইডি পুলিশ জানতে পারে যে, শায়খুল হিন্দ কর্তৃক প্রেরিত গুরুত্বপূর্ণ পত্রসমূহ মাওলানা মুহাম্মাদ নবীর কাছে সিন্দুকে সংরক্ষিত আছে। মাওলানা মুহাম্মদ নবী যে মুহুর্তে সিন্দুক খুলে পত্রটি বের করছিলেন ঠিক সেই সময়ে পুলিশ তার বাড়ীতে হানা দেয়। তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে চিঠি দুটি রক্ষা করেন এবং শায়খুল হিন্দের নির্দেশ অনুযায়ী চিঠি দু'টি হাজী নুরুল হাসানের কাছে পৌঁছে দেন। পুলিশ সংবাদ জানতে পেরে নুরুল হাসানের বাড়ীতে হানা দেয় এবং বাড়ীর সব কিছু লন্ডভন্ড করে দেয়। পুলিশের এত তল্লাশি ও কড়াকড়ি সত্ত্বেও পত্রসমূহের অনেক ফটোকপি প্রস্তুত করে নির্দিষ্ট বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ ও কেন্দ্রসমুহে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়।[৭০] এ পত্রের উত্তর কাবুলস্থ ভারতীয় নেতৃবর্গ আফগান সরকার থেকে নিয়ে শায়খুল হিন্দের নিকট মদীনায় প্রেরণ করেন। দেড় মাস জেলে বন্দী থাকার পর মুক্তি পেয়ে মাওলানা সায়্যিদ হাদী হাসান তুর্কী আফগান সরকারের

[৭০] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners Of Malta* (Asiran'-E-Malta), Tr. by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam, (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications PVT. LTD, 2005), p. 37.

মধ্যে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধ সম্পর্কিত চুক্তিটি মাওলানা মুহাম্মাদ নবীর কাছ থেকে গ্রহণ করে আফগানিস্তানের মাওলানা সিন্ধীর কাছে পৌঁছে দেন। মাওলানা সিন্ধী এটি আমীর হাবিবুল্লাহ খানের কাছে পৌঁছে দেন।

তৃতীয় পত্রটির সারমর্ম ছিল আফগান সরকারের অনুমোদন থাকলে তুর্কী বাহিনী ১৯১৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী আফগান সীমান্তের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ভারত আক্রমণ করবে এবং ভারতেও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটবে। কথা ছিল-আফগান সরকার কর্তৃক এ চুক্তি অনুমোদনের পর অনুমোদন পত্রটি মদীনায় অবস্থানরত শায়খুল হিন্দের মাধ্যমে তুরস্ক সরকারের হাতে পৌঁছাতে হবে। অনুরূপভাবে, শায়খুল হিন্দের মাধ্যমে তুর্কী সরকারের যুদ্ধের নির্দেশটি পূনরায় ১৯১৭ সালের ১লা জানুয়ারীর মধ্যে কাবুলের সদর দফতরে পৌঁছাতে হবে। আবার কাবুলের সদর দফতর ওই সংবাদটি দিল্লীর সদর দপ্তরে পৌঁছাবে ১৯১৭ সালের ১ লা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে। এরপরেই ৯ই ফেব্রুয়ারী তুর্কী বাহিনী আফগানিস্তান যাবে এবং ১৯ শে ফেব্রুয়ারী অভিযান পরিচালনা করা হবে। শায়খুল হিন্দ স্বয়ং ঐ সময়ে আফগানিস্তানে উপস্থিত থাকবেন।

৬.১৫ রেশমী রুমাল আন্দোলন ও এর ব্যর্থতা

কাবুলস্থ ভারতীয় নেতাগণ উবায়দল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে ওই চুক্তিপত্র নিয়ে আফগান বাদশাহ আমীর হাবিবুল্লাহর কাছে নিয়ে যান। কিন্তু তখন পর্যন্ত আমীর হাবিবুল্লাহ ব্রিটিশদের সরাসরি বিরোধিতা করার ব্যাপারে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। কারণ, আফগানিস্তানের বৈদেশিক ও আন্তর্জাতিক নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা ছিল বৃটিশদের হাতে। কিন্তু, তার পুত্র সরদার আমানুল্লাহ, ভাই নাসরুল্লাহ ও সাধারণ জনগণের দাবী ও প্রবল চাপের মুখে তিনি বিপ্লবী দলের নেতাদের সাথে ২৪শে জানুয়ারী ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন যে, আফগান সরকার নিরপেক্ষ থাকবে। তুর্কী ফৌজ আফগান সীমান্ত এলাকা দিয়ে ভারতে প্রবেশ করবে। আফগান সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে কৈফিয়ত দিবে যে, উপজাতীয় লোকেরা বিদ্রোহ করে আফগান সরকারের আওতা ছাড়িয়ে গেছে। তবে, ব্যক্তিগতভাবে কেউ যুদ্ধে যোগদান করলে তাতে তার কোন আপত্তি থাকবে না। অস্থায়ী ভারতীয় সরকারের নেতৃবৃন্দ তার এতটুকু স্বীকারোক্তিকেই যথেষ্ট বলে মনে করলেন। তারা ঐ মর্মে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়ে নেন।

সরদার নসরুল্লাহ মাওলানা সিন্ধীর নির্দেশে এই চুক্তিনামা নিজের কাছে রাখেন। চাপের মুখে চুক্তি স্বাক্ষর করলেও আমীর হাবিবুল্লাহ গোপনে এসব তথ্য বৃটিশ সরকারকে অবহিত করে এবং তাদের কাছ থেকে আর্থিক সুযোগসুবিধা গ্রহণ করেন। আমীর হাবিবুল্লাহ খানের কাছ থেকে বৃটিশ বিরোধী যুদ্ধে অবতরণের কোন নিশ্চিত আশ্বাস না পাওয়ায় এবং তার নিরপেক্ষতা আঁচ করায় জার্মান মিশন মে, ১৯১৬ খ্রিষ্টাব্দে কাবুল ত্যাগ করে এবং তুর্কী মিশন আরও কিছুকাল সেখানে অবস্থান করে। এহেন পরিস্থিতিতে কাবুলে অবস্থানরত মাওলানা সিন্ধী ভাবলেন, কাবুলের এ সমূহ ঘটনা, মিশনের ব্যর্থতা ও সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে হিজাজে অবস্থানরত শায়খুল হিন্দকে অবহিত করাবেন। তাই, তিনি শায়খুল হিন্দের নিকট পত্র লিখলেন। তবে, ব্রিটিশ

গোয়েন্দাদের নজর এড়াতে তিনি চিঠিগুলো কাগজে না লিখে আমীর নাসরুল্লাহ খানের পরামর্শ মাফিক একজন দক্ষ কারিগরের হাতে আরবী ভাষায় চুক্তিপত্রের পূর্ণ ভাষ্য এবং যুদ্ধ আরম্ভের তারিখ (১৯ শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৭) একটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বুনেন। এ বয়নকৃত রেশমী পত্রটি বাহকের মাধ্যমে শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করেন। যা এই রেশমী রুমালগুলোর নামানুসারেই শায়খুল হিন্দের সশস্ত্র আন্দোলন ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে রেশমী রুমালপত্র বা রেশমী রুমাল আন্দোলন নামে খ্যাত।[৭১]

রেশমী রুমাল সম্পর্কে সি.আই.ডি রিপোর্টে বলা হয়েছে, মাওলানা সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুর আনসারী একজন দক্ষ কারিগরের হাতে তিনটি রুমালে রেশমী সুতা দিয়ে বয়ন করে তিনটি পত্র লিখেন। এ পত্রগুলো হলুদ রঙয়ের রেশমী কাপড়ের তিনটি টুকরাতে লেখা হয়েছিল। প্রথম পত্রটি শায়খ আব্দুর রহীমের নামে লিখিত। এ পত্রটির সাইজ ছিল ছয় ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং পাঁচ ইঞ্চি প্রস্থ। দ্বিতীয় পত্রটি শায়খুল হিন্দের নামে লিখিত। এটি ছিল দশ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং আট ইঞ্চি প্রস্থ। তৃতীয় পত্রটি শায়খুল হিন্দের নামে একই ধারাবাহিকতায় লেখা হয়েছিল। এ পত্রটি ছিল পনেরো ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং দশ ইঞ্চি প্রস্থ। প্রথম ও তৃতীয় পত্রে উবায়দুল্লাহর দরখাস্ত রয়েছে এবং দ্বিতীয় পত্রটি দস্তখত বিহীন। আব্দুল হক সিআইডিকে বলেছে, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুল থেকে তাকে এ তিনটি পত্র শায়খ আব্দুর রহীমকে পৌঁছিয়ে দেয়ার জন্য দিয়েছেন। এ পত্রগুলো তারই সম্মুখে মাওলানা সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুর আনসারী লিখেছেন। মাওলানা সিন্ধী উপমহাদেশ ও আরবের বিপ্লবী দলের কাজের অগ্রগতি ও ব্রিটিশ-ভারতকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করার জন্য এসকল পত্রে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। এগুলো নির্ভরযোগ্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে মদীনা পাঠানোর ব্যবস্থা ছিল। তার উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান ও সীমান্তের উপজাতি এলাকার যাবতীয় তথ্য ও যুদ্ধ শুরুর তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শায়খুল হিন্দকে অবহিত করা। শায়খ আব্দুর রহীমের দায়িত্ব ছিল এ রেশমী রুমাল পত্র দুটি শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া। তাই, তার কাছে প্রথম চিঠিটি লেখা হয়।

প্রথম পত্র

প্রথম পত্রের সারাংশ এরকম লিখিত পত্র দুটি শায়খুল হিন্দের কাছে মদীনায় পাঠাতে হবে। শায়খুল হিন্দকে মৌখিকভাবে বলে দিতে হবে তিনি যেন কাবুলে না আসেন। পত্রেও এর উল্লেখ রয়েছে। পত্রে জুনুদ-ই-রাব্বানিয়া গঠনের কথা বলা হয়। মদীনা ছিল আন্তর্জাতিক এই বিদ্রোহী দলের হেডকোয়ার্টার। আর শায়খুল হিন্দ হচ্ছেন এ কেন্দ্রের প্রধান এবং মাওলানা সিন্ধী কর্তৃক সদ্য গঠিত মুক্তি ফৌজের জেনারেল। মাওলানা মনসুর আনসারীর এবার হজ্জে আগমন সম্ভব নয় তাই, তার জন্য তিনি যেন অপেক্ষা না করেন। মদীনার যাবতীয় তথ্য সংগ্রহ করে শায়খ আব্দুর রহীম যেন কাবুলে মাওলানা সিন্ধীর সাথে সাক্ষাত করেন। প্রয়োজন

[৭১] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *তাহরিক ই রেশমি রুমাল* (দেওবন্দ: মাকতাবাই জাবিদ, তা. বি.), পৃ. ১২১-১২৫।

বোধ করলে শায়খ আব্দুর রহীম পানিপথের মাওলানা হামদুল্লাহর সহায়তা নিতে পারেন। আর এ পত্রের উত্তর যেন সরাসরি মাওলানা আব্দুর রহীম অথবা মাওলানা আহমদ আলী লাহোরীর মাধ্যমে আফগানিস্তান কাবুলে পাঠানো হয়।

দ্বিতীয় পত্র

দ্বিতীয় পত্রটি ভারতের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদগণের বিষয় নিয়ে লেখা হয়েছিল। এতে মুজাহিদদের নিয়ে প্রস্তাবিত জুনুদুল্লাহ বা মুক্তিফৌজ গঠনের পূর্ণ বিবরণ ছিল। জুনুদুল্লাহ মুজাহিদগণের ১০৪ জন অফিসারের নাম এবং তাদের বেতন ভাতার কথা উল্লেখ ছিল। মুজাহিদ অফিসারগণের দায়িত্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছিল যে, তারা মুজাহিদদেরকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিবেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে কাজে লাগাবেন। এও উল্লেখ করা হয় যে, এসব মুজাহিদকে হিন্দুস্থান সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করা হবে। ঐ মুজাহিদ বাহিনীর কেন্দ্র হবে মদীনায়। শায়খুল হিন্দকে ঐ বাহিনীর প্রধান করার কথা ছিল। তিনজন পৃষ্ঠপোষক, ১২ জন জেনারেল এবং উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তার নাম ছিল। সেনাপতিদের অধীন কেন্দ্রসমূহ হবার কথা ছিল কনস্টান্টিনোপল, তেহরান এবং কাবুল। কাবুলে সেনাবাহিনীর প্রধান হওয়ার কথা ছিল মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর। পত্রে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের কর্মোদ্দীপনা, জার্মান মিশনের আগমন ও তাদের কর্মতৎপরতা, অস্থায়ী ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং রুশ, জাপান ও তুরস্কে মিশন প্রেরণের পূর্ণ বিবরণ ছিল। পত্রে শায়খুল হিন্দকে অনুরোধ করা হয়েছিল, তিনি যেন এসব বিষয়ের তথ্য তুরস্কের উসমানীয় খলীফার নিকট পৌছে দেন।

তৃতীয় পত্র

তৃতীয় পত্রটি লেখা হয়েছিল মাওলানা মনসুর আনসারীর পক্ষ থেকে। এ চিঠিতে তিনি হজ্জ সম্পাদন শেষে হিজাজ থেকে ভারতে ফিরে এসে পরবর্তী আন্দোলনের যাবতীয় ঘটনাবলী সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছিলেন। মনসুর আনসারী তার চিঠিতে স্বাধীনতা আন্দোলনের অবস্থা ও কোন কোন নেতাকর্মীরা ব্রিটিশ সরকারের নির্যাতনের ভয়ে নিরুৎসাহী ও নিষ্ক্রিয় রয়েছেন তা উল্লেখ করেন এবং বলেন তাঁর পুনরায় হিজাজে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি হিজাজ থেকে যে গালিবনামা বহন করে নিয়ে এসেছেন তারও উল্লেখ করে বলেন যে, মুজাহিদদেরকে গালিবনামা দেখানোতে তাদের মধ্যে ব্যাপক প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে এবং তারা এখন যুদ্ধ করছে। সীমান্তের লৌহমানব হাজী তুরঙ্গযয়ী এখন মেহমন্দ এলাকায় অবস্থান করছেন। পত্রে তুর্কী-জার্মান মিশনের আগমন এবং তাদের ব্যর্থতার কারণও উল্লেখ করা হয়। মাওলানা সিন্ধী উপমহাদেশ ও আরবের বিপ্লবী দলের কাজের অগ্রগতি ও বৃটিশ-ভারতকে আক্রমণ করা সম্বন্ধে ওয়াক্বিফহাল করার জন্য এসকল পত্রে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করেছেন। তার উদ্দেশ্য ছিল আফগানিস্তান ও আযাদ উপজাতি এলাকার যাবতীয় তথ্য ও যুদ্ধ শুরুর তারিখসহ বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে শায়খুল হিন্দকে অবহিত করা। হায়দারাবাদের শায়খ আব্দুর রহীমের দায়িত্ব ছিল এ রেশমী রুমাল পত্র দুটি শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছিয়ে দেয়া।

সংবাদ আদান-প্রদান এবং পত্র বহন করে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব ছিল নও মুসলিম শায়খ আব্দুল হকের উপর। তিনি ছিলেন শায়খুল হিন্দের বিশিষ্ট মুরীদ এবং তার আন্দোলনের বিশ্বস্ত ও সতর্ক কর্মী। তার কাছে নির্দেশনা ছিল তিনি পত্রটি সিন্ধুর শায়খ আব্দুর রহিমের কাছে পৌঁছিয়ে দিবেন এবং আব্দুর রহিমকে বলে দিবেন, তিনি যেন হজ্জ করতে গিয়ে পত্রটি শায়খুল হিন্দের কাছে পৌঁছে দেন কিংবা নির্ভরযোগ্য কারও মাধ্যমে তা পৌছানোর ব্যবস্থা করেন। আব্দুল হক মাওলানা সিন্ধীর পত্রটি একটি পোশাকের ভেতরে সেলাই করে নিয়ে কাবুল থেকে পেশোয়ার পর্যন্ত আসেন কিন্তু সেখানে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের কড়া তল্লাশি দেখে তিনি ভাওয়ালপুরের মৌলভী গোলাম মুহাম্মাদের কাছে সিন্ধুতে পাঠানোর জন্য পত্রসম্বলিত পোশাকটি গচ্ছিত রাখেন। শায়খ আব্দুল হকের পুরনো বন্ধু রব নাওয়ায খানের দুই পুত্র শাহ নাওয়ায খান ও আল্লাহ নাওয়ায খান (এরা ছিলেন লাহোর থেকে কাবুলে আগত পনেরো জন মুজাহিদের অন্তর্ভুক্ত) ছিলেন উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর 'জুনদুল্লাহ'র সৈনিক। রব নাওয়ায খান ছিলেন ব্রিটিশ গুপ্তচর। তার ভিতর দু'ছেলের দেশত্যাগ করে মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে যোগদানের কারণে ক্ষোভ ও প্রতিশোধ স্পৃহা কাজ করছিল। পেশোয়ারে আগমন করে শায়খ আব্দুল হক রব নাওয়ায খানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত ও তার ছেলেদের খোঁজখবর নেবার জন্য যান। কথায় কথায় রব নাওয়ায খান আব্দুল হকের নিকট থেকে রেশমী রুমাল পত্রগুলোর কথা অবগত হয়ে তা দেখার জন্য চাপ প্রয়োগ করেন। চাপের মুখে নতি স্বীকার করে মৌলভী গোলাম মুহাম্মদের কাছ থেকে নিয়ে এসে দেখাতে বাধ্য হন এবং পত্রগুলো দেখার পর রব নাওয়ায খান তা হস্তগত করে ফেলেন এবং ব্রিটিশ গোয়েন্দা প্রধান স্যার মাইকেল এডওয়ার্ডকে সাথে সাথে তা অবহিত করেন। এরপর তিনি শায়খ আব্দুল হককে পত্রগুলোসহ মূলতান ডিভিশনের কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করেন। ব্রিটিশের পক্ষে রব নেওয়াযের এ অবদানের কারণে ব্রিটিশ ভারত সরকার তাকে খান বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করে।

এদিকে মাওলানা মাহমুদ হাসান নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলেন যে, বিপ্লবের তারিখ যদিও নির্ধারিত আছে তবুও আমাদের সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত কোন কেন্দ্র থেকে কেউ যেন কোথাও বিপ্লব না ঘটায়। রেশমী রুমালগুলো বৃটিশদের হস্তগত হয়ে যাওয়ায় শায়খুল হিন্দ বিপ্লবীদেরকে শেষ নির্দেশ দিতে পারেননি। কেন্দ্রসমূহ বিপ্লব আরম্ভ করার তারিখ সম্পর্কে অবহিত ছিল, কিন্তু শায়খুল হিন্দের সর্বশেষ নির্দেশ না পাওয়ায় উপমহাদেশের অভ্যন্তরীণ কেন্দ্রসমূহ এবং সীমান্ত এলাকার ইয়াগিস্তান থেকেও বিপ্লবের সূত্রপাত হয়নি। রাওল্যাট রিপোর্টে বলা হয়েছে, ইংরেজগণ রেশমী রুমালপত্রে বিপ্লবের নির্ধারিত তারিখ জানতে পেরে সব ধরণের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে ফেলে। নির্ধারিত বিপ্লবের তারিখ ১৯১৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারীর পূর্বে উপমহাদেশের বিপ্লবী নেতাদেরকে গ্রেফতার করা হয় এবং উপমহাদেশের সকল স্থানে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় যেন, কোথাও কোন বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি না হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্রিটিশ ভারত সরকার অত্যন্ত দ্রুত বিভিন্ন বিপ্লবী দলের হাজার হাজার সন্দেহভাজন নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করে। সারা ভারত জুড়ে চলে পাকড়াও ও তল্লাশী অভিযান। বিশেষ করে ভারতের

উত্তর প্রদেশ, দিল্লী, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু প্রদেশ, গুজরাট, বিহার ও বাংলা প্রদেশে এ অভিযান ভয়ংকরভাবে চলে। উল্লেখযোগ্য শহর আলীগড়, দেওবন্দ, মীরাট, সুরাট, কলিকাতা, গয়া, রেঙ্গুন (বার্মা/মিয়ানমার), কুটিহার, মুজাফফর নগর, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বিজনৌর, আজমীর, সিমলা, কসুর, বোম্বাই, সাহারানপুর, দেওরিয়া, রায়পুর, শেয়ালকোট, মোরাদাবাদ, পেশোয়ার, ভাগলপুর, লাহোর, হায়দারাবাদ, ভূপাল ও গাঙ্গুহ শহরের প্রতিটি ঘরে ঘরে পুলিশি তল্লাশী ও ধরপাকড় হয়। পুলিশ অসংখ্য স্থানে রেড দিয়েছিল। ২০০ জনের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এদের মধ্যে ৫৯ জনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত ও সে উদ্দেশ্যে বিদেশী সাহায্য প্রার্থনার অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়। গ্রেফতারকৃতদের এ পরিসংখ্যান থেকে বুঝা যায়, ঐ সব এলাকায় স্বাধীনতা আন্দোলন তখন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। বৃটিশ সরকার মাওলানা সিন্ধী ও তার সহকর্মীদেরকেও গ্রেফতার করে তাদের হাতে সমর্পণ করার জন্য আফগানিস্তানের আমীর হাবিবুল্লাহ খানের উপর চাপ প্রয়োগ করে। কিন্তু, সরদার নসরুল্লাহ খান ও সরদার আমানুল্লাহ খানের হস্তক্ষেপে আমীর হাবিবুল্লাহ খান তাদেরকে গ্রেফতার করতে সাহস পায়নি। তবে, ১ লা রমজান ১৩৩৫ হিজরী মোতাবেক ১৯১৭ সালে মাওলানা সিন্ধী ও তার সহচরবৃন্দকে একটি সংকীর্ণ প্রকোষ্ঠে নজরবন্দী করে রাখা হয়। অপরদিকে মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া মনসুর আনসারী এ অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এলাকায় চলে যান। ১৯১৯ সালের ২০ ফেব্রুয়ারীতে আমীর হাবিবুল্লাহ খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার আগ পর্যন্ত মাওলানা সিন্ধী ও তার সহকর্মীবৃন্দকে নজরবন্দী করে রাখেন। আমীর হাবিবুল্লাহ নিহত হওয়ার পর সরদার আমানুল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ায় মাওলানা সিন্ধী ও তার সহকর্মীবৃন্দ মুক্ত হন এবং তিনি তাদেরকে জালালাবাদ থেকে কাবুলে ডেকে এনে সম্মান প্রদর্শন করেন।

শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দের গ্রেফতার ও মাল্টায় কারাবরণ

আনওয়ারনামা ও গালিবনামা ভারতীয় উপমহাদেশের সীমান্ত এলাকা ইয়াগিস্তান এবং আফগানিস্তানে ব্যাপকভাবে প্রচার করার পূর্ব পরিকল্পনানুযায়ী ইয়াগিস্তানে গমন করে সেখান থেকে উপমহাদেশে সক্রিয়ভাবে আন্দোলন চালানোর সিদ্ধান্ত নেন। হিজায থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তিনি গালিব পাশার সাথে আরও কিছু জরুরী পরামর্শ সম্পাদন করার জন্য মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী, মাওলানা উজায়ের গুল ও মাওলানা মাদানীর ভ্রাতুষ্পুত্র ওয়াহিদ আহমাদ মাদানীকে সাথে নিয়ে মদীনা থেকে মক্কার তায়েফের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

১৩৩৪ হিজরীর ২৪ শে রজব তারিখে তারা তায়িফ পৌঁছে গালিব পাশার সাথে সাক্ষাত করেন। ইতিমধ্যে বৃটিশের কুমন্ত্রণায় ও প্রলোভনে শরীফ হুসাইন তুর্কী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ৯ ই শাবান মক্কা, জিদ্দা, ইয়ারমুক এবং মদীনাতে একই সাথে শরীফ হুসাইন আক্রমণ চালায় ও জেদ্দা তার দখলে নিয়ে আসে। ১১ শাবান শরীফ হুসাইনের সৈন্যরা তায়িফ আক্রমণ করলে শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দ তায়িফে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। অবরোধ দীর্ঘদিন যাবত চলার কারণে তায়িফে দারুণ অভাব অনটন দেখা দেয়। নব

প্রতিষ্ঠিত শরীফ হুকুমতের অমানুষিক অত্যাচার ও নিপীড়নের দরুণ খাদ্যদ্রব্য আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ঈদের পর তায়িফে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এদিকে যুদ্ধের কারণে তায়িফ থেকে ফিরে আসারও কোন উপায় ছিলনা। অবশেষে তায়িফবাসীর অনুরোধে শরীফ সরকার ৬ ই শাওয়াল শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দকে শরীফ হুকুমতের সীমানা পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। শরীফ সরকারের পক্ষে এ ঘাঁটিতে কমান্ডার নিযুক্ত ছিলেন শরীফ হুসাইনের পুত্র আব্দুল্লাহ বেগ। মাওলানা মাদানীর অগাধ গুণ, জ্ঞান ও মর্যাদা সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বেগ অবহিত ছিলেন। মাওলানা মাদানী তার উস্তাদসহ আগমন করেছেন দেখে আব্দুল্লাহ বেগ তাদের জন্য সম্মানজনক একটি ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং পরেরদিন নিরাপদে মক্কায় পৌঁছে দেয়ার উদ্যোগ নেন।

শরীফ হুসাইন বিদ্রোহ করে আরবদেশ গ্রাস করার কারণে ভারত উপমহাদেশের জনগণ বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে প্রচন্ড বিক্ষোভ ও হিজাজের বর্তমান শরীফ হুকুমতের নিন্দাবাদ আরম্ভ করে এবং তুর্কী খিলাফতের পক্ষে জোরালো আন্দোলন চালায়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজগণ মনে করে হিজাজের বর্তমান শরীফ হুকুমতকে সমর্থন করে তুর্কী খেলাফত ও তুর্কীবাসীদের বিরুদ্ধে মক্কা ও মদীনার আলিমদের স্বাক্ষরিত ফতওয়াব্যাপকভাবে ভারতের সর্বত্র প্রচার একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় এ আন্দোলন প্রতিরোধ করা সম্ভব ও আয়ত্বের বাইরে চলে যাবে। সুতরাং, কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্সের ইঙ্গিতে খান বাহাদুর মোবারক আলী আওরঙ্গাবাদী কতিপয় আলিমের মাধ্যমে তুর্কী খেলাফত ও তুর্কীবাসীদেরকে কাফির ও খিলাফতের অনুপযুক্ত প্রতিপন্ন করে এবং শরীফ হুসাইনের তুর্কী খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে হিজাজ দখল করাকে যথার্থ বলে একটি ফতওয়া সংকলন করেন। এ ফতোয়ায় শরীফ হুসাইনের সমর্থক ও অনুগত আলিমগণ স্বাক্ষর করেন। পক্ষান্তরে, হিজাজের অধিকাংশ আলিম এ ফতওয়া সম্বন্ধে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। শায়খুল হিন্দের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হলে তিনি তা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

ফতোয়াটি শায়খুল হিন্দ প্রত্যাখ্যান করায় রাজদ্রোহের অভিযোগে তাঁকে দন্ডিত করা হয়। শরীফ হুসাইন জেদ্দায় গমন করলে কর্নেল ওয়ালসন ও কর্নেল লরেন্স প্রমুখের পরামর্শে ফতওয়া প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করা হয়। শায়খুল হিন্দ সহচরবৃন্দের অনুরোধে মাওলানা মাদানীর ভ্রাতুষ্পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আত্মগোপন করেন। তারা মনে করেছিলেন আত্মগোপন করে থাকলে কিছুদিন পর তাকে হিজাজের বাইরে কোথাও পাঠিয়ে দেয়া যাবে। অন্যদেরকে গ্রেফতার করলেও কিছুদিন পর তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে। এদিকে ১৩৩৫ হিজরীর ২২ সফর মাওলানা মাদানীকে গ্রেফতার করা হয়। গোয়েন্দা পুলিশ শায়খুল হিন্দকে গ্রেফতার করার জন্য তার বাসস্থানে গিয়েও তাকে পায়নি। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তাকে না পেয়ে তার বাসস্থানে অবস্থানরত মাওলানা হাকিম নুসরাত হুসাইন ও মাওলানা উজাইর গুলকে তার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারা তার সম্বন্ধে কিছু জানেন না বলে অবহিত করেন। ইশার সময় পর্যন্ত শায়খুল হিন্দ না আসলে ওইদিন মাগরিবের পর শরীফ হুসাইন শায়খুল হিন্দের সাথীদ্বয় (মাওলানা উজাইর গুল ও মাওলানা হাকীম নুসরাত হুসাইন) কে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেন।

শায়খুল হিন্দ শরীফ হুসাইনের এ পৈশাচিক আদেশ অবহিত হয়ে স্বেচ্ছায় বন্দী হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, যেন কারও উপর যেন কোন অভিযোগ উত্থাপিত না হয়। এজন্য তিনি ইশার সময়ে ইহরামের কাপড় পরিধান করে তালবিয়া পড়ে কাবা শরীফে প্রবেশ করেন। সহচরদ্বয় অবশ্য গুলির মুখ থেকে রক্ষা পেলেন কিন্তু, শরীফ হুসাইনের আদেশক্রমে ১৯১৬ সালের ১০ জুন শায়খুল হিন্দ ও তার সহচর মাওলানা উজাইর গুল ও মাওলানা হাকীম নুসরাত হুসাইন ও মাওলানা ওয়াহীদ আহমাদ মাদানীকে গ্রেফতার করে জেদ্দার বৃটিশ সরকারের হাতে অর্পণ করা হয়। পরবর্তীতে বিপ্লবী নেতাদের অন্যতম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, মৌলভী আজিজ গুলকেও বন্দী করে মাল্টায় প্রেরণ করা হয়।[৭২]

গ্রেফতারের পর নব প্রতিষ্ঠিত সরকারের কতিপয় বিশিষ্ট উচ্চপদস্থ কর্মচারী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মাওলানা মাদানীকে কারামুক্ত করার অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসেন। কিন্তু, তিনি এ পরিহাসমূলক কাপুরুষোচিত সহানুভূতিকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তাদেরকে জেদ্দার বন্দীশালায় শায়খুল হিন্দের নিকট তাকে পৌঁছে দেয়ার অভিপ্রায় জানান। সে হিসেবে তাকে জেদ্দার বন্দীশালায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। শায়খুল হিন্দের সেবা শুশ্রুষা ও প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা অর্জন করার মহৎ উদ্দেশ্যে তাকে নিজে অভিযুক্ত না হওয়া সত্ত্বেও মাল্টার নির্বাসিত জীবন অবলম্বনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বন্দী অবস্থায় মাওলানা মাদানীর উপর বহু অত্যাচার নির্যাতন চলে। কিন্তু, তাকে তার নিজ আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত করা সম্ভব হয়নি।[৭৩] বরং মাল্টায় বন্দী থাকার সময় কালীন তিনি বিশ্বের বিভিন্ন স্থান হতে আগত রাজনৈতিক বন্দীদের সাথে যোগাযোগের সুযোগ লাভ করেন যারা ব্রিটিশ উপনিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়তে গিয়ে কারারুদ্ধ হয়েছিল। এটি তাঁর রাজনৈতিক সংকল্পকে আরো দৃঢ় করে।[৭৪] জেদ্দা কারাগারে একমাস অতিবাহিত করার পর ২৩ রবিউস সানি ১৩৩৫ হিজরী / ১৬ ই ফেব্রুয়ারী শায়খুল হিন্দকে তার সহচরবৃন্দসহ মাল্টার বন্দীশালার রোগেট ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হয়। এ বন্দীশালায় থাকাকালীন সময়ে তিনি সেখানে প্রচলিত কিছু নিয়মকানুনের বিরুদ্ধে ইসলামের আলোকে ফতওয়া প্রদান করেন। সেগুলো হল-

ক. পূর্বে মাল্টার বন্দীশালায় বৈজ্ঞানিক উপায়ে বধ করা প্রাণীর গোশত খাওয়ানো হত। মুসলিম বন্দীরাও অনন্যোপায় হয়ে তা খেতে বাধ্য হত এবং তা বৈধ মনে করত। শায়খুল হিন্দসহ অন্যান্য আলিমগণ এর চরম বিরোধিতা করেন। নির্বাসিত আলিমদের প্রচেষ্টা ও প্রবল আপত্তি উত্থাপনের পর কর্তৃপক্ষ মুসলিম বন্দীদের জন্য ইসলামী পদ্ধতিতে আল্লাহর নামে প্রাণী জবেহ করে আহার করার অনুমতি দিতে বাধ্য হয়।

খ. মাল্টার বন্দীশালায় কোন কয়েদীর মৃত্যু হলে খৃষ্টান রীতি অনুসারে তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করার বিধান ছিল। ইসলামী শরীয়াত অনুসারে তাদেরকে দাফন কাফন ও জানাজার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শায়খুল হিন্দ ও

---

[৭২] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৫।

[৭৩] আসীর আদরবী, *মা'আসীরে শায়খুল ইসলাম* (দেওবন্দ: দারুল মুয়াল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ. ১৩৭-১৩৯।

[৭৪] Goyal, *Maulana Ahmed Hussain Madani : A Biographical study* (New Delhi: Anamika Publishers and Distributors, 2004), pp. 68-69.

মাওলানা মাদানী প্রমুখ এব্যাপারে ইসলামী বিধানানুযায়ী নিয়ম প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন করেন এবং দাবী মেনে নেয়া না হলে অনশন শুরু করেন। সর্বশ্রেণীর সাধারণ বন্দীগণও তাদের ন্যায়সঙ্গত দাবির সমর্থনে আন্দোলনে যোগদান করলে কর্তৃপক্ষ তাদের দাবী মেনে নিতে বাধ্য হয়।

গ. মাল্টার কারাগারে মুসলিম বন্দীদের জন্য আযান ও জামাআতে নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা ছিলনা। মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীর প্রচেষ্টা ও সাধনায় আযান ও জামায়াতের সাথে নামাজ আদায় করার রেওয়াজ গৃহীত হয়।

মাল্টার বন্দীদশা হতে মুক্তি লাভ

শায়খুল হিন্দের গ্রেফতারের খবর প্রথমে গোপন থাকলেও পরবর্তীতে কায়রো থেকে শায়খুল হিন্দের এক সহচরের মাধ্যমে ভারতবাসী তার গ্রেফতারের কথা জানতে পারে।[৭৫] এ খবর বিদ্যুতের বেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হতে সাধারণ জনগণ তাদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন করতে থাকেন। ডাঃ মুখতার আহমদ আনসারী তাদের মুক্তির দাবিতে 'আঞ্জুমান-ই-আনতে নযরবন্দানে ইসলাম' নামে একটি আঞ্জুমান প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও আঞ্জুমানের পক্ষ থেকে, বিশিষ্ট ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে, বিভিন্ন জেলা, শহর, ও এলাকার জনগণের পক্ষ থেকে শতসহস্র তারবার্তা শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দের মুক্তির জন্য লন্ডনে ভারতমন্ত্রী এবং ভারতে ভাইসরয়ের নিকট প্রেরণ করা হয়।[৭৬] ১ম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর ১৯১৯ সালে যেসব যুদ্ধবন্দীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি, তাদের মুক্তি দেয়ার নির্দেশ জারি করে। শায়খুল হিন্দ ও তার সহচরবৃন্দের বিপরীতেও কোন অভিযোগ প্রমাণ না হওয়ায় ১৯২০ সালের ১২ ই মার্চ তাদের মুক্তি দেয়া হয়।

৬.১৬ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ প্রতিষ্ঠা

রেশমী রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর বিপ্লবী আলিমগণ পুনরায় নিজেদেরকে সংগঠিত করার চেষ্টা করেন। এ লক্ষ্যে ১৯১৯ সালে উপমহাদেশের প্রায় ৫০ জন্য শীর্ষস্থানীয় আলিম দিল্লীতে একত্রিত হন এবং হযরত শায়খুল হিন্দকে সভাপতি করে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ গঠন করেন। শায়খুল হিন্দ তখনও মাল্টায় বন্দী ছিলেন বিধায় তার স্থলে মুফতী কিফায়েত উল্লাহকে ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও মাওলানা আহমাদ সাঈদকে সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। ঐ বছর ডিসেম্বরে অমৃতসরে মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লীর সভাপতিত্বে জমইয়াতের অধিবেশন বসে। প্রায় ৮০ জন আলিম উক্ত অধিবেশনে যোগ দেন। তখন থেকে এ প্রতিষ্ঠান বিপ্লবী আলিমদের রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মতৎপরতার প্রধান কেন্দ্রস্থল হিসেবে বিবেচিত হয়।

---

[৭৫] মুখতার আহমদ আনসারী, *শায়খুল হিন্দ* (দিল্লীঃ আঞ্জুমান ই আনতে নযরবন্দানে ইসলাম, ১৯১৮), পৃ. ২৬।
[৭৬] সায়্যিদ আসগর হুসায়ন, *হায়াতে শায়খুল হিন্দ* (লাহোরঃ ইদারা ইসলামিয়াঁত, ১৯৭৭), পৃ. ১৩৮।

৬.১৭ শায়খুল হিন্দ এর খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও ফতওয়া প্রদান

শায়খুল হিন্দ মাল্টার বন্দীশালায় অবস্থানরত অবস্থায় তার পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচীর পরিকল্পনা প্রণয়ণ শুরু করেন। যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি কেবল উপমহাদেশেই নয় বরং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে দানব রুপ ধারণ করে গোটা মুসলিম বিশ্বকে স্থিমিত করে দেয়ার লক্ষ্যে অগ্রসর হচ্ছিল একে সমূলে বিকল করে দেয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে শায়খুল হিন্দ সহচরবৃন্দসহ কারাপ্রাচীর থেকে বের হয়ে আসেন। মাল্টা হতে মুক্তিলাভ করে ভারতে ফিরে আসার পর মাওলানা মাহমুদ হাসান উপলব্ধি করেন যে, পূর্বে বিদেশী শক্তির সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের যে পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে তা কাজে লাগানোর কোন সুযোগ নেই। সমসাময়িক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তিনি মহাত্মা গান্ধী ও জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক আহুত অসহযোগ আন্দোলনে সমর্থন ও অংশগ্রহনের মাধ্যমে ব্রিটিশদের প্রতি বিরোধীতার পূর্ব আন্দোলনকে সচল রাখেন। নাটকীয় ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর এই কৌশল পরিবর্তন ছিল রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয়তা ও বাস্তবধর্মীতারই প্রতিফলন।

উপমহাদেশে পূর্ণোদ্যমে খেলাফত আন্দোলনের জোয়ার বয়ে চলছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত তুরস্কের খিলাফত পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার জন্য সাম্রাজ্যবাদী শত্রুগণ যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছিল এর প্রতিবাদে বিশ্বের মুসলিম প্রধান দেশগুলোর জনগণ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠে। কারণ, তুরস্কের উসমানীয় খেলাফতের অস্তিত্বের দাবি ছিল ধর্মপ্রাণ মুসলিম বিশ্বের প্রাণের দাবি। আর, ভারতবর্ষই ছিল তখন ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের শক্তির প্রধান উৎস। সাম্রাজ্যবাদীদের এ ঘৃণ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বৃটিশ সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম উপনিবেশ ভারতের মুসলমানগণও জেগে ওঠে। মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহারের নেতৃত্বে বৃটিশের খেলাফতবিরোধী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সারা ভারতবাসী রুখে দাঁড়ায়।

১৯২০ সালের এমন একটি মুহুর্তে শায়খুল হিন্দ ও মাওলানা মাদানী ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রবেশ করেন যখন খেলাফত আন্দোলন গোটা ভারতে গণজোয়ার সৃষ্টি করেছিল। দেশবাসী সকলে ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, শিয়া, সুন্নী, ব্রাক্ষ্মণ, শুদ্র, দেওবন্দী, ব্রেলভী সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে অভিন্ন কণ্ঠে খেলাফত জিন্দাবাদ, ভারত মাতার জয় ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য এত সুদৃঢ় হয়েছিল যে, আর্য সমাজীদের নেতা স্বামী সারদানন্দ দিল্লীর জামে মসজিদের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেন।[৭৭] শায়খুল হিন্দ তার সহচরদেরকে সাথে নিয়ে ভারতে আগমন করে খেলাফত আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করেন এবং দেশবাসীর সাথে একাধারে শামিল হয়ে খেলাফত আন্দোলনকে আরও প্রাণবন্ত করে তোলেন। খিলাফত আন্দোলনের পক্ষ থেকে মাওলানা মাহমুদ হাসানকে "শায়খুল হিন্দ" উপাধিতে ভূষিত করা হয়। এ উপাধিটি এত প্রসিদ্ধি লাভ করে যে, এটি নামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে

[৭৭] মওলানা হুসায়ন আহমেদ মাদানী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড (দিল্লীঃ আল জামিয়াঁত বুক ডিপো, ১৯৫৫), পৃ. ৪৮২।

পরিণত হয়ে যায়।[৭৮] সুদীর্ঘ জীবনের নির্যাতন ও কষ্ট-ক্লেশ শায়খুল হিন্দের মনে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীনতার উদ্দীপনা ও ইংরেজ বৈরী মনোভাবে কোন দুর্বলতা আনতে পারেনি। বরং, ভারতীয় মার্শাল ল', রাওল্যাট এ্যাক্ট এর বাস্তবায়ন, জালিয়ানওয়ালাবাগ, ও অন্যান্য স্থানের ঘটনাবলী, তুরস্ক সাম্রাজ্যের ভাগবন্টন ও সিউরা চুক্তি এবং তুর্কীদের সাথে সীমাহীন অন্যায় আচরণ ইত্যাদি তার বিপ্লবী চেতনায় ঘৃতাহুতি দেয়। বোম্বাই অবতরণের পরই মরহুম শওকত আলী, খেলাফত কমিটির সদস্যবৃন্দ, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিঙ্গীমহল্লী, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখের সাথে তার একান্তে এবং প্রকাশ্য কথাবার্তা হয়। তিনি তখন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার লক্ষ্যে অহিংস কর্মসূচী অত্যাবশ্যক বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস তখন ইংরেজ সরকারবিরোধী প্লাটফর্মের ভূমিকায় ছিল বলে বিপ্লবী আলিমগণের অনেকেই কংগ্রেসের প্রতি নৈতিক সমর্থন দেন। হযরত শায়খুল হিন্দ, শায়খুল ইসলাম মাদানী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ প্রমুখ ব্যক্তিরা কংগ্রেসে যোগ দিয়ে ইংরেজবিরোধী তৎপরতা আরও বেগবান করে তোলেন। অনেকে কংগ্রেসের সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার নির্বাচিত হন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ একাধিকবার সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

আলিমগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সমর্থন ও সহযোগিতা করলেও কংগ্রেসের সাথে তাদের বহু বিষয়ে মতানৈক্য ছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে কংগ্রেস মুসলিম ধর্মানুভুতির বিপরীতে কোন সিদ্ধান্ত নিলে আলিমগণ নির্দ্বিধায় শোধরানোর চেষ্টা করেন। কংগ্রেস সাংবিধানিকভাবে কোন ধর্মের প্রতি আঘাত না করার শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল বলে তাদের আপত্তিসমূহ বিবেচনা করতে বাধ্য ছিল। কংগ্রেসের সভায় জমইয়াত সভাপতি মুফতী কিফায়েতুল্লাহ স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, আমরা প্রথমে মুসলমান তারপর হিন্দুস্থানী। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রাম আমাদের দৃষ্টিতে 'জিহাদ' হিসেবে গণ্য। সেই জিহাদের অংশ হিসেবেই কংগ্রেসের প্রতি আমাদের এই সমর্থন।[৭৯] ১৯২০ সালের জুন মাসে এলাহাবাদে খিলাফত কমিটির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় যাতে মাওলানা মাদানী কংগ্রেস কর্তৃক উদ্ভূত ব্রিটিশদের সাথে অসহযোগিতার পরিকল্পনাকে সমর্থন দেন। এই অসহযোগ আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে ১৯২০ সালে আগস্ট মাস হতে শুরু হয়।[৮০] মাল্টার বন্দিগণ যে মাসে ভারতে পদার্পণ করেন সেই মাসের শেষ দিকে এলাহাবাদে খেলাফত কমিটির অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। খেলাফত কমিটি ভারতের ভাইসরয়কে জানিয়ে দেন যে, সিউরা চুক্তি বাতিল করা না হলে এবং মুসলমানদের ধর্মীয় খেলাফতকে রক্ষা করা না হলে গোটা ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সরকারের সাথে অসহযোগিতা প্রদর্শনে বাধ্য হবে। ব্যারিস্টার মাযহারুল হক, মাওলানা শওকত আলী, স্যার ইয়াকুব হাসান ও মাওলানা

---

[৭৮] মওলানা হুসায়ন আহমেদ মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৮।

[৭৯] আবদুর রশীদ আরশাদ, *বীস বড়ে মুসলমান* (দেওবন্দ: মাকতাবা কাসিমীয়া, ১৯৭০), পৃ. ৪৩৭।

[৮০] Madani Asjad, *Role of Jamiat ulama Hind in Freedom struggle* (New Delhi: Jamiat ulama Hind, n.d.), p. 09.

আবুল কালাম আযাদের সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধিদল নোটিশটি সরকারের কাছে পৌছে দেন। মহাত্মা গান্ধীও ভাইসরয়ের কাছে খিলাফতের বিষয়ে ইতিবাচক বিবেচনার অনুরোধ নতুবা অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের হুমকি দিয়ে পত্র লিখেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের অসহযোগ আন্দোলনেও শায়খুল হিন্দ সমর্থন দান করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশরা ভারতের যে সম্পদ চুরি করে নিজেদের সমৃদ্ধি অর্জন করছে তাতে অসহযোগিতা করে তাদের এ দেশ হতে বিতাড়ন। অসহযোগের আহবানে তখন সরকারি অফিস আদালত থেকে শুরু করে সরকার পরিচালিত স্কুল-কলেজ-মাদরাসা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। শায়খুল হিন্দ এর সমর্থন পুষ্ট হবার কারণে মুসলমানরাও এ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এ আন্দোলনকে জোরদার করে।

শায়খুল হিন্দের ঐতিহাসিক ব্রিটিশ বিরোধী ও অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে ফতওয়া প্রদান

১৯২০ সালের জুলাই মাসে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে জনগনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মাওলানা মাহমুদ হাসান এক ঐতিহাসিক ফতওয়া জারি করেন। উলামাদের একটি বৃহৎ দল কর্তৃক স্বাক্ষরিত এ ফতওয়াটি জাতীয় আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করে। এ ফতওয়ার অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় ছিল এর ব্যপ্তি, যা কেবল মুসলমানদেরই, নয় হিন্দুদেরও অন্তর্ভুক্ত করে। এর ফলাফল ছিল নাটকীয়। এর প্রতিটি শব্দ জনগণের মনে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের জন্ম দেয়। এ ফতওয়াতে গণউত্তেজনা সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তুর কারণে ব্রিটিশ সরকার একে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।[৮১]

খিলাফত আন্দোলনকে জোরদার করার উদ্দেশ্যে শায়খুল হিন্দ খিলাফত কমিটির মাধ্যমে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে একটি ফতওয়া প্রদান করেন। আর এ সংকলিত ফতওয়াটি দেশবরেণ্য পাঁচশত আলিমের স্বাক্ষর গ্রহণ করে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সর্বসম্মত ফতওয়া হিসেবে প্রকাশিত হয়। ফতোয়াটি নিম্নে উল্লেখ করা হল

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী আলা রাসুলিহীল কারীম। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

ক. আর তোমরা পরস্পর বিবাদ করবে না, যদি তা কর তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে যাবে এবং তোমাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।[৮২]

খ. সৎকর্ম ও তাকওয়ার ভিত্তিতে তোমরা পরস্পর সাহায্য করবে এবং পাপ ও সীমালঙ্ঘনে একে অপরের সাহায্য করবে না।[৮৩]

গ. তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে।[৮৪]

---

[৮১] Madani Asjad, *op. cit.*, p. 11.

[৮২] সুরা আনফাল: ৪৬।

[৮৩] সুরা আল মায়িদাহ: ২।

বর্তমানে যখন প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মুসলমানদের উপর ভীষণ বিপদ আপতিত হয়েছে, ইসলামী খিলাফতের জাহাজ যখন ঝঞ্ঝাবায়ুতে সমুদ্রের তরঙ্গের সংঘর্ষে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা অনুভূত হয়েছে, প্রত্যেক মুসলমানের আত্মা যখন মৃত্যুর হুমকি দ্বারা ত্রস্ত হয়েছে তখন বিশেষত ভারতের মুসলিমগণ নিজেদের ভবিষ্যতকে নিজেদের জন্য বিপজ্জনক বলে মনে করছে। এসময়ে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ আলিম, দক্ষ হিন্দু ও মুসলিম রাজনীতিবিদদের বৃহৎ একটি অংশ নিজেদের বৈধ অধিকার ও দাবি আদায়ে সচেষ্ট। সফলতা তো আল্লাহর হাতে রয়েছে। দেশ, জাতি ও শরীয়তের পক্ষ থেকে কারো প্রতি কোন দায়িত্ব অর্পিত হলে তা পূর্ণ করা তার জন্য অপরিহার্য। এতে অবহেলা কিংবা সামান্যতম ত্রুটি করা জঘন্যতম অপরাধ। স্বভাবগতভাবে আমি কোন রাজনীতিবিদ নই। আমার অতীত জীবনকাল এর প্রমাণ। ধর্মীয় চেতনাই আমার জীবনের মূল লক্ষ্য। এ চেতনাই আমাকে হিন্দুস্তান থেকে মাল্টা এবং মাল্টা থেকে হিন্দুস্তানে পৌছিয়েছে। যে আন্দোলনের সম্পর্ক ইসলাম ও মুসলমানের কল্যাণ ও সফলতার সাথে সংশ্লিষ্ট সে আন্দোলন থেকে এক মুহূর্তের জন্যও আমি বিচ্ছিন্ন হতে পারি না।

মাল্টা থেকে প্রত্যাবর্তনের পর আমি জানতে পেরেছি, ভারতের সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব কর্তব্য পালন এবং নিজেদের প্রেরণা ও অধিকার সংরক্ষণের কর্মপন্থা হিসেবে সাব্যস্ত করেছে যে, তারা কুরআন মাজীদের একটি প্রকাশ্য শিক্ষা ও মহানবী (সাঃ) এর এক উজ্জ্বল আদর্শকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করবে। জাতির লাভ লোকসান এবং পরিণাম যাচাই করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাবে, তা হল- ইসলামের শত্রুদের সাথে ভারতবাসী সকল প্রকারের সহায়তা ও সহযোগিতা বর্জন করবে। এ বিষয়টি শরীয়াত স্বীকৃত। এ পরিপ্রেক্ষিতে একজন মুসলমানের কর্তব্য হল-

ক. সরকার প্রদত্ত সকল উপাধি, পদবী ইত্যাদি প্রত্যাখ্যান করা।

খ. দেশের নুতন কাউন্সিলে কাউন্সিলরদের অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

গ. কেবল দেশে প্রস্তুত সকল প্রকার পণ্য সামগ্রী ব্যবহার করা এবং বিদেশী সকল পণ্য বর্জন করা।

ঘ. সকল অভিভাবক নিজেদের সন্তান ও পোষ্যদেরকে সরকারি স্কুল কলেজে ভর্তি না করা।

ঙ. খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে যেসব প্রস্তাব প্রচার করা হবে তা কার্যকর করা- এ শর্তে যে, এতে শরীয়তের কোন বিধি-নিষেধ বিঘ্নিত না হয়। যেসব বিষয়ে বিশৃংখলার সৃষ্টি হবে এবং নিরাপত্তা লঙ্ঘিত হবে তা পরিহার করা।

কেউ কোন মহৎ কাজ করলে তার সহায়তা করা এবং কেউ অসৎ কাজ করলে তা পরিহার করা সকলের জন্য একান্ত কর্তব্য। আল্লাহ তায়ালা সকলের প্রতি সহায় হোন।

---

[৮৪] সুরা তাওবা: ২৩।

আল্লাহর বান্দা মাহমুদ হাসান দেওবন্দী

৩ যুল কা'দা ১৩৩৮ হিজরী।[৮৫]

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন দানের পাশাপাশি মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী মুসলমানদের ভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের সাথে একজোট হয়ে ব্রিটিশ রাজতন্ত্র উৎখাতে সহযোগিতার আহ্বান জানান। “Divide & Rule” পলিসি দ্বারা ব্রিটিশরা “মুসলিম জাতীয়তাবাদ” এর বীজ বপন করেছিল। তাঁর মতে বর্তমান পরিস্থিতিতে ব্রিটিশদের ভারত থেকে বিতাড়িত করা মুসলমানদের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতার পর্যায়ে পড়ে, আর কেবল মাত্র হিন্দু মুসলিম মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ লক্ষ্য পূরণ হওয়া সম্ভব। তিনি বলেন,“এই ঐক্য সংঘটনের জন্য আমাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বিসর্জন দেবার প্রয়োজন নেই। হিন্দুরা ‘হিন্দু’ হিসেবে এবং মুসলমানরা ‘মুসলমান’ হিসেবেই একত্রে এগিয়ে আসবে এবং দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টা চালাবে। প্রত্যেক জনগণ তার নেতার নির্দেশিত পথ অনুসরণ করবে। একই সাথে এটাও মনে রাখতে হবে যে, শত্রুপক্ষ এবং তাদের নিযুক্ত দালালরা ধর্ম সংক্রান্ত বিভেদের ধুঁয়া তুলে এই সম্প্রীতি ভাঙ্গার চেষ্টা করবে। তাদের প্ররোচনায় কোনোভাবেই কান না দিয়ে আমাদের এই ঐক্য বজায় রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।[৮৬]

মাওলানা শওকত আলী, খিলাফত কমিটির নেতৃবৃন্দ, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরঙ্গী মহল্লী, মহাত্মা গান্ধী এবং উপমহাদেশের প্রখ্যাত বিভিন্ন নেতৃবৃন্দের সাথে শায়খুল হিন্দ বোম্বেতে একাকী এবং সম্মিলিতভাবে দেশের রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ আলোচনা করেন। মাতৃভূমিকে ব্রিটিশ নিপীড়ন হতে মুক্ত করার তাগিদে তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের সিদ্ধান্তের সাথেও একাত্মতা ঘোষণা করেন। আগ্রার খিলাফত কমিটির অনুরোধে শায়খুল হিন্দ অসহযোগ আন্দোলনের একটি ফতওয়া সংকলন করেন। অন্যান্য আলিমদের ফতোয়ার সাথে খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে এটি প্রকাশ করা হয়। ফতোয়াটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

ইংরেজ বেনিয়াদের প্রতি ভারতের মুসলমানদের অসহযোগিতা করা সম্বন্ধে এ অধমের নিকট আগ্রার খিলাফত কমিটির পক্ষ থেকে একটা ফতওয়া প্রার্থনা করা হয়েছে। যদিও অসুস্থতা ও দুর্বলতা হেতু আমি ফতওয়া লিখতে অপারগ এবং লিখলেও তা দ্বারা কেউ উপকৃত হবে বলে আমার মনে হয়না। তবুও এ পরিস্থিতিতে কিছু না লিখলে নীরব ভূমিকা রাখা বৈধ হবে বলে আমি মনে করি না। আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলছি-

কাফিরদেরকে সহযোগিতা করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং অবৈধ। কুরআন ও হাদীস এর স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। এ ইংরেজ বেনিয়ারা ইসলামকে সমূলে বিনাশ করার জন্য যেভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এবং মুসলমানদের উপর যেভাবে অমানুষিক অত্যাচার ও অবিচার করছে এবং ভবিষ্যতে আরও অধিক পরিমাণে অত্যাচার করার আশঙ্কা রয়েছে এজন্য এদের সাথে মুসলমানদের অসহযোগ অত্যাবশ্যক।

---

[৮৫] শায়খ মুহাম্মদ মূসা, *উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান* (ঢাকা: হোছাইনিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২), পৃ. ১১৮।
[৮৬] Goyal, *op. cit.*, p. 147.

ক. বর্তমান অবস্থায় ইংরেজ বেনিয়াদের সাথে অসহযোগিতা করা ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই। অসহযোগের কারণে তাদের যেকোন সময় বিপদের সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য। এজন্য মুসলমানদের ধৈর্যধারণ করে নীরব ভূমিকা অবলম্বন করা বৈধ নয়। মুসলমানগণ কর্তৃক সম্মিলিতভাবে সরকারের নিকট থেকে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা চালানো একান্ত কর্তব্য। ইতিপূর্বে তাদের অবহেলার কারণে তারা আজ এ দুঃখময় পরিণাম ভোগ করছে।

খ. বর্তমান এ দুঃসময়ে হিন্দুদের সহযোগিতা লাভ করা অথবা তাদের সহমর্মিতা লাভ করা কিংবা তাদের সাথে সমঝোতা করা বা তাদের সাথে সদাচরণ করা এবং যেসব হিন্দু আমাদের দুঃখে দুঃখী হবে এবং সমবেদনা জানাবে তাদের সাথে সদাচরণ করা ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে শর্ত হল, এতে যেন ইসলামী শরীয়তের বিধানের কিঞ্চিৎৎ পরিমাণ ও ব্যাঘাত না ঘটে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেনি এবং বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দেয়নি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও ন্যায় বিচার করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ ন্যায় বিচারকারীদের পছন্দ করেন। আল্লাহ তোমাদেরকে শুধু তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে নিষেধ করছেন যারা দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের সাথে লড়াই করেছে, বাড়ীঘর থেকে তোমাদের তাড়িয়ে দিয়েছে এবং তোমাদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে পরস্পরকে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে তারাই জালেম।[৮৭] সাহাবীগণ মক্কার কাফিরদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে খৃষ্টান হওয়া সত্ত্বেও হাবশা রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। হযরত আবু বকর (রাঃ) এর ইবনুদ দাগিনার আশ্রয় গ্রহণ করা, স্বয়ং নবী (সাঃ) এর চাচা আবু তালিবের মৃত্যুতে বিষণ্ন বদনে তার সহায়তা ও সহযোগিতা গ্রহণ করা, বানু খোজা'আ ও অন্যান্য কাফির গোত্রের মহানবী (সাঃ) এর সাথে মক্কায় গমন করা ইত্যাদি বহু দৃষ্টান্ত রয়েছে।

গ. অসহযোগ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক বিষয় আছে, যা মুসলমানদের জন্য কল্যাণকর তা কার্যকর করা আবশ্যক। ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ এবং সন্তানদের শিক্ষার দায়িত্ব মুসলমানদেরকে নিজেদের আয়ত্বাধীনে এনে তাদের ধর্মীয় ছাঁচে ও জাতীয় চেতনায় গড়ে তুলতে হবে। প্রাথমিক অবস্থায় আলীগড় কলেজে ইংরেজ খৃষ্টানদের ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী আলিমগণ সম্পূর্ণভাবে নিষেধ করেছিলেন। পরিণামে দেখা গেল, আলীগড় কলেজের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে মুসলমানগণ ইংরেজ খৃষ্টানদের মতই হচ্ছে। তাই, জাতিকে এ অভিশাপ থেকে বাঁচানো একান্ত আবশ্যক। যদি অভিভাবকগণ ইংরেজদের অনুরূপ শিক্ষায় শিক্ষাগ্রহণ করতে শিক্ষার্থীদেরকে বাধ্য করে এবং ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখে তবে, শিক্ষার্থীদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার প্রয়াস চালানো একান্ত আবশ্যক।

---

[৮৭] সুরা মুমতাহিনা: ৮-৯।

বান্দা মাহমুদ হাসান

১৩৩৮ হিজরীর ১৮ জিলহজ্জ কলকাতায় খিলাফত আন্দোলনের এক কনফারেন্সে বার্ধক্যজনিত দুর্বলতা ও অসুস্থতার কারণে অংশগ্রহণ করতে না পারলেও লিখিত বক্তব্য প্রেরণ করেন যা মাওলানা মুরতাযা হাসান চাঁন্দপুরী কর্তৃক কনফারেন্সে পঠিত হয়। তার বক্তব্যটি ছিল নিম্নরূপ-

আমি অধম, সম্মানিত বন্ধুবর্গ সমীপে মাসনুন সালামান্তে জানাচ্ছি, আপনাদের ক্রমাগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে দেশ ও জাতির উন্নতিকল্পে উদ্যোগ গ্রহণ, নিদ্রিতদেরকে জাগ্রত করে দুর্বলদেরকে উদ্দীপিত করে কল্যাণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ায় প্রথমে আপনাদেরকে জানাই অশেষ শুকরিয়া। আল্লাহ তায়ালা আপনাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। বর্তমানে সারাদেশে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা আপনাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও পরিশ্রমের ফল। হে আল্লাহ! তুমি তাদের মনোবাঞ্ছা পূরণ করে দাও। আপনারা এ অধমকে স্মরণ করে আপনাদের কনফারেন্সে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এজন্য আপনাদেরকে আবার জানাই আল্লাহর শুকরিয়া। কনফারেন্সে অংশগ্রহণের প্রবল আকাংঙ্খা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন অসুবিধা ও অসুস্থতার কারণে দুর্বল হয়ে পড়ায় আপনাদের নির্দেশ পালন করতে অক্ষম হয়ে পড়েছি। এজন্য আপনাদের কাছে ক্ষমা পাব বলে আশা করছি। আমি আল্লাহর দরবারে দু'আ করি, আল্লাহ তায়ালা আপনাদের নিয়্যাত ও প্রচেষ্টায় বরকত দান করুন। দেশ এবং দেশের সকল মুসলমানদেরকে এর কল্যানে মঙ্গল দান করুন। অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মপন্থায় সতর্কতার সাথে এগিয়ে যেতে হবে। আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ না করে পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ সহায় হোন

বান্দা মাহমুদ

১৮ জিলহজ্জ, ১৩৩৮ হিজরি।[৮৮]

৬.১৮ জামিয়া মিল্লিয়া স্থাপন কালে শায়খুল হিন্দের আহবান

সমগ্র ভারত যখন আন্দোলনে উত্তাল তখন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করেন। তাদের বিরোধিতা সত্ত্বেও শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের একটি দল আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। তাদের আমন্ত্রনে উপস্থিত হয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন। ফলে, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী ও ড. জাকির হুসাইন প্রমুখের নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রভাবমুক্ত একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তারা এর পৃষ্ঠপোষকতার জন্য শায়খুল হিন্দকে অনুরোধ করেন। শায়খুল হিন্দ নিজে এই ইউনিভার্সিটির (জামিয়া মিল্লিয়া) উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, আমার বার্ধক্য

[৮৮] শায়খ মুহাম্মদ মূসা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১৯।

ও অসুস্থতা সত্ত্বেও আমি আপনাদের আমন্ত্রনে এসেছি একারণে যে আমি এখান থেকে আমার হারানো সম্পদ ফিরে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী।

এ নতুন বিশ্ববিদ্যালয়টি জামিয়া মিল্লিয়া নামে কার্যক্রম শুরু করে। বক্তৃতা শেষে ছাত্ররা শায়খুল হিন্দের নিকট অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে একটি ফতওয়া স্বাক্ষরের জন্য পেশ করেন। সরকারের পক্ষ থেকে স্যার রহিম বখশ শায়খুল হিন্দকে স্বাক্ষর করতে নিষেধ করেন এবং এর মন্দ পরিণাম সম্বন্ধে বিভিন্ন ভয়ভীতির কথা শোনান। শায়খুল হিন্দ ওদিকে কোন কর্ণপাত না করে স্বাক্ষর করে দেন। শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী উপরোক্ত সকল কাজে প্রিয় শিক্ষকের সহযোগী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন।

৬.১৯ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সম্মেলনে শায়খুল হিন্দের সভাপতিত্ব ও জাতির প্রতি আহবান

১৯-২১ শে নভেম্বর ১৯২০ সালে দিল্লীতে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জমইয়ত কর্তৃপক্ষের অনুরোধক্রমে চিকিৎসকদের কঠোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও শায়খুল হিন্দ এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে সভাপতিত্ব করতে সম্মতি প্রদান করেন। এ সম্মেলনে তার যে লিখিত ভাষণ পাঠ করে শোনানো হয় তা সংক্ষিপ্ত হলেও জাতীয় নেতৃবৃন্দের জন্য ছিল সময়োপযোগী। সভাপতির ভাষণে তিনি নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের জন্য যে দিকনির্দেশনা দেন তা হল-

ক. ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রু হল ইংরেজ। এ জাতির সহযোগিতা না করা মুসলমানদের একান্ত কর্তব্য।

খ. খিলাফত ও জাতির সংরক্ষণে যদি ভারতের যেকোন জাতির ভ্রাতৃবৃন্দ ইসলামী দাবি দাওয়া আদায়ে মুসলমানদের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করে এবং সহযোগিতা করে তাহলে তা ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে।

গ. মুসলমানগণ ভারতীয় যেকোন জাতির ভ্রাতৃবৃন্দের সাথে ধর্মীয় বিষয় বিঘ্নিত না হওয়ার শর্তে সম্মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে পারবে।

ঘ. বর্তমান যুগে শত্রু থেকে আত্মরক্ষার জন্য বন্দুক, কামান, বোমারু বিমান ইত্যাদির ব্যবহার সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। (অথচ, মহানবী (সাঃ),সাহাবী, তাবেয়ী, তাবে তাবেয়ীদের যুগে এসবের ব্যবহার ছিল না।) অতএব, দেশ স্বাধীন করার জন্য সকল জাতি একতার ভিত্তিতে মিছিল মিটিং, জাতীয় ঐক্য এবং ঐক্যমতের দাবী দাওয়া সমুহের বৈধ হওয়ার ব্যাপারে চিন্তা করার কোন অবকাশ নেই। কেননা, স্বাধীনতাকামী ভারতীয়দের নিকট বন্দুক, কামান, বোমারু বিমান ইত্যাদি না থাকায় হিন্দু মুসলিমের সম্মিলিত মিছিল মিটিং এবং দাবি দাওয়া আদায়ের আন্দোলনই হল তাদের অস্ত্র।

তিনি বলেন, কোন সন্দেহ নেই যে, মহান আল্লাহ তায়ালা আপনাদের স্বদেশে একটি সম্প্রদায়, যারা ভারতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিসেবে পরিচিত তাদেরকে কোন না কোন ভাবে আপনাদের দীর্ঘদিনের লালিত পবিত্র উদ্দেশ্য সফলের পথে সহযোগী করে দিয়েছে। আমি আন্তঃসাম্প্রদায়িক ঐক্যকে অত্যন্ত উপকারী ও ফলপ্রসূ

বলে মনে করি। অবস্থা ও পরিস্থিতি বিবেচনা করে ঐক্যের লক্ষ্যে উভয়পক্ষের নেতৃবৃন্দ যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন আমি সেটিকে আন্তরিকভাবে পছন্দ করছি। আমার বিশ্বাস পরিস্থিতি যদি অনৈক্যের দিকে মোড় নেয় তাহলে, স্বাধীনতা অর্জন চিরদিনের জন্য অসম্ভব হয়ে পড়বে।

হিন্দু ও মুসলিম জাতির বরেণ্য নেতৃবৃন্দকে সম্বোধন করে বলছি, প্রস্তাব পাশে তারা যেন সম্মেলনে উপস্থিত জনগণের হস্ত উত্তোলনকারীদের আধিক্য এবং মৌলিক স্বীকারোক্তি দ্বারা প্রতারিত না হন। হিন্দু ও মুসলমানদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্বার্থ ত্যাগ করে ত্যাগের মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। নতুবা হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে কোন অবস্থাতেই ঐক্য থাকতে পারেনা। হিন্দু মুসলমানদের পাত্রে পানি পান করে না এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের শবদেহ বহন করে না এটা মৌলিক সমস্যা না। কিন্তু, হিন্দু মুসলমানগণ যদি পরস্পরকে ঘায়েল করার জন্য কাজ করে বা স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রতিযোগিতা করে তাহলে, তা হবে জাতির জন্য ক্ষতিকর। আপনারা এসব বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখবেন বলে আমি আশা করি। সবশেষে শায়খুল হিন্দ ভারতের মুসলমানদেরকে বিশেষত জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং আলিম সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, কুরআন ও হাদীসের আলোকে আপনারা আমার বক্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে সোজা পথে চলুন। এতেই আপনাদের জন্য মঙ্গল রয়েছে।[৮৯]

খেলাফত কমিটি কলকাতা শাখার সভাপতি মাওলানা আবুল কালাম আযাদের সাহসী তৎপরতায় কলকাতা আলিয়া মাদরাসা থেকেও ছাত্রদের একটি দল মাদ্রাসা ত্যাগ করে বেরিয়ে আসে। মাওলানা আযাদ তাদেরকে নিয়ে শহরের নাখোদা মসজিদে নতুন মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তার অভিপ্রায় ছিল এটিকে অল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মাদ্রাসায় পরিণত করা এবং দেশের সকল নেতা ও আলীমগণের মাধ্যমে মাদ্রাসাটিকে জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে বেগবান করে গড়ে তোলা। সেমতে তিনি মাদরাসার প্রধান দায়িত্বশীল হিসেবে শায়খুল হিন্দের নাম প্রস্তাব করেন। এ উদ্দেশ্যে দিল্লীতে তার কাছে নিজের একজন প্রতিনিধি প্ররণ করেন। শায়খুল হিন্দের পক্ষে বার্ধক্য ও অসুস্থতার দরুন তার পক্ষে এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। তাই, তিনি নিজের স্থলে সাইয়্যিদ হুসাইন আহমেদ মাদানীকে যাবার নির্দেশ দেন। জমইয়াতে উমালায়ে হিন্দের সম্মেলনের পর থেকে শায়খুল হিন্দের অবস্থার অবনতি হতে থাকে এবং ১৮ই রবিউল আওয়াল ১৩৩৯ হিজরী মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ১৯২০ খৃষ্টাব্দ তারিখ মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাত ঘটিকার সময় দিল্লীতে ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারীর বাসভবনে শায়খুল হিন্দ মাহমূদ হাসান ইন্তেকাল করেন।

৬.২০ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কর্তৃক কাবুলে কংগ্রেসের শাখা স্থাপন

শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পর তাঁর রেখে যাওয়া আন্দোলনের ভার ন্যস্ত হয় তার দুই যোগ্য শিষ্য উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানীর ওপর। কিন্তু, উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর দেশে ফেরার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকার ফলে তাকে কাবুলেই অবস্থান করতে হয়। শায়খুল হিন্দ মাল্টায় বন্দী থাকাকালে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও

[৮৯] শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসান, *খুতবায়ে সদারত ইজলাসে জম্ইয়াতে উলামায়ে হিন্দ* (দিল্লী: গণিয়ূল মাতাবি, ১৯২০), পৃ. ১৬।

ছিলেন কাবুলে নজরবন্দী অবস্থায়। ১৯১৯ সালে মুক্তি পাবার পর আমানুল্লাহ খানের শাসনামলে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী প্রায় চার বছর কাবুলে অবস্থান করেন এবং পূর্বতন বিকল্পরূপে কাবুলে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেসের একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। সেটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে প্রথম শাখা। আনুষ্ঠানিকভাবে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী এর প্রেসিডেন্ট ও জাফর হাসান সেক্রেটারী ছিলেন। এ শাখার সর্বেসর্বা ছিলেন ডাক্তার নুর মুহাম্মাদ। তৎকালীন সময়ে ড.মুখতার আহমেদ আনসারী ছিলেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। তার সুদৃষ্টির ফলে এ শাখাটি গয়া অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।

৬.২১ তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ভূমিকা

স্বাধীনচেতা আমীর আমানুল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবার পর আফগানিস্তানের উপর ব্রিটিশ সরকারের আধিপত্য নস্যাৎ করার জন্য আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেন। তাকে শায়েস্তা করার জন্য ব্রিটিশ ১৯১৯ সালের মে মাসে আফগানিস্তানে আক্রমণ চালায় যা ইতিহাসে তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধ বলে পরিচিত। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী আমীর আমানুল্লাহর পক্ষালম্বন করে তাঁর জুনদুল্লাহ ও ভারতীয় বিপ্লবী বাহিনীসহ আফগান যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধে আমানউল্লাহ খান বিজয় লাভ করেন এবং তার সেনাপতি নাদের খানের নেতৃত্বে আফগান বাহিনী কোহাট পর্যন্ত দখল করে নেয়। পার্বত্য যুদ্ধে বিশেষভাবে পারদর্শী আফগান বাহিনীর কাছে চরমভাবে পরাজিত হয়ে বাধ্য হয়ে ইংরেজ সরকার আমানুল্লাহর কাছে নতিস্বীকার করে এবং তারাই প্রথম সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। ১৯১৯ সালের ৮ আগস্ট রাওয়ালপিন্ডিতে ব্রিটিশ ভারতের সরকারের সাথে আমানুল্লাহ খানের সরকারের সন্ধি হয় এবং এর ফলে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেন।[৯০]

তৃতীয় ইঙ্গ-আফগান যুদ্ধে মাওলানা সিন্ধী ও তাঁর জুনদুল্লাহ'র অংশগ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য আফগান সরকার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। ঐ যুদ্ধে সিন্ধীর ভূমিকা বিষয়ে তৎকালীন আফগানিস্তানের ব্রিটিশ দূত লর্ড হামফ্রে বলেছিলেন, এ বিজয় আফগানিস্তানের নয়, এ বিজয় উবায়দুল্লাহর।[৯১] আফগান সরকার ও মাওলানা সিন্ধী ও তার সহযোগীদের সক্রিয় ও সফল ভূমিকার স্বীকৃতি দেন। এমনকি আমীর আমানুল্লাহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজে মাওলানা সিন্ধীর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। মাওলানা সিন্ধীও আন্তরিকভাবে আফগানিস্তানের মঙ্গল সাধনে চেষ্টা করতেন। কিন্তু উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে বিতাড়নের জন্য পরবর্তীতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ বিভিন্নভাবে কূটনৈতিক চাপ প্রয়োগ করতে থাকে যার সামনে অবশেষে বাদশাহ আমানুল্লাহকে নতি স্বীকার করতে হয়।

আমানুল্লাহ কর্তৃক রাজনৈতিক বিধিনিষেধের কারণে ১৯২২ সালে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী অস্থায়ী ভারত সরকারের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। নিজ দেশ হতে নির্বাসিত হয়ে উবায়দুল্লাহ কাবুলে কেবলমাত্র ব্রিটিশবিরোধী

---

[৯০] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩।

[৯১] মওলানা মুজীবুর রহমান, *মওলানা উবায়দুল্লাহর সিন্ধীর রোজনামচা* (ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪), পৃ. ৭৫।

প্রোপাগান্ডা চালানোর জন্যই অবস্থান করছিলেন। তিনি যদি পরিস্থিতি মেনে নিতেন তাহলে হয়তো বাদশাহ আমানুল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় তার কোনরূপ অসুবিধাই হতো না। কিন্তু তিনি ব্যক্তিগত সুযোগ-সুবিধা, মান সম্মান বা আরাম আয়েশের জন্য নীতি বর্জন করতে প্রস্তুত ছিলেননা। স্বদেশকে স্বাধীন করার দুর্দমনীয় বাসনা তার মনে অনির্বাণ শিখার মতই সততঃ প্রজ্বলিত ছিল। একারণে ১৯২২ সালের ২২শে অক্টোবর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে রাশিয়ার পথে যাত্রা করেন এবং নভেম্বর মাসে রাশিয়ায় পৌঁছান। রাশিয়ায় তখন জারের শাসন সমাপ্ত হয়েছে। ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবের পর রাশিয়ায় লেনিন (১৮৭০-১৯২৪ খৃষ্টাব্দ) এর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সিন্ধী রাশিয়ায় অবস্থান করে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমাজতন্ত্র সম্পর্কে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেই জীবনধারায় বেশ প্রভাবান্বিত হন। সেখানে অবস্থান করে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গতিধারাও পর্যবেক্ষণ করেন। সেখানে তিনি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সদস্য ও আফগানিস্তান শাখার প্রেসিডেন্ট রূপে সরকারি মেহমান ছিলেন। এ ভ্রমণ তার জীবনদর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে এবং তার রাজনৈতিক জীবনে এর প্রতিফলনও ঘটে। তিনি জারের শাসনামলে কী কী দোষ ও দুর্বলতা ছিল যার কারণে তার পতন হয়েছে এবং সমাজতন্ত্রের কি কি গুণ ও কারণ রয়েছে যে কারণে সে বিজিত হয়েছে পৃথিবীতে এর কি কি প্রভাব রয়েছে তা উপলব্ধির চেষ্টা করেন। তিনি সমাজবাদের বিষয়ে রাশিয়ার বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের অসাধারণ কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ ও প্রভাবান্বিত হন বটে কিন্তু, সমাজবাদের ধর্মহীনতায় শঙ্কিত হন। সিন্ধী রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের মতবাদ ভারতে প্রচার করার পরিকল্পনা করেন। সাথে সাথে কোন ইসলামী দেশে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে হলে তা কিভাবে করতে হবে এসব বিষয়ে গবেষণা করেন।

৬.২২ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর তুরস্ক ভ্রমণ ও ব্রিটিশ বিরোধী কর্মতৎপরতা

রাশিয়ায় সাতমাস অবস্থান করার পর সিন্ধী তার সাথী জাফর হাসানসহ ১৯২৩ সালে আংকারায় পৌঁছেন। ইস্তাম্বুলে তখন আধুনিক তুরস্কের প্রতিষ্ঠাতা কামাল পাশার রাজত্ব। সেখানে তখন রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করছিল। সিন্ধী যাবার কিছুকাল পরেই ১৯২৪ সালের ৩ রা মার্চ কামাল পাশা তুরস্কে ইসলামী খেলাফত ব্যবস্থা বিলুপ্ত করে ধর্ম-নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। সিন্ধী তিন বছর (১৯২৩-১৯২৬) তুরস্কে অবস্থান করে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ পর্যবেক্ষণ করেন এবং এতে অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতে ন্যাশনাল স্টেট গঠনের চিন্তা করেন। তিনি তুরস্কের অনুকরণে ন্যায় বাইরের দেশের প্রভাবমুক্ত থেকে জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারতের ইসলামী আন্দোলনকে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস এর আওতাভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কংগ্রেসের অধীনে 'সর্বরাজ্য পার্টি' নামে একটি দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন।

ভারতের স্বাধীনতা ও স্বাধীন ভারত সরকারের জন্য ১৯২৪ সালে ইস্তাম্বুল থেকে উর্দুতে প্রকাশিত উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ঐ ম্যানিফেস্টোর মর্ম ছিল, ভারতে পূর্ণ স্বাধীনতা কায়েম করা হবে। সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার

থাকবে। মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের স্বার্থ এবং ইসলামের মর্যাদা সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ব্যবস্থাপক সভায় বয়স্ক ভোটের মাধ্যমে সকল শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব থাকবে। জমিদারী ও পুঁজিবাদ খতম করা হবে। দেশের ভূমি সম্পদ সরকারের মালিকানাধীন থাকবে। ব্যক্তিগত মালিকানা সীমিত করা হবে। সুদী কারবার বন্ধ করা হবে। ভারত হবে বহু জাতির আবাসভূমি। অভিন্ন ভাষাভাষী ও অভিন্ন তাহযীব তমদ্দুনের অধিকারী অঞ্চলগুলো ভিন্ন ভিন্ন স্টেটে পরিণত হবে, স্টেটগুলোতে সংখ্যাগরিষ্ঠদের ধর্মকে সরকারি ধর্ম বলে পরিগণিত করা হবে। প্রত্যেকটি স্টেট সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন থাকবে। ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে সকল স্টেট থেকে সংখ্যানুপাত এবং আর্থিক সাংস্কৃতিক ও সামরিক গুরুত্বের নিরিখে প্রতিনিধি প্রেরণ করা হবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু সামরিক বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও পররাষ্ট্র নীতি। সিন্ধী তার এ কর্মসূচীতে অহিংসনীতিকে অবশ্য পালনীয় বলে গণ্য করেন। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী আরও ভাবলেন, এর ম্যানিফেষ্টোর কপিসমূহ তিনি গোপনে ডাকযোগে ভারতের নেতাদের নামে প্রেরণ করেন। কিন্তু, সেগুলো ভারত সরকারের হাতে পড়লে সরকার সেগুলোর প্রবেশ ও প্রচারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। ১৯২৫ সালের ১৮ই মে লাহোরের জমিদার এবং সিয়াসত পত্রিকায় ঐ নিষেধাজ্ঞা প্রকাশিত হয়। সিন্ধী ইস্তাম্বুলে অবস্থানকালে তার প্রচারিত কর্মসূচী সম্পর্কে লালা লাজপত রায়ের সাথে আলোচনা করেন। ড. মুখতার আহমেদ আনসারীর সাথেও পত্রযোগে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা হয়। কিন্তু, তাঁরা এ পরিকল্পনা সমর্থন করেননি।

৬.২৩ উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ভারতে প্রত্যাবর্তন ও পুনরায় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ

১৯২৪ সালের নভেম্বরে শরীফ সরকারের পতন ঘটিয়ে ওয়াহাবী মতাবলম্বী ইবনে সাউদ মক্কার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে ১৯২৫ সালে তিনি খিলাফত অধিবেশন আহবান করেন। সে অধিবেশনে ভারতসহ মুসলিম বিশ্বের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী তার প্রাক্তন সহকর্মীদের সাথে সাক্ষাৎ করার মানসে মক্কায় আসতে চাইলেও তা সম্ভব হয়নি। অধিবেশন শেষ হওয়ার পর ১৯২৬ সালের আগস্টে তিনি ইটালী ও সুইজারল্যান্ড হয়ে মক্কায় পৌঁছতে সক্ষম হন। হিজাজ সরকারকে রাজনৈতিক প্রচারণা না করার অঙ্গীকার করে তিনি হেজাজে স্বাধীনভাবে থাকার অনুমতি লাভ করেন। মক্কায় দীর্ঘ বার বছর অবস্থান করে উবায়দুল্লাহ সিন্ধী লেখাপড়া, জ্ঞানচর্চা ও গবেষণায় আত্মনিয়োগ করেন। মক্কায় থাকাকালে সিন্ধী ১৩/১৪ বছর (১৯২৬-১৯৩৯) ধরে কুরআন ও শাহ ওয়ালীউল্লাহর হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। তাফসীরে কুরআনের যে জায়গাগুলো তার কাছে কঠিন বলে মনে হত, শাহ ওয়ালীউল্লাহর নীতি অবলম্বনে তিনি সেগুলো পুরোপুরি আয়ত্ব করতেন। ১৯৩৬ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তাকে ভারতে ফিরে যাবার অনুরোধ জানায় এবং ব্রিটিশ সরকারও তাকে দেশে ফেরার অনুমতি দেয়। ১৯৩৮ সালে তিনি আরব হতে করাচী বন্দরে অবতরণ করেন। দেশে ফেরার পর সিন্ধীর নবজীবন শুরু হয়।

পূর্বে গোপনীয়ভাবে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যক্রম চালিয়ে গেলেও ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে মৃত্যু পর্যন্ত তার সাড়ে পাঁচ বছরের রাজনীতি ছিল তার প্রকাশ্য রাজনীতি। তিনি দিল্লীতে শাহ ওয়ালীউল্লাহর

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'র শিক্ষা প্রচার করতে থাকেন। ইতিপূর্বে শক্তিপ্রয়োগ ও জিহাদ করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচারণা চালালেও অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে অহিংসনীতি ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের মতবাদের সমর্থন করতে হয়। তিনি বায়তুল হিকমাত, সিন্ধসাগর একাডেমী ও শাহ ওয়ালীউল্লাহ আবুল কাসেম থিয়োলজিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। তার নেতৃত্বে সর্বরাজ্য পার্টির দ্বিতীয় সংস্করণ যমুনা নর্মদা সিন্ধসাগর পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করলেও তা জনপ্রিয়তা ও সাফল্য লাভ করতে পারেননি। ইউরোপীয় দেশগুলোতে ভ্রমন করে বিভিন্ন সরকার ব্যবস্থা পরিদর্শন ও এর উপর গবেষণা করার ফলে তার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছিল। বারংবার ব্রিটিশবিরোধী অভ্যুত্থানের ব্যর্থতা তাকে নতুনভাবে চিন্তা করতে সাহায্য করে। তিনি মনস্থ করেন যে, বৃটিশের সাথে আপাততঃ সহযোগিতা করে এবং ইউরোপ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করে আগে ব্রিটিশদের সাথে লড়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে নিতে হবে এবং তারপর দেশের অভ্যন্তরীণ শক্তি নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা অভিযান চালাতে হবে। তার নিজ ভাষায়,

ভারতীয়দের উচিত, বহির্দেশীয় মুসলমানদের কোন বিব্রতকর কর্মসূচীতে জড়িত না হওয়া। তাদের কর্তব্য হল- নিজ দেশের উপর আধিপত্য স্থাপনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। যদি এ পথে একশ বছরও প্রয়োজন হয় তবুও কর্মসুচী পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই। আমার মতে- ভারতবাসীদের জন্য কংগ্রেসের অহিংস নীতি অতদিনই মেনে চলা প্রয়োজন যতদিন পর্যন্ত যুদ্ধ করে স্বদেশ জয় করতে পারবে বলে তাদের বিশ্বাস অর্জিত না হয়। এই নীতি প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। দৃঢ়ভাবে এটা পালন করা উচিত। যতদিন তারা শেষ সুযোগের জন্য প্রস্তুত না হবে ততদিন পর্যন্ত ছোট ছোট লড়াইয়ে অবতীর্ণ হওয়া মোটেই উচিত হবে না।

সিন্ধী তার আকাঙ্খিত স্বাধীন ভারতে সরকার ব্যবস্থা প্রণয়নে ফেডারেল গভর্নমেন্টের রূপরেখা বর্ণনা করে বলেন, অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি তমদ্দুনের ভিত্তিতে ভারত উপমহাদেশে কয়েকটি স্টেট সৃষ্টি করা হবে এবং সেগুলোর দুই, তিনটি বিষয় ছাড়া সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে। এ স্টেটসমুহের যৌগিক হবে একটি ফেডারেশন তথা যুক্তরাষ্ট্র। এর কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্টেট সমূহ থেকে রাজনৈতিক গুরুত্বের দিক থেকে কতক প্রতিনিধি প্রেরিত হবে। কেন্দ্রের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা, বহির্বাণিজ্য ও পররাষ্ট্রনীতি। এ স্টেটগুলোর রাষ্ট্রীয়ভাষা হবে স্থানীয় মাতৃভাষা এবং কেন্দ্রের ভাষা হবে উর্দু ও ইংরেজী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯৪২ সালের ২২ শে মার্চ ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সদস্য স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে শাসন সংস্কারের একটি মিশন নিয়ে ভারতে আসেন। ঐ মিশনেও এই প্রস্তাবের আশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধ শেষে উপমহাদেশকে একটি ডোমিনিয়নের মর্যাদাসম্পন্ন করে একটি যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করা হবে। সিন্ধীর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের স্কীমটির অভিনবত্ব হল, তিনি অভিন্ন ভাষা ও কাছাকাছি আচার অনুষ্ঠানের অধিকারী অঞ্চলগুলো নিয়ে ভাষা ও তমদ্দুন ভিত্তিক স্টেটসমূহ গঠন ও ঐসব স্টেটের সমন্বয়ে একটি ফেডারেল

সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পূর্ববর্তী স্কীম গুলোর তুলনায় সিন্ধীর যুক্তরাষ্ট্রের স্কীমটি ছিল অনেক বেশী স্বব্যাখ্যাত ও উদারনীতি তথা গণতান্ত্রিক চরিত্রসম্পন্ন।

সিন্ধী কংগ্রেসের সমর্থক হলেও তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে এর সদস্য ছিলেন না। তিনি গান্ধীর কংগ্রেসকে মোটেও পছন্দ করতেন না। কারণ, তিনি ছিলেন ধর্মনিরপেক্ষ সরকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াসী। তিনি কংগ্রেসের সমালোচনা করতে দ্বিধা করেননি। তিনি অভিযোগের সুরে বলেছিলেন, কংগ্রেস যদি সংখ্যানুপাতে মুসলমানদের ন্যায্য অধিকার দিত তাহলে, তারা কংগ্রেস থেকে এত দূরে সরে যেত না। যদিও শেষ জীবনে উবায়দুল্লাহ'র মধ্যে কিছুটা ব্রিটিশ তোষণ নীতি পরিলক্ষিত হয়। ব্রিটিশ শাসনকে আরও কিছুকাল ভারতে জিইয়ে রাখা, ভারতকে ব্রিটিশ উপনিবেশের মর্যাদা দেওয়া, বৃটিশের সাথে দ্বন্দ্বে লিপ্ত না হওয়া,অহিংস নীতি অবলম্বন করে ব্রিটিশ কমনওয়েলথে থাকা, পাকিস্তান প্রস্তাবের বিরোধিতা, দেশরক্ষা বিভাগে ব্রিটিশ অফিসার বহাল রাখার পরামর্শ প্রদান, ব্রিটিশ উপনিবেশে ব্রিটিশ জাতির সাথে সহাবস্থানের প্রস্তাব প্রভৃতি তার ব্রিটিশদের প্রতি নমনীয় মনোভাবেরই স্বাক্ষর বহন করে। ধারণা করা যায়, দেশে ফেরার সময় তিনি ব্রিটিশ শাসন উৎখাত না করার অঙ্গীকার করে এসেছিলেন। তাই, মনে হয় আন্তরিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ভারতকে ব্রিটিশমুক্ত করার কোন সরাসরি আন্দোলনে যোগদান করেননি। তবে, পূর্ণ স্বাধীনতার আকাংখ্যা যে তার মনে সব সময় পীড়া দিত তা অনুমান করা যায়। দেশ স্বাধীন হবার মাত্র তিন বছর পূর্বে ১৯৪৪ সালে শারিরীক অসুস্থতার কারণে তিনি ইন্তেকাল করেন।

৬.২৪ দেওবন্দ আন্দোলনের নতুন কর্ণধার হুসাইন আহমদ মাদানী ও তার কার্যক্রম

১৯২০ সালে শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পর ভারতে উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর অবর্তমানে দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃত্ব কাঁধে তুলে নেন মাওলানা সাইয়্যিদ হুসাইন আহমেদ মাদানী। শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর সময় তিনি তাঁর আদেশে কলকাতার আলিয়া মদ্রাসা হতে বের হয়ে আসা ব্রিটিশ বিরোধী ছাত্রদের নিয়ে গঠিত একটি নতুন মাদ্রাসার দায়িত্ব নেবার জন্য যাত্রাপথে থাকায় মৃত্যুকালে শায়খুল হিন্দের পাশে থাকতে পারেননি। শায়খুল হিন্দের মুত্যু তার কাছে ছিল অভিভাবক হারানোর বেদনার মত। শায়খুল হিন্দের ওফাতের পর দেওবন্দের উলামাবৃন্দ তাকে কলকাতার না গিয়ে দারুল উলুমে দেওবন্দে শিক্ষকতা করার জন্য জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু, তিনি শায়খুল হিন্দের শেষ নির্দেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে কলকাতা যাবার সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। জীবদ্দশায় শায়খুল হিন্দের মনোগত ইচ্ছা ছিল মাওলানা মাদানীকে তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব প্রদান। এজন্য জীবনের অন্তিম দিনগুলোতে তিনি মাওলানা মাদানীকে কাছছাড়া করতে চাইতেননা। তাঁর মৃত্যুর পর শায়খুল হিন্দের দুই ভাই মাওলানা মাদানীকে শায়খুল হিন্দের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে গ্রহণ করেন।[৯২] স্থলাভিষিক্ত হিসাবে শুধু পারিবারিকভাবেই নয়, শায়খুল ইসলাম তখন শায়খুল হিন্দের সকল ছাত্র, সকল কর্মী ও ভক্তবৃন্দের কাছে একবাক্যে জা-নাশীনে শায়খুল হিন্দ উপাধিতে ভূষিত হন।[৯৩]

---

[৯২] রাশিদ হাসান উসমানী, *তাযকিরায়ে হযরত মাদানী* (দেওবন্দ: রাশিদ কোম্পানী লিমিটেড, তা.বি.), পৃ. ১১২।
[৯৩] রশীদুল ওয়াহিদী, *শায়খুল ইসলাম মাদানী হায়াত ওয়া কারনামে* (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো, তা.বি.) পৃ. ৮৭।

ভারতীয় রাজনীতিতে মাওলানা মাদানীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রচার

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে শায়খুল ইসলাম কলকাতা পৌঁছেন। এখানে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ও মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতিতে নতুন মাদরাসার ভিত্তি স্থাপিত হয়। শায়খুল ইসলাম এ মাদ্রাসার হাদীস, তাফসীর ও ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপনা শুরু করেন। এখান থেকে তিনি তাঁর স্বয়ংসম্পূর্ণ রাজনৈতিক জীবনের সূচনা করেন। মাল্টায় কারাবরণের দরুন তার মান মর্যাদা সর্বজন স্বীকৃতি লাভ করেছিল। কলকাতা ও বঙ্গদেশ খিলাফত কমিটির কিংবা কংগ্রেসের যেসব সভা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় তিনি তাতে প্রধান অতিথি কিংবা সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। ফলে, একদিকে যেমন একজন শীর্ষস্থানীয় আলিম ও আধ্যাত্মিক রাহবার হিসেবে তাঁর পরিচিতি বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে একজন উচ্চপদস্থ রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি তখন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করেন।[৯৪] কলকাতা থাকাকালে শায়খুল ইসলাম মাদানী সিলেটের মৌলভীবাজারে একই সময়ে জমইয়াত ও খিলাফত অধিবেশনের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন।[৯৫] মাওলানা মাদানীর মতে, ভারতে স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য হিন্দু-মুসলিম ঐক্য তথা সকল শ্রেণীর জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ওপর নির্ভর করে। এই মৈত্রীকে আরো মজবুত করার জন্য তিনি, মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দিল্লীর জমইয়াতে উলামা-ই-হিন্দ কর্তৃক ঘোষিত ধর্মীয় স্বাধীনতার সুপারিশের প্রতি জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

স্বদেশপ্রেমের চেতনায় ভারতীয়দের উদ্ধুদ্ধকরণ

দেশমাতৃকার প্রতি শায়খুল ইসলাম মাদানীর ছিল প্রগাঢ় ভালবাসা যা তাঁর বক্তব্যে পরিস্ফুট হয়ে উঠতো। তিনি প্রায়শই বলতেন, মানুষ যে মাটিতে জন্মগ্রহন করে ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তা যতই অস্বাচ্ছন্দ্যকর হোক না কেন, মানুষের মন এর কাঁটাকেই ফুল হিসেবে বরণ করে নেয়। সিলেটে প্রদান করা এক ভাষণে তিনি ভারতের স্বর্ণালী অতীত তুলে ধরে বলেন, ভারত এক সময় সমগ্র বিশ্বে জ্ঞানের কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত হয়েছে, চারু-কারু ও শিল্প সাহিত্যের দিক হতে বিশ্বকে নেতৃত্ব প্রদান করেছে। তিনি পরিসংখ্যান ও উদাহরণের সাহায্যে তুলে ধরেন যে, কিভাবে ভারতের এ সকল ঐশ্বর্য ও তার উৎস লুন্ঠন করা হয়েছে। ১৯২১ সালের ২০-২১ ফেব্রুয়ারী সিউহারায় খেলাফত কমিটি ও জমইয়াতে উলামার বার্ষিক অধিবেশন একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল ইসলাম উভয় অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[৯৬] ভাষণে তিনি ইংরেজ শাসনপূর্ব ভারতের অতীতে গৌরবময় সোনালী ঐতিহ্যের ইতিহাস তুলে ধরেন। তিনি বলেন যে, ভারতের প্রাচুর্যের কারণে দীর্ঘকাল পর্যন্ত ইউরোপ নিজের সকল শ্রম সাধনা এ দেশটির দিকে অভিনিবিষ্ট করে রেখেছে। পৃথিবীর এমন কোন সম্রাট ছিল না যার প্রলুব্ধ দৃষ্টি এ দেশটির দিকে পড়েনি। এমন কোন জাতি ছিল না যাদের মনে ভারতবর্ষের ভালবাসার

---

[৯৪] মওলানা হুসায়ন আহমেদ মাদানী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৯২।

[৯৫] ফরীদুল ওয়াহিদী, *শায়খুল ইসলাম মওলানা হুসায়ন আহমেদ মাদানী* (নিউ দিল্লী: কওমী কিতাব ঘর, ১৯৯২), পৃ. ২৪৫।

[৯৬] Barbara D. Metcalf, *Hussain Ahmed Madani* (England: One world publication Oxford, 2009), p. 79.

দাগ কাটেনি। এমন কোন বস্তু পৃথিবীতে নেই যার ভান্ডার আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিতে অনুপস্থিত। এমন কি যোগ্যতা অন্য জাতির আছে যা রপ্ত করতে ভারতীয়রা অক্ষম?

এ ভূ-খন্ড ইউরোপীয়রা বিশেষ করে ইংরেজরা কিভাবে অধীভুক্ত করেছিল এবং তাদের হাতে এ দেশের সম্পদ, ঐশ্বর্য, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা কি পরিমাণে বিধ্বস্ত হয়েছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, সেই ভারতবর্ষ যে কিছুকাল আগেও শুধু নিজ দেশকে নয় বরং পৃথিবীর শত শত দেশকেও নানা রকমের পোশাক উপহার দিয়ে সজ্জিত করে আসছিল, যে দেশের বস্ত্রশিল্প এশিয়া ইউরোপ ও আফ্রিকার বহু দেশে প্রচুর চাহিদার সাথে রপ্তানি হত, সে দেশ এখন ভয়ানক অভাবী ও দায়গ্রস্ত। ইউরোপীয় কূট-কৌশল ও পাশ্চাত্য সংস্কার এ দেশকে এতখানি দুর্বল ও দরিদ্রে পরিণত করেছে যে, বর্তমানে শুধু সূতি বস্ত্র আমদানির জন্য প্রতি বছর ৬০ কোটি টাকা লন্ডনে পাঠাতে হচ্ছে। যেই ভারত বর্ষ নিজের উৎপাদন দ্বারা নিজ সন্তানকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখত এবং পার্শ্ববর্তী দেশগুলিকেও লালন করত, আজ সেই দেশের পক্ষে নিজ সন্তানের ক্ষুধা নিবারণে এক টুকরা রুটির সংস্থান করাও কঠিন।

ভারতবর্ষের আধিপত্য অক্ষুণ্ণ রাখার স্বার্থে ইংরেজরা পার্শ্ববর্তী কোন কোন ভূ-খন্ডের উপর নিজেদের হিংস্র থাবা প্রসারিত করে রেখেছে, সেদিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, বর্তমানে গোলামীর সাড়াঁশীকে আরও সুদৃঢ় করে চিরদিনের জন্য পাকাপোক্ত করে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। এ লক্ষ্যেই জিব্রাল্টার, মাল্টা ও এডেন বন্দর হস্তগত করা হচ্ছে। সমুদ্রের নেতৃত্ব ও রাজত্ব নিজেদের কুক্ষিগত করে নেয়া হচ্ছে। এ লক্ষ্যেই মিশরকে দাবিয়ে রাখা হচ্ছে, ইরাককে পিষে ফেলা হচ্ছে, ইরানের মস্তক কর্তন করা হচ্ছে, তুর্কী খেলাফতের কেন্দ্রীকতা ভেঙ্গে দেয়া হচ্ছে এবং আরব ও সুদানি দেশগুলিরর শক্তি খান খান করা হচ্ছে।[৯৭]

তিনি ভারতীয়দের উপর ইংরেজদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিপীড়নের বিস্তারিত বর্ণনা দেন। বিশেষতঃ জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঘটনা ও মুসলমানদের পবিত্র স্থানসমুহের উপর আক্রমণ চালানোর কাহিনী তুলে ধরে বলেন, ইংল্যান্ডের সাধারণ খ্রিষ্টান ও পাদ্রীদের মধ্যে ধর্মীয় উন্মাদনা এত প্রবল যে, মুসলিম সমাজে পবিত্র কুরআনের অস্তিত্ব বজায় থাকা কিংবা কোন মসজিদ আবাদ হওয়াকেও তারা মুসলমানদের জন্য অপরাধ বলে মনে করে। তাদের মস্তকে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব এত বেশি যে, যেই ভারতবর্ষ তাদের জীবন ও সম্পদ সকল দিক থেকে শক্তি সরবরাহ করছে, সেই ভারতের অধিবাসীদেরকে তার শেয়াল কুকুরের চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করে এবং নানাভাবে তাদেরকে লজ্জিত ও অপমানিত করে। দেশ ও দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি বলেন, আজ অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, দেশ আমাদের, ভূখন্ড আমাদের, সম্পদ আমাদের, সৈনিক আমাদের, ভান্ডার আমাদের, অথচ আমরাই লাঞ্ছিত ও অপমানিত, আমরাই দুর্বল ও শক্তিহীন। আমাদের অধিকার কেড়ে নেয়া হচ্ছে। আমাদেরকে নানাভাবে হয়রানি করা হচ্ছে। আমাদের উপর কঠিন থেকে

[৯৭] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫৮।

কঠিনতর আইন চাপিয়ে দেয়া হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত এ ব্যাধির চিকিৎসা কি হবে? ভবিষ্যতের মুক্তি ও সফলতা কিভাবে আসতে পারে? আমাদের কাঁধ থেকে গোলামীর জিঞ্জির, আমাদের পা থেকে অসহায় ও বন্দিত্বের শিকল কিভাবে কেমন করে খোলা যেতে পারে? এসকল বিষয়ে আমরা চিন্তা করছি কি? এ ব্যাপারে আমাদের চিন্তা-ভাবনা করা এবং সঙ্কট নিরসনের উপায় খুঁজে বের করা যুগের সর্বপ্রথম দাবী ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।[৯৮] মাওলানা আবুল কালাম আযাদের নেতৃত্বে (১৮-২০ নভেম্বর, ১৯২০) জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের তৃতীয় সম্মেলনে বিদেশী পণ্য বর্জন করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[৯৯]

মাওলানা মাদানীর ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারণা ও কারাবরণ

১৯২১ সালের ২৫ মার্চ রংপুরের মহিমাগঞ্জে আঞ্জুমানে উলামায়ে বাঙ্গালের আহবানে একটি সম্মেলনে শায়খুল ইসলাম সভাপতি হিসেবে আমন্ত্রিত হন। তিনি এখানে বর্তমান দেশ ও জাতির জন্য আলিম সমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে গুর"ত্বপূর্ণ আলোচনা করেন এবং নিজেদের মধ্যকার মতানৈক্য ভুলে গিয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানান। তার বক্তব্যে তিনি খেলাফত সংরক্ষণের ও বিদ্যমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুসলমানদের জন্য জিহাদ আবশ্যক বলে ঘোষণা করেন। মুসলিম বিশ্বের উপর ব্রিটিশের গোলাবর্ষণ বিশেষত পবিত্র মক্কা ও মদীনার উপর তাদের বর্বরোচিত হামলার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদের মুসলিম সৈন্যরাই সেখানে ইংরেজদের নির্দেশ মোতাবেক মুসলমানদের উপর গুলি চালাচ্ছে। আমাদের সৈন্যরা সেই মুসলমানদের সম্পদ লুন্ঠন ও তাদের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত করে ধর্মের শত্রু ইংরেজদেরকে সাহায্য করছে। আপনারা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন এ কর্মকান্ডের পর কিভাবে আমরা গুরুতর শাস্তি থেকে রক্ষা পাব?[১০০]

১৯২১ সালের ৮-৯ ই জুলাই করাচীতে মুহাম্মদ আলী জাওহারের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় খিলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাতীয় প্রেক্ষাপটের আলোকে প্রশ্নোত্তরের জন্য সাধারণ জনগণকেও আমন্ত্রণ জানানো হয়। এ সম্মেলনে মাওলানা মুহাম্মদ আলী মাওলানা মাদানীকে প্রয়াত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের মাল্টায় বন্দী থাকাকালীন সময়ের সহচর ও খাঁটি ভক্ত হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে জনগণের সামনে পরিচয় করিয়ে দেন।[১০১] সম্মেলন চলাকালে মাওলানা মাদানী জনগণের বহু প্রশ্নের জবাব দেন। তাঁর প্রদত্ত উত্তরসমূহ জনগণের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায় ও ভবিষ্যত আশা ভরসার কেন্দ্রস্থল হিসেবে তিনি জনগণের মনে স্থান তৈরী করে নেন। তাঁর জাতীয়তাবাদের চিন্তাদর্শন কেবল মুসলমানদের কেন্দ্র করেই আবর্তিত ছিলনা। এই ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই তাকে সকল শ্রেণীর নেতৃবৃন্দের কাছে সুপরিচিত ও জনপ্রিয় করে তোলে। এমনকি

---

[৯৮] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩।
[৯৯] Madani Asjad, *op. cit.*, p. 10.
[১০০] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৬।
[১০১] *তদেব*, পৃ. ১৬৭।

হিন্দুদের ধর্মীয় নেতা শঙ্করাচার্য এবং জগৎ গুরু প্রকাশ্যে মাওলানা মাদানীর সমর্থন করেন এবং তাদের অনুসারীদেরও তাকে অনুসরণ করতে উৎসাহ দেন। ১৯২১ সালের ৮-৯ ই জুলাই করাচীতে মাওলানা মুহাম্মদ আলী জওহরের সভাপতিত্বে সর্ব ভারতীয় খেলাফত কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল ইসলাম এ কনফারেন্সে যোগদান করেন। তিনি তার ভাষণে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে ঘোষণা দেন যে, ইংরেজ সরকারের পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে কোন মুসলমানের চাকুরী করা হারাম।[১০২] তার বক্তব্যের সমর্থনে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, মাওলানা নেছার আহমাদ, ডাক্তার সাইফুদ্দিন কিচলু ও স্বামী কৃষ্ণ তীর্থ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এ সিদ্ধান্তটি দেওবন্দ থেকে শায়খুল ইসলাম মাদানী, কানপুর থেকে মাওলানা নেছার আহমাদ, সিন্ধু থেকে মাওলানা গোলাম মুজাদ্দিদের স্বাক্ষরে একটি ফতোয়ার আকারে মুদ্রিত করা হয়। ব্রিটিশ সরকার উক্ত ফতোয়াকে উস্কানিমূলক ও সহিংস আখ্যা দিয়ে বাজেয়াপ্ত করে এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার আখ্যা দিয়ে উপরিউক্ত পাঁচ নেতার উপর ওয়ারেন্ট জারি করে।[১০৩] এসময়ে শায়খুল ইসলাম হুসাইন আহমদ মাদানী দেওবন্দে অবস্থান করছিলেন। পুলিশ তাকে গ্রেফতারের জন্য উপস্থিত হলে পুলিশ ও সাধারণ জনতার সংঘর্ষ চলে। সংঘর্ষ থামাতে শায়খুল ইসলাম নিজেই পুলিশের হাতে নিজেকে সোপর্দ করেন।[১০৪]

করাচীর ওই সম্মেলন হতে আলী ভ্রাতৃদ্বয় (মাওঃ শওকত আলী ও মাওঃ মুহাম্মদ আলী) এবং আরো ৫জন নেতৃবৃন্দকে তাদের গণবিক্ষোভ ও উস্কানীমূলক বক্তব্য প্রচারের জন্য গ্রেফতার করা হয়। বাকী ৫ জন নেতারা হলেন ডঃ কিচলু, জগৎগুরু শংকরাচার্য, নিসার আহমেদ, পীর গোলাম মুজাদিদ এবং হুসাইন আহমদ মাদানী প্রমুখ।[১০৫]

পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে করাচী নিয়ে যায় এবং ২৬ সেপ্টেম্বর অভিযুক্তদের সকলকে প্রথমে করাচীর ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট 'খালেকদীনা' হলে উপস্থিত করা হয়। তাকে জেরা করা হলে তিনি লিখিত বক্তব্যে সকল প্রশ্নের জবাব দিবেন বলে জানান। এ বক্তব্য পরে ফুলস্কেপ সাইজের কাগজের ১৬ পৃষ্ঠায় 'বেনজির পহেলা বয়ান' শিরোনামে প্রকাশিত হয়। এখানে তিনি কুরআন-হাদীস ও যুক্তির মাধ্যমে নিজের পক্ষ সমর্থন করেন। বক্তব্যের শুরুতে মহারানী ভিক্টোরিয়ার প্রচারিত ঘোষণাপত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, এ ঘোষণাপত্রে উপমহাদেশীয় মুসলমানদের ধর্মীয় পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে। তাছাড়া কারও ধর্মীয় অনুভূতির উপর হস্তক্ষেপ করা হবে না বলেও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আমার দুটি পরিচয় আছে। আমি একজন মুসলমান এবং আমি একজন আলিম। মুসলমান হিসেবে আমাকে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশ অনুযায়ী চলা আবশ্যক। এক্ষেত্রে কোন প্রকারে অন্যথা করার সুযোগ নেই। আর একজন

---

[১০২] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭।
[১০৩] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউনেন্ডশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ৩৯।
[১০৪] Metcalf D. Barbara, *Hussain Ahmed Madani* (England: One world publication Oxford, 2009), p. 147.
[১০৫] Ram Gopal, *How India struggled for freedom* (Bombay: K. R. Samanthe the book center Pvt. Ltd., 1967), p. 326.

আলিম হিসেবে পবিত্র ধর্ম হিসেবে ইসলামের যথাযথ সংরক্ষণ করার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আলিমদের সম্পর্কে ইসলামের পয়গাম প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ রয়েছে। তিনি কুরআনের ৯ টি আয়াত উল্লেখ করে বলেন, এ সকল আয়াতের নির্দেশ থেকে প্রমাণিত যে, কোন মুসলমানকে হত্যা করা হারাম। এভাবে সহীহ হাদীসগ্রন্থের ৩৪ খানা হাদীস পেশ করে প্রমাণ করেন যে, কুফরীর পরে একজন মুসলিমের জন্য জঘন্যতম পাপকর্ম হল কোন মুসলমানকে হত্যা করা। তিনি কালাম শাস্ত্রের জাওহারাহ, শরহে আকাঈদে নাসাফী, শরফে মাওয়াকিফ, শরহে মাকাসিদ, ফিকহ ও ফাতওয়া শাস্ত্রের কাযীখান, আলমগীরি, দুররে মুখতার, শামী, বাযযাযিয়া, উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের নুরুল আনওয়ার, তাওযীহ, তালবীহ, উসুলে বাযদুবী ইত্যাদি থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, ইসলামের বিধান হল কোন স্বৈরাচারী যালিম যদি কোন মুসলমানকে অপর কোন মুসলমানের হাত, পা বা অন্য কোন অঙ্গ অন্যায়ভাবে কর্তনের আদেশ দেয় এবং এ আদেশ অমান্য করার কারণে তাকে হত্যার হুমকি দেয় তাহলে, এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির অপর ভাইয়ের উপর আঘাত করে বেঁচে যাওয়ার চেয়ে নিজে মারা যাওয়া উত্তম।[১০৬]

তিনি ফতওয়া বিশেষজ্ঞ মাওলানা আব্দুল হাই লখনোবী, শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলবী ও মাওলানা আশরাফ আলী থানভীর উল্লেখ করে বলেন, এদের সকলের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ বাহিনীতে চাকুরী করা হারাম। কাজেই জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের গৃহিত রেজুলেশন নতুন কোন কথা নয়। এটি ইসলামের শাশ্বত বিধান। ইসলামের এ বিধান প্রচারে বাধা দেয়া মুসলমানদের ধর্মীয় অনুভূতির উপর হস্তক্ষেপের শামিল। দ্বিতীয় বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়ের মূহুর্তে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিস্টার জর্জ এ যুদ্ধকে ক্রুসেড যুদ্ধ বলেছেন। মিস্টার চার্চিলও এটিকে ক্রুসেড যুদ্ধ অভিহিত করেছেন। এমতাবস্থায় যে মুসলমান ক্রুসেডে খৃষ্টান পক্ষ অবলম্বন করবে সে শুধু পাপ নয় বরং কাফিরে পরিণত হবে।

তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, শাসকের কোন আদেশ ইসলামী বিধান ত্যাগ না করে করা যায়। আমরা আজ পর্যন্ত যা করেছি তার সবই যেমন ইসলামের আওতায় অবস্থিত তেমনি রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রেরও আওতায় অবস্থিত। অতএব, এ কারণে যদি আমাদের শাস্তি হয় তাহলে এর যাবতীয় দায় দায়িত্ব বহন করতে হবে সরকারকেই। আর সরকার যদি আমাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা রহিত করতে চায় তাহলে পরিস্কারভাবে জানিয়ে দেয়া উচিত। আমরা সাত কোটি মুসলমান চিন্তা করে দেখব আমরা মুসলমান হিসেবে থাকব নাকি বৃটিশের প্রজা হিসেবে থাকব। অনুরূপ ২২ কোটি হিন্দুও নিজেদের ধর্মের ব্যাপারে চিন্তা করে সিদ্ধান্ত নেবে। ঐ বক্তব্যে শায়খুল ইসলাম আরও বলেন, যদি লর্ড রিডিং এ উদ্দেশ্যে ভারতে প্রেরিত হয়ে থাকেন যে, তিনি কুরআন শরীফ পুড়িয়ে দেবেন, হাদীস শরীফ মিটিয়ে দিবেন, ফিকহের কিতাবপত্র খতম করে দিবেন তাহলে,

---

[১০৬] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৪।

পবিত্র ধর্ম ইসলাম রক্ষার্থে নিজ জীবন উৎসর্গের জন্য সর্বপ্রথম আমি আমার নাম পেশ করলাম।[১০৭] তার বক্তব্যের শেষের বাক্যগুলি উচ্চারণের সাথে সাথে খালেকদীনা হল মারহাবা মারহাবা ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে। মাওলানা জাওহার দূরে দাড়িয়ে ছিলেন। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে সম্মুখে অগ্রসর হয়ে শায়খুল ইসলামের পদচুম্বন করেন। জবানবন্দির পর মামলাটি নিম্ন কোর্ট থেকে স্থানান্তরিত করে জুডিশিয়াল কমিশনারের হাতে ন্যস্ত করা হয়। ঐ কোর্টেও তিনি একই বক্তব্য আরও বিস্তারিতভাবে পেশ করেন যা 'দিলিরানা ও শাজাআনা দুসরা বায়ান' শিরোনামে মুদ্রিত হয়। মামলার রায়ে শায়খুল ইসলামকে বিদ্রোহের অভিযোগ থেকে নিস্কৃতি দিলেও অপরাধ আইনের ৫০৫ ও ১০৯ ধারা অনুসারে ২ বছরের সশ্রম কারাদন্ড দেয়া হয়। করাচীর মামলায় শায়খুল ইসলাম মাদানী, মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার প্রমুখ নেতা কারারুদ্ধ হওয়ার পর অসহযোগ আন্দোলনের দায়ে কংগ্রেস ও খেলাফত কমিটির আরও বহু নেতা কারাগারে প্রেরিত হন। মহাত্মা গান্ধী, মাওলানা আযাদ, চিত্ত রঞ্জন দাস, মতিলাল নেহেরুসহ রাজবন্দীদের সংখ্যা তখন ২০ হাজারে গিয়ে দাড়িয়েছিল।

শায়খুল ইসলামকে প্রথমতঃ করাচী জেলে তারপর আহমেদাবাদের সাবরমতি জেলে রাখা হয়। এই দন্ডকালীন সময়ে অন্য অপরাধীদের সাথে তাঁর ওপরও অকথ্য অপমান ও নির্যাতন চলে। প্রথমদিকে প্রতিদিন পাঁচ ঘন্টা কাজ করতে হয়। পরিধানের জন্য জেল থেকে মোটা সূতি কাপড়ের কোর্তা ও হাঁটু ছোয়া নিকার (হাফ প্যান্ট) দেওয়া হয়। এ পোশাকে সতর ঢাকা যেত না বলে নামাজ পড়তে ভীষণ কষ্ট হত। তিনি কয়েকজন কয়েদীকে সাথে নিয়ে জেলের ভিতরেই কঠোর প্রতিবাদ জানান। ফলে, হাঁটুর নিচ পর্যন্ত নিকারের ব্যবস্থা হয়। খাটুনীর পর ব্যারাকে ফেরার পথে গেইটে প্রত্যেক কয়েদীর জামা কাপড় চেক করা হত। বিশেষ করে তাদের কোমরের রশি খুলতে বাধ্য করা হত। কোন কোন কয়েদীকে উলঙ্গ পর্যন্ত করে ফেলা হত। তিনি এর প্রতিবাদ জানালে বাড়তি সময় হাতকড়া পরিয়ে রাখা ও অত্যন্ত নিম্নমানের খাবার প্রদান সহ ১ মাসের জন্য শায়খুল ইসলামসহ সকলের পায়ে ভারী লোহার শিকল বেঁধে দেয়া হয় যার কারণে তাদের স্বাভাবিক চলাফেরা কষ্টকর হয়ে পড়ে। মহাত্মা গান্ধী বিষয়টি জানতে পেরে 'ইয়াং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় প্রতিবাদ করলে বাড়তি শাস্তি ও চেক করার শাস্তি মওকুফ হয়।[১০৮]

সাবরমতি জেল থেকে লিখিত এক চিঠিতে তিনি বলেন,আল্লাহর পরম অনুগ্রহে এখানে বা করাচীতে আমার বিশেষ কোন কষ্ট হয়নি। কোন প্রকার কৃত্রিমতা না করে বাস্তবভাবেই বলছি, এখানে আমি কোন কষ্টের মধ্যে নেই। বন্ধুদের বিরহ সাময়িক সময়ের জন্য মনে যন্ত্রণার উদ্রেক করলেও চিঠি সাক্ষাতের অর্ধাংশ সূত্র মতে তা নিরসন হয়ে যাচ্ছে। আল্লাহর অনুগ্রহের ফলে, আমি এখানে মনের যে স্থিরতা ও সন্তুষ্টি অনুভব করছি তাতে এখান থেকে বের হওয়ার দু'আ করতেও বিবেক বাধা দেয়। তবে, আল্লাহর সন্তুষ্টির উপর সন্তুষ্ট থাকা জরুরী।

---

[১০৭] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭২-১৭৪।
[১০৮] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মালটা* (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো., ১৯৭৬), পৃ. ১২৬।

তাই, আমি তার হাজার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি যে, তিনি বন্দী অবস্থায় আমাকে বহু প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য পুরস্কার দ্বারা ধন্য করে যাচ্ছেন। আমি শপথ করে বলতে পারি এ বন্দীত্ব সম্পূর্ণ আমার জন্য রহমত হিসেবে দেখা দিয়েছে। দয়াময় আল্লাহ তায়ালা যদি এটি কবুল করেন তাহলে, প্রতিটি মুহূর্ত ইনশাআল্লাহ আমার আখিরাতের পথে হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মোটকথা সবদিক থেকেই আসমানী অনুগ্রহ প্রাপ্ত হচ্ছি। আমাদের মহান বুযুর্গদ্বয় হযরত গাঙ্গুহী ও হযরত শায়খুল হিন্দ উভয়েই অধমের প্রতি সহানুভূতিশীল দেখতে পাচ্ছি। এমনও বন্দীত্ব বছরের পর বছর থাকলেও চিন্তা কিসের?[১০৯]

মাওলানা মাদানীর মুক্তি লাভ

করাচীতে দুই বছর কারাবাসের পর শায়খুল ইসলাম ১৯২৩ সালের অক্টোবরে মুক্তি লাভ করেন। অন্য সকল নেতার ন্যায় তার মুক্তি উপলক্ষেও বিশাল সম্বর্ধনার আয়োজন করা হয়। কিন্তু তিনি এসব অনুষ্ঠানে যোগদান না করে দেওবন্দে ফিরে যান। দেওবন্দে নিজের একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষীদের এক অনুরোধের জবাবে তিনি বলেছিলেন, আমাদের কিসের আনন্দ মিছিল? আমরা কি ইংরেজদেরকে পরাজিত করতে সক্ষম হয়েছি? আমার কাছে নিজের মুক্তিতে আদৌ কোন খুশি মনে হচ্ছে না। বরং, আমার দুঃখ যে, ইংরেজরা জয়ী হচ্ছে এবং আমরা হেরে যাচ্ছি। এমন পরাজিতদের স্ফুর্তি মিছিল করার সুযোগ কোথায়?[১১০]

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

১৯২৩ সালে মুক্তির পর ফিরে তিনি দেখেন, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। যে খিলাফত সংরক্ষণের প্রতি তিনি জোর দিচ্ছিলেন, তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক কর্তৃক খলিফা ৬ষ্ঠ মুহাম্মদকে পদচ্যুত করার ফলে সে খিলাফত বিলুপ্তপ্রায়। যার ফলে ভারতবর্ষে খেলাফত আন্দোলনের প্রাণশক্তিও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। অপরদিকে তিনি কারারুদ্ধ হবার পূর্বে যে হিন্দু-মুসলিম মৈত্রী আন্দোলন দেখে গিয়েছিলেন, ব্রিটিশদের 'ডিভাইড ও রুল নীতি' সেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিও বিনষ্ট করেছে। কারণ, অসহযোগ আন্দোলনে হিন্দু মুসলিম ঐক্য পর্যবেক্ষণ করে ক্ষমতাশীল ইংরেজরা নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দারুন উদ্বিগ্ন হয়ে গিয়েছিল। ব্রিটিশরা উপলব্ধি করেছিল যে, ভারতীয়দের ঐক্য যেকোন মুহূর্তে ইংরেজদের পতন ঘটাতে সক্ষম। তাই, সরকার পরিকল্পিতভাবে ভারতীয়দের ঐক্য ভেঙ্গে দেয়ার ও সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিহিংসা উস্কে দেয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাদের উস্কানিতে 'সংগঠন' ও 'শুদ্ধি' নামে উগ্রপন্থীদের দুটি সংস্থা হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলন শুরু করে। আবার এরই প্রতিক্রিয়ায় মুসলমানদের দিক থেকে 'তাবলীগ' ও 'তানযীম' নামে পাল্টা কর্মসূচী গৃহীত হয়। এভাবে ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের গতি পরিবর্তিত হয়ে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার দিকে মোড় নেয়। এই পরিস্থিতিতে শায়খুল ইসলামকে পুনরায় নতুন করে আন্দোলন শুরু করতে

[১০৯] নাজমুদ্দীন ইসলাহী, *সীরাত ই শায়খুল ইসলাম*, ২য় খণ্ড (দেওবন্দ: মাকতাবা দ্বীনিয়া, তা.বি.), পৃ. ৫৬-৫৭।
[১১০] আবদুর রশীদ আরশাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৮১।

হয়। তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সফর করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ও ঐক্য পুনরুদ্ধারের প্রয়াস চালান। জেল হতে মুক্তির পর তাঁর জীবিকার ব্যবস্থা করা জরুরী হয়ে পড়েছিল। উপরন্তু, তিনি বহু টাকা ঋণী হয়ে পড়েন। তাঁর এ আর্থিক অনটনের সুযোগ নিতে সরকারি-বেসরকারি বহু চাকুরীর প্রলোভন তাঁকে দেখানো হয়। শর্ত ছিল, আন্দোলন ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু তিনি তাদের এই বলে ফেরত দেন যে, হযরত শায়খুল হিন্দ আমাকে যে কাজে লাগিয়ে গিয়েছেন, সেটি থেকে আমি সরতে পারিনা।[১১১]

জমইয়াতের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে মাদানীর সভাপতিত্ব ও জাতীর দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত

১৯২৫ সালে জেল হতে মুক্তি লাভের পর তিনি কোকানাড়ায় অনুষ্ঠিত জমইয়াতের ৫ম বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন।[১১২] এই সম্মেলনে সাম্প্রদায়িক ঐক্য অটুট রাখার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সভাপতির ভাষণে তিনি বলেন, ইংরেজরা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর শত্রু। একজন মুসলমান হিসেবে এ শত্রুর প্রতিরোধে জিহাদে অবতীর্ণ হওয়া সকলের কর্তব্য। তিনি কুরআনের বাণী (৮:৬০) উল্লেখ করে বলেন, বর্তমানে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক ঐক্য গড়ে তোলা ও অব্যাহত রাখা জরুরী। কেননা, একমাত্র ঐক্যের শক্তি দ্বারাই শত্রুকে কাবু করা যেতে পারে। তিনি আরও বলেন, বর্তমানে আমাদের সার্বিক বিষয়ে কর্তব্য হল- ব্রিটিশ অপকৌশলের বিরুদ্ধে পূর্ণ শক্তি নিয়ে মোকাবেলা করা এবং এই মোকাবেলাকে নিজেদের উদ্দেশ্য হিসেবে গ্রহণ করা। যতদিন পর্যন্ত উপমহাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত না হবে ততদিন পর্যন্ত না নিজেরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলব আর না সাম্রাজ্যবাদকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে দেব। এ অধিবেশনে জমইয়াত তাদের প্রতিষ্ঠার মৌলিক উদ্দেশ্য হিসেবে ভারতের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জোরালো দাবী জানায়। কোকানাড়া অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মাওলানা মাদানীর সভাপতির বক্তব্যে মুসলমানদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের প্রতি আলোকপাত করা হয়।

ক. বিদেশী প্রশাসনের বিরুদ্ধে লড়াই
খ. ভারতের স্বাধীনতা

তাঁর বক্তৃতার কিছু অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল-

হিন্দু মুসলিম ঐক্য ভারতের স্বাধীনতার একটি পূর্ব শর্ত। এটি মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দায়িত্ব যে তারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালাবে যতক্ষণ পর্যন্ত না ক্ষমতাসীন প্রশাসন তাদের দাবি মেনে নেয়। এ দায়িত্ব তাদের একক অথবা যৌথভাবে; যেভাবেই হোক না কেন পালন করতে হবে। এটি আল্লাহর আদেশ যে, যদি কোন অমুসলিম তোমার দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়, তোমাকেও হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। সহীহ কারণে যারা সমঝোতা করে ; তারাই আল্লাহর প্রকৃত বিশ্বাসী বান্দা। আর যদি তারা (অমুসলিম)

---

[১১১] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫।
[১১২] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮১।

তোমার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাতে অভিযোগের কিছু নেই কারণ, আল্লাহই তোমার সবচেয়ে বড় সমর্থনকারী।[১১৩]

কোকানাড়ায় ৫ম বার্ষিক অধিবেশনের (৩১ ডিসেম্বর ১৯২৩- ২রা জানু ১৯২৪) সভাপতির ভাষণে মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানী পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।[১১৪] দেশবাসীদের ওপর ব্রিটিশদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরার মাধ্যমে তিনি তাঁর বক্তব্য শুরু করেন। ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে যাবার মাধ্যমে তাদের যতটা সম্ভব ক্ষতি সাধনের জন্য তিনি জনগণকে উৎসাহিত করেন। তিনি বলেন ব্রিটিশরা ভারতের পবিত্র স্থানগুলোকে রক্ষা করার জন্য যত ওয়াদা করেছিল তার সবই তারা ভঙ্গ করেছে। সুতরাং মুসলমানদের জন্য ব্রিটিশদের বিরোধিতা করা ধর্মীয় ও রাজনৈতিকভাবে অবশ্য কর্তব্য। তাঁর বক্তব্যের সপক্ষে তিনি নিম্নলিখিত যুক্তি তুলে ধরেন-

ক) ব্রিটিশরা আমাদেরই সামরিক শক্তি ব্যবহার করে সর্বত্র আমাদের নির্যাতন ও অপদস্থ করছে। অতএব ভারতের স্বাধীনতা অর্জনই তাদের অশুভ শাসন ও নীতিসমূহ হতে মুক্তিলাভের একমাত্র পন্থা।[১১৫]

খ) মুসলমানদের পবিত্র তীর্থ স্থানসমূহ এবং খিলাফত সম্পর্কে গৃহীত বিদ্বেষপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলোর বিরুদ্ধে ভারতীয় মুসলমানদের প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হবে যদি ভারত মুক্ত হয়। ভারতের সাথে বিশ্বের বহু রাষ্ট্র ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হবার ফলে ভারত মুক্ত হলে জনগণের প্রতিবাদ ফলপ্রসূ হতে বাধ্য।[১১৬]

গ) ব্রিটিশদের অশুভ নীতির বলে তারা মুসলিম সেনাদের বিভিন্ন মুসলিম দেশের লুন্ঠন, ও ধ্বংসসাধনের কাজে নিয়োগ করেছে। যদি কোন সৈন্য এ কাজ বৈধ দায়িত্বের অনুসঙ্গ মনে করে পালন করে তবে সে ইসলামী আইন অনুসারে বিধর্মী বলে গণ্য হবে।[১১৭]

এ কারণে আমাদের প্রাথমিক, গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য দায়িত্ব হলো সর্বশক্তি নিয়োগ করে ব্রিটিশদের নীতিসমূহের ঘোর বিরোধিতা করার লক্ষ্যে সংকল্পবদ্ধ হওয়া। বিপ্লবী আলিমদের উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ১৯২৫ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত জমইয়াতের চতুর্থ বার্ষিক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত হয় যে, জমইয়াত বৃটিশের কোন সহযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে না। জমইয়াতের দৃষ্টিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কাউন্সিলের সদস্যপদ গ্রহণ করা হারাম। ভারতীয়দের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম বিনষ্ট করার জন্য ব্রিটিশরা যখন তুমুল হানাহানি উস্কে দেয় তখন বিপ্লবী উলামাগণ সাম্প্রদায়িক ঐক্য ফিরিয়ে আনা এবং স্বাধীনতার মূল দাবির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন। এক পর্যায়ে এমনকি শুধু মুসলমানদেরকে নিয়ে হলেও সংগ্রাম অব্যাহত

---

[১১৩] হুসাইন আহমদ মাদানী, *খুতবাত ই মাদানী* (দেওবন্দ: জমজম বুক ডিপো., ১৯৯৭), পৃ. ২৩২।

[১১৪] সাইয়্যেদ তুফায়িল আহমেদ, *মুসলমানো কা রোশান মুসতাকবিল* (মুম্বাই: মাকতাব আল হক মডার্ন ডায়েরী জোগেশ্বরী, ২০০১), পৃ. ৫১২।

[১১৫] রোজিনা পারভীন, *জমিয়তে উলামা ই হিন্দ দস্তাবেজাত ই মারকাযি ই জলসা ই আম ১৯১৯-১৯৪৫*, ১ম খণ্ড (ইসলামাবাদ: কাওমি ইদারা বড়ই তাহকিক ওয়া সাকাফাত, ১৯৮০), পৃ. ১৯৪-২২৮।

[১১৬] রোজিনা পারভীন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৪-২২৮।

[১১৭] *তদেব*।

রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাই, ১৯২৬ সালে কলকাতা অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হয় যেহেতু স্বদেশী ভাইদের কারণে যেহেতু হিন্দু-মুসলিম পারস্পরিক প্রতিহিংসা বৃদ্ধি পাচ্ছে সুতরাং, মুসলমানরা নিজেরাই নিজেদেরকে সংগঠিত করে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করে যাবে। তবে, মুসলিমদের যারা এ ব্যাপারে একমত হবে তাদের সঙ্গে ঐক্য গঠনের সুযোগ থাকবে।[১১৮]

জেল থেকে সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কঠোর নজরদারিতে ছিলেন। ১৯২২ সালে চৌরিচৌরার পুলিশদের পুড়িয়ে মারার ঘটনায় মহাত্মা গান্ধীও অসহযোগ আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটান। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাদানী শাসক শ্রেণীর রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ব্রিটিশ শাসন হতে আযাদীর সংগ্রামে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকেন।

১৯২৩ সালে থেকে ১৯৩০ সালে পর্যন্ত অর্ধযুগেরও বেশী সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে চরম বিশৃংখলা ও অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে। স্বাধীনতা আন্দোলন রূপান্তরিত হয় নিছক ধর্মীয় বিরোধ ও সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসায়। ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন ভুলে হিন্দু-মুসলমানরা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকে। সাম্প্রদায়িকতার এ সাংঘর্ষিকতায় সর্বভারতীয় জাতীয় নেতৃবৃন্দ তথা মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহার, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। তারা স্বধর্মীয় লোকদের কাছেও প্রচন্ড সমালোচনার সম্মুখীন হন। শায়খুল ইসলাম জেল থেকে মুক্তির পর সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা প্রতিরোধের চেষ্টা করেন। কোকানাড়ায় জমইয়াত ও কংগ্রেসের বিভিন্ন ভাষণে এই সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের জন্য তিনি প্রধানতঃ ইংরেজদেরকে দায়ী করেন। তিনি প্রতিরোধের একমাত্র উপায় হিসেবে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে জোরালো ও শক্তিশালী করার পরামর্শ দেন। সিলেট আগমনের পর বিভিন্ন সভায় তিনি জনগণকে সাম্প্রদায়িকতা থেকে বিরত থাকার আহবান জানান। সিলেটের উলামাশ্রেণীর বারংবার অনুরোধে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করে এখানকার জনগণকে কুরআন-হাদীসের শিক্ষা প্রদান করেন। সত্য প্রকাশে অকুতোভয় মাওলানা মাদানীকে ১৯২৬ সালে করাচীর বেইনা হলে ইংরেজ বিচারকের সামনে শুনানির জন্য ডাকা হয়। তাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে, হুসাইন আহমেদ! আপনি কি মুসলমানদের সেনাবাহিনীতে যোগদানের বিরুদ্ধে ফতওয়া প্রদান করেছিলেন? তিনি উত্তর দেন, আমি অতীতেই শুধু এই ফতোয়া জারী করিনি বরং এই ফতওয়া এখনও জারী আছে। এই শুনানীতে মুহাম্মদ আলী জাওহার ও উপস্থিত ছিলেন। তিনি মাওলানা মাদানীর পা জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বলেন, আল্লাহর দোহাই! আপনার মত পরিবর্তন করুন। মাওলানা উত্তর দেন, মুহাম্মদ আলী জাওহার! আজ যদি আমি আমার মত পরিবর্তন করি, আল্লাহর কসম, জনগণের ঈমান ও পরিবর্তিত হয়ে যাবে। একারণে আমি আমার মত পরিবর্তনে অক্ষম"।[১১৯]

---

[১১৮] সাইয়্যিদ তোফায়েল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৩।
[১১৯] জিয়াউর রহমান ফারুকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৩।

তার জ্বালাময়ী বক্তৃতা জনগণকে এতটাই প্রভাবিত করত যে, বক্তৃতার জন্য ব্রিটিশদের পক্ষ হতে তাকে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। এতেও তাকে দমানো যায়নি। করাচীর খিলাফত কনফারেন্সে ৯ লক্ষ জনগণের সামনে তিনি চারিদিকে গোলাভর্তি কামান দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে তিনি কাফনের কাপড় বাহুতে জড়িয়ে ভাষণ দিতে দন্ডায়মান হন। তার অকুতোভয় প্রচারণার ফলে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে পুনরায় জনমত সংগঠিত হতে থাকে।[১২০]

মাওলানা মাদানীর দারুল উলুম দেওবন্দের দায়িত্ব গ্রহণ

১৯২৭ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ এক ভয়াবহ দুর্যোগের মুখে পড়ে। প্রতিষ্ঠার ৬১ বছর পর এই প্রথমবার দেওবন্দে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্র ছিলেন তৎকালীন সদরুল মুদাররিসীন ও শায়খুল হিন্দের প্রিয় ও সুযোগ্য শাগরিদ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী। ১৯১৪ সালে হিজাজ যাত্রার প্রাক্কালে হযরত শায়খুল হিন্দ আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীকে ঐ পদে মনোনীত করে যান। হাদীস শাস্ত্রে অসামান্য দক্ষতা ও সুগভীর প্রজ্ঞার কারণে আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী তদানিন্তন বিশ্বের ইমাম বুখারী নামে পরিচিত ছিলেন। তার খ্যাতির ফলে দারুল উলুমের পরিচিতি ও সুখ্যাতি বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। উপমহাদেশে ও বহির্বিশ্ব থেকে জ্ঞান পিপাসু শিক্ষার্থীরা দলে দলে ছুটে আসে। কিন্ত, ১২ বছর পর এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়ে যে, তিনি মাদরাসা থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য হন। মাদরাসার প্রশাসন বিভাগের সহিত শিক্ষা বিভাগের মতানৈক্যে এ ঘটনা ঘটে।

দেওবন্দের অভ্যন্তরে যারা তাঁর সমর্থক ছিলেন তাদের দাবী ছিল, প্রশাসনিক সকল কাজকর্মে সদরুল মুদাররিসিন আল্লামা কাশ্মিরীর মতামত সংযুক্ত থাকতে হবে। কিন্তু, কর্তৃপক্ষের রায় ছিল প্রশাসন ও শিক্ষা সম্পূর্ণ আলাদা বিষয়। তাই, শিক্ষকদেরকে প্রশাসনিক বিষয়ে দখলদার বানানো যায় না। দুই পক্ষ নিজ নিজ দাবিতে অটল থাকেন। প্রথমে উভয়পক্ষের কথাবার্তা ও যুক্তিপ্রমাণ প্রদর্শিত হয়, পরে তর্কবিতর্ক ও বিবাদে রূপ নেয়ায় পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, নিজেদের বিষয় জনসাধারণ্যে ও ঘরের কথা বাজারে ছড়িয়ে পড়ে। মাওলানা আব্দুস সালাম কিদওয়ারী বলেন, দীর্ঘদিন যাবত বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এসব ঘটনা নিয়ে বাদানুবাদ চলে আসছিল। কোন কোন পত্রিকা শুধু এসব আলোচনার জন্য বের করা হত। অবস্থা এমন ভয়ানক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, বুযুর্গানে দ্বীনের অর্ধ শতাব্দীকালের অমূল্য সঞ্চয় ধূলায় বিলীন হওয়ার আশংকা দেখা দিয়েছিল। বিবাদের চরম পর্যায়ে ১৯২৭ খ্রিঃ আল্লামা কাশ্মিরী বহু ছাত্রকে নিয়ে দেওবন্দ থেকে চলে যান।

তখন প্রাক্তন দেওবন্দী উলামাদের মধ্য হতে মাওলানা হুসাইন আহমদ ব্যতিরেকে এই শূণ্যস্থান পূরণ করার মত ব্যক্তিত্বের অধিকারী আর কেউই ছিলেন না।[১২১] ১৯২৮ সালে দারুল উলুম কর্তৃপক্ষের জরুরী নির্দেশে শায়খুল ইসলাম সিলেট থেকে দেওবন্দে গমন করেন। সেখানে পৌঁছে শিক্ষকমন্ডলী ও কর্তৃপক্ষের জোর অনুরোধে দারুল উলুমের সদর মুদাররিস পদ গ্রহণ করেন। সদরুল মুদাররিসিন পদে তার যোগদানের ফলে

---

[১২০] জিয়াউর রহমান ফারুকী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬৪।
[১২১] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরান-ই-মালটা* (দেওবন্দ: কুতুব খানা নাইমিয়াঁ, ২০০২), পৃ. ১১০।

বিগত দেড় বছর যাবত দারুল উলুমের অভ্যন্তরে যে অস্থিরতা ও বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছিল তা দ্রুত প্রশমিত হতে থাকে। তিনি উভয়পক্ষের মধ্যে সমঝোতার জন্য আল্লামা কাশ্মিরী ও তার একান্ত সমর্থক মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানীর সাথে মিলিত হন। তার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে আল্লামা কাশ্মিরী পূর্বের দৃঢ় অবস্থান থেকে সরে আসেন এবং মাদরাসায় পুনরায় যোগদান করে সবক পড়াতে সম্মত হন। মাদরাসায় পুনরায় স্বাভাবিক কর্মকান্ড শুরু হয় ও দারুল উলুম নিশ্চিত বিনাশ থেকে রক্ষা পায়। পরবর্তীতে অবশ্য আল্লামা কাশ্মিরী দেওবন্দ ছেড়ে তার সহচরদের একটি নতুন শিক্ষাকেন্দ্রে যোগ দেন। প্রায় ৩২ বছর মাওলানা মাদানীর অধ্যক্ষ থাকাকালীন সময়ে ৪৪৮৩ জন ছাত্র হাদীস শাস্ত্রে স্নাতোকোত্তর করে। মাওলানা মাদানীর অধ্যক্ষকালীন সময়ে পূর্বে এই স্নাতক ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭৫১ জন। মাওলানা মাদানী প্রায় ২৮ বছর যাবৎ দারুল উলুম দেওবন্দে 'শায়খুল হাদীস' পদে শিক্ষকতা করেন।[১২২]

৬.২৫ সাইমন কমিশনের রিপোর্ট ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের প্রতিক্রিয়া

১৯২৩ সাল থেকে সূচিত সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পরিবেশ সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ঐক্য ও সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। ১৯২৭ সালে ইংল্যান্ডে খ্যাতনামা আইনজীবী স্যার জন সাইমনের নেতৃত্বে ভারতে একটি কমিশন প্রেরিত হয়। কমিশনের উদ্দেশ্য ছিল ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন ভারতে কতখানি কার্যকর হয়েছে তা পর্যালোচনা করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রিপোর্ট পেশ করা। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাত সদস্য নিয়ে এ কমিশন গঠিত হয়। কমিশনে কোন ভারতীয়কে সদস্য রাখা হয়নি। ফলে, ভারতে তীব্র ক্ষোভ ও প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বিষয়টি ভারতবাসী নিজেদের জাতীয় অবমাননা বলে মনে করে। তাই, ভারতীয় সকল রাজনৈতিক দল এ কমিশন বয়কট করে। ১৯২৮ সালের ৭ ই ফেব্রুয়ারী সাইমন কমিশন বোম্বে অবতরণ করলে দেশব্যাপী হরতাল পালিত হয়। সর্বত্র কালো পতাকা উত্তোলন ও কমিশন ফিরে যাও শ্লোগান হরতালকে আশাতীত সফল করে তোলে।[১২৩]

১৯২৭ সালে জমইয়াত প্রথম সাইমন কমিশন বয়কটের ঘোষণা দেয়। মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরীর সভাপতিত্বে ১৯২৭ সালের ২৫ শে ডিসেম্বর পেশোয়ার অধিবেশনে এ সিদ্ধান্ত পাশ হয়। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এ অধিবেশনে সাইমন কমিশন প্রেরণের পিছনে ব্রিটিশদের গূঢ় অভিসন্ধি সম্পর্কে অনলবর্ষী বক্তৃতা দেন এবং এতে কোন প্রকার সহযোগিতা না করার জন্য জনগণকে অনুরোধ জানান।[১২৪] হযরত শায়খুল ইসলাম মাদানী কমিশন বয়কটের দাবি নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থান সফর করে জনমত গঠন করেন। তার বক্তব্য ছিল- দেশ আমাদের, সমস্যা আমাদের, জনগণ আমাদের, অথচ আইন রচনা আইনের সংস্কার করবে

[১২২] মুফতি ইব্রাহিম দেশাই, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ০৩।
[১২৩] অতুল চন্দ্র, *ভারতের ইতিহাস* (কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১), পৃ. ৪৭০।
[১২৪] আল জামিয়্যাত, সাপ্তাহিক পত্রিকা, পৃ. ০৬।

ইংরেজরা এটা কখনও হতে পারে না।[১২৫] তার আন্তরিক প্রচারণার ফলে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের পরিবেশ ফিরে আসতে থাকে। তাঁর নিজের লেখনী অনুসারে, আমি দেখেছি, কিভাবে ইউরোপীয়, এশিয়ান ও আফ্রিকার জাতিগুলো মুক্তির গান গাইছে এবং এর জন্য যেকোন ত্যাগ স্বীকারে নিজেদের প্রস্তুত করছে। তাদের এই উন্মাদনা পর্যবেক্ষণ করে আমার অভ্যন্তরেও দেশের প্রতি গভীর ভালবাসা উৎসারিত হয় যা আমাকে দেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে উদ্বুদ্ধ করে।[১২৬]

তৎকালীন সময়ে মুসলিম লীগের অবিসংবাদিত নেতা মি. জিন্নাহ পরবর্তীকালে একপেশে চিন্তাধারা ও দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করলেও পূর্ববর্তীকালে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী। হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতীয়দের স্বরাজ ও স্বায়ত্বশাসনের দাবিতে ১৯০৬ সাল থেকে তিনি কংগ্রেসের রাজনীতি শুরু করেন। তার জাতীয়তাবাদী চেতনা এতখানি প্রবল ছিল যে, ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করলে লীগের গঠনতন্ত্র সংস্কারপূর্বক লীগকে সংগ্রামশীল পার্টিতে রূপান্তরিত করেন। এজন্য লীগের সরকার অনুগত পূর্ববর্তী নেতাদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল। ১৯১৫ সালে তিনি সভাপতি নির্বাচিত হলে লীগ ও কংগ্রেসের দুরত্ব হ্রাস করতেও সচেষ্ট হন। তার ঐকান্তিক চেষ্টায় লক্ষ্ণৌ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ঐ চুক্তির ফলে লীগ ও কংগ্রেস একত্রে সভা-সমিতি করে এবং তিনি লীগের সভাপতি হওয়া সত্বেও কংগ্রেসে তার সদস্যপদ বহাল থাকে। ১৯২৩ সালে মে মাসে মুসলিম লীগের এক সভায় তিনি বলেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেদিন হিন্দু ও মুসলমান পরস্পর ঐক্যবদ্ধ হবে সেদিনই ভারতীয়রা একটি দায়িত্বশীল ডোমিনিয়ন সরকার প্রাপ্ত হবে। মহাত্মা গান্ধীও তার এই বক্তব্য সমর্থন করেন। ১৯২৫ সালে এসেম্বলীর এক বক্তৃতায় তিনি আরো পরিস্কারভাবে বলেন, আমি আগেও জাতীয়তাবাদী, সবশেষেও জাতীয়তাবাদী। তিনি ধর্মভিত্তিক পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে ও যৌথ নির্বাচন ও হিন্দু মুসলিম ঐক্যের অব্যহত প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু ১৯২৮ সাল থেকে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তিনি ক্রমান্বয়ে জাতীয়তাবাদী হিন্দু মুসলিম ঐক্য ও কংগ্রেস থেকে সরে যেতে থাকেন। তার এ পরিবর্তনের অন্যতম কারণ ছিল নেহেরু রিপোর্ট।

ভারতীয় উপমহাদেশের শাসনতান্ত্রিক সমস্যা সমাধানে ও ভারতবাসীর প্রত্যাশা পুরনে সাইমন কমিশন ব্যর্থ হলে ১৯২৭ সালে ভারত সচিব লর্ড বার্কেন হেড ভারতের সকল রাজনৈতিক দলের কাছে গ্রহনযোগ্য একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য খোলা চ্যালেঞ্জ জানান। কংগ্রেস এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে ১৯২৭ সালে দিল্লীতে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলন আহ্বান করে। কারণ, এতে ভারতের স্বাধীনতার স্থলে "Dominion Status" চাওয়া হয়।[১২৭] ১৯২৮ সালের ১৯ ই মে কংগ্রেসের উদ্যোগে ড.এ.এ আনসারির সভাপতিত্বে বোম্বাই (বর্তমান মুম্বাই) শহরে এক সর্বদলীয় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভবিষ্যত সংবিধানের নীতি নির্ধারনের ব্যাপারে পন্ডিত

---

[১২৫] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২২।
[১২৬] Goyal, *op. cit.*, p. 143.
[১২৭] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 146.

মতিলাল নেহেরুর নেতৃত্বে ৯ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির চেয়ারম্যানের নামানুসারে এ রিপোর্টের নামকরণ করা হয় নেহেরু রিপোর্ট। ১৯২৭ সালের ২০ মার্চ লর্ড বার্কেন হেড এর চ্যালেঞ্জের ভিত্তিতে দিল্লীতে মাওলানা মুহাম্মাদ আলী জাওহারের উদ্যোগে মুসলিম নেতৃবৃন্দের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক বিভিন্ন মতাদর্শের ৩০ নেতা এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সভাপতিত্ব করেন মি. জিন্নাহ। উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে এ কনফারেন্স বসে। কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবগুলো দিল্লী প্রস্তাব বলে পরিচিত। এ প্রস্তাবের বিষয়গুলো ছিল নিম্নরূপ:-

ক. আইনসভাগুলি যৌথ নির্বাচনের ভিত্তিতে গঠিত হবে। তবে, হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে।

খ. সিন্ধুকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি নতুন প্রদেশে পরিণত করতে হবে।

গ. আরও দুইটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট সুবা অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানে সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন করতে হবে।

ঘ. কেন্দ্রীয় আইনসভার এক তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

ঙ. মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অন্যান্য প্রদেশ যথা- পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশে হিন্দু ও মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব, প্রত্যেকের নিজ নিজ আবাদী অনুসারে গৃহীত হবে। তাছাড়া মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ট প্রদেশে কাউন্সিলের প্রতিনিধিত্ব ও আসন সংরক্ষনের ব্যাপারে হিন্দুদেরকেও সুবিধা দেয়া হবে যেগুলো হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ থেকে মুসলমানরা পেয়ে থাকেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রস্তাবগুলির সাথে ঐক্যমত পোষণ করেন।

ঐ বছর ডিসেম্বরে মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস দিল্লী প্রস্তাবের মঞ্জুরী দেয়। একই রেজুলেশনে কংগ্রেস আরও প্রস্তাব পাশ করে যে, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন পালনের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকবে। কোন খসড়া আইন বা বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের উপর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে এমন জিনিস বিধান সভায় ততক্ষণ পর্যন্ত উত্থাপিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের নির্বাচিত তিন চতুর্থাংশ সদস্য থেকে অনাপত্তি না পাওয়া যায়।

নেহেরু রিপোর্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে অনুমোদিত হওয়ার এক বছর পর ব্যাপক মঞ্জুরী লাভের জন্য ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতায় সর্বদলীয় সম্মেলন আহবান করা হয়। মুসলিম নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে মি.জিন্নাহ ও মাওলানা মুহাম্মাদ আলীর ইচ্ছা ছিল যে, সম্মেলনে কংগ্রেস মি.জিন্নাহর দিল্লী প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করবে। কিন্তু, বাস্তবে তা হয়নি। উপস্থিত সম্মেলনে স্যার তেজ বাহাদুর চোপড়া এ ব্যাপারে সভায় সভাসদমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মি.চোপড়া দিল্লী প্রস্তাবের আলোকে নেহেরু রিপোর্ট সংস্কার করে নেবার আহবান জানিয়ে বলেছিলেন, যদি এই রিপোর্টে দিল্লী প্রস্তাব উপেক্ষা করা হয় তাহলে, গোটা দেশের উপর এমন এক কঠিন আঘাত নেমে আসতে পারে যে আঘাতের ক্ষত বহু বছরেও শুকাবে না। পূর্বে হিন্দু -মুসলিম

সম্পর্কে বহু টানাপোড়েন থাকলেও হিন্দু মুসলিম দুটি পৃথক জাতি এমন ধারণা এবারই প্রথমবারের মত স্পষ্ট আকারে ফুটে ওঠে। চৌধুরী খালিকুজ্জামান নিজের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে লিখেছেন, এ ঘটনার ফলে গোটা ভারতের ভাগ্যের উপর সিল লেগে গেছে। হিন্দু রাজনীতিকরা দৃষ্টিভঙ্গির যে সংকীর্ণতা প্রকাশ করেছেন সেটির আর প্রতিবিধান সম্ভব হয়নি।

মুসলমানদের আসন সংরক্ষন এবং পৃথক ভোটের বিষয়টি উপেক্ষা করার কারণে মুসলিম লীগ তাদের স্বার্থের পরিপন্থি মনে করে এ রিপোর্ট কে প্রত্যাখান করে এবং ১৯২৯ সালে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ চৌদ্দ দফা প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৯২৮ সালে পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর রিপোর্টে মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষা করা হয়নি বলে, জমইয়াত সভাপতি মুফতী কিফায়াতুল্লাহ কংগ্রেসের সভায় জোর আপত্তি তুলেন। সকল দলই এই রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করলে ১৯২৯ সালের ২৫শে ডিসেম্বর কংগ্রেস তার লাহোর অধিবেশনে পূর্বের অবস্থান হতে সরে আসে এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে সিদ্ধান্ত ইস্যু করে।[১২৮]

কলকাতার সর্বদলীয় অধিবেশনের এক বছর পরই ১৯২৯ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর লাহোরে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সিদ্ধান্তে বলা হয়, অদ্য ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হল এবং নেহেরু রিপোর্ট রহিত করে রাভি নদীর অতল গর্ভে নিক্ষেপ করা হল। কিন্তু নেহেরু রিপোর্ট নদীগর্ভে বিলীন হলেও ভারত বিভক্তির একটি ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে গিয়েছিল।

ঐ বছর ব্রিটিশ সারদা এ্যাক্টের আলোকে বাল্য বিবাহকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এ আইন হিন্দু মহিলাদের জন্য যথেষ্ট উপকারী ছিল। কেননা, হিন্দুধর্মে বিধবাদের জন্য পূনর্বিবাহের কোন বিধান নেই। কিন্তু, মুসলমানদের ক্ষেত্রে এ সমস্যা নেই। কেননা, ইসলামের দৃষ্টিতে বাল্যকালে কোন বিবাহ সম্পাদিত হলে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার মুহুর্তে বর ও কনের নিজস্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার থাকে। তাছাড়া স্বামীর মৃত্যু হলে বিধবা স্ত্রীর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনের আবদ্ধ হওয়ার বিষয়ে কোন আপত্তি নেই। উল্লেখ্য, বাল্যবিবাহ রহিত করণ আইনের প্রতি কংগ্রেস সমর্থন করে। অথচ, জমইয়াতে উলামা এ আইন ইসলামী বিধানের উপর অহেতুক হস্তক্ষেপ হিসেবে প্রতিবাদ জানায় এবং মুসলমানদের জন্য এ আইন প্রত্যাহারে সরকারকে বাধ্য করে।

উপমহাদেশে স্বাধীনতার চেতনা বলিষ্ঠ করার লক্ষ্যে বিপ্লবী আলিমগণ দেশের অপরাপর জাতীয়তাবাদী দলের সমন্বয়ে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম কনফারেন্স নামে সম্মিলিত জোট প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উদ্যোগে ১৯২৯ সালে দিল্লীতে এ জোটের সভা অনুষ্ঠিত হয়। জমইয়াত নেতৃবৃন্দ প্রধানতঃ জোটের নেতৃত্ব দেন। জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ, শিয়া পলিটিক্যাল কনফারেন্স, মাজলিশ-ই-আহরার, সীমান্ত গান্ধী, গাফফার খানের খোদায়ী খেদমতগার ঐ জোটে অংশ নেয়। ঐ বছর কংগ্রেস লাহোর অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ

---

[১২৮] Azad Abul Kalam, *India Wins Freedom* (Delhi: Oriental Longman Publications, 1988), p. 12.

স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করলে দীর্ঘ ৬ বছর পর কংগ্রেসের দাবী জমইয়াতের দীর্ঘদিনের লালিত দাবির সাথে মিশে যায়। এতে জমইয়াতের সাথে কংগ্রেসের সাংগঠনিক সম্প্রীতির পরিবেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এভাবে রাজনৈতিক প্রধান দাবীর ক্ষেত্রে উভয়ের ঐক্য সৃষ্টি হওয়ায় সংগঠনদ্বয়ের যুক্ত কর্মসুচী শুরু হয়। নতুবা ইতিপূর্বে উভয়ের মধ্যে সমন্বয়ের চেয়ে বিরোধের বিষয়ই বেশি ছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সেন্ট্রাল পরিষদে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহিত হলে জমইয়াতের পক্ষ থেকে স্বাগত জানানো হয়। ১৯৩০ সালের মে মাসে আমরোহায় হযরত শায়খুল ইসলামের সভাপতিত্বে জমইয়াতের বার্ষিক অধিবেশন বসে। মাওলানা মাদানীর সভাপতিত্বে আমরোহা অধিবেশনের গৃহীত সিদ্ধান্তে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, শরীয়তের অনুশাসন পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করতে হলে মুসলমানদের কংগ্রেসের সাথে হাত মেলানো অবশ্য কর্তব্য। এই সিদ্ধান্তটি তরুন উলামা মাওলানা হাফিজুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত হয় এবং অন্য কোন সদস্যের সমর্থন দানের পূর্বেই মাওলানা মাদানী সর্বাগ্রে এটার প্রতি সমর্থন প্রদান করেন এবং এও উল্লেখ করেন যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এখন সময়ের দাবী।[১২৯]

তখন জমইয়াতের মূল সভাপতি যদিও ছিলেন মুফতী কিফায়াতুল্লাহ কিন্তু স্বাধীনতা সংগ্রামে শায়খুল ইসলামকে প্রধান প্রাণশক্তি বিবেচনা করা হত বিধায় তারই সভাপতিত্বে এ গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল।[১৩০] ১৯৩০ সালের ৩-৬ মে জমইয়াতের আমরোহার এক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, যেহেতু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নেহেরু রিপোর্ট বিসর্জন দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতাকেই এর লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে, সেহেতু এখন আর কংগ্রেস থেকে মুসলমানদের দূরে থাকার কোন কারণ নেই।[১৩১]

৬.২৬ আইন অমান্য আন্দোলনে কংগ্রেস ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের যৌথ অংশগ্রহণ

১৯৩০ সালে জমইয়াত ও কংগ্রেসের যৌথ আহবানে ইংরেজদের বিরুদ্ধে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। বিপ্লবী আলিমগণ আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। আন্দোলনে মহাত্মা গান্ধীসহ মুফতি কিফায়াতুল্লাহ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ডাক্তার মুখতার আহমাদ আনসারী প্রমুখ কারারুদ্ধ হন। তবে উলামাদের মধ্যে কেউ কেউ কংগ্রেসকে অন্ধ সমর্থন দানের পরিবর্তে প্রথমে কংগ্রেসের কাছ হতে সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের বিশেষ বিশেষ দাবিগুলো আদায়ের পক্ষপাতী ছিলেন।

আশ্চর্যজনক যে এ সকল উলামাদের মধ্যে বড় ভূমিকা রাখেন আলী ভ্রাতৃদ্বয়। তারা প্রথমে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসেবে যেসব অধিকার পাবার দাবি রাখে তা আদায় করার উপদেশ দেন। তাদের এ সিদ্ধান্ত "প্রথমে সমঝোতা পরে আন্দোলন" এ নামে পরিচিত হয়।[১৩২] এ বিষয় নিয়ে কংগ্রেস ও জমইয়াতের

[১২৯] সাইয়েদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামা ই হক্ব* (দিল্লীঃ আল জমইয়াত বুক ডিপো., ১৯৪৪), পৃ. ১৮২।
[১৩০] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩৯।
[১৩১] সাইয়্যেদ তুফায়েল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৪-৫১৫।
[১৩২] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিঁয়া, *আসীরানে মালটা* (দেওবন্দঃ কুতুব খানা নাইমিয়াঁ, ২০০২), পৃ. ১৮৩।

মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী চাইছিলেন না, জমইয়াত কংগ্রেসের ঐক্য হতে বিচ্যুত হয়ে যাক। তিনি কংগ্রেসের অতিমাত্রায় সমর্থক ছিলেন কারণ তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন যে এটিই একমাত্র জাতীয়তাবাদী সংগঠন যা হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই সহজে অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। ১৯৩১ সালে শায়খুল ইসলাম পরিবার সহ দীর্ঘ ১৩ বছর পর হজ্বব্রত পালন করতে মক্কা-মদীনায় গমন করেন। তার সহোদর ভাইরা ছিলেন সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। তারা সেখানে তাকে থেকে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু তিনি বলেন, ভারতে দারুল উলুম দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাদের দীর্ঘকালীন শ্রম সাধনার ফসল বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত। সেখানে সত্য ও ন্যায়ের কালেমা বুলন্দ করার লক্ষ্যে জিহাদের ডাক দেয়া হয়েছে, তাছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় সামাজিক ও রুহানী কাজকর্মের জন্য সেখানে শ্রম দেয়া প্রয়োজন। আজ আমি শারিরীক আরাম-আয়েশকে সামনে রেখে এখানে রয়ে গেলে এবং কষ্ট-ক্লেশ থেকে পলায়নের পথ বেছে নিলে কাল আল্লাহর সামনে কিভাবে মুখ দেখাব? এভাবে পার্থিব শান্তি, পরিবার পরিজনের সাহচর্য দূরে ঠেলে শায়খুল ইসলাম মাদানী দৃপ্ত পদক্ষেপে ভারতের মুক্তির লক্ষ্যে সামনে অগ্রসর হন।

গান্ধীর 'আইন অমান্য আন্দোলন' জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। অসহযোগ আন্দোলন স্থগিত হবার পর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়েছিল যা এ নতুন কর্মসূচির মাধ্যমে চাঙ্গা হয়ে ওঠে। ডান্ডি মার্চ এর মাধ্যমে কংগ্রেস এ আন্দোলন শুরু করে। লবণ আইনকে আন্দোলনের কারণ হিসেবে গ্রহন করে ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ গুজরাটের সাবরমতি হতে গান্ধী তার বিখ্যাত ডান্ডি পদযাত্রা শুরু করেন।[১৩৩] এই পদযাত্রায় হিন্দু-মুসলমানরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করে এবং আন্দোলনকে ভারতীয় সংগ্রামের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ করে তোলে। বিপুল জনগণের অংশগ্রহণের পাশাপাশি এই প্রথম ভারতের নারীরাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। মাওলানা মাদানীর নেতৃত্বে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দও এই আন্দোলনে পূর্ণ আন্তরিকতার সাথে অংশ নেয়।[১৩৪]

মাওলানা ফজলুর রহমান সাহেরবী, মুফতী আতিকুর রহমান উসমানীও এ আন্দোলনে যোগ দেন। মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা হামিদুর রহমান, মাওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মিয়া, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ এবং জমইয়াতের সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আহমদ সাঈদ দেহলভী ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক গ্রেফতার হন।[১৩৫] বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, আইন অমান্য আন্দোলনে রসদ সরবরাহ ছাড়াও জমইয়াত এর নিজস্ব সংবাদপত্র আল জমইয়াতের মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে। আন্দোলনে জমইয়াতের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণই তাঁদের সরকার বিরোধী ভূমিকাকে সরকারের কাছে উন্মুক্ত করে দেয় এবং তারা সরকারের তোপের মুখে পড়ে। জমইয়াতে উলামা ছাড়া আরো দুটি মুসলিম রাজনৈতিক সংগঠন এ আন্দোলনে অংশগ্রহন করে এবং

[১৩৩] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিঁয়া, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮৩।
[১৩৪] *তদেব*, পৃ. ১৮৩।
[১৩৫] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৬।

কংগ্রেসের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়। এদের অন্যতম ছিল মজলিস-এ-আহরার যারা দেওবন্দী ওলামাদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল। এদের প্রভাব মূলত পাঞ্জাব অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল।[১৩৬] ১৯৩২ সালে কংগ্রেস ও জমইয়াতের যৌথ নেতৃত্বে পুনরায় আইন অমান্য আইন শুরু হয়। এতে করে ইংরেজ সরকার প্রচন্ড দমননীতি অবলম্বন করে। কংগ্রেস ও জমইয়াত উভয় সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করা হয় ও এ সংগঠন দুটির কাগজপত্র ও তহবিল বাজেয়াপ্ত করা হয়। জমইয়াত তখন নিজের কার্যক্রম অব্যাহত রাখার প্রয়োজনে কার্যনির্বাহী পরিষদ বাতিল করে তার জায়গায় ধারাবাহিক অধিনায়কের নেতৃত্বে একটি অ্যাকশন কমিটি গঠন করে। তন্মধ্যে তৃতীয় অধিনায়ক মনোনীত হন শায়খুল ইসলাম মাদানী। প্রথম এবং দ্বিতীয় অধিনায়ক ছিলেন যথাক্রমে মুফতী কিফায়াত উল্লাহ ও মাওলানা আহমাদ সাঈদ। অধিনায়কদের ধারাবাহিকতা রাখা হয় যাতে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তি গ্রেফতার হলে আন্দোলন থেমে না যায়।

আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবার পর জমইয়াত এর অনুসরণ করে এবং আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করার জন্য পরস্পর বেশ কয়েকজন নেতাকে নির্বাচিত করে, যাতে একজন নেতা গ্রেফতার হলে আন্দোলন থেমে না যায়। মাওলানা মাদানী ছিলেন এই নেতৃবৃন্দের মধ্যে ষষ্ঠ যিনি তাঁর নাম ঘোষিত হওয়ার পরপরই গ্রেফতার হন।[১৩৭]মুফতী কিফায়াত উল্লাহ ও মাওলানা আহমাদ সাঈদ গ্রেফতার হওয়ার পর তৃতীয় অধিনায়ক শায়খুল ইসলাম অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্বগ্রহণ করেন। তিনি শুক্রবার জুমআর পর দিল্লী জামে মসজিদে বক্তব্য দানের উদ্দেশ্যে দেওবন্দ থেকে দিল্লীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও বক্তব্য সম্পর্কে সরকারের আতংক ছিল বিধায় পথিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করা জরুরী মনে করে। তিনিও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে নিজের বক্তব্য একখানা কাগজে লিখে রাখেন। মুজাফফর নগর স্টেশন থেকে তাকে গ্রেফতার করে তুলে নেয়ার মুহূর্তে তিনি ঐ কাগজটি দিল্লী জামে মসজিদে তার পক্ষ থেকে পড়ে শুনানোর উদ্দেশ্যে তিনি ঐ কাগজটি মাওলানা আবুল মহসিন সাজ্জাদের নিকট পাঠিয়ে দেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে করাচী জেল থেকে মুক্তির পর থেকে এই তৃতীয়বার আবার তিনি কারারুদ্ধ হন।[১৩৮]

তবে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে অংশগ্রহণই মাওলানা মাদানীকে গ্রেফতার করার পেছনে একমাত্র কারণ ছিলনা, তাঁর যুদ্ধবিরোধী জ্বালাময়ী বক্তৃতার কারণেই তাকে গ্রেফতার করা হয়। ভারতকে বিভিন্ন যুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ এ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলার মানসে তিনি জমইয়াতের অংশগ্রহনে এক গোপন কর্মসূচি পরিচালনা করেন। মূলতানের মাওলানা খোদা বখশের কাছে লিখিত একটি পত্রে তাঁর এই কর্মসূচী সম্পর্কে জানা যায়। “জরুরী গুজারিশ” শিরোনামে লিখিত পত্রটির বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ-

---

[১৩৬] Farhat Tabbasum, *op. cit.*, p. 148.

[১৩৭] Goyal, *op. cit.*, p. 151.

[১৩৮] মুহিউদ্দীন খান ও মুহাম্মদ ছফিউল্লাহ, *হায়াতে মাওলানা মাদানী* (ঢাকা: আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫), পৃ. ১২৩।

"জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের এই কর্মসূচী সমূহ নিজে পড়, অন্যকে পড়াও এবং কর্মসূচীসমূহ মুদ্রণ করে জনগণের মাঝে বন্টন করে তোমার দায়িত্ব সম্পূর্ণ কর। যদি তুমি নিজে প্রেসের মাধ্যমে ছাপাতে অসমর্থ হও তবে স্থানীয় কংগ্রেসের কার্যালয়ে যাও এবং এর একটি অনুলিপি তৈরি করে তোমার কাছে রেখে এই কপিটি অন্য কাউকে প্রদান কর।" কাগজের নোটের পরিবর্তে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণমুদ্রা বিদেশে পাচার করা হচ্ছে এবং আমেরিকায় বন্ধক রাখা হচ্ছে। এ কাজ দীর্ঘ দিন ধরে চলে আসছে। আপনি কংগ্রেসের সমর্থক হন বা বিরোধী হন এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে আপনি আপনার সম্পদের নিরাপত্তার বিষয়ে ভাবুন। আপনি যদি এই আন্দোলনের বিরোধী হন আমরা আপনাকে কোন ত্যাগ স্বীকার অথবা আন্দোলনে সমর্থন দিতে বলছিনা। আমরা আপনাকে কেবলমাত্র প্রতারণা সম্পর্কে সতর্ক করে দিতে চাই। কাগজের নোটের পরিবর্তে আপনার মূল্যবান সম্পদ বিনিময় করে একে ধ্বংস করবেননা। কারণ, ব্রিটিশদের যেমন বিশ্বাস করা যায়না, তেমনি তাদের ব্যাংক এবং কাগুজে নোটও বিশ্বস্ত নয়।

অতএব-

ক. কোন কাগজের নোট বিশেষ করে এক রূপী ও পাঁচ রূপীর নোট গ্রহণ করবেন না।

খ. আপনার কাছে যত কাগুজে নোট আছে তা স্বর্ণ বা রৌপ্যের সাথে বিনিময় করে নিন।

গ. ব্যাংকে আপনার যে অর্থ সঞ্চিত আছে তা উত্তোলন করে নিন।

ঘ. কাগজের অর্থের বিনিময়ে কোন বস্তু বা সম্পত্তি কেনা - বেচা করবেন না।

নঙ্গে আসলাফ (পূর্বসূরীদের কলঙ্ক)

হুসাইন আহমদ (মোরাদাবাদ জেলখানা)

৬.২৭ মুসলিম লীগের সাথে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের ঐক্যজোট গঠন

১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের আলোকে ১৯৩৬ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে মন্ত্রী পরিষদ গঠনের প্রশ্ন উদিত হয়।[১৩৯] ১৯৩৫ সালে ব্রিটিশ সরকার গভর্ণমেন্ট অব ইন্ডিয়া এ্যাক্ট পাস করে। এ এ্যাক্ট ভারতীয়দের জন্য প্রদেশে ও কেন্দ্রে বিধানসভা ও মন্ত্রীপরিষদ গঠনের সুযোগ করে দেয়। শাসনকার্যে ভারতীয়দেরকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে এটি ছিল তাদের সর্বোচ্চ সংস্কার। কেননা, কোম্পানি আমলে প্রশাসনে কোন ভারতীয়কে অন্তর্ভুক্তই রাখা হয়নি। ব্রিটিশ সরকারের আমলে ১৮৬১ সালে মাত্র ১ জন ভারতীয়কে ভাইসরয় কাউন্সিলে উপদেষ্টা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর ১৮৮৩ সালে বিভিন্ন লোকাল বোর্ডে তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা শুরু হয়। ১৮৮৫ সাল থেকে কংগ্রেসের উদ্যোগে ভারতীয়দেরকে সিভিল সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত করার সংগ্রাম চলে। কংগ্রেস এ সংগ্রামের দ্বারা দেশীয়দের অন্তর্ভুক্তির সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি করিয়ে নেয়। ১৯৩৪ সালে অসহযোগ

[১৩৯] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩১।

আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়া হলে পরবর্তী বছর ব্রিটিশ ভারতের জন্য বিধানসভা ও মন্ত্রী পরিষদ গঠনের আইন পাশ করে। এ আইনে বর্ণিত মন্ত্রীত্বের সুযোগ প্রাপ্তি রাজনীতিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বস্তুত এ ভারত শাসন আইনের দুটি মন্দ দিকও ছিল।

১. বিধান সভা নির্বাচন করার পদ্ধতি হিসেবে ১৯৩২ সালে সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা অর্থাৎ, হিন্দু মুসলিমের পৃথক নির্বাচন নীতি বহাল রাখা হয়।

২. গভর্ণর কিংবা ভাইসরয়ের জন্য চূড়ান্ত রায় প্রদানের অধিকার সংরক্ষিত রাখা হয়। ফলে এ এ্যাক্ট দ্বারা বাহ্যতঃ স্বায়ত্বশাসনের ঘোষণা হলেও কার্যতঃ এই শাসন ব্যবস্থায় প্রকৃত ক্ষমতা ব্রিটিশদের হাতেই থাকে।

এই এ্যাক্টের অন্তর্নিহিত সত্য জমইয়াতে উলামা ও কংগ্রেসের নিকট বাঞ্ছনীয় ছিলনা। কারণ এটি ছিল স্বাধীনতা আন্দোলনকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার লক্ষ্যে বৃটিশের ষড়যন্ত্রেরই একটি অংশ। জওহরলাল তাই এটিকে দাসত্বের নতুন অধ্যায় বলে অভিহিত করেন। ফলে, উভয় দল নির্বাচনে অংশগ্রহণে অসম্মতি জানায়। মুসলিম লীগ বর্ণিত প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন সমর্থন করলেও এ্যাক্টের অন্যান্য ধারাগুলোর সমালোচনা করে। কিন্তু, ১৯৩৬ সালে কংগ্রেস ভারত শাসন আইনকে আপাতত মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মতি জানালে মুসলিম লীগও নির্বাচনে যোগ দেয়।[১৪০]

কিন্তু নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নেবার পর মুসলিম লীগ কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়। মুসলিম লীগ শুরু হতেই অভিজাতশ্রেণীদের নিয়ে রাজনীতি করার কারণে তৃণমূল জনতার সাথে তাদের জনসংযোগ ছিলনা। ভারতের ধর্মভীরু সাধারণ মুসলিম জনগণের ওপর ছিল বিপ্লবী উলামা শ্রেণীর প্রাধান্য; কারণ তারা কংগ্রেস অথবা মুসলিম লীগের বহু পূর্ব হতেই ভারতের স্বাধীনতার জন্য লড়াই চালিয়ে আসছিলেন এবং আন্দোলন চালাতে গিয়ে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছতে পেরেছিলেন। কিন্তু মুসলিম সাধারণ ভোটদাতাদের নিকট মুসলিম লীগের প্রধান নেতা জিন্নাহর তেমন পরিচিতি ছিলনা। কিন্তু, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করে খুবই বিচক্ষণতার সাথে এসব সমস্যার মোকাবেলা করেন। নির্বাচন সফল করার লক্ষ্যে ঐ বছর মার্চে দিল্লীতে মুসলিম নেতৃবৃন্দের মিটিং হয়। সেখানে চৌধুরী খালিকুজ্জামান, নওয়াব ইসমাইল খান, মাওলানা শওকত আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। জিন্নাহর পক্ষ থেকে আব্দুল মতিন চৌধুরী প্রস্তাব করেন যে, আসন্ন নির্বাচনের জন্য মুসলমানদের নতুন কোন পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন না করে লীগের নির্বাচনী বোর্ড থেকেই নির্বাচন করা হোক। চৌধুরী খালিকুজ্জামান তাতে আপত্তি করলে তিনি বলেন, জিন্নাহ নিজেও স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দ নির্বাচিত করে আনতে ইচ্ছুক। জিন্নাহর উপরিউক্ত অভিপ্রায়ের কথা বিপ্লবী আলিমদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তারা ভাবলেন, জিন্নাহ নিজে একজন যোগ্য ও দক্ষ রাজনীতিক। কিন্তু, তিনি যাদের নিয়ে কাজ করছেন

---

[১৪০] অতুল চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯৮-৪৯৯।

তাদের অধিকাংশই হল ইংরেজ সমর্থক ও তাবেদার। নির্বাচন উপলক্ষে যদি লীগকে তাবেদারী চরিত্র থেকে মুক্ত করে জাতি সংগঠক দলে পরিণত করা যায় তাহলে, ভারতে মুসলিম রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যাটির সমাধান হয়ে যাবে। সে মতে জিন্নাহর সাথে বিপ্লবী উলামা শ্রেণীর মিটিং হয়। মাওলানা শওকত আলী, মুফতী কিফায়াতুল্লাহ, মাওলানা আহমাদ সাইদ, মাওলানা ইনায়াতুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল বারী ফিরিংগী মহল্লী, সাইয়্যিদ তোফায়েল আহমাদ মঙ্গলুরী প্রমুখ মিটিং-এ উপস্থিত ছিলেন। সেখানে দীর্ঘ আলাপ আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, সকলে লীগের নির্বাচনী বোর্ড থেকেই নির্বাচন করবেন। তবে, বোর্ড গঠনের দায়িত্ব থাকবে জিন্নাহ সাহেবের উপর। তিনি বোর্ড এমনভাবে গঠন করবেন যেন তাবেদারী মানসিকতার চেয়ে জাতীয় সংগঠক দলগুলির সদস্যরা অধিক সংখ্যায় থাকতে পারেন।

> In the meeting, Mr.Jinnha was confronted with the questions that league parliamentary board being dominated by those who he himself declared reactionary how will other Muslims leaders find scope for cooperation. At this Mr.Jinnha suggested that he should be given full authority to re constitute the board.The board consisted of as many as 56 members in which there were twenty nominees from jamiat.[১৪১]

জিন্নাহ এ অঙ্গীকারে কোন অন্যথা করেননি। বোর্ডের ৫২ সদস্যের মধ্য থেকে ২০ সদস্য জমইয়াতে উলামা থেকেই গ্রহণ করেন। আর অবশিষ্ট সদস্যদেরকে মুসলিম লীগ ও জাতীয়তাবাদী অন্যান্য সংগঠন থেকে নেন। শায়খুল ইসলাম মাদানী জরুরী কাজে দিল্লীর বাইরে ছিলেন বলে মিটিংয়ে অংশ নিতে পারেননি। এতদসত্ত্বেও জিন্নাহসহ অন্যান্য নেতা ঐক্যের ব্যাপারে শায়খুল ইসলামের সম্মতি অত্যাবশ্যক বলে মনে করেন। ফলে, তাকে টেলিগ্রাম করে আনা হয় এবং স্থানীয় একটি হোটেলে শায়খুল ইসলাম ও অন্যান্য নেতার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা হয়। জিন্নাহ সাহেব অত্যন্ত জোরালো ভাষায় শায়খুল ইসলামকে বলেন যে, নির্বাচনের পর সকলে মিলে একযোগে স্বাধীনতার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বেন। আর বর্তমান পার্লামেন্টারী বোর্ড এমনভাবে গঠন করবেন যেন, বিপ্লবী মানসিকতাসম্পন্ন লোকদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী থাকে। এ আলোচনার পর বিপ্লবী আলিমগণ একযোগে মুসলিম লীগের পতাকাতলে কাজ করা শুরু করেন।

৬.২৮ মুসলিম লীগের পক্ষে শায়খুল ইসলামের নির্বাচনী প্রচারণা

শায়খুল ইসলাম দারুল উলুম হতে ২ মাসের ছুটি নিয়ে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চলে লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাতে থাকেন। তখন লীগের চেহারা ইংরেজ সমর্থিত পুরাতন লীগ বলে দেখা যায়নি বরং, স্বাধীনতার দাবিতে আন্দোলনকারী বিপ্লবী অন্যান্য সংগঠনের মতই মনে হয়েছিল। তখন মুসলিম লীগ নির্বাচনী কমিটি থেকে ঠিক সেই ইশতেহারই প্রকাশ করা হয়, যেটি কংগ্রেস নির্বাচনী কমিটি থেকে প্রকাশ করা হয়েছিল। এভাবে প্রধান দুটি

[১৪১] আসীর আদরবী, *মা'আসীরে শায়খুল ইসলাম* (দিল্লী: দারুল মুয়াল্লিফীন, ১৯৮৭), পৃ. ২৩১।

সংগঠনের রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা নীতি ও পদ্ধতি বহুলাংশে অভিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়া পূর্বেকার ছোটখাটো যেসব ব্যাপারে উভয়ের বিবাদ ছিল সেগুলো ক্রমেই মিটে যায়। বহুদিন পর লীগ ও কংগ্রেস উভয়ের প্লাটফর্ম থেকে একই কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল হিন্দুস্থান জিন্দাবাদ, বিপ্লব জিন্দাবাদ, স্বাধীনতা জিন্দাবাদ।[১৪২]

মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী দেশজুড়ে বহু নির্বাচনী সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি মুসলিম লীগকে এমন সব এলাকায় পরিচিত করে তোলেন যেখানে পূর্বে মুসলিম লীগের অস্তিত্ব সম্পর্কেই জনগণ ওয়াকিবহাল ছিল না। তিনি জনগণের কাছে মুসলিম লীগের উপর আস্থা স্থাপন ও তাদের মধ্য হতে প্রতিনিধি নির্বাচন করে মন্ত্রীসভায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি তাঁর অনুসারীবৃন্দ, ছাত্রবৃন্দ ও জমইয়াত উলামার নেতৃবৃন্দের কাছেও মুসলিম লীগকে সমর্থন করার সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ মুসলিম লীগের প্রার্থীগণ নির্বাচনে বিরাট সাফল্য অর্জন করেন।[১৪৩] কারণ, আলিমদের প্রচারণার ফলে মুসলিম লীগের পরিচিতি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের বাসিন্দাদের কাছে পৌঁছে যায়। লীগ নির্বাচন যুদ্ধে মুসলিম জনসাধারণের ৮০ শতাংশ ভোট কুড়িয়ে আনতে সক্ষম হয়। এ প্রসঙ্গে স্বয়ং শায়খুল ইসলাম বলেন, আমরা লীগের পূর্ণ সহযোগিতা করি। আমি নিজে দারুল উলুম থেকে দুই মাসের ছুটি নিয়ে নির্বাচনী প্রচারণায় আত্মনিয়োগ করি। আমাদের প্রচেষ্টার ফলে মুসলমানদের মধ্যে এগ্রিকালচারিস্ট পার্টিসহ অন্যান্য তাবেদার দলগুলির ব্যাপক পরাজয় ঘটে। প্রায় ৩০ এর অধিক প্রার্থী লীগ থেকে জয়লাভ করে। একই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে পাকিস্তানের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখেন যে,আপনি ত্রিশ বছরের মৃত মুসলিম লীগকে নতুনভাবে জীবন্ত করে দিয়েছেন।[১৪৪]

৬.২৯ মুসলিম লীগ ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের মধ্যে ঐক্য বিনষ্ট

এতদ্বসত্ত্বেও জিন্নাহ তার পূর্বেকৃত সকল প্রতিশ্রুতি ভুলে লীগকে তার পূর্বের পথে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। তিনি জমইয়াতে উলামা-ই-হিন্দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন কারণ, জমইয়াতের কংগ্রেসের সাথে সম্পর্ক তাকে অসন্তুষ্ট করেছিল।[১৪৫] নির্বাচন বৈতরণী অতিক্রান্ত হওয়ার পর উলামাবৃন্দ ও লীগ নেতাদের মধ্যে ক্রমেই দৃষ্টিভঙ্গির অবনতি ঘটতে থাকে। উভয়ের মধ্যে দ্বীনদারী ও দুনিয়াদারীর ব্যবধান সূচীত হয়। বিপ্লবী আলিমগণ যে স্বাধীনতার আওয়াজ বুলন্দ করার আশায় তাদের সাথে কাজ করেছিলেন, লীগ নেতাদের কাছে সেই স্বাধীনতার আওয়াজ ক্রমেই গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে এবং মন্ত্রীত্ব অর্জনের বিষয়টি মুখ্য বিষয় হিসেবে দেখা দেয়।[১৪৬]

নিজেদের স্বার্থ আদায়ের জন্যই লীগ জমইয়াতে উলামার সাথে জোটবদ্ধ হয়েছিল। কারণ, নিজেদের যোগ্যতায় লীগের প্রার্থীরা এতবড় জয় অর্জন করতে পারতেন না। জমইয়াতের সাথে মিত্রতার সুযোগ নিয়ে তারা নিজেদের

---

[১৪২] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪০৪।
[১৪৩] আসীর আদরবী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩২।
[১৪৪] নাজমুদ্দীন ইসলাহী, *মাকতূবাতে শায়খুল ইসলাম*, ৪র্থ খ' (গাওজরনাওয়ালা: মাদানী কুতুবখানা, তা.বি.), পৃ. ৩৫২।
[১৪৫] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 152.
[১৪৬] আসীর আদরবী, পৃ. ১৪৯-১৫০।

অবস্থান দৃঢ় করেছে। এবং এতটা শক্তিশালী হয়েছে যে তারা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছে। কিন্তু এ ব্যাপারে জমইয়াতের কোন সদস্যের সাথে কোনও আলোচনা করেনি। এভাবে মুসলিম লীগ জমইয়াতে উলামার সুনাম নষ্ট করেছে। নির্বাচনের পরে লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ড ও ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ১৩ মার্চ লক্ষ্মৌতে প্রথম অধিবেশনে বসেন। অধিবেশনে জিন্নাহ ইংরেজ তাবেঁদার দল এগ্রিকালচারিস্ট পার্টি ও ইন্ডিপেনডেন্ট পার্টি লক্ষ্মৌ থেকে বিজয়ী মুসলিম সদস্যদেরকে নিজ দলে ভেড়ানোর জন্য জোর তদবির শুরু করেন। অথচ, নির্বাচনের পূর্বে ঐ সকল সদস্য লীগের টিকেটে নির্বাচন করতে শুধু অসম্মতি প্রকাশই নয় বরং লীগের বিরুদ্ধাচরণে নিজেদের সম্ভাব্য সকল অস্ত্রও ব্যবহার করেছেন। মাওলানা মাদানী জিন্নাহ'র এই বিশ্বাসঘাতকতা কে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রেখে নিরব থাকেন নি। তিনি "মিঃ জিন্নাহ কা পর আসরার মুআম্মা অউর উসকা হাল" (The Mysterious riddle of Jinnah and its resolution) নামে একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে সত্য জনগণের সামনে তুলে ধরেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী,"এটি খুবই দুঃখজনক যে, নির্বাচনে জয়লাভের পর মুসলিম লীগ তার সকল ওয়াদা ভঙ্গ করেছে। লীগ এমন সব লোককে দলে নেবার সুপারিশ করেছে যাদেরকে তারা নির্বাচনের পূর্বে দল থেকে বাদ দেবার সিদ্বান্ত নিয়েছিল। তারা এমন প্রকৃতির লোক যারা পূর্বে ব্রিটিশদের পক্ষে সমর্থক এবং যেকোন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিপক্ষে ছিল বলে সকলেই জানে, যখন তাদের (লীগ নেতা) জিজ্ঞেস করা হল যে, আপনারা তো তাদের পার্টি হতে বাদ দেবার সিদ্বান্ত নিয়েছিলেন, আজ আপনারা তাদের দলে ঢোকানোর কথা বলছেন? তখন তারা উত্তর দিল ওসব তো ছিল রাজনৈতিক ওয়াদা"।[১৪৭]

কংগ্রেসের সাথে লীগের উপরোক্ত মনোমালিন্যের পর লীগের রাজনৈতিক পলিসি বদলে যায়। ১৯৩৭ সালের ১ এপ্রিল কংগ্রেস নতুন আইন প্রয়োগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দেয়। জমইয়াতে উলামা হরতালকে সমর্থন করে এতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাতে লীগ খুবই অসন্তুষ্ট হয় এবং ইংরেজ সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে হরতাল বিরোধী প্রচারণা চালায়। আলিমদের সাথে জিন্নাহর ওয়াদা ভঙ্গ করা এবং লীগের নীতি পরিবর্তন করে নেয়ার কারণে লীগের প্রতি আলিমদের সমর্থন অব্যাহত রাখার মত পরিবেশ বজায় থাকেনি। কাজেই তাঁরা নিজেদের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হন এবং নিজেদের আযাদীর সংগ্রামে পূনরায় মনোনিবেশ করেন। তাঁরা লীগের প্লাটফর্ম থেকে সরে পড়লে জিন্নাহ উলামা শ্রেণী বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম মাদানীর উপর বেশি ক্ষিপ্ত হন। তাই, মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে শায়খুল ইসলামের প্রতি তীব্র সমালোচনা করা হয়। এমনকি তিনি কংগ্রেস থেকে ঘুষ গ্রহণ করেছেন বলেও অপপ্রচার চালানো হয়।

এসব কারণে শায়খুল ইসলাম মুসলিম লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে ইস্তফা দেন। তার ইস্তফার কয়েকমাস পর লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি রাজা সেলিমপুর নিজেও ইস্তফা দেন। বোর্ডসভায় তাদের ইস্তফানামা একই সময়ে উত্থাপিত হয় কিন্ত, সিদ্ধান্ত জানানো হয় দুই রকমের। শায়খুল ইসলাম ঐ সিদ্ধান্তের

---

[১৪৭] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 152.

কথা উল্লেখ করে বলেন, পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি রাজা সেলিমপুর লীগের সাথে কৃত ওয়াদা ভঙ্গ করেন এবং ইংরেজ গভর্ণরের যোগসাজশে মন্ত্রীত্ব দখল করে বসেন। উচিত ছিল ওয়াদা ভঙ্গের দায়ে রাজার বিরুদ্ধে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা অথচ তা করা হয়নি। বোর্ডসভায় তার ইস্তফানামা উত্থাপিত হলে সেটি গৃহীত হয়। আর আমার ইস্তফানামা গ্রহণ না করে আমাকে বোর্ড থেকে বহিস্কারের ঘোষণা দেয়া হয়।[১৪৮] উপস্থিত সভায় জহীরুদ্দিন ফারুকীসহ লীগের কয়েকজন নেতা প্রতিবাদ করে বলেছিলেন, জমইয়াত নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম মাদানীর ত্যাগ তিতিক্ষার কারণে লীগের পরিচিতি প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছে। তাদেরই পরিশ্রমে লীগ কাঙ্ক্ষিত বিজয় লাভে সক্ষম হয়েছিল। এমতাবস্থায় তাদের সাথে আমাদের আচরণ। মার্জিত হওয়া উচিত। কিন্তু, জিন্নাহ কারও কথায় কর্ণপাত করেননি।

মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মনোমালিন্য ঘটে যাওয়ার পর লীগ নেতারা জমইয়াতের কঠোর সমালোচনায় লিপ্ত হন। জমইয়াতের কার্যক্রম প্রধানতঃ শায়খুল ইসলামের নির্দেশে পরিচালিত ছিল বিধায় তিনি সমালোচনার মূল টার্গেট হিসেবে বিবেচিত হন। জিন্নাহ নিজে সমালোচনার সূত্রপাত ঘটান। শায়খুল ইসলামকে তারা রাজনীতি সম্পর্কে অজ্ঞ, কংগ্রেসের সেবাদাস ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন। এই উত্তপ্ত পরিস্থিতিতে ইংরেজদের খেতাবপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কবি স্যার মুহাম্মদ ইকবাল শায়খুল ইসলামকে বিদ্রুপ করে এক কবিতা প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে ইকবাল মাওলানা মাদানীর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও বিদ্রুপের কারণে কবি ইকবালের ব্যক্তিত্বের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা আর পূরণ করা সম্ভব হয়নি।[১৪৯] এদিকে কংগ্রেস ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষশক্তি হিসেবে কাজ করে বিধায় বিপ্লবী আলিমগণ কংগ্রেসকে নিজেদের সহায়ক মনে করেন। তারা কংগ্রেসের প্রতি নিজেদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। বিষয়টি জিন্নাহকে ক্ষুব্ধ করে। তাই, মাওলানা আযাদকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে কংগ্রেস ত্যাগের পরামর্শ দেন। রাজমোহন গান্ধী বলেন, ১৯৩৮ সালে জিন্নাহ একটি চিঠিতে কংগ্রেসের কাছে দাবি জানান যে, কংগ্রেস যেন সেন্ট্রাল কমিটিতে কোন মুসলিমকে মনোনীত না করে। তার জবাবে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, কংগ্রেস নিজের দীর্ঘকালের বিশ্বাস (অসাম্প্রদায়িকতা) থেকে বিচ্যুত হবে না এবং নিজের মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দকে ত্যাগ করতে সম্মত নয়।[১৫০]

৬.৩০ নির্বাচন পরবর্তী সরকার গঠন নিয়ে কংগ্রেস - মুসলিম লীগ সম্পর্ক

নির্বাচনে লীগ মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন লাভ করলেও সামগ্রিকভাবে সমগ্র দেশে গরিষ্ঠ সংখ্যক আসনের অধিকারী ছিল কংগ্রেস। তাই, ভাইসরয় আগে কংগ্রেসকে সরকার গঠনের আহবান জানায়। কংগ্রেস তখন মৃদু অভিমান ও জল্পনা কল্পনার মধ্যে ছিল। অন্যদিকে লীগের জন্য অপর ছোট ছোট দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুযোগ ছিল। এহেন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি রাজা

---

[১৪৮] মাদানী, *মিষ্টার জিন্নাহ কা পুরআসরার মু'আম্মা আওর-উসকা হল* (দিল্লী: আল জামিয়াঁত বুক ডিপো., তা. বি.), পৃ. ৫।
[১৪৯] নাজমুদ্দীন ইসলাহী, *সীরাতে শায়খুল ইসলাম* (দেওবন্দ: মাকতাবা দ্বিনীয়া, ২য় খণ্ড, তা.বি.), পৃ. ২৭৯-২৯২।
[১৫০] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬২।

সেলিমপুর লীগের সাংগঠনিকভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে নিজেই অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর আসন দখল করে বসেন। এদিকে কংগ্রেসও সরকার গঠনের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে বসে।

সরকার গঠনকে কেন্দ্র করে লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সম্পর্ক ক্রমেই তিক্ততার দিকে চলে যায়। জিন্নাহ এক চিঠিতে মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছেন, আপনি যদি সামান্য মনযোগী হন তাহলে পারস্পরিক তিক্ততার নিরসন করে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের একটি সুযোগ কাজে লাগাতে পারেন। জিন্নাহর উদ্দেশ্য ছিল দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার ভিত্তিতে মন্ত্রীপরিষদ গঠন করা। উল্লেখ্য, গান্ধী যদিও তখন সাময়িকভাবে কংগ্রেস থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন তবুও কংগ্রেসের উপর তার প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। গান্ধী জবাবে লিখেছিলেন, ঐক্যের ব্যাপারে আমি নিজেও অনুরূপ আকাঙ্খা পোষণ করি। তবে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি নিজেকে অক্ষম দেখতে পাচ্ছি। হিন্দু মুসলিমের ঐক্যের আবশ্যকতা সম্পর্কে আমার বিশ্বাস পূর্বের মতই অটল আছে। কিন্তু, বর্তমানে এ ক্ষেত্রে কোন আশাব্যঞ্জক অবস্থা দেখা যাচ্ছে না।

ইউপিতে কংগ্রেস সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। কিন্তু, মন্ত্রী পরিষদ গঠন করতে গিয়ে নির্বাচিত সদস্যদের আনুপাতিক হারের নিয়ম রক্ষা করতে গিয়ে লীগ সদস্যদেরকেও মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে রাখতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, লীগ থেকে তারা ২ জনকে মন্ত্রীপরিষদে গ্রহণ করবে। তন্মধ্যে একজনকে মনোনীত করবে লীগ এবং একজনকে মনোনীত করবে কংগ্রেস। উল্লেখ্য সদস্য নেয়া হবে লীগ থেকে অথচ বাছাই করবে কংগ্রেস। এটিও লীগ নেতাদেরকে ভীষণভাবে আহত করে। নির্বাচনে ইউপিতে মুসলিম লীগ থেকে বিজয়ীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও নওয়াব ইসমাইল খান। যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তারা উভয়ে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী হওয়া অযৌক্তিক ছিল না। চৌধুরী খালিকুজ্জামান এ ব্যাপারে কংগ্রেসের সাথে সম্মানজনক কোন সমঝোতার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজেও হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে সবার কাছে জনপ্রিয় ছিলেন। ইতিপূর্বে প্রায় ২০ বছর তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। মতিলাল নেহেরু ও জওহরলালের সাথে তার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতাও ছিল। কিন্তু, চূড়ান্ত পর্বে দেখা গেল কংগ্রেস উপরোক্ত উভয় নেতাকেই উপেক্ষা করেছে। তাদের বদলে নিজের পছন্দমত অপর দুই সদস্য তথা রফী' আহমদ কিদওয়ায়ী ও হাফিয মুহাম্মদ ইবরাহীমকে মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছে। ফলে, খালিকুজ্জামান ও নওয়াব ইসমাইল খান মর্মাহত হন। ইউপির এ ঘটনাও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল ও মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত গড়ায় কিন্তু কোন সুফল হয়নি। মাওলানা আযাদ বলেন, মনোমালিন্যের এসব ঘটনাকে জিন্নাহ সুন্দরভাবে স্বার্থসিদ্ধির কাজে লাগান। তিনি এগুলি ব্যাখ্যা করে লীগকে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ প্রমাণের চেষ্টা চালান। নির্বাচন উপলক্ষে লীগের পুরাতন বহু লোক জিন্নাহ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল। কিন্তু, পরবর্তীকালে কংগ্রেস থেকে যেসব অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হন সেগুলোর কারণে লীগের

পুরাতন নেতাদেরকে পুনরায় নিজের দিকে টেনে আনতে সক্ষম হন।[১৫১] এসব আচরণে রুষ্ট হয়ে ইউপির জনপ্রিয় নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান ও নওয়াব ইসমাইল খান কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণে অবতীর্ণ হন এবং লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল মিটিয়ে লীগকে কংগ্রেসের প্রতিপক্ষ দল হিসেবে সাংগঠনিকভাবে দাঁড় করানোর কাজে লেগে যান।

মন্ত্রীত্বের ভাগাভাগি নিয়ে কংগ্রেসের সাথে লীগের যে বিরোধ ঘটেছিল সেটি শেষ পর্যন্ত উভয় দলের রাজনৈতিক মৌলিক আদর্শকেও বিঘ্নিত করে। নির্বাচনে বিপ্লবী আলিমগণের সাহায্য করার পিছনে উদ্দেশ্য ছিল লীগকে বিপ্লবী দলে পরিণত করা। তারা মনে করেছিলেন, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামের রণক্ষেত্রে কংগ্রেস তো আছেই, যদি লীগকেও সংগ্রামী ও বিপ্লবী দলে পরিণত করা যায় তাহলে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্বাধীনতা অর্জন খুব সহজ হবে। লীগ ও কংগ্রেসের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের সামনে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তি এক দন্ডও টিকে থাকতে পারবে না। কিন্তু, নির্বাচন হয়ে যাওয়ার পর পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছল যে, লীগের প্রধান শত্রু তখন আর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ নয়; বরং প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় কংগ্রেস। আলিমগণ স্বাধীনতা সংগ্রামকে বেগবান করার যে মহৎ উদ্দেশ্যে লীগের সমর্থন করেছিলেন সেটি নষ্ট হয়ে যাওয়ায় মুসলিম লীগের প্রতি তাদের সমর্থন অব্যাহত রাখা সম্ভবপর হয়নি।[১৫২]

৬.৩১ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি হিসেবে মাদানীর মনোনয়ন

শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পর তার স্থলাভিষিক্ত হিসেবে দায়িত্বভার অর্পিত হয়েছিল শায়খুল ইসলামের উপর। তখন থেকেই উপমহাদেশীয় মুসলিম সমাজের ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, রুহানিয়্যাত ও শিক্ষাবিষয়ক যেকোন সমস্যার সমাধানে তারই অভিমত বিশেষভাবে বিবেচিত হতে থাকে। শায়খুল ইসলাম 'জানাশীনে শায়খুল হিন্দ' হিসেবে সর্বত্র পরিচিত হলেও ব্যক্তিগতভাবে তিনি প্রচার বিমুখ থাকতে ভালোবাসতেন। জাতির স্বার্থে কোন ত্যাগ তিতিক্ষার জন্য তিনি থাকতেন সকলের আগে। আর কোন পদ কিংবা নেতৃত্ব গ্রহণে থাকতেন সকলের পিছনে। ১৯২০ সালে মুফতী আজম কিফায়েত উল্লাহ জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের সভাপতি মনোনীত হন। ইতিপূর্বে তিনি ছিলেন ভারপ্রাপ্ত সভাপতি। ১৯৩৮ পর্যন্ত তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণতার সাথে তিনি সেই দায়িত্ব পালন করেন। রেশমি রুমাল আন্দোলন ব্যর্থ হওয়ার পর তার সুচারু নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ পুনরায় সংগঠিত হন এবং স্বাধীনতার জিহাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। মুফতী সাহেবের ইলম ও তাকওয়া, গভীর প্রজ্ঞা ও উপলব্ধি, রাজনৈতিক দূরদর্শীতা ও বিপ্লবী মনোভাব আলিম সমাজে তার নেতৃত্ব প্রশ্নাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দেয়। কিন্তু, তিনি একটানা ১৮-২০ বছর পর্যন্ত দায়িত্ব পালনের পর শারীরিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়েন। তার বয়স তখন পৌঁছে গিয়েছিল ৭০ এর কোঠায়। ১৯৩৮ সালে তিনি স্বেচ্ছায় দায়িত্ব থেকে ইস্তফা দেন।

---

[১৫১] শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *জিন্না/পাকিস্তান/ নূতন ভাবনা* (কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮), পৃ. ১৬৭।
[১৫২] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫২।

১৯৩৮-৩৯ সালের সময়গুলো ছিল রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিক থেকে উপমহাদেশের সবচেয়ে নাজুক মুহূর্ত। কারণ, তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছিল। ব্রিটিশ জার্মানীর প্রতিপক্ষ হয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। রাজনৈতিক কারণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতকে যুদ্ধদেশ ঘোষণা করে এবং ভারতীয়দের নিকট সামরিক সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হয়। ঐ সময় কংগ্রেস ব্রিটিশকে সাহায্য দানের জন্য শর্তারোপ করে যে, যুদ্ধশেষে ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হবে পক্ষান্তরে, লীগ শর্ত করে যে, যুদ্ধ শেষে কংগ্রেসের নিপীড়ন থেকে মুসলমানদেরকে মুক্তি দিতে হবে। সরকারের কাছে কংগ্রেসের তুলনায় লীগের আরোপিত শর্ত সহজসাধ্য বিবেচিত হয় বিধায়, উভয়ের আঁতাত গড়ে ওঠে। পরিশেষে সরকার ভারতীয়দেরকে যুদ্ধে অংশগ্রহণের নির্দেশ দিলে প্রতিবাদ হিসেবে ১৯৩৯ সালে ২৩ ডিসেম্বর কংগ্রেসের সকল সদস্য মন্ত্রীসভা থেকে একযোগে পদত্যাগ করেন। রাজনৈতিক এ নাজুক মুহূর্তে মুফতী আজমের অপারগতা ও ইস্তফার কারণে জমইয়াত নেতৃবৃন্দ নতুন সভাপতি মনোনয়নের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। এ ব্যাপারে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলিমদের মতবিনিময় হয়। অবশেষে সকলের সম্মিলিত রায়ে সভাপতির দায়িত্ব শায়খুল ইসলামের উপর অর্পিত হয়। ১৯৪০ সালে ৭-৯ জুন জমইয়াতের বার্ষিক অধিবেশন বসে। অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে তার নাম প্রস্তাব করা হয়। তখন থেকে শায়খুল ইসলাম জমইয়াত তথা বিপ্লবী আলিমদের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়া বলেন Maulana Madani was made the president and the reins of leadership were handed over to him.[১৫৩]

৬.৩২ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারকে সবধরনের অসহযোগিতার নির্দেশ

জমইয়াতের জৌনপুর অধিবেশনে শায়খুল ইসলাম দেশ ও জাতির সমস্যাবলী নিয়ে ভাষণ দান করেন। তিনি বলেন, কতিপয় অপরিণামদর্শী লোক বলে বেড়ায় যে, যুদ্ধের নাযুক মুহূর্তে ব্রিটিশদের সৈনিক ও রসদ দিয়ে সাহায্য করা উচিত। এ ব্যাপারে আমাদের স্পষ্ট বক্তব্য হল, সাহায্য দানের দ্বারা বস্তুতঃ ব্রিটিশদের অপকার বৈ উপকার কিছুই হবেনা। বরঞ্চ তাদেরকে ও তাদের সরকারকে জাহান্নামের আরো গভীরে নিক্ষেপ করা হবে। ব্রিটিশদের সাহায্য করার পন্থা একটিই আছে। সেটি হল তাকে তার নিপীড়নমূলক গর্হিত কার্যকলাপ থেকে বিরত করা। খোদা না করুন, বর্তমানে যদি ব্রিটিশকে সৈন্য রসদ কিংবা অস্ত্র-শস্ত্র সরবরাহের দ্বারা সাহায্য করা হয় তাহলে এই সাহায্য কারীরা ইংরেজদের কৃত যাবতীয় অপরাধ, পাপ, জুলুম ও নিপীড়নের অংশীদার ও সহযোগী বিবেচিত হবে। ইংরেজরা আল্লাহর মাখলুকের ওপর নিপীড়ন চালাচ্ছে। কোন সন্দেহ নেই, এমন উৎপীড়নকারী ও উৎপীড়নে সাহায্যকারীরা সকলে আল্লাহর শক্ত গযবে নিপতিত হবে।[১৫৪]

জমইয়াতের এই অধিবেশনে গৃহীত সিদ্ধান্তে বলা হয়, আলিমগণ সবসময়ই উপমহাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতাকে নিজেদের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে ব্যক্ত করে আসছে। জমইয়াতের দৃষ্টিতে এই স্বাধীনতা মানুষের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ন্যায্য অধিকার। এ অধিকার আদায়ে প্রতিবন্ধক যে কোন জিনিসই জমইয়াত গ্রহণের অযোগ্য

---

[১৫৩] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪১।

[১৫৪] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৭-১৬৮।

মনে করে। জমইয়াতে উলামার কার্যনির্বাহী পরিষদ বর্তমান বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে সাহায্য দানের বৈধ কোন দিক আছে বলে মনে করে না।[১৫৫] মাওলানা মাদানী এ সম্মেলনে কতগুলো বিষয় তুলে ধরে বলেন, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অন্যান্য জাতির তুলনায় ভারতের মুসলমানদের দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। এর পেছনে কারণ হল:-

ক) হযরত আদম (আঃ) এর সময়কাল হতেই ভারত মুসলমানদের আদি আবাসভূমি।

খ) এ কারণে মুসলমানরা মৃত্যুর পরও এই দেশ মাতৃকা হতে উপকৃত হবে।

গ) ব্রিটিশরা মুসলমানদের হাত থেকেই এই দেশ ছিনিয়ে নিয়েছে।

ঘ) ভারতবর্ষের স্বাধীনতার মাধ্যমে পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ যেমন- আফগানিস্তান, ইরান, ইয়াগিস্তান উপকৃত হবে এবং তারা বিভিন্ন বিপদ হতে নিস্কৃতি পাবে।

ঙ) অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর তুলনায় ব্রিটিশরা মুসলমানদেরই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করেছে।

চ) স্বাধীনতা অর্জন ব্যতিরেকে দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হতে মুক্তি পাওয়া যাবেনা।

ছ) স্বাধীনতা অর্জন ছাড়া বেকারত্বের সমাপ্তি ঘটানো যাবেনা এবং বেকারত্বের হাত হতে মুক্তি না পেলে জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক লক্ষ্য অর্জন করাও সম্ভব নয়। মুসলমানদের জন্য এই দাসত্বের শৃংখল হতে মুক্তি লাভ করা অবশ্য কর্তব্য এবং একারণেই ভারতের অন্য সকল অধিবাসীদের তুলনায় স্বাধীনতা সংগ্রামের অধিকতর কঠোর পরিশ্রম করা মুসলমানদের জন্য জরুরী।[১৫৬]

মাওলানা মাদানী এ সম্মেলনে তাঁর অভিন্ন জাতীয়তাবাদের ধারণা জনগণের সামনে তুলে ধরার সুযোগ লাভ করেন, যা তিনি ইতিমধ্যে পুস্তিকার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌছানোর প্রয়াস চালাচ্ছিলেন। মুসলিম লীগের একজন নেতা ব্যতিরেকে সম্মেলনের সকল সদস্যই তাঁর এ মতবাদের প্রতি সমর্থন জানায়।[১৫৭] সভাপতির ভাষণে মাওলানা মাদানী অভিন্ন জাতীয়তাবাদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, "আমরা ভারতবাসী এবং ভারতের বাসিন্দা হিসেবে আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য থাকা সত্বেও এমন কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমাদের পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রাখে। আমাদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য আমাদের জাতীয় অংশীদারীত্বের পথে বাধা হতে পারেনা। জাতীয়তার দৃষ্টিকোণ থেকে, আমরা সবাই 'ভারতীয়'। অতএব, দেশের সার্বজনীন কল্যাণ এবং এর যেকোন অঘটন হতে নিরাপত্তা রক্ষার খাতিরে মুসলমান ও অন্যান্য জাতি ও ধর্মীয় সত্তার রয়েছে সমান দায়িত্ব-কর্তব্য। এজন্য যৌথভাবে সংগ্রামের প্রয়াস চালানো এবং অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ধর্মীয় বিভিন্নতা বা বৈচিত্র্য লক্ষ্য অর্জনে কোনভাবেই দুর্বলতা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনা। আর এটাই অভিন্ন জাতীয়তাবাদের মূলকথা।[১৫৮]

---

[১৫৫] সাইয়্যিদ তুফায়েল আহমদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫১৭-৫১৮।
[১৫৬] *তদেব*, পৃ. ৮৮।
[১৫৭] *তদেব*, পৃ. ৯২।
[১৫৮] *তদেব*, পৃ. ৯২।

উল্লেখ্য যে, শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী এমন সময়ে এই অনলবর্ষী বক্তব্য রাখেন, যখন যুদ্ধ জয়ের তাগিদে সৈন্য ও রসদ জোগাড়ে ব্রিটিশরা মরিয়া হয়ে ওঠে ও ঘোষণা করে দেয় যে, যুদ্ধে যারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধাচরণ করবে তারা যেন জীবনের মায়া সম্পূর্ণ ত্যাগ করে নেয়। এই বিরূপ পরিস্থিতিতেও শায়খুল ইসলাম সত্য ভাষণে পিছপা হননি। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় ব্রিটিশরা পুনরায় ভারতীয়দের সাহায্যের অনুরোধ করে। কিন্তু এবার অধিকাংশ কংগ্রেস নেতারাই এ ব্যাপারে সচেতন ছিলেন। এতদসত্বেও স্বৈরাচারী জার্মানীর বিপক্ষে মাহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশদের পক্ষেই সমর্থন প্রদান করেন। ব্রিটিশদের পক্ষাবলম্বন করায় আত্মপক্ষ সমর্থন করে তিনি বলেন যে, ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়ে তিনি সুখী নন, কিন্তু তিনি অনন্যোপায় হয়েই তাদের সমর্থন করেছেন শুধুমাত্র এই কারণে যে তারা গণতন্ত্রের শত্রুদের সাথে লড়াই করেছে।

কিন্তু জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ মাহাত্মা গান্ধীর এই চিন্তাধারার সাথে একমত হননি। তারা যুদ্ধে ব্রিটিশদের যে কোন সহায়তা দানের সুস্পষ্ট বিরোধীতা করে। ১৬ ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ সালে জমইয়াত-ই-উলামার বার্ষিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী নীতির নিন্দা করেন এবং ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি জানান।[১৫৯] ১৯৩৯ সালে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করলে ব্রিটিশবিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অসহযোগ আন্দোলন ক্রমেই প্রবল আকার ধারণ করে। শায়খুল ইসলামের নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশকে কোন প্রকার সাহায্য না করার জোর প্রচারণা চালান। জমইয়াতে উলামার ওয়ার্কিং কমিটির দিল্লীর অধিবেশনে অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত পুনরায় ব্যক্ত করা হয়। ১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকার দেওবন্দ আলিম সৈয়দ মুহাম্মদ মিয়ার 'উলামা-ই-হিন্দ কা শানদার মাযি' শিরোনামে গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করে এবং লেখককে গ্রেফতার করে। কারণ এ গ্রন্থে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়েছিল।[১৬০]

৬.৩৩ লাহোর প্রস্তাব ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের বিরোধীতা

ভারত সরকার আইন পাশ হওয়ার পর জিন্নাহ প্রচার করতে থাকেন যে, হিন্দু ও মুসলিম দুটি পৃথক জাতি। তার এ অযৌক্তিক দাবীর অনিবার্য পরিণামে সাম্প্রদায়িকতাবাদী হিন্দুরা দাবি উত্থাপন করে যে, ভারতীয় বলতে একমাত্র হিন্দুদেরকেই বুঝায়। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী তথা মুসলিমরা বিদেশী। কংগ্রেস ও লীগের এই বৈরী মনোভাবের কারণে ১৯৪০ সালের ২২ মার্চ সালে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ মুসলমানদের জন্য পৃথক দেশ তথা স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব অনুমোদন করে। নিখিল ভারত মুসলিম লীগের ২৩ তম অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ আনুষ্ঠানিকভাবে তার দ্বি-জাতি তত্ত্বটি পেশ করেন। লাহোর প্রস্তাব তথা জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বটির মূলকথা ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যেসব সুবায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে সেগুলোকে নিয়ে একটি স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন যে, যেকোন

---

[১৫৯] Madani Asjad, *op. cit.*, p. 13.
[১৬০] *Ibid.*, p. 13.

আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী মুসলমানরা একটি পৃথক জাতি। তাই তাদের একটি পৃথক আবাসভূমি প্রয়োজন, প্রয়োজন একটি ভূ-খন্ডের এবং একটি রাষ্ট্রের। তার পরামর্শ ছিল-ভারতকে স্বয়ংশাসিত রাষ্ট্রে ভাগ করে সব জাতিকে পৃথক, পৃথক বাসভূমি প্রদান করতে হবে। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

হিন্দু ও মুসলমানদের পৃথক পৃথক ধর্মীয় দর্শন, সামাজিক প্রথা ও সাহিত্য রয়েছে। তাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়না। তারা একসাথে আহার ও করেনা। তারা এমন দুটি পৃথক পৃথক সভ্যতার অঙ্গ, যার ভিত্তি হল প্রধানতঃ পরস্পর সংঘর্ষরত ভাবধারা ও মতবাদ। জীবন সম্পর্কে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও সম্পূর্ণ পৃথক। একথাও স্পষ্ট যে, হিন্দু ও মুসলমানরা ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করে। তাদের মহাকাব্য ও তার নায়ক এবং কাহিনীর মধ্যেও ভিন্নতা বর্তমান। প্রায়শঃই দেখা গেছে, একের নায়ক অপরের শত্রু হিসেবে পরিগণিত হন। এরকম দুটি পৃথক জাতিকে একটি রাষ্ট্রের জোয়ালে জুড়ে দিলে এর একটি হবে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং অপরটি হবে সংখ্যালঘিষ্ঠ। ফলে, তাদের মধ্যে যে অসন্তোষের সৃষ্টি হবে, তা একদিন সমগ্র রাষ্ট্রকাঠামোটিকেই ধ্বংস করে দেবে।

জিন্নাহর মতে, ভারত একটি জাতি নয়। বিগত বারোশ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনাকরলে দেখা যাবে যে, এখানে কোনদিনই সে ধরনের ঐক্য গড়ে ওঠেনি। বরং ভারত সবসময় 'হিন্দু-ভারত' এবং 'মুসলিম-ভারত'-এ দু'ভাগে বিভক্ত থেকেছে। জয়ী হবার পর ইংরেজরা অস্ত্রবলে ভারতের কৃত্রিম ঐক্য বজায় রেখেছে। তিনি দৃঢ়ভাবে একথা ঘোষণা করেন যে, 'মুসলিম-ভারত এমন কোন সংবিধানকে মেনে নেবেনা, যার ফলে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের সরকার প্রতিষ্ঠিত হবে। গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে এরূপ সরকার প্রতিষ্ঠার অর্থ হবে, হিন্দু রাজত্ব কায়েম করা। তিনি আশা করেন যে, ব্রিটিশ সরকার এ ধরনের কোন সংবিধান মুসলমানদের ওপর চাপিয়ে দেবেন না। তার দাবি হলো, 'জাতি' শব্দের যেকোন পরিভাষা অনুযায়ী মুসলমানরা যেহেতু একটি জাতি, সেহেতু তাদের নিজস্ব বাসভূমি, ভৌগোলিক এলাকা এবং রাষ্ট্রের প্রয়োজন।

প্রস্তাবের সমর্থনে জিন্নাহ আরও বলেন, ভারতের রাজনৈতিক সমস্যা শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক নয়; এ সমস্যা বিশ্বজনীন। এর সমাধানের একমাত্র উপায় হল ভারতকে স্বশাসিত জাতীয় রাজ্যে বিভক্ত করা। উল্লেখ্য, লাহোর অধিবেশনে গৃহীত বিভক্তির প্রস্তাব উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতা ও ব্রিটিশ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের ইন্ধন যোগায়। তারপর থেকেই জিন্নাহ বারংবার ঘোষণা দিতে থাকেন যে, ভারত সমস্যার একমাত্র সমাধান হল ভারত বিভক্তি।[১৬১] জিন্নাহর দ্বিজাতি দর্শন আলিমদেরও স্বীকৃতি পায়নি। বরং আলিমগণ শত শত বছর ধরে যে অসাম্প্রদায়িকতার নীতি অবলম্বন করেছিলেন তা ছিল জিন্নাহর দ্বিজাতিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত।[১৬২] ২৩ মার্চ ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ঘোষণা পাস হলে মাওলানা

---

[১৬১] অতুল চন্দ্র, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫০৫।
[১৬২] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫০-২৫১।

মাদানী আসাম হতে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ঝটিকা সফর করেন এবং মুসলমানদের কাছে আবেদন জানান যাতে তারা মুসলিম লীগের প্রচারণা দ্বারা বিপথগামী না হন। এ সফর কালীন সময়ে তিনি লীগের সমর্থকদের আক্রমণের শিকার হন যারা তার প্রতি আবর্জনা নিক্ষেপ করে। ভারতে জাতিসত্তার মূল নিয়ামক নিরূপণে নেতৃবৃন্দের এহেন মতানৈক্য ভারতবাসীর ভয়াবহ বিভেদ ডেকে আনে। পরিণামে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠিত ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

৬.৩৪ ক্রিপস মিশনের ব্যর্থতা ও জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি

২য় বিশ্বযুদ্ধে জাপান ব্রিটিশদের পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলি জয় করতে করতে ভারত সীমান্তে এসে উপনীত হলে ব্রিটিশ সরকার বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। এমতাবস্থায় ভারতবাসীদের সহায়তা ব্যতিরেকে জাপানকে প্রতিহত করা ব্রিটিশদের পক্ষে সম্ভব ছিলনা। ফলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনার জন্য ১৯৪২ সালের ১১ই মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে প্রেরণ করেন। তিনি এক সপ্তাহ ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। ক্রিপস মিশনের প্রস্তাব ছিলঃ

ভারত ব্রিটিশ শাসনাধীনে একটি স্বাধীন ডোমিনিয়ন হিসেবে থাকবে যার অভ্যন্তরীণ অথবা বাহ্যিক বিষয়ে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করা হবে না। প্রদেশগুলো স্বাধীনভাবে কর্মকান্ড চালাতে পারবে। ব্রিটিশ সরকারের সাথে সম্পর্ক বজায় রেখে তাদের স্বাধীনভাবে ডোমিনিয়নে অংশ নেবার অথবা পৃথক থাকার অধিকার থাকবে। নির্বাচনের মাধ্যমে একটি আইনসভা গঠন করা হবে যারা সমগ্র দেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে। এই সংবিধান ব্রিটিশদের কর্তৃক স্বীকৃত হবে।

ক্রিপস ফর্মূলা তার প্রস্তাবনার দিক থেকে ছিল উৎসাহ উদ্দীপক। মুসলিম লীগের জন্যও এটি ছিল একটি আকর্ষণীয় প্রস্তাব কারণ এখানে প্রাদেশিক স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার বিষয়টিতে 'বিভাগ' এর দিকে কিছুটা ইঙ্গিত করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বে এই সকল প্রতিশ্রুতিই ছিল ভবিষ্যতের ওপর নির্ভরশীল। তার বিনিময়ে যুদ্ধ শেষ হবার আগ পর্যন্ত ব্রিটিশ সরকারের সামনে মাথা নোয়াতে হবে ভারতবাসীকে। মোট কথায় ক্রিপস ফর্মূলা ছিল একটি অপূর্ব কাল্পনিক বাগানের অনুরূপ। যার জন্যে ভারতবাসীদেরকে তাদের জীবন ও সম্পদ বাজী রাখতে বলা হয়েছিল। অপরদিকে ভারতবাসীদের ছিল ২০০ বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতা যার শিক্ষণীয় ছিল এই যে, ব্রিটিশদের কৃত যে কোন প্রতিশ্রুতি শুধু স্বার্থ উদ্ধার ও কাল ক্ষেপনের জন্য, তারা তা কখনই পূরণ করবেনা। একারণে শুধু জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দই নয় বরং কংগ্রেস সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দল ক্রিপসের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং অসহযোগের কর্মসূচী আরো বেগবান করেন।[১৬৩]

---

[১৬৩] Arun Mehta, *History of Modern India* (Natraj Nagar: ABD Publishers B-16, 2004), p. 161.

ক্রিপস মিশন আগমনকালীন সময়ে জমইয়ত-ই-উলামার সভাপতি ছিলেন মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী। ১৯৪২ সালের ২০ মার্চ জমইয়াতের লাহোর অধিবেশনে যে বক্তব্য উপস্থাপন করা হয় তার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হল:-"ক্রিপস মিশন বিলম্বে উপস্থিত হয়েছে এবং এটি যে সময়ে প্রয়োগের জন্য উপস্থাপন করা উচিত ছিল তা-ও অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আর কোন প্রস্তাবই আমাদের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা সকল মুসলিম পার্টি এবং অন্য সকল রাজনৈতিক সংগঠনের নিকট আবেদন জানাচ্ছি যাতে তারা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথভাবে কাজ করেন এবং পারস্পরিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঐক্যমতের ভিত্তিতে যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[১৬৪]

ক্রিপস মিশন ব্যর্থ হলে লীগ নেতৃবৃন্দ দুশ্চিন্তায় পড়েন। তারা চলমান পরিস্থিতির নিরিখে প্রয়োজনীয় মতামত দিয়ে ব্রিটিশকে আশ্বস্ত করা ও সাহায্য দেয়ার সকল দায়িত্ব মিষ্টার জিন্নাহর উপর অর্পণ করেন। অন্যদিকে কংগ্রেস ও জমইয়াতে উলামা অসহযোগিতার কর্মসূচী আরও বেগবান করেন। ২২ শে মার্চ, ১৯৪২ শায়খুল ইসলামের সভাপতিত্বে জমইয়াতের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে। উল্লেখ্য, এই লাহোর ছিল লীগ সমর্থকদের প্রধান ঘাঁটি। এখান থেকেই আল্লামা ইকবাল ভারত বিভক্তির প্রথম প্রস্তাব করেন। তারপর এখানেই জিন্নাহ পাকিস্তান প্রস্তাবের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এসব কারণে লাহোরে অনুষ্ঠিতব্য জমইয়াতের ঐ অধিবেশন ছিল খুব ঝুঁকিপূর্ণ। লীগের প্রোপাগান্ডাকারীরা জমইয়াতের নামে নানা রকমের বিদ্রুপাত্মক বাক্য লিখে বিভিন্ন পোস্টার টাঙ্গিয়ে পরিবেশ নোংরা করে রাখত। এতদসত্ত্বেও যথাসময়ে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে এ অধিবেশন সাফল্যমন্ডিত করেন। মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া লিখেছেন, সভাপতির ভাষণ শুরু হলেই প্যান্ডেলের প্রান্তদেশ থেকে পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান শুরু হলে গোটা সম্মেলন পন্ড হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। কিন্তু শায়খুল ইসলাম অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বক্তব্য চালিয়ে যান। কয়েক মিনিট পর দুস্কৃতিকারীরা আপনা থেকেই নিরব হয়ে যায়।

অধিবেশনে শায়খুল ইসলাম সমকালীন পরিস্থিতির উপর বিস্তারিত বক্তব্য রাখেন। তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামের সার্বজনীনতা ও প্রশাসনিক সুব্যবস্থার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত সমাজ ব্যবস্থার কোথাও ধোঁকা নেই, প্রতারণা নেই, ক্রটি নেই। এ সমাজ ব্যবস্থায় অপরকে অবহেলা করারও বিধান নেই। প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা এ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত। এ ব্যবস্থায় মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি সদস্যের প্রতি নিজ পিতামাতা ও আত্মীয়ের ন্যায় পরম দরদ ও ভালোবাসা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখানে উচ্চবিত্ত, নিম্নবিত্ত, সাদা-কালো, ব্রাহ্মণ-শুদ্র, শেখ-সাঈদ ইত্যাদির কোন ব্যবধান রাখা হয়নি। ব্যবধান

---

[164] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫১।

হবে একমাত্র আল্লাহর হুকুম পালন ও তাক্বওয়া অবলম্বনের নিরিখে। পক্ষান্তরে, যে আনুগত্য থেকে পলায়ন করে সে যেই বংশ ও পরিবারের লোকই হোক না কেন সে বিদ্রোহী ও নাফরমান বলেই পরিগণিত হবে।

অধিবেশনে শায়খুল ইসলাম ব্রিটিশদেরকে পুনরায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, জমইয়াতে উলামা চলমান যুদ্ধে বৃটিশের সাহায্য কোনক্রমেই বৈধ মনে করে না। বৃটিশের প্রদত্ত অঙ্গীকার সম্পর্কে তিনি বলেন, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রায় এক শতাব্দীকাল ধরেই চলে আসছে। এ শতবর্ষের ভিতর ব্রিটিশ বহুবার অঙ্গীকার দিয়েছে এবং ভঙ্গ করেছে। তাই, কোন অঙ্গীকারকে ভিত্তি করে সরকারকে বিশ্বাস করার সুযোগ নেই।

৬.৩৫ জিন্নাহর দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতে মাদানী ফর্মূলার প্রচার

মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপরীতে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের নেতৃত্বে বিপ্লবী আলিমগণ অসাম্প্রদায়িক ভারতের শাসনতান্ত্রিক রূপরেখা প্রণয়ন করেন। শায়খুল ইসলাম মাদানীর উদ্যোগে এ ফর্মূলা রচিত হয়েছিল বিধায় এটি মাদানী ফর্মূলা নামে পরিচিত। এর প্রস্তাবনা ছিল নিম্নরূপ:

স্বাধীন ভারতের জন্য মৌলিক কিছু নীতিমালার আলোকে সুবাগুলির সমন্বয়ে কনফেডারেশন ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। কনফেডারেশনে যোগদানকারী প্রত্যেক সুবা নিজ নিজ স্থানে থাকবে স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসনের অধিকারী। কেন্দ্রীয় সরকার কোন সুবার স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবেনা। কেন্দ্রের হাতে কেবল ঐ সকল অধিকার থাকবে যেগুলো ফেডারেশন সদস্যদের সম্মিলিত রায়ে গৃহীত হবে। সুবা সরকারের হাতে থাকবে অলিখিত অন্যান্য সকল ক্ষমতা। প্রত্যেক সরকার সংখ্যালঘুদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষণে বাধ্য থাকবে এবং তারা যেভাবে ভাল মনে করবে, সেভাবে সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন সংখ্যাগরিষ্ঠরা নিজেদের গরিষ্ঠতার কারণে উপকৃত হতে পারে, পাশাপাশি সংখ্যালঘিষ্ঠরা সামগ্রিকভাবে সুস্থির ও নিরাপদ জীবনযাপনের পূর্ণ সুযোগ পায়।[১৬৫]

মাওলানা মাদানী যে ধর্ম নিরপেক্ষ অভিন্ন জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার করছিলেন তা মুসলিম লীগের সরাসরি বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। তাদের বক্তব্য অনুসারে মাওলানা মাদানীর প্রচারকৃত অভিন্ন জাতীয়তাবাদের ধারণা ইসলামের বিরোধী। দ্বিজাতি তত্ত্ব বলতে বোঝায় মুসলমানরা তাদের স্বতন্ত্র ধর্ম বিশ্বাস, ইতিহাস ও সংস্কৃতির কারণে একটি পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য। মাওলানা মাদানী এ তত্ত্বের বিরোধিতা করে তিনি তার মতাদর্শগত প্রতিপক্ষ স্যার ডঃ ইকবালের প্রশ্নের উত্তরে 'মুত্তাহিদা কওমিয়্যাত অউর ইসলাম' শিরোনামে একটি পুস্তক রচনা করেন। অন্যদিকে মাওলানা হাফিজুর রহমান সহ অন্যান্য উলেমাবৃন্দ 'মুত্তাহিদা কওমিয়্যাত' (অভিন্ন জাতীয়তাবাদ) এর ধারণাকে সমর্থন দেন। সর্বোপরি, তারা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে ও এর গ্রহণযোগ্যতা ব্যাখ্যা করেন। Metcalf D. Barbara এর মতে-

---

[১৬৫] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

> Maulana Hussain Ahmed Madani was a strong believer in Composite Nationalism and confronted the notions that only Muslims could represent Muslims, an answer not only to the British attempts to encourage Hindu-Muslim differences but also to the Muslim league and Jinha's claim to solely represent the Muslim community. In one of his influential writings, Muttahida Qaumiat aur Islam (Composite Nationalism andIslam), Maulana Hussain Ahmed Madani justified a secular government for the society comprised of people of different religious backgrounds.[১৬৬]

মাওলানা মাদানী তার 'মুত্তাহিদা কওমিয়্যাত অউর ইসলাম' গ্রন্থে তিনি তার মতবাদের সপক্ষে কুরআনের বিভিন্ন উদ্ধৃতির সহায়তা নেন এবং স্পষ্টভাবে দেখান যে সহজাত ইসলাম বিচ্ছিন্নতাবাদকে সমর্থন করে না।

৬.৩৬ ব্রিটিশ সরকারের দমন নীতি

১৯৪২ সালে কংগ্রেস বোম্বে অধিবেশনে ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। এটি কুইট ইন্ডিয়া বা আগস্ট আন্দোলন নামে পরিচিত। এ প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতের মঙ্গলের জন্য এবং ইউনাইটেড ন্যাশনের সাফল্যের জন্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান অপরিহার্য। কংগ্রেসের উচ্চ পরিষদ মহাত্মা গান্ধীকে সংগ্রাম পরিচালনার অনুরোধ জানান। সে মতে গান্ধী 'কারেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' মন্ত্রের ঘোষণা দেন। তার প্রচারিত মন্ত্রে অনতিকালেই স্বাধীনতা আন্দোলন ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিক্ষোভ ক্রমেই অহিংস আদর্শের সীমানা অতিক্রম করে হিংসাত্মক পরিস্থিতির দিকে মোড় নেয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের কারণে ইংরেজ সরকার গান্ধীকে দায়ী করেন। ৯ই আগস্ট মহাত্মা গান্ধী ও মাওলানা আযাদসহ বহু নেতাকে গ্রেফতার করা হয়। মোটকথা, কংগ্রেস জমইয়াতে উলামার উপরোক্ত আপসহীন নীতির দরুন ব্রিটিশ সরকার ক্ষিপ্ত হয়ে দমন নীতি অবলম্বন করে। নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠায়। জমইয়াতের যারা বন্দী হয়েছিলেন তাদের অন্যতম হলেন- মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা আহমাদ আলী, মাওলানা মুহাম্মাদ কাসিম শাহজাহানপুরী, মাওলানা আবুল ওয়াফা, মাওলানা শাহিদ মিয়া ফাখিরী, মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল শাম্ভুলী ও মাওলানা আখতারুল ইসলাম মুরাদাবাদী। ১৯৪৩ সালের ২৩ জানুয়ারী শায়খুল ইসলাম মুরাদাবাদে জমইয়াতের অপর এক কনফারেন্সে বক্তৃতা দেন। বক্তৃতায় তিনি ইসলামের দৃষ্টিতে জিহাদ ও স্বাধীনতার গুরুত্ব আলোচনা করে সামাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে মুসলমানদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য বলে বর্ণনা করেন। তার বক্তব্য মুসলিম জনমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ফলে, কনফারেন্স থেকে প্রত্যাবর্তনের পরই তাকে সাহারানপুর রেলস্টেশন থেকে গ্রেফতার করে জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে পরদিন অর্থাৎ ১৯৪৩ সালের ২৪ জানুয়ারী এলাহাবাদের অন্তর্গত নৈনিতাল জেলে পাঠিয়ে দেয়া হয়।[১৬৭]

---

[১৬৬] Metcalf D. Barbara, *op. cit.*, p. 148.
[১৬৭] Goyal, *op. cit.*, pp. 191-193.

১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধী বিখ্যাত একুশ দিনের অনশন শুরু করেন। তাতে কয়েকদিনের মাঝে তার শারীরিক অবস্থা ভীষণ অবনতির দিকে গেলে দেশব্যাপী সর্বত্র তার মুক্তির দাবি উত্থিত হয়। সরকার মানুষের এ দাবি উপেক্ষা করে যায়। ঐ সময় মুসলিম লীগসহ হিন্দু মহাসভা, ডেমোক্রেটিক রেডিক্যাল দল ও দেশী রাজন্যবর্গের অধিকাংশ আগস্ট আন্দোলনের বিরোধিতা করে। জিন্নাহ সর্বতোভাবে লীগকে আগস্ট আন্দোলন থেকে সরে থাকার নির্দেশ দেন। রাজনৈতিক দলগুলোর অসহযোগিতার দরুন অবশেষে আগস্ট আন্দোলন ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে ও অবশেষে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতির ব্রিটিশদের অনুকূলে চলে আসে। ফলে সরকার বহু রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৪৪ সালের ২৬ শে আগষ্ট শায়খুল ইসলামকেও মুক্তি দেয়া হয়।

৬.৩৭ সুভাস চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে আযাদ হিন্দ ফৌজের ব্যর্থতা ও বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের উদ্যোগ

এসময় সুভাষ চন্দ্র বসুর নেতৃত্বে অন্যত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়। সুভাষ চন্দ্র আগস্ট আন্দোলনের আগেই ১৯৪১ সালের ১৭ই জানুয়ারী গোপনে অন্তর্হিত হন। তিনি অত্যন্ত দুঃসাহসিকভাবে প্রথমে জার্মান ও পরে জাপান গিয়ে আযাদ হিন্দ ফৌজ ও আযাদ হিন্দ সরকার গঠন করেন। তিনি তার ফৌজকে গান্ধী, আযাদ ও নেহেরু এই তিনটি ব্রিগেডে বিভক্ত করে দিল্লি চল অভিযানের ঘোষণা দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময় বিশ্বযুদ্ধের পরিস্থিতি পরিবর্তিত হলে আযাদ হিন্দ বাহিনী আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন।

সুভাষ চন্দ্রের উদ্যোগ ব্যর্থ হলেও ব্রিটিশ সরকারের উপলব্ধি ঠিকই ঘটে যে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপর নির্ভর করে ভারতে ইংরেজ আধিপত্য বজায় রাখা আর সম্ভব নয়। কিছুদিন পর ১৯৪৫ সালের মাঝামাঝি জার্মানীর পতন ঘটলে ইউরোপে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। তখন পর্যন্ত পূর্বাঞ্চলে জাপানের সাথে মিত্রপক্ষের যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম বিধায় ভারতের সাথে সমঝোতা করে জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের শক্তি বলিষ্ঠ করার জন্য রাশিয়া বৃটেনের উপর চাপ দেয়। এদিকে বৃটেনে সাধারণ নির্বাচন আসন্ন হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরোধীদল লেবার পার্টি ভারতের সাথে কোন একটি মীমাংসায় উপনীত না হওয়ায় রক্ষণশীল দলের সরকারকে প্রচন্ডভাবে দায়ী করে। এমতাবস্থায় বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী চার্চিল ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসনে সচেষ্ট হন। এসময় ভারতীয়দের গণ অসন্তোষ ও স্বাধীনতা আন্দোলন, ইংরেজ সরকারের উপর বৈদেশিক চাপ, ও ব্রিটেনে লেবার পার্টির জোরালো দাবির ফলে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতকে স্বাধীনতা দানের বিষয়টি প্রায় নিশ্চিত হয়ে যায়। শুধু এটুকু সংশয় থাকে যে, স্বাধীনতা ভারতকে অবিভক্ত রেখে না বিভক্ত করে দেয়া হবে।

৬.৩৮ ওয়াভেল পরিকল্পনা পেশ ও সিমলা অধিবেশন

১৯৪৪-৪৫ সালের ঐ সময়ে ভারতের ভাইসরয় ছিলেন লর্ড ওয়াভেল। তার সামনে ভারতের সমস্যাগুলো ছিল জটিল। বাংলার ক্রমাগত দুর্ভিক্ষ ও সাম্প্রদায়িকতা তখন পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছিল। ওয়াভেল প্রথমতঃ গান্ধীসহ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন এবং ভারতের মৌলিক ঐক্যের উপর ভিত্তি করে শাসনতন্ত্র রচনা করার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন। কিন্তু, জিন্নাহ তার পাকিস্তান দাবীতে ছিলেন অনড়। কংগ্রেসের ভারত ছাড় আন্দোলনের সাথে জিন্নাহ দুটি শব্দ ঘোষণা দেন- 'ভাগ করে ভারত ছাড়'। ফলে, দেশে আবার সূচিত হয় অচলাবস্থা। ১৯৪৫ সালে ওয়াভেল ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার সাথে পরামর্শ করে একটি পরিকল্পনা পেশ করেন। এটি ওয়াভেল পরিকল্পনা নামে পরিচিত। পরিকল্পনাটির লক্ষ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিরসন করা।

পরিকল্পনার ধারাগুলি ছিল এমন-

১. ভারতে নতুন সংবিধান রচিত না হওয়া পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে।

২. বড়লাটের কার্যনির্বাহী কাউন্সিলে বর্ণ হিন্দু ও মুসলিম সদস্যদের সংখ্যা সমান রাখা হবে।

৩. বড়লাট ও প্রধান সেনাপতি ছাড়া কাউন্সিলের অপর সকল সদস্য ভারতীয়দের থেকে মনোনীত হবে।

৪. যতদিন ভারতের প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটিশ সরকারের উপর থাকবে ততদিন সামরিক দপ্তরের কর্তৃত্ব বৃটিশের হাতে ন্যস্ত থাকবে।

উপরোক্ত পরিকল্পনার আলোকে ঐ বছর জুন মাসে ওয়াভেলের আমন্ত্রণে সিমলায় সর্বদলীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশনে দীর্ঘ আলোচনা পর্যালোচনার পরও জিন্নাহ ভারত বিভক্তির দাবী ত্যাগে সম্মত হননি। এছাড়াও লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক দায়িত্বশীল সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি আদায়ে চাপ দিতে থাকে। তাছাড়া কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী পরিষদে সদস্য মনোনীত না করার দাবিতেও অটল থাকেন। কিন্তু গোড়া থেকেই কংগ্রেসে জাতীয়তাবাদী বহু মুসলমান বিদ্যমান থাকায় কংগ্রেসের পক্ষে জিন্নাহর প্রস্তাব মেনে নেয়ার সুযোগ ছিল না। অবশেষে উভয় দলের মধ্যে কোন মীমাংসা না হওয়ায় সিমলা অধিবেশন ব্যর্থ হয়।

বস্তুতঃ ওয়াভেল পরিকল্পনায় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণের বিশেষ সুযোগ ছিল। লীগ নেতৃবৃন্দের অতি বাড়াবাড়িতে সে সুযোগ হারাতে হয়। তাই, মাওলানা আযাদ লিখেছেন জিন্নাহর অহেতুক বিরোধিতার কারণে অধিবেশন ব্যর্থ না হলে ফলাফল দাঁড়াত যে, ভাইসরয় কাউন্সিলের মোট ১৪ সদস্যের মধ্যে ৭ সদস্যই থাকতেন মুসলমান। অথচ, মুসলমান ভারতের মোট জনসংখ্যার মাত্র ২৫%। ব্যাপারটি যেমন কংগ্রেসের উদারতা বোঝাচ্ছে তেমনি লীগের নির্বুদ্ধিতার প্রমাণ দিচ্ছে। লীগ উপরোক্ত সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমানদের যাবতীয় অধিকার সংরক্ষণ করে নিতে পারত। কিন্তু লীগের অহেতুক বিরোধিতার ফলে মুসলমানগণ অবিভক্ত ভারতের অন্যতম বৃহৎ শক্তির মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকার সম্ভাব্য আসন থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে।

মাওলানা আযাদ অধিবেশন ব্যর্থতার জন্য স্বয়ং ব্রিটিশ সরকারকেও দায়ী করেছেন। তার মতে সরকার যদি ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদানে পরিচ্ছন্ন মনোভাব পোষণ করত তাহলে লীগের অযৌক্তিক শর্তারোপকে বিবেচনায় রেখে আরেকটি সিদ্ধান্ত নিতে পারত। কিন্তু সরকার সেটা করেনি বরং, লীগের বিরোধিতা দেখে পুনরায় অচলাবস্থার ঘোষণা দিয়ে সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়। আযাদের মতে, লীগ মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক সংগঠন হওয়ার দাবীও অবাস্তব ছিল। কেননা, ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে দেখা গেছে, যেসব সুবায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেখানে লীগ মন্ত্রীসভা গঠনে সক্ষম হয়নি। যেমন মুসলিম প্রধান সীমান্ত প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করেছে কংগ্রেস। বাংলায় সরাসরি গভর্ণরের সরকার গঠিত হয়। পাঞ্জাবের ইউনিয়নিস্ট পার্টি সরকার গঠন করে। সিন্ধু প্রদেশে কংগ্রেসের সহযোগিতায় সরকার গঠন করেন স্যার গোলাম হুসাইন। আসামের অবস্থাও ছিল তেমনি। এমতাবস্থায় তার মতে লীগকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী একক সংগঠন বলা যুক্তিসংগত নয়। মোটকথা, লীগের এ আচরণে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা নিজেদের সর্বশেষ চক্রান্ত কার্যকর করার সুযোগ পায় এবং ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের ঘোষণা দেয়। নির্বাচনের দিন লীগ নিজেদের মুসলমানদের একক সংগঠন প্রমাণ ও ভারত বিভক্তিপূর্বক পাকিস্তান অর্জনের লক্ষ্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করে ময়দানে নামে।

৬.৩৯ ব্রিটিশ সরকার ও মুসলিম লীগের কঠোর সমলোচনা

১৯৪৫ সালের ৭-৯ মে সাহারানপুরে জমইয়াতের ১৪ তম অধিবেশন বসে। শায়খুল ইসলাম এ অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। জমইয়াতের এ অধিবেশন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যমন্ডিত। প্রায় ৩০ হাজারের বেশি সদস্য অধিবেশনে যোগদান করে। অধিবেশনের ভাষণে শায়খুল ইসলাম ভারতে ইংরেজ শাসনের কুফল ও বর্বরতা দুর্ভিক্ষ কবলিত বাংলার করুণ পরিস্থিতি, সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদের বিভিন্ন অপকৌশল এবং তথাকথিত পাকিস্তানের নামে ভারত বিভক্তির চক্রান্ত ইত্যাদির উপর বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের নিষ্ঠুরতা ও স্বার্থপরতার সমালোচনা করে বলেন, ইংরেজদের অমানবিক শাসনের দরুন ভারতবাসীর প্রাণ আজ ওষ্ঠাগত। ভারতবাসী আজ চরম দারিদ্রক্লিষ্ট ও কাঙ্গালে পরিণত হয়েছে।

সাহারানপুরের ঐ অধিবেশনে তিনি পাকিস্তান আন্দোলন তথা মুসলমানদের ভৌগলিক ঐক্য বিভক্ত করারও সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, আজ সরলপ্রাণ মুসলমানদের ধোঁকা দেয়া হচ্ছে যে, পাকিস্তানে খাঁটি ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠা করা হবে। সেখানে খোলাফায়ে রাশেদার আদলে সরকার প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ স্বপ্ন নিশ্চয় একটি মধুর স্বপ্ন। লীগ নেতারা এ ব্যাপারে আমাদের নিশ্চয়তা দান করলে ভালো ছিল। আমরা জমইয়াতের সকল সদস্য একযোগে তাদের আহবানে সাড়া দিতাম। কিন্তু, তাদের পক্ষে কি এ নিশ্চয়তা প্রদান আদৌ সম্ভব? যাদের দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম ও ইসলামী মূল্যবোধের বিন্দুমাত্র সম্পর্কও নেই। ধার্মিকতা তো নয়ই, আকার আকৃতি ও বেশভূষায় পর্যন্ত যাদের মধ্যে ইসলামের পরিচয় নেই তারা কায়েম করবে ইসলামী হুকুমত? এই

লোকেরা সমগ্র দেশে ইসলামী অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করবে, ধর্মীয় বিধি-বিধানের আওতায় খোলাফায়ে রাশেদুনের পদ্ধতি অনুসারে সরকার পরিচালনা করবে এমনটি কখনও বিশ্বাসযোগ্য নয়। তিনি আরও বলেন, জিন্নাহ 'নিউজ ক্রনিক্যাল'-এর যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন সেটি অধ্যয়ন করে আমাদের শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। সেখানে তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, পাকিস্তানে যে সরকার গঠিত হবে সেটি হবে সম্পূর্ণ ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির সরকার। হিন্দু মুসলিম সকলে নিজ নিজ আবাস ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রতিনিধি নির্বাচন করে পাঠাবে এবং সে প্রতিনিধিদের দিয়েই গঠিত হবে মন্ত্রীপরিষদ। বক্তব্যের শেষে শায়খুল ইসলাম ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতার সংগ্রামকে আরও বেগবান করতে মুসলমানদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ জানান। তার মতে, ভারতে ইংরেজদের অস্তিত্ব বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত কোন শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার চিন্তা করা বৃথা। সাহারানপুরের অধিবেশনে জমইয়াতের প্রস্তাবিত খসড়া সংবিধান (মাদানী ফর্মূলা) ও তার মূলনীতির মঞ্জুরী গ্রহণ করা হয়।[১৬৮]

জমইয়াতের প্রস্তাবিত ফর্মূলার উপর আলোচনা করে মাওলানা হিফজুর রহমান বলেন, ভারতীয় মুসলমানদের অধিকার সংরক্ষণ ও আদায়ে বিপ্লবী আলিমদেরকে কখনো তথাকথিত কমিউনাল মুসলমানদের চেয়ে পেছনে দেখা যায়নি। এ ধরনের বিষয় যখনি উত্থাপিত হয়েছে, তখনই আলিমগণ এমন প্রস্তাব পেশ করতে চেষ্টা করেছেন, যার দ্বারা মুসলমানদের স্বার্থ সর্বোচ্চ পরিমাণে সংরক্ষিত থাকে এবং মুসলমানগণ হিন্দুদের সমকক্ষ হয়ে প্রশাসনে সমান অংশীদারের মর্যাদা লাভ করতে পারে। জমইয়াতে উলামা ভারতের শাসনতন্ত্রের জন্য যে ফর্মূলা পেশ করে সেটি মিঃ জিন্নাহর বিভক্তি প্রস্তাব হতে বহুগুণে উন্নত ছিল। ঐ ফর্মূলার দ্বারা মুসলমানদের সমস্যাবলীকে বিভক্তির চেয়ে অধিকতর লাভজনক ভাবে সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।[১৬৯]

৬.৪০ ভারত বিভক্তি প্রশ্নে ত্রিমুখী অবস্থান

কংগ্রেস ও উলামা শ্রেণী ভারতের অখন্ড জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী হলেও ভারতকে বিভক্ত করার মধ্যে তাদের নিজেদের স্বার্থ নিহিত ছিল বলে প্রথম থেকেই ইংরেজরা ঐ পথ সুগম করতে থাকে। মাওলানা আযাদ বলেন, ব্রিটিশরা তখন এশিয়ায় তাদের বাণিজ্যিক অ-রাজনৈতিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়োজনেই বিভক্তির সমর্থনে কাজ করে। মাওলানা মাদানী আরও স্পষ্ট করে বলেন, ব্রিটিশরা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই ভারতকে বিভক্ত করেছিল। কারণ, হিন্দুরা বিলাতী পণ্যের ব্যবসা বর্জন করায় ইংরেজরা মুসলমানদের মাধ্যমে নিজেদের ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য একটি পৃথক ও নতুন ক্ষেত্র তৈরির চেষ্টা করে যাচ্ছিল।[১৭০] **১৯৩১** সালে মুসলমানদের একটি প্রতিনিধিদল লন্ডন গমন করলে ইংরেজদের সাথে গোপন আঁতাত হয়। আঁতাতে বৃটেন ঐ প্রতিনিধিদল থেকে আশ্বাস পায় যে, পাকিস্তান ভূখন্ডে বিলাতী শিল্প ও বাণিজ্যের লেনদেন অব্যাহত রাখা হবে। তাছাড়া উপমহাদেশের সমুদ্র বন্দরগুলোর মধ্যে করাচী ও কলকাতায় বৃটিশের বাণিজ্যের সুযোগ দেয়া হবে। মোটকথা

---

[১৬৮] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২১৫।

[১৬৯] হিফজুর রহমান, *তাহরীকে পাকিস্তান পর এক নযর* (দিল্লীঃ আলজামিয়াঁত বুক ডিপো., তা.বি.), পৃ. ৪০।

[১৭০] মাদানী, *পাকিস্তান কিয়া হ্যায়* (দিল্লীঃ আলজামিয়াঁত বুক ডিপো., তা.বি.), পৃ. ৫।

ভারতবর্ষ থেকে বিদায়ের মূহুর্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের শেষ চেষ্টা ছিল ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে যাওয়া। ভারতকে যে কোন উপায়ে বিভক্ত করাই ছিল সে স্বার্থ রক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা। কেননা, পাকিস্তান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবেই থাকবে দুর্বল, আর ঐ পাকিস্তান সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদেরকে সমীহ করে চলবে। তখন পাকিস্তানকে মাধ্যম বানিয়ে গোটা এশিয়ার উপর কূটনৈতিক আধিপত্য বজা রাখা সম্ভব হবে। তাছাড়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলির অন্যতম বৈদেশিক নীতি ছিল যে, মুসলিম শক্তি পৃথিবীর যেখানেই হোক না কেন সেটিকে খন্ডিত করে দুর্বল করে দেয়া। যেন মুসলমানরা পুনরায় পৃথিবীতে রাজশক্তি নিয়ে দাঁড়াতে না পারে। ভারতবর্ষ ত্যাগ করার প্রাক্কালে পশ্চিমাদের ঐ কূটনীতি বিশেষভাবে কাজ করেছিল। এ লক্ষ্যেই ইংরেজরা উপমহাদেশে অবস্থিত মুসলিম শক্তিকে বিভক্তির মাধ্যমে দ্বিখন্ডিত বরং ত্রিখন্ডিত করে সম্পূর্ণ দুর্বল করে দিয়ে যায়।

দেশী নেতৃবৃন্দের মধ্যে লীগ নেতারা পূর্ব থেকেই বিভক্তির দাবি পেশ করে আসছেন। লীগ নেতাদের কাছে মুসলিম গণমানুষের স্বার্থ চিন্তার চেয়ে নিজেদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ও মন্ত্রীত্ব অর্জনের চিন্তা ছিল বেশি। ইংরেজ আশীর্বাদের ভিত্তিতেই লীগের জন্ম। তারপর লীগের সকল রাজনীতি ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে ওঠে। এমতাবস্থায়, ইংরেজরা চলে যাওয়ার পর দেশে গণতন্ত্রের চর্চা শুরু হলে এবং নেতৃত্ব লাভের বিষয়টি গণতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর ন্যস্ত হলে তাদের নেতৃত্ব অর্জন করা হবে অনেকটা সুকঠিন ব্যাপার। এ কারণে লীগ গোড়া থেকেই সম্প্রদায় ভিত্তিক পৃথক নির্বাচন ও পৃথক ভূখন্ডের জোর তদবির চালিয়ে আসে।

কংগ্রেস নেতারা অবিভক্তির পক্ষে ছিলেন। তাদের এই অবিভক্তির চিন্তা মুসলিম স্বার্থ রক্ষার তাগিদে ছিল না। বিভক্তির কারণে রাজনৈতিকভাবে ভারত দুর্বল হবে এ আশংকায় কংগ্রেস বিভক্তিকে অপছন্দ করতো। অবশ্য কংগ্রেসের কিছু নেতা মানবতাবাদী ছিলেননা। তাদেরই চক্রান্তের কারণে মাওলানা আযাদ সহ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হন। কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক গ্রুপটি জওহরলাল ও গান্ধীকে প্রলোভিত করেছিল।[১৭১] ভারত বিভক্তির সবচেয়ে কট্টর বিরোধী ছিলেন বিপ্লবী উলামায়ে কেরাম। এই উলামা যারা নিজেদের নেতৃত্ব বা মন্ত্রীত্বের রাজনীতি করেননি। যারা ভারতীয় গণমানুষের জন্য নিরলসভাবে শতাব্দীকাল থেকে লড়াই করে আসছেন তারা ভারতের বিভক্তিকে ভারতীয়দের জন্য বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর বিবেচনা করেন। তাদের বিশ্বাস ছিল বিভক্তির ফলে এ উপমহাদশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ স্থায়ী আসন গেড়ে নিবে। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল থেকে জিহাদকারী মুসলিম বিপ্লবী গোষ্ঠীটি খন্ডিত হয়ে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তারা আরও উপলব্ধি করেন যে, ভারতকে বিভক্ত করার এ চক্রান্তটি বস্তুতঃ বৃটেন থেকে সরবরাহকৃত। এশিয়ার উপর কূটনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ব্রিটিশরা ভারতকে বিভক্ত করেছে। কাজেই যে ব্রিটিশকে এশিয়া থেকে উৎখাতের জন্য উলামাগণ জীবনব্যাপী সংগ্রাম করে আসছেন, বিভক্তির মাধ্যমে

[১৭১] ভবানী প্রসাদ চট্টোপাধ্যয়, *দেশ বিভাগ পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৯৩), পৃ. ১০১-১০৩।

সেই বৃটিশের হাতেই সেই এশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে। এটা তারা মেনে নিতে পারেননি। সবচেয়ে বড় কথা, তারা পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, ন্যায্য বিভক্তি তো হবেই না, তথাপিও বিভক্তির নামে দাঙ্গা ও রক্তক্ষয়ের যেই সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব হবে সেটি প্রতিরোধের কোন উপায় থাকবে না। তারপর যারা পাকিস্তানের ভূখণ্ডে হিজরত করে যাবে তারা সেখানে গিয়েও বিদেশী নাগরিক (মুহাজির) হয়ে থাকবে আর যারা নিরুপায় হয়ে ভারতের মূল ভূখণ্ডে রয়ে যাবে তারা সংখ্যালঘু হিসেবে আজীবন নিস্পেষিত জীবনযাপনে বাধ্য হবে। বিভক্তির কারণে ভারত ভূখণ্ডে হাজার হাজার বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত সকল ঐতিহ্য তথা মসজিদ, মাদ্রাসা, গোরস্থান, ওয়াক্ফ সম্পত্তি সবকিছু হিন্দুদের হাতে বিধ্বস্ত হবে।[১৭২] কোন ভূ-খণ্ডে এহেন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়া শরিয়তের দৃষ্টিতে বৈধ নয়। এসব কারণে বিপ্লবী উলামাগণ খন্ডন ও দেশ বিভক্তির বিরোধিতা করেন।[১৭৩]

৬.৪১ ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বিপ্লবী আলিম ও স্বাধীনতাকামীদের সমন্বয়ে জোট গঠন ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা

১৯৪৬ সালের নির্বাচনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় মুসলমানদের নিজেদেরই দুটি দলের মধ্যে। কারণ, এটি ছিল সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত নির্বাচন। অর্থাৎ, ভোট প্রয়োগের দ্বারা মুসলমানগণ মুসলমান প্রতিনিধি ও হিন্দুরা হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচন করে দেবে। নির্বাচনে অবিভক্তির সমর্থক, কংগ্রেস বহু কেন্দ্রে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পাশ করে। আবার কোথাও প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলেও সেটি ছিল নামে মাত্র। পক্ষান্তরে, মুসলিম শিবির ছিল দুটি শিবিরে বিভক্ত। একদিকে জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী উলামা; এরা অবিভক্তির সমর্থক এবং অবিভক্তির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। অপরদিকে ইংরেজদের আনুকূল্যভোগী লীগ নেতৃবৃন্দ; এরা বিভক্তির সমর্থক এবং বিভক্তির জন্যই কাজ করে যাচ্ছেন। নির্বাচনে আরও একটি বিষয় ছিল যে, ভোটে মুসলমানদের যে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করবে সেটি তাদের প্রধান প্রতিনিধিত্বকারী দল হিসেবে গণ্য হবে এবং সেই দলের রায় অনুসারে ভারতের বিভক্তি বা অবিভক্তি সংক্রান্ত ভাগ্য নির্ধারণ করা হবে।[১৭৪]

এ উপলক্ষে আলিমগণ মুসলমানদের বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী দলগুলির সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য জোটের উদ্যোগে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিস, অল ইন্ডিয়া মজলিসে আহরার, অল ইন্ডিয়া মুমিন কনফারেন্স, ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি বিহার, কৃষকপ্রজা পার্টি বঙ্গদেশ, খোদায়ী খেদমতগার, সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জোটের সভাপতি মনোনীত হন শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী।[১৭৫]

[১৭২] মুশতাক আহমেদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, পৃ. ৮৮-৮৯।
[১৭৩] নাজমুদ্দীন ইসলাহী, *সীরাতে শায়খুল ইসলাম* (দেওবন্দ: মাকতাবা দীনিয়্যা, ১৯৯৩), পৃ. ৩২৭।
[১৭৪] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৬।
[১৭৫] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *উলামায়ে হক*, ২য় খন্ড (দিল্লী: আল জমইয়াত বুক ডিপো., ১৯৪৪), পৃ. ২৯১।

নির্বাচনে মুসলিম লীগ উপমহাদেশের মুসলিম সমাজে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শন ও নিজেদেরকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্বকারী প্রধান রাজনৈতিক দল প্রমাণে সর্বময় চেষ্টা নিয়োজিত করে। লীগ এ উদ্দেশ্যে সর্বপ্রকার রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করে। এ নির্বাচনে লীগ রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মানুষের ধর্মানুভূতিকে ব্যবহার করে। প্রতারণামূলকভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার এবং বিপ্লবী আলিমদেরকে ভয়ানকভাবে অপমানিত করে।[১৭৬] নির্বাচনে লীগের প্রধান সমস্যা ছিল বিপ্লবী আলিমদের সমর্থনহীনতা। এ সমস্যার কারণে ইতিপূর্বে ১৯৩৭ সালে লীগ আলিমদের সাথে ঐক্য স্থাপনে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু, কালক্রমে আলিমগণ লীগ থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে লীগ পুনরায় একই সমস্যায় পতিত হয়।

৬.৪২ জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ও মুসলিম লীগের স্বার্থ হাসিল

একটি অনাকাঙ্খিত ঘটনার মধ্য দিয়ে দেওবন্দী উলামাদের মধ্যে ফাটলের সূত্রপাত হয় যা পরবর্তীতে ভাঙ্গনে রূপ নেয়। কেননা, আলিমদেরই একটি দল বিভিন্ন কারণে দারুল উলুম দেওবন্দ থেকে বহিস্কৃত হয়ে লীগ রাজনীতির সাথে যোগ দেন।[১৭৭] শায়খুল ইসলাম জেলে বন্দী থাকাকালীন সময়ে দারুল উলুমে তার সমর্থক ছাত্রবৃন্দ সরকারের বিরুদ্ধে মিটিং-মিছিল ও প্রতিবাদ সভা করে। সরকার পূর্ব হতেই আলিম শ্রেণীর ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। এই ছুতোয় তারা দারুল উলুমের উপর চাপ প্রয়োগ করে এবং তাদের জবাবদিহি তলব করে। যেহেতু, দারুল উলুম বাহ্যিকভাবে রাজনীতি মুক্ত ছিল একারণে এ ঘটনা তাদের বিব্রতকর পরিস্থিতিতে ফেলে। এ সুযোগে কুতুবখানার দায়িত্বশীল মাওলানা মুহাম্মদ তাহিরের নেতৃত্বে মাদ্রাসার প্রশাসন বিভাগ ও মজলিশে শূরার কিছু প্রভাবশালী নেতৃবৃন্দ শায়খুল ইসলাম ও তার সমর্থক ৮০ জন ছাত্রকে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত নেন। শায়খুল ইসলাম জেল হতে দারুল উলুমের মুহতামিম ও ও সদরে মুহতামিমকে চিঠি লিখে এ সিদ্ধান্ত হতে সরে আসার জন্য অনুনয় করেন।

পরবর্তীতে মজলিশে শূরা এ বিষয়ে সভা আহবান করে পরিস্থিতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করে দেখতে পায় যে, মূল ব্যাপারটি মুহতামিম ও সদরে মুহতামিমের মধ্যেই আবর্তিত। তারা মুহতামিমের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে সদরে মুহতামিম পদটি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত নিলে সদরে মুহতামিম মাওলানা শাব্বীর আহমেদ উসমানী, মুফতী মুহাম্মদ শফীসহ আরো কয়েকজন শিক্ষক ক্ষুব্ধ হন এবং ইস্তফা দিয়ে দারুল উলুম ত্যাগ করেন।[১৭৮] মাওলানা উসমানী দেওবন্দ থেকে সরে পড়লে লীগ নেতারা তার প্রতি বিশেষভাবে মনযোগী হন। তারা দারুল উলুম থেকে তার পদচ্যুতির জন্য কংগ্রেস ও শায়খুল ইসলামকে দায়ী করেন এবং তাদের বিরুদ্ধে উসকানি দিতে থাকেন। ঘটনার প্রতিকারের জন্য মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ মাওলানা উসমানীকে সভাপতি করে জমইয়্যাতে উলামায়ে হিন্দের বিপরীতে জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম শিরোনামে লীগ সমর্থক আলিমদের একটি

---

[১৭৬] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।
[১৭৭] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬১।
[১৭৮] কাযী মুহাম্মদ যাহিদ, *চেরাগে মুহাম্মদ*, মুহিউদ্দীন খান (অনু.) (ঢাকা: জামেয়া হুসাইনিয়া আরজাবাদ, ১৯৯৮), পৃ. ৩৫৫-৩৫৬।

রাজনৈতিক দল গঠনের প্রস্তাব করেন। এসব ঘটনা সংঘটনের সময় শায়খুল ইসলাম জেলখানায় বন্দী ছিলেন। এতদসত্ত্বেও বিপ্লবী আলিমদের যারা জেলের বাইরে ছিলেন তাদের মধ্যে মাওলানা হিফজুর রহমান, মুফতী আতিকুর রহমান, মুফতী কিফায়াতউল্লাহ, মাওলানা আহমাদ সাঈদ প্রমুখ নেতা উসমানীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তারা মাওলানাকে জমইয়াত বিভক্ত না করার পরামর্শ দেন।

মাওলানা উসমানী তখন যদিও সাক্ষাতকারী আলিমদেরকে এ কথা বলে আশ্বস্ত করেন যে, তিনি এখন পর্যন্ত লীগ সমর্থক জমইয়াতের নেতৃত্ব গ্রহণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তবুও তার কাছে লীগ নেতাদের ক্রমাগত আনাগোনা, জোর তদবীর ও বিভিন্ন চমকপ্রদ আশ্বাস প্রদানের কারণে দোদুল্যমানতা অব্যাহত থাকেনি। শায়খুল ইসলাম জেল থেকে বের হওয়ার আগেই আলিমদের নতুন দল জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হয় এবং মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী ঐ জমইয়াতের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে লীগের সমর্থনে কাজ করতে শুরু করেন।[১৭৯]

পুরাতন জমইয়াতের ভাঙন ও নতুন জমইয়াত গঠনের দ্বারা অবচেয়ে বেশি উপকৃত হয় মুসলিম লীগ। কারণ, নির্বাচন উপলক্ষে আলিমদের সমর্থনহীনতার যে সমস্যা লীগের ছিল, জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম গঠিত হওয়ার দ্বারা সে সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পক্ষান্তরে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের বিপ্লবী আলিমগণ যারা স্বাধীনতা ও আযাদীর জন্য জীবনভর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছেন। জিন্নাহর পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারত বিভক্তির পর পাকিস্তান ভূ-খণ্ডের শাসনতন্ত্র হবে ধর্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। মুসলমানদের হুকুমতে ইলাহীর সাথে পাকিস্তানের কোন সম্পর্ক থাকবে না। হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে প্রত্যেকেই নিজ নিজ এলাকা থেকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করে পাঠাবে। আর ঐ প্রতিনিধি দ্বারা আইন পরিষদ ও মন্ত্রী পরিষদ গঠিত হবে। কিন্তু, নির্বাচনের প্রাক্কালে লীগ নেতারা জমইয়াতে উলামায়ে ইসলাম ও ধর্মপ্রাণ সাধারণ মুসলমানদের সমর্থন লাভের জন্য প্রতারণামূলক প্রচারণা চালায়। তারা ঘোষণা দেয় যে, গঠিতব্য পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমাত কায়েম হবে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে। সেখানে মদীনার ইসলামী সরকারের এক নতুন সংস্করণ প্রতিষ্ঠা করা হবে ইত্যাদি বলে ধুম্রজালের সৃষ্টি করে। ফলে, বহু উলামা মাশায়েখ, শিক্ষাবিদ, ছাত্রজনতা এ জালে আবদ্ধ হন। ধর্মীয় আবেগের আতিশয্য তাদেরকে লীগ নেতাদের বক্তব্য গভীরভাবে তলিয়ে দেখার সুযোগ দেয়নি।

৬.৪৩ পাকিস্তান সৃষ্টির পক্ষে জমইয়াতে উলামায়ে ইসলামের প্রচারণা

জমইয়াতে উলামায়ে ইসলামের অন্যতম নেতা মাওলানা জাফর আহমাদ থানভী ২৬ এপ্রিল এক নির্বাচনী সভায় বলেন, বর্তমান অবস্থায় গোটা ভারতে যেহেতু ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয় সেহেতু আপাতত যেসব সুবায় মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতা আছে সেসব সুবায় ইসলামী নীতিমালায় সরকার গঠনের চেষ্টা করা উচিত।

[১৭৯] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬১।

শরীয়াতের দৃষ্টিতে এটা জরুরীও বটে। প্রিয় নবী মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার ঘটনা এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মক্কায় ইসলামী শাসন ও ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব ছিল বিধায় তিনি হিজরত করে মুসলমানদের নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ করেন। তারপর ঐ কেন্দ্র থেকে ইসলামের যে উন্নতি ও অগ্রগতি সাধিত হয় তা সকলের কাছে সুস্পষ্ট। এখানে আশ্চর্যের কি থাকতে পারে যে, পাকিস্তান থেকেও ইসলামের অগ্রগতি সাধিত হবে এবং এটি মুসলিম উম্মাহর নতুন বিজয় অর্জনের সোপানে পরিণত হবে।[১৮০]

অনুরূপ ৩রা নভেম্বর জমইয়াতে উলামায়ে ইসলামের সভাপতি মাওলানা উসমানী কলকাতার ভাষণে বলেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হল আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এর অগ্রযাত্রা সবশেষে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মহান রাব্বুল আলামিনের প্রদত্ত ন্যায় নীতির শাসন প্রতিষ্ঠায় গিয়ে শেষ হবে। উপরোক্ত বক্তৃতা ও বিবৃতি থেকে আলিমদের নিয়াতের স্বচ্ছতা ও পবিত্রতা অনুধাবন করা যায়। এই উলামাবৃন্দ ইতিপূর্বে স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে খুব বেশি জড়িত ছিলেন না। তাদের মধ্যে অনেকে এমন ছিলেন যারা মুসলমানদের সক্রিয় রাজনীতি করার বৈধতা সম্বন্ধেও সংশয়ে ছিলেন। তারা পূর্বে আপন গৃহের নিরাপদ কোণে ইবাদাত ও বন্দেগীর কাজেই মশগুল ছিলেন। লীগ নেতাদের আমন্ত্রণ পেয়ে হঠাৎ মঞ্চে আসেন এবং রাজনৈতিক জটিল মূহুর্তে প্রায় মধ্য পথ হতেই মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। নিজেদের অনভিজ্ঞতার দরুন লীগ নেতারা তাদেরকে প্রতারিত করে। অবশেষে পাকিস্তান হওয়ার পর বাস্তবে ইসলামী হুকুমত না পেয়ে তারা আন্তরিকভাবে দুঃখিত ও লজ্জিত হন।

৬.৪৪ মুসলমানদের বিভক্তি রোধে শায়খুল ইসলাম মাদানীর আহবান

১৯৪৬ সালের নির্বাচন চলাকালে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভাপতি শায়খুল ইসলাম মাদানী অত্যন্ত দরদের সাথে মুসলমানদেরকে বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, মুসলমানগণ বিভক্ত না হয়ে ঐক্যবদ্ধ থাকার মধ্যেই রয়েছে অধিকতর কল্যাণ। ভারত বর্ষে তৎকালীন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১০ কোটি। ঐক্যবদ্ধ থাকলে এই ১০ কোটি জনসমষ্টি ভারতের একটি শক্তিশালী দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তারা নিজেদের যথার্থ অধিকার আদায়ে সক্ষমতা লাভ করবে। ১০ কোটি জনসমষ্টিকে কোথাও ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে দেয়া সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, নিজেরা বিভক্ত হয়ে যাওয়ার অর্থ হল মুসলিম শক্তিকে খন্ডিত ও দুর্বল করে দেয়া। এই বিভক্তির পরিণাম হল মুসলিম শক্তিটির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের হাতে আজীবন গোলাম হয়ে থাকা। বিভক্তির দরুন ভারতের মূল ভূ-খন্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ার নিশ্চিত সম্ভাবনা বিদ্যমান। সাহারানপুর থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূখন্ডের সর্বত্র মুসলমানরা বসবাস করছেন, এখানে রয়েছে তাদের বড় বড় বহু ধর্মীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাজার হাজার মাদরাসা, লক্ষ লক্ষ মসজিদ, অসংখ্য মাজার ও খানকা। বিভক্তির কারণে এসব ধর্মীয় আমানত বিধ্বস্ত হয়ে যাবে। এ বিভক্তির অর্থ দাঁড়াবে, মুসলমানরা

---

[১৮০] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪।

বিগত কয়েক শতাব্দীর চেষ্টায় ভারতে যে সভ্যতা ও সংস্কৃতির গোড়াপত্তন করেছিল, এক মুহূর্তের মধ্যে সেটি ধ্বংস করে দেয়া। পাকিস্তানের নামে খন্ডিত যে অংশ মুসলমানদের জন্য নির্ধারণ করা হচ্ছে সেখানে ভারতের অবশিষ্ট ৩ কোটি মুসলমানের হিজরত করে যাওয়া একটি অসম্ভব ব্যাপার। ফলে, ৩ কোটি মুসলমান বাধ্য হয়ে নিজেদের বাসভূমিতে থেকে যাবে এবং আজীবন অবহেলিত, দুর্বল ও সংখ্যালঘু হিসেবে বসবাস করবে। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের সমাজে তাদের মানবেতর জীবন যাপন করা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকবেনা।

শায়খুল ইসলাম বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী সরকার গঠনের নামে বর্তমানে যেসব আশ্বাস দেয়া হচ্ছে সেগুলোর কোন সারবত্তা নেই। এগুলো বাকচাতুর্য ছাড়া আর কিছু নয়। আর ইসলামী হুকুমত ছাড়া অন্যান্য যেসব সুযোগ সুবিধার কথা শোনানো হচ্ছে সেগুলো মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবায় আপনাআপনিই বিদ্যমান থাকবে। কোন শক্তিই এসব সুবিধা থেকে বঞ্চিত রাখতে পারবে না। কিন্তু, পাকিস্তান যেসব এলাকায় রয়েছে সেসব এলাকার বাইরেও মুসলমানরা রয়েছেন। তাদের সংখ্যাও কম নয়। এমতাবস্থায় জেনেশুনে ৩ কোটি মুসলমানকে কুরবানির জন্তুতে পরিণত করা ইতিহাসের নির্মম আচরণ ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি বলেন, পাকিস্তানে ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠার নাম দিয়ে তোমাদের কাছ থেকে শুধু ভোট আদায় করে নেয়া হচ্ছে। নির্বাচন শেষ হয়ে গেলে তোমরা তখন এ কথা নিয়ে তাদের কাছে পৌঁছতেও পারবে না। ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠায় লীগ আন্তরিক হয়ে থাকলে দলটির নেতৃত্বে থাকতেন আলিমরা। তখন এর নেতৃত্বে এমন সব লোকদেরকেই পাওয়া যেত যাদের জীবনের সবকিছু ইসলামী অনুশাসন পালনে পরিপূর্ণ।

উল্লেখ্য যাদের জীবনধারায় ইসলাম পালনের সামান্য ছোঁয়াও নেই তাদেরকে হযরত আবু বকর ও ওমর (রাঃ) এর আসনে অধিষ্ঠিত করা নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। বরং, ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার বিষয়টি সুনিশ্চিত জেনে কায়েমী স্বার্থবাদী তথা পুঁজিপতি, জায়গীরদার ও ইংরেজদের তাবেদার শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের ও সন্তানদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন করার ধান্দায় ইসলাম ও খিলাফতে রাশিদার নাম উচ্চারণ করে তোমাদেরকে প্রতারিত করতে চায়। ইসলামী হুকুমতের মত একটি সুমহান কাজ সম্পাদনের মাধ্যমে নিজেদের চিরাচরিত ভোগ বিলাসের জীবন উৎসর্গ করার মত ঈমান তাদের আদৌ নেই। কাজেই, হে ভারতবাসী! আল্লাহর ওয়াস্তে ভেবে চিনতে কাজ করবে। বিভক্তির পরিণামে ইউপি, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, হায়দারাবাদ, দিল্লী প্রভৃতি এলাকার কোটি কোটি মুসলমানের উপর অচিরেই কিয়ামাত নেমে আসবে। তখন তোমাদের আহাজারি শোনার মত কোন লোক থাকবে না। পাকিস্তান নামে তোমাদের এই দেশ তোমাদেরই ভাগ্য বিনষ্ট করবে, তোমাদেরই উপর বিপদ নিয়ে আসবে।[১৮১] এদিক মুসলিম লীগের সমর্থক আলিমরা পাকিস্তান ও ইসলামী হুকুমাত অর্জনের লক্ষ্যে সাধারণ মানুষের কাছে মুসলিম ইতিহাসের বিভিন্ন জযবা ও আবেগময় ঘটনা তুলে ধরেন। তারা সাহাবায়ে কেরামের জিহাদী প্রেরণা, কুরবাণী, ত্যাগ ও তিতিক্ষার ঘটনাবলী তুলে ধরে মুসলমানদের মনে এক অদ্ভুত

[১৮১] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩০২।

উন্মাদনার উদ্রেক করে বলেন, প্রিয়নবী নিজ জন্মভূমি মক্কায় যখন ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা দেখলেন না তখন হিজরত করে চলে যান মদীনায়। তারপর মদীনায় ইসলামের শক্তি অর্জিত হলে তিনি মক্কাও জয় করে নেন। আজ আমরাও একটি ইসলামী সরকার গঠন করতে চাই। আমাদের কাঙ্ক্ষিত এ সরকার হবে কুরআনী সরকার। এখানে খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে হদ ও কিসাস চালু হবে। এভাবে পাকিস্তান নিজের কাঙ্ক্ষিত শক্তি অর্জন করলে একদিন ভারতও আমাদের করায়ত্ব হয়ে যাবে। যদি ঐ পর্যন্ত আমরা না যেতে পারি তাহলে সাহাবীগণ যেভাবে দারুল কুফর থেকে দারুল ইসলামে চলে গিয়েছিলেন, আমরা ভারতীয় ৩ কোটি মুসলমান হিজরত করে পাকিস্তানে চলে যাব।

লীগপন্থী আলিমরা আরও বুঝিয়েছিলেন যে, ভারতের হিন্দুরা এই উপমহাদেশের কোথাও ইসলামী সরকার গঠিত হোক সেটা আদৌ চায় না। আর এ কারণেই কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ পাকিস্তানের সৃষ্টি কিংবা ভারত বিভক্তির প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত নন। কংগ্রেস সমর্থনকারী নেতৃবৃন্দকে কটাক্ষ করে লীগপন্থী আলিমরা বলেন, যারা নিজেদেরকে মুসলমান দাবি করা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সাথে সুর মিলিয়ে কথা বলে, তারা বস্তুত নিজেদের ঈমান হিন্দুদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তারা কংগ্রেসের এজেন্ট, হিন্দুদের বেতনভুক্ত দালাল। কাজেই তোমাদের একেকটি ভোট মুসলিম লীগকে প্রদান করে একথার স্বাক্ষর রাখতে হবে যে, উপমহাদেশের মুসলমানরা আজো ইসলামের জন্য নিজেদের সব কিছু উৎসর্গ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[১৮২] ঐ আলিমদের এমন জ্বালাময়ী বক্তব্যে সাধারণ মুসলমানদের মনে যে ধারণার জন্ম নিল যে, উপমহাদেশে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বস্তুতঃ ঈমান ও কুফরের যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। এ যুদ্ধে একজন মুসলমান হিসেবে প্রত্যেককে মুসলিম লীগকে সমর্থন করা এবং ইসলামী ফৌজে অংশগ্রহণ করে কুফরকে পরাস্ত করা অবশ্য কর্তব্য। উল্লেখ্য, এই বক্তব্য ও অনুভূতি ঈমানী শক্তিতে পরিণত হয়ে মুসলিম যুবকদের মাঝে এক অপূর্ব নেশার জন্ম দেয়। বড় বড় মুফতীদের দেয়া ফতওয়া অনুসারে ঐ যুবকরা নিজেদেরকে ইসলামী ফৌজেরই একজন সিপাহী ও মুজাহিদ হিসেবে মনে করতে থাকে।

৬.৪৫ বিপ্লবী আলিমদের উপর মুসলিম লীগ পন্থীদের নির্যাতন

নির্বাচন যুদ্ধের এই মোকাবেলা যেহেতু সরাসরি হিন্দুদের সাথে ছিল না বরং মোকাবেলা ছিল জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ, মজলিশে আহরার ও দেশপ্রেমিক বিপ্লবী আলিমদের সাথে সেহেতু, লীগবাহিনীর সকল ক্রোধ গিয়ে পড়ে সেসব আলিমদেরই উপর। ফলে, লীগবাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা বিপ্লবী আলিমদেরকে বাক্যবাণে ও শারিরীকভাবে বিভিন্ন স্থানে অপমান-অপদস্থ করতে থাকে। বস্তুতঃ নির্বাচনের আগে সমগ্র উপমহাদেশ একটি যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। এ যুদ্ধ মুসলমানদের নিজেদেরই যুদ্ধ। যুদ্ধের একদিকে যেমন ছিলেন চিরবিপ্লবী ও সংগ্রামী আলিমগণ আর অপরদিকে ছিলেন ইংরেজ পোষ্য লীগের নেতৃবৃন্দ। এ যুদ্ধে দেশপ্রেমিক বিপ্লবী

---

[১৮২] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৯৭।

আলিমদের জন্য সমগ্র উপমহাদেশকে এক জ্বলন্ত অগ্নিকুন্ডে পরিণত করে দেয়া হয়। আলিমদের পেছনে যত্রতত্র গুন্ডাবাহিনী লেলিয়ে দেয়।[১৮৩] জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের কোন নেতা ঐ গুন্ডাবাহিনীর হাত থেকে রেহাই পাননি। শায়খুল ইসলামকে খুন করার চেষ্টা করা হয়। মাওলানা আবুল কালাম আযাদের উপরেও আক্রমণ চলে। আব্দুর রাজ্জাক মালিহাবাদীকে গুন্ডারা আহত করে। মাওলানা নাসির ফয়যাবাদী ছুরিকাহত হন। সবচেয়ে কঠিন নিপীড়নের মুখে পড়েন শায়খুল ইসলাম নিজে। তাকে অশ্লীল গালি-গালাজ, বিদ্রুপ, কটূক্তি, স্লোগান হতে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে শারিরীক লাঞ্ছনার ও শিকার হতে হয়।

আশ্চর্যের ব্যাপার যে, এসব অশ্লীল আচরণ পাকিস্তান কায়েম, ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা ও জিহাদের পবিত্র দায়িত্ব পালনের শিরোনামে করা হয়েছিল। আরও আশ্চর্যের বিষয় ছিল- এতসব অপমান ও অপদস্ত করেও শায়খুল ইসলামকে নিজের অবিচলতা থেকে বিন্দুমাত্রও হটানো সম্ভব হয়নি। বস্তুতঃ লীগ নেতারা নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ধর্ম তথা ইসলামকে ব্যবহার করেছিল। তারা মানুষের ধর্মানুভূতিকে এমন সুকৌশলে নিজ স্বার্থ উদ্ধারের কাজে লাগিয়েছিলেন যে, সেখান থেকে সাধারণ মুসলিমরা নিস্কৃতি পাওয়ার চিন্তাও করতে পারেননি। ইসলামী হুকুমাত প্রতিষ্ঠার ঐ ধুম্রজাল সকলকে অন্ধ বানিয়ে দিয়েছিল।[১৮৪]

৬.৪৬ মন্ত্রী মিশন (কেবিনেট মিশন) পরিকল্পনা ও লীগ-কংগ্রেস দ্বন্দ্ব

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস সমগ্র ভারতে সরকার গঠনের উপযুক্ততা অর্জন করে। মুসলিম লীগ একমাত্র বঙ্গদেশ ব্যতিত অন্য কোন সুবায় সরকার গঠনের সক্ষমতা অর্জন করতে পারেনি। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সুবাগুলিতে সরকার গঠন করে কংগ্রেস। সিন্ধু প্রদেশের সরকার গঠনের সুযোগ না থাকায় লীগের পক্ষে সরকার গঠন করা সম্ভব হয়নি। মুসলিম আসনগুলোর মধ্যে লীগ ৮৫% আসন অর্জন করে। ফলে, মুসলমানের প্রতিনিধিত্বকারী একক দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠান হিসেবে লীগের যে দাবি ছিল সেটা অনায়াসেই প্রমাণিত হয়। ঐ বছরের মার্চে স্বাধীনতার রূপরেখা ও পদ্ধতি আলোচনার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রীমিশন ভারতে আগমন করেন। মিশনের সদস্য ছিলেন প্যাথিক লরেন্স, স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ও এ.ভি. আলেকজান্ডার। মন্ত্রীমিশন ১ লা এপ্রিল থেকে সিমলায় কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক শুরু করেন। কিন্তু, কোন মতৈক্যে পৌছা সম্ভব হয়নি। মিশন জমইয়াতে উলামার নেতৃবৃন্দকে আহবান করে। ঐ বৈঠকে মাদানী ফর্মূলা পেশ করলে তারা গভীর আন্তরিকতার সাথে শ্রবণ করেন এবং বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রশ্নোত্তর ও পর্যালোচনা করে যান। ১ মাস যাবত আলোচনা পর্যালোচনার পর রাজনৈতিক দলগুলোর অনৈক্যের কারণে মিশন নিজের পক্ষ থেকে যে পরিকল্পনা পেশ করেছিল তা ছিল মূলতঃ মাদানী ফর্মুলারই ছায়াবিশেষ।[১৮৫] ভারতের বিভক্তি ও পাকিস্তান নামে পৃথক ভূ-

---

[১৮৩] অমলেশ ত্রিপাঠী, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫- ১৯৪৭)* (কলিকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৩), পৃ. ৪৩৮।
[১৮৪] আর রশীদ পত্রিকা, মাদানী ও ইকবাল সংখ্যা, পৃ. ৩১২।
[১৮৫] সাইয়্যিদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪৩।

খন্ড রচনার প্রস্তাব মিশন সদস্যদের কাছে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তাদের দৃষ্টিতে ঐ প্রস্তাবের মধ্যে ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থের গন্ধ রয়েছে। এভাবে পৃথক ও বিভক্ত হওয়ার দ্বারা পাকিস্তান ভূখন্ড নিজ পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু, লীগ নেতারা একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত ছিলনা বিধায় মিশন শেষ পর্যন্ত নিজস্ব পরিকল্পনার ঘোষণা দিতে বাধ্য হয়। কংগ্রেস সেই পরিকল্পনা অনুমোদন করে। মিশন প্রদত্ত পরিকল্পনা সম্পর্কে লীগের কাউন্সিলে ৩ দিন আলোচনা চলে। শেষ দিনে জিন্নাহ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মুসলমানদের সমস্যা সমাধানে এর চেয়ে উত্তম ব্যবস্থা আর কিছু নেই। একারণে, জিন্নাহ লীগ নেতৃবৃন্দকে মিশনের পরিকল্পনা অনুমোদনের পরামর্শ দেন।[১৮৬] এর ফলে বহুদিন পর পুনরায় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে ঐক্যমত্যের পরিবেশ ফিরে আসে। কিন্তু ১৯৪৬ সালের ১০ জুলাই কংগ্রেস নেতা জওহরলাল নেহরু এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস আগ্রহী। কিন্তু তাতে ইংরেজ অথবা আর কারো হস্তক্ষেপ মেনে নিতে কংগ্রেস রাজী নয়।[১৮৭] সংখ্যালঘু হিসেবে মুসলমানদের অভিহিত করায় জিন্নাহ ভীষণ ক্ষুব্ধ হন এবং ঘোষণা দেন, কংগ্রেস সভাপতির মন্তব্যের কারণে লীগ নিজেদের সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করবে। এভাবে মতৈক্যের পরিবেশ পুনরায় ঘোলাটে হয়ে যায়। এর মধ্যে অতিমাত্রায় ধূমপান ও মদ্যপানের কারণে জিন্নাহর শারিরীক অবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে পাকিস্তান তৈরীর জন্য জিন্নাহ আরো অধীর হয়ে ওঠেন। এরই প্রেক্ষিতে তিনি ১৬ই আগস্ট ডাইরেক্ট এ্যাকশনের ঘোষণা দেন। ঐ তারিখে লীগ শাসিত বঙ্গদেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। বিপ্লবী আলিমগণ লীগ সরকারকে ছুটির ঘোষণা প্রত্যাহার করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু, তাদের এ অনুরোধ রক্ষা করা হয়নি। সেই তারিখে ঘটে যায় কলকাতা ও নোয়াখালীর হিন্দু-মুসলিম রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। দাঙ্গার প্রতিবাদে কংগ্রেস শাসিত বিহার সুবায় হিন্দুরাও মুসলমানদেরকে নির্মমভাবে খুন করে। দাঙ্গার আগুন বিহার থেকে দিল্লী এবং ইউপিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কংগ্রেস নেতা প্যাটেল দাঙ্গার সংবাদে প্রচন্ড উত্তেজিত হন। তিনি নিজেও হিন্দুদের পক্ষ হয়ে উত্তর ভারতে মুসলমানদের চ্যালেঞ্জ করেন। কিন্তু, উত্তর ভারতের ঐ সব এলাকায় জমইয়াতে উলামার নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে শায়খুল ইসলাম মাদানী যথাসময়ে পৌছে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে উত্তর ভারত দাঙ্গার রক্তপাত থেকে কোনমতে রক্ষা পায়। উল্লেখ্য ডাইরেক্ট এ্যাকশন অভিযান পরিচালিত হওয়ার পর ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিমের বিভক্তি অনিবার্য হয়ে পড়ে।

এ বিশৃংখল পরিস্থিতির ভিতর ১২ আগস্ট মন্ত্রী মিশনের প্রস্তাব মোতাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠিত হয়। কংগ্রেস ও লীগ উভয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগ দেয়। তাতেও শুরু হয় আবার সেই মন্ত্রীত্বের কোন্দল। অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রণালয় বন্টনেও দেখা দেয় তুমুল প্রতিযোগিতা। মুসলিম লীগ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রণালয়ের জন্য দাবি করে। কিন্তু কংগ্রেস নেতা বল্লভ ভাই প্যাটেল ঐ মন্ত্রণালয় ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই সম্মত নন। অবশেষে বাধ্য

---

[১৮৬] আবুল কালাম আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫০।
[১৮৭] ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২।

হয়ে কংগ্রেস লীগকে অর্থ মন্ত্রণালয় অর্পণ করে। লীগের পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পিত হয় নওয়াবজাদা লিয়াকত আলী খানের উপর। তিনি সুদক্ষ সচিব চৌধুরী মুহাম্মাদ আলীর সহযোগিতায় অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপর নিজের এমন কর্তৃত্ব স্থাপন করেন যে, অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয় এই এক মন্ত্রণালয়ের অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত হয়ে যায়। মাওলানা আযাদ বলেন, টানাপোড়েনে ক্রমে পরিস্থিতি এমন তিক্ততায় পৌছেছিল যে, প্যাটেলের মত নেতাও ভারত ভূ-খন্ডের নিরাপদ অংশ পেয়ে যদি লীগের যন্ত্রণা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় সেটিই পরম প্রাপ্তি বলে বোধ করতে থাকেন।[১৮৮] অন্যদিকে লন্ডনের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভারতকে যথাশীঘ্র বিভক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য ভাইসরয়ের উপর চাপ দিতে থাকে। কিন্তু তৎকালীন ভাইসরয় ওয়াভেল বিভক্তির অনিবার্য জের হিসেবে সাম্প্রদায়িকতা ও সহিংসতার আশংকায় প্রথমে শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা কায়েম করার সুপারিশ করেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার তার মতামত বিবেচনা না করায় তিনি ইস্তফা দিয়ে লন্ডন চলে যান।

৬.৪৭ ভারতের স্বাধীনতা লাভ ও ভারতীয় মুসলমানদের পুনর্বাসনে দেওবন্দ আলিমদের ভূমিকা

১৯৪৭ সালের ২২ শে মার্চ নতুন ভাইসরয় নিযুক্ত হয়ে ভারতে পদার্পণ করেন মাউন্ট ব্যাটেন। বৃটেন তথা ইউরোপীয় স্বার্থ যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে ভারতীয়দের স্বাধীনতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছিল তার আগমনের লক্ষ্য। তিনি অনতিবিলম্বে উপলব্ধি করেন যে, দেশপ্রেমিক ও মানবতাবাদী কয়েকজন শীর্ষনেতাকে সম্মত করা গেলে ভারত বিভক্তির পথে আর কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। ভারত ভূ-খণ্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের জীবন বিপন্ন হওয়ার উদ্যোগকে ঠেকিয়ে রাখার লক্ষ্যে জমইয়াতে উলামার নির্মোহ মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ ছাড়া কেউ অবশিষ্ট ছিলেন না। উল্লেখ্য, পরিস্থিতি এতটুকু পর্যন্ত গড়ালেও বিপ্লবী আলিমগণ নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল ও অবিচল থাকেন। ঐ সময় ১০ মে জমইয়াতের অধিবেশন বসে। নেতৃবৃন্দ তখনও এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ভারতের বিভক্তি ভারতীয়দের জন্য বিশেষ করে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সম্পূর্ণ স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্ত। এটি মানবতাবাদী সিদ্ধান্ত নয়।

শায়খুল ইসলাম মাদানী মানবতাবাদের সমর্থক ছিলেন। তিনি এই মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপরই অবিচল থাকেন। কোন শত্রুতা, বিরুদ্ধাচরণ, আঘাত, তিরস্কার কিংবা নিপীড়ন তাকে মানবতাবাদের পক্ষাবলম্বন থেকে স্খলিত করতে পারেনি। স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষ মুহূর্তে পৌছে যেখানে জওহরলাল ও মহাত্মা গান্ধীও সাম্রাজ্যবাদী কূটনীতির সম্মুখে আত্মসমর্পণ করেছেন, মানবতাবাদের ওই সিংহপুরুষ সেখানে পৌঁছেও নিজ আদর্শের উপর অটল থাকেন। তবে, ভারতবাসীর ভাগ্যে দুর্ভোগ ছিল বলে শেষ পর্যন্ত তার সম্পূর্ণ অসম্মতি সত্ত্বেও ইংরেজরা ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করে দেয়।[১৮৯]

---

[১৮৮] আবুল কালাম আজাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৯৯।

[১৮৯] আসরারুল হক কাসিমী, *আযাদী কী লড়াই মেঁ উলামা কা ইমতিয়াযি রোল* (দিল্লী: শুবা নশর ওয়া ইশায়াত জমইয়াতে উলামা, তা.বি.), পৃ. ২০১-২০৪।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মাউন্ট ব্যাটেন বিভক্তির ঘোষণা দেন। বিশ্ব মানচিত্রে তখন পাকিস্তান ও ভারত নামে দু'টি স্বাধীন দেশ আত্মপ্রকাশ করে। মাউন্ট ব্যাটেনের এই ঘোষণায় ১৮০৩ সাল থেকে বিপ্লবী উলামা স্বাধীনতা ও আযাদীর যে জিহাদ পরিচালনা করে আসছিলেন সেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছালেও তারা যে আঙ্গিকে স্বাধীনতা পেতে চেয়েছিলেন সে আঙ্গিকে প্রদান করা হয়নি। ফলে, পরম আনন্দের ঐ দিবসে অবিভক্ত ভারত বর্ষের প্রায় অর্ধ জনপদের অধিবাসীরা ভয়াবহ নিরাপত্তাহীনতায় পড়ে যায় এবং স্বাধীন ভারতের ভিতরে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমান মূহুর্তের মধ্যে বিদেশী নাগরিকে পরিণত হয়।

তাছাড়া নতুন দুই রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে দীর্ঘ ৬ শত বছরের পৈত্রিক ভিটা মাটি থেকে শুরু করে সর্বপ্রকারের সহায় সম্পত্তি পাই পাই হিসেব করে বন্টনের আবশ্যিকতা দেখা দেয়। বিভক্তির ঘোষণার পর মুসলমানদের যারা সৌভাগ্যক্রমে পাকিস্তান ভুখণ্ডে ছিলেন তারা পরম আনন্দিত ও তৃপ্ত। কিন্তু যারা দুর্ভাগ্যক্রমে ভারত সীমানার মধ্যে ছিলেন তাদের মাথার উপর দুর্যোগের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে। তারা ছিলেন ঐ মুহুর্তে সন্তান-সন্ততি নিয়ে গৃহবন্দি, ক্ষুধার্ত, সাত পুরুষের ভিটায় দাড়িয়েও জীবনের ভয়ে শঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। ফলে, তাদের কেউ হিজরত করে পাকিস্তানে আশ্রয়ের চেষ্টা করে। আবার কেউ অজানার পথে পাড়ি দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে নেন।[১৯০] বন্টনের ঘোষণা অনুযায়ী দুই দেশের চৌহদ্দি চিহ্নিত হলে দুই দেশের সীমান্তে জ্বলে ওঠে সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসার আগুন। পশ্চিমাঞ্চলে পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে হিন্দু ও শিখদের রক্ত হালাল করা হয় আর পূর্বাঞ্চলে ভারত মাতার জয় রব তুলে মুসলমানদেরকে খুন করার জঘন্য কান্ড চলে। নিরাপত্তা বিধানের জন্য পৃথিবীর সকল দেশে পুলিশ ও আর্মি কাজ করে থাকে। কিন্তু, উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক নেতারা ঐ পুলিশ ও আর্মিকেও পেশীশক্তির অংশ হিসেবে গ্রহণ করেছিল।[১৯১]

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, আমার বিশ্বাস সেনাবাহিনী যদি বিভক্ত করা না হত, তাহলে বিভক্তির ঘোষণার অব্যবহিত পরেই রক্তপাতের যে বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল তা হতে পারত না। কিন্তু আমি দুঃখিত যে, আমার সহকর্মীরা আমাকে সাহায্য করেনি। তারা সেনাবাহিনী অবিভক্ত রাখার কঠিন বিরোধিতা করেন। আমার আরো দুঃখ হয় যে, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যিনি একজন শান্তিপ্রিয় ও দয়ালু প্রকৃতির লোক হিসেবে সুপরিচিত, তিনিও সেনাবাহিনী বিভক্তির পক্ষে মত দেন। মাউন্টব্যাটেন আমার কাছে দুঃখ করে বলেছেন, ভারতীয় হিন্দু সৈন্যরা মুসলমানদের নিধনযজ্ঞে অংশগ্রহণের আকাঙ্খী ছিল। ব্রিটিশ অফিসাররা অনেক কষ্টে তাদের প্রতিরোধ করে।[১৯২] দুই দেশের বন্টন উপলক্ষে অসংখ্য লোক স্বদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয় অগণিত মানুষ ভিটাবাড়ী থেকে উচ্ছেদ হয়। প্রায় ১০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। হতাহতের সংখ্যা বর্ণনায় এম জে আকবরের মতটি অধিকতর বিশুদ্ধ। তার মতানুসারে মৃতের সংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষ। আর গৃহহীনে পরিণত লোকের সংখ্যা ছিল ১

---

[১৯০] ফরীদুল ওয়াহীদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬১৮।

[১৯১] আসীর আদরবী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৮।

[১৯২] আবুল কালাম আযাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২০।

লক্ষ। ভারত হতে পাকিস্তানগামী কাফেলার যাত্রাপথের বহু স্থানে খুনীরা চলন্ত গাড়ী থামিয়েও মুসলমানদের উপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল।[১৯৩]

লাহোরেও চলে হিন্দুদের ওপর পৈশাচিক রক্তপাত, অগ্নিসংযোগ ও সম্ভ্রম লুণ্ঠনের হাজার হাজার লোমহর্ষক ঘটনা। লাহোর পুলিশ বিভাগে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বেশী। হিন্দুদের নিরাপত্তা বিধানের প্রতি ঐ পুলিশদের মনেও খুব আকর্ষণ ছিলনা।[১৯৪] বিভক্তির এ ভয়ানক পরিণতির কথা চিন্তা করেই শায়খুল ইসলাম সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করেছিলেন। ১৫ আগস্ট তিনি ছিলেন দেওবন্দে। ভারত ভূ-খন্ডে অবস্থিত ৩ কোটি মুসলমানের মাথায় আসমান ভেঙ্গে পড়লে তিনি তাদেরকে ধৈর্যধারণ করা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির সাহসী মোকাবেলা করার পরামর্শ দেন। দেশ বিভক্তির কারণে জমইয়াতে উলামার শক্তিও বিভক্ত হয়ে পড়ে। শায়খুল ইসলাম জমইয়াতের অবশিষ্ট সদস্যদেরকে একত্রিত করেন। তিনি মাওলানা হিফজুর রহমান, মাওলানা আহমাদ সাঈদ, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান ও মাওলানা মুহাম্মাদ মিয়া প্রমুখকে নিয়ে নতুনভাবে কাজ শুরু করেন। এ আলিমগণ হিংসাত্মক দাবানলের ভিতর ঝাঁপিয়ে পড়ে জীবনকে বাজি করে অভিভাবকহীন মুসলমানদের জীবন রক্ষার্থে এগিয়ে আসেন। তারা মুসলমানদের ধৈর্যের সাথে স্বস্থানে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করা এবং আর এস এস জৈন সিং ও উগ্র হিন্দুদের প্রতিরোধ করার বিস্তারিত কর্মসুচী গ্রহণ করেন। দেওবন্দী আলিমগণ যদি তাৎক্ষণিক ওই কর্মসূচী গ্রহণ না করতেন তাহলে হয়ত গোটা ভারত ভূ-খন্ড মুসলিম শূন্য ভূ-খন্ডে পরিণত হত। শায়খুল ইসলাম ঐ দুর্যোগের ভিতরে দেওবন্দ থেকে সাহারানপুর ও দিল্লী গমন করেন। মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে তিনি জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সরকারি আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বিভাগের প্রতিকারের জন্য তিনি ইউপির মুখ্যমন্ত্রী পন্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পান্থের সাথে বৈঠক করেন। শায়খুল ইসলামের এ ব্যবস্থা গ্রহণের পর সাহারানপুরের প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ লোকদের রদবদল করে দেয়া হয়। ফলে, ক্রমেই শান্তিশৃঙ্খলা ফিরে আসে।

দিল্লী ও অন্যান্য শহরে জমইয়াত নেতৃবৃন্দকে নিয়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ অসহায় মুসলমানদের জন্য সাময়িক আশ্রয় কেন্দ্র ও নিরাপত্তা ক্যাম্প গঠন করেন। মুসলমানদেরকে পাকিস্তান গমন কিংবা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেন। ভারতে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য জমইয়াত নেতৃবৃন্দ প্রাণপণ চেষ্টা করেন। দূর্গত লোকদের সাহায্যার্থে প্রশাসন ও জনগণকে সক্রিয় করার জন্য তারা মহাত্মা গান্ধীর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনিও প্রাণান্তকর চেষ্টায় অবতীর্ণ হন। স্বাধীনতার পর ভারত সরকার দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যারা অনন্য ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের রাজকীয় খেতাবে ভূষিত করেন। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর ত্যাগ-তিতিক্ষার মূল্যায়ন স্বরূপ তাঁকে সর্বোচ্চ খেতাব 'পদ্মভূষণ' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করা হয়। কিন্তু তিনি পার্থিব সম্মানের প্রতি লালায়িত ছিলেননা বিধায় এ উপাধি প্রত্যর্পন করেন। ১৯৫৭ সালে বার্ধক্যজনিত রোগে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর মৃত্যুর সাথে প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী দেওবন্দী উলামাদের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামী অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি ঘটে।

---

[১৯৩] আবুল কালাম আযাদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৭।
[১৯৪] ফরীদুল ওয়াহীদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬২৬।

সপ্তম অধ্যায়

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য ও মূল্যায়ন

৭.১ প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য

৭.১.১ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে মুসলমান ও আলিম সমাজ

ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম উচ্চারিত কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে ওঠে যাদের মধ্য হতে, তারা আর কেউ নন; ভারতের উলামায়ে কেরাম। অর্থ–বিত্তহীন হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী এ উলামায়ে কেরামগণ তৎকালীন সবচেয়ে বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠতে পরোয়া করেননি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (রহঃ) ছিলেন এমন একজন ধর্মীয় চেতনার অগ্রসৈনিক যিনি মুসলমানদের ধ্যান-ধারণার পরিশুদ্ধির চেষ্টা করতেন ও ইংরেজদের বিরুদ্ধে সচেতন করে তুলতেন। তাঁর সুযোগ্য পুত্র শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দীসে দেহলভী (রহঃ) শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলনকে আরো একধাপ অগ্রসর করেন। তিনি ভারতবর্ষকে 'দারুল হারব' ঘোষণা করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আহ্বান জানান। যার ফলে মুসলমানদের উপর ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে একথা ফরয হয়ে যায় যে, হয় তারা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদের ময়দানে নামবে নতুবা হিজরত করে কোন ইসলামী রাষ্ট্রে চলে যাবে। এই ঐতিহাসিক ফতোয়া ভারতবর্ষে মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপরেখা নির্দিষ্ট করে দেয়। শাহ আব্দুল আযীযের পক্ষে এ আন্দোলন পরিচালনা করেন তাঁর সুযোগ্য শিষ্য সাইয়্যেদ আহমদ ব্রেলভী, শাহ ইসমাঈল সহ অন্যান্য আলিমবৃন্দ। তাঁরা নিজেদের 'তরীকায়ে মুহাম্মদীয়া' অনুসারী বলে অভিহিত করেন। এই আলিমদের সমর্থক/অনুসারীবৃন্দ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তৃতি ঘটান। বাংলা প্রদেশে আন্দোলন চালান সাইয়্যেদ আহমদের অনুসারী মীর নিসার আলী যিনি তিতুমীর নামেই সমধিক পরিচিত। ১৮৩০-১৮৩১ সালে বাংলায় সংঘটিত তিতুমীরের এই ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বদলে জমিদার বিরোধী বাংলার প্রথম প্রজা বিদ্রোহ বলে অভিহিত করা হলেও এটি ছিল প্রকৃত পক্ষে জমিদার বিরোধী ভূমিকায় ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদ ও তিতুমীরের লক্ষ্য ছিল অভিন্ন, অর্থাৎ জমিদাররা ছিলেন ইংরেজদের প্রতিভূ, তাই জমিদারবিরোধী আন্দোলনের অর্থই হচ্ছে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন। তিতুমীরের আন্দোলনের পাশাপাশি সমসাময়িক কালে আরেকটি আন্দোলন প্রজাবিদ্রোহের রূপ লাভ করেছিল, তা হল হাজী শরীয়তুল্লাহ'র ফরায়েজী আন্দোলন। এ আন্দোলন সরকারের দমন নিপীড়নের শিকার হলেও এর স্থায়ীত্ব সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত ছিল। এভাবে দেখা যায় যে, ১৮৫৭ সালে হিন্দু মুসলিম যৌথ অংশগ্রহণে সিপাহী বিদ্রোহের পূর্বে যতগুলো ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয়েছে তার নেতৃত্বও পথ প্রদর্শনের ভূমিকার পুরোভাগে ছিলেন আলেম শ্রেণী তথা ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ।

১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ সমাপ্তির পর তৎকালীন ব্রিটিশ ভাইসরয় তার মন্ত্রী ও উপদেষ্টাদের একটি রিপোর্ট প্রস্তুত করতে বলেন যার মাধ্যমে তারা যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ভারতে ব্রিটিশ দখলদারিত্ব আরো অটুট ও সুদৃঢ় রাখতে পারবেন। ভারতে অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক ডঃ উইলিয়াম ইউর ভাইসরয়ের কাছে যে রিপোর্ট পেশ

করেন তার বক্তব্য ছিল এরকম:-“ভারতের সমগ্র জনগণের মধ্যে মুসলমানরা সবচেয়ে বেশী তেজস্বী ও সতর্ক। স্বাধীনতার যে লড়াই হয়েছে তা প্রধানতঃ মুসলমানদের দ্বারাই সংঘটিত হয়েছে। যতদিন মুসলমানরা জিহাদের চেতনা অন্তরে লালন করবে, ততদিন আমরা আমাদের শাসন তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারব না। এজন্য প্রথমেই তাদের এই চেতনাকে বিনষ্ট করা অবশ্য কর্তব্য। আর মাত্র একটি উপায়েই এ লক্ষ্য অর্জন করা যেতে পারে, তা হল উলামা শ্রেণী ও কুরআনকে সমূলে উৎপাটিত করা” ।[১]

৭.১.২ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পত্র-পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে প্রতিহত করার প্রয়াস

ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর এখানকার মধ্যযুগীয় ভারতীয় সংস্কৃতিতে পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় গোঁড়া সংস্কৃতির তুলনায় ছিল অনেক বেশী উদারপন্থী ও খোলামেলা। ইংরেজগণ কর্তৃক ভারতে শাসন প্রতিষ্ঠার পর ভাগ্যানুসন্ধানে যেমন আরও ইংরেজরা ব্রিটেন হতে ভারতে পাড়ি জমায়, তেমনি তাদের সাথে ভারতে আগমন ঘটে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিরও যা যুব সমাজকে খুব সহজেই প্রভাবিত করে ফেলে। পূর্ব হতেই ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তথা মাদ্রাসা গুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এবং ধর্মীয় শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করায় ইসলামের চর্চা হ্রাস পাচ্ছিল। মাদ্রাসা মক্তবগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মুসলিম পরিবারের সন্তানরা শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যেত সেগুলোতে চলত ইসলাম ধর্মের বিভিন্ন বিয়য়ে ব্যঙ্গ-কটুক্তি এবং খ্রিষ্ট ধর্মের মহিমার খোলামেলা প্রচারণা। খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারকরা স্কুল-কলেজ ছাড়াও হাটে-ময়দানে খ্রিষ্টধর্মের প্রচারণা চালাতেন। তাদের প্রচারণার ফলে যুব সম্প্রদায়ের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। ধর্মকে তারা “প্রাচীনপন্থী” মনে করতে থাকে। এহেন পরিস্থিতিতে মুসলমানদের পক্ষে তাদের ঈমান-আকীদা টিকিয়ে রাখা ছিল অত্যন্ত দুস্কর।

এই মৌলিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেওবন্দের শহরের ছয়জন বরেণ্য ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব দীর্ঘ চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শের পর সশস্ত্র সংগ্রামের ধারা আপাততঃ স্থগিত রেখে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যা গুলোকে সামনে রেখে উপনিবেশবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের বলিষ্ঠ চেতনায় উজ্জীবিত ও ঈমানী শক্তিতে উদ্দীপ্ত একদল আত্মত্যাগী সৈনিক তৈরির সুমহান অভীষ্ট নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দারুল উলূম দেওবন্দ। সুতরাং বলা যায় যে, এসকল সমস্যা নিরসনের চিন্তা ভাবনাই প্রতিফলিত হয়েছে দারুল উলূম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। যেহেতু ইংরেজদের অত্যাধুনিক মরণাস্ত্রের মুখে সম্মুখ সমরে বিজয়ের সম্ভাবনা ছিল সুদূর পরাহত, তাই একাডেমিক পন্থায় তাদেরকে প্রতিহত করার প্রয়াস গ্রহণ হয়। শুরু হয় শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে আযাদীর নয়া সংগ্রাম।

---

[১] Diyaur Rahman, Farooqi, *The Ulama of Deoband Their Majestic past* (Karachi, Pakistan: Zamzam Publishers), 2006.

দেওবন্দে আন্দোলনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল সমজাতীয় মাদ্রাসা স্থাপনের মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারার বিস্তার সাধন ও ইসলামী শিক্ষার প্রসার। দেওবন্দ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতাগণ সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে সেগুলোর আদর্শ ছিল শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ শিক্ষা ও সংস্কৃতি আত্মস্থ পূর্বক বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদের মাধ্যমে নিজেদের ভাগ্য পরিবতর্নের অনুপ্রাণিত করা। এই শিক্ষাদর্শনের ভিত্তিতে স্থাপিত প্রথম মাদ্রাসা দারুল উলুম দেওবন্দ। এরপর এই মাদ্রাসার আদর্শ নিয়ে আরো বেশ কিছু মাদ্রাসা স্থাপিত যেগুলো দেওবন্দী মাদ্রাসা নামে পরিচিতি হয়। মাওলনা নানতুবীর জীবদ্দশাতেই ৭/৮ টি প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব লাভে করে। শায়খুল হিন্দের আমলে দেশব্যাপী এ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রচারের কেন্দ্র বিস্তৃতি লাভ করে। শায়খুল হিন্দ তার যেসব শাগরিদদের কুরআন হাদীস ও বিপ্লবের চেতনার শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুলতেন শিক্ষা সমাপ্ত হবার প্রাক্কালে তাদের উপদেশ দিতেন নিজ নিজ অঞ্চলে গিয়ে যাতে তারা মাদ্রাসা স্থাপনের মাধ্যমে ইসলামের শিক্ষার আরো বিস্তার সাধন করে। এ ছাত্রদের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শতশত মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। ১৯০৯ সালে জমিয়াত উল আনসার প্রতিষ্ঠার পর, ১৯১০ সালে দেওবন্দে "পাগড়ী পরিধান" অনুষ্ঠানে মাওলানা সিন্ধী জমিয়াত-উল-আনসারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ঘোষণা করেন-

১) কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচার।

২) জনগনের ঈমানী শক্তি বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন সভা সেমিনারের আয়োজন করা এবং আলোচনা সমালোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জনগণের ইসলামী জিজ্ঞাসার সমাধান।

৩) ইসলামী জ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

১৯১১ সালের ১৫-১৭ ই এপ্রিল মোরাদাবাদে জমইয়াত-উল-আনসারের ১ম কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় যাতে এ সংগঠন হতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্বান্ত নেয়া হয় যার উদ্দেশ্য হবে বক্তা ও খতীব তৈরী করা যারা তাদের বক্তৃতা বা রচনার মাধ্যমে বিদ'আতীদের প্রচারণার প্রতিবাদ করে প্রকৃত ইসলামকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে সমর্থ হবেন। ১৯১২ সালে জমইয়াত-উল-আনসারের ২য় কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয় যাতে জমইয়াত-উল-আনসারের তহবিল হতে দেশের বিভিন্ন স্থানে নৈশ ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং "আল-আনসার" নামে একটি মুখপত্র প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

দারুল উলূমের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের মনোভাব ছিল, এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্র সংক্রান্ত বিষয় ও রাজনীতি হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থেকে শুধু বিদ্যাচর্চার একক ব্যবস্থা থাকবে।[২] একারণে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শ্যোনদৃষ্টি জমিয়াত-উল-আনসারের উপর নিপতিত হলে দারুল উলুম কর্তৃপক্ষ সরকারি হস্তক্ষেপ এড়ানোর জন্য উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে মাদ্রাসা হতে সরিয়ে দেন। উবায়দুল্লাহ সিন্ধীও জমইয়াতুল আনসারের সাধারন সম্পাদকের পদ হতে পদত্যাগ

---

[২] মুফতি আজীজুর রহমান বিজনৌরি, *তাযকিরায়ে শায়খুল হিন্দ* (বিজনৌরঃ ১৯৬৫), পৃ. ১৪৭।

করে দিল্লীতে চলে যান। এরপর থেকেই জমইয়াত-উল-আনসার-এর বিলুপ্তি না হলেও সংগঠনটি জড়পদার্থের মত অসাড় হয়ে পড়ে।[৩]

জমইয়াত-উল-আনসার হতে ইস্তফা প্রদানের পর মাওলানা মাহমুদ হাসান উবায়দুল্লাহ সিন্ধীকে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে দিল্লীতে প্রেরণ করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল দিল্লিতে একটি শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা , যাতে এমনভাবে কুরআন শিক্ষা দেয়া হবে, যাতে ইসলাম সম্পর্কে যুব সমাজের সর্বপ্রকারের সংশয়, সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্ধ সমূলে দূরীভূত হয়।[৪] মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নিজ ভাষ্যমতে, "হযরত শায়খুল হিন্দের নির্দেশক্রমে আমার কর্মস্থল দেওবন্দ থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হলো।[৫] ১৯১৩ সালে মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী দিল্লীতে চলে যান।[৬] ১৯১৩ সালের নভেম্বর মাসে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান, ভারত বিখাত ইউনানী চিকিৎসক মসীহ-উল-মুলক হাকীম আজমল খান ও সৈয়দ আহমদ খানের আদর্শে প্রভাবান্বিত আলীগড় কলেজ কমিটির সেক্রেটারী এবং মুসলিম লীগের প্রথম সম্পাদক নবাব ভিকারুল মুলক প্রমুখ শীর্ষ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতায় দিল্লীর ফতেহপুর মসজিদে 'মাদরাসাতুল নাযারাতুল মা'আরিফিল কুরআনিয়া' বা সংক্ষেপে 'নাযারাতুল মা'আরিফ' প্রতিষ্ঠা করেন। 'নাযারাতুল মা'আরিফ' প্রতিষ্ঠানটি নতুন ও পুরানো সিলেবাস অনুযায়ী শিক্ষিতদের পরস্পর কাছে টেনে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। পাঞ্জাবের ইংরেজী কলেজের মুসলমান ছাত্ররা যে দেশ ত্যাগের আন্দোলনে শরীক হয়েছিলেন, উবায়য়দুল্লাহ সিন্ধীই সে আন্দোলনকে চাঙ্গা করেছিলেন,[৭] তবে বাহ্যিক ভাবে যা-ই হোকনা কেন, দারুল উলুম দেওবন্দের মত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবী চেতনার সৈনিক তৈরি। এ কারণে তৎকালীন C.I.D কর্তৃক যে রিপোর্ট প্রদান করা হয় তাতে বলা হয়েছিল, উবায়দুল্লাহ দারুল উলুম দেওবন্দকে নিজেদের মিশনারী সমূহের দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বানাতে সক্ষম না হওয়ায় দিল্লীতে একটি ইসলামী শিক্ষালয় স্থাপন করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।[৮]

শায়খুল ইসলাম মাদানীর যুগে এর প্রচারাভিযান শুধু উপমহাদেশেই নয়, এশিয়া, আফ্রিকার সুবিশাল অংশে সম্প্রসারিত হয়ে যায়।[৯] শায়খুল ইসলামের মতানুযায়ী শিক্ষা শুধু পেশাই নয়, একটি উচ্চ মানের ইবাদত ও বটে। তিনি মনে করতেন, শিক্ষার মাধ্যমে এমন ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলা আবশ্যক যারা গবেষণা ও জ্ঞানচর্চার অঙ্গনে বিশ্বাস ও নির্ভরযোগ্যতার সাথে পূর্ণ অংশগ্রহণে সক্ষম হবে এবং নিজ ধর্ম ও নিজ দেশের সেবা করার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে

---

[৩] মৌলভী সিরাজ আহমেদ, "জমিয়্যাতুল আনসার মে মাওলানা সিন্ধি কা ইসতিফা", *মাসিক আল কাসিম*, সফর সংখ্যা (দারুলঃ উলুম দেওবন্দ, ১৩৩২ হিজরী), পৃ. ৫।

[৪] সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী, *নকশে হায়াত*, ২য় খণ্ড (মাকতাবা এ দ্বীনিয়াহ, ১৯৫৩), পৃ. ১৩৮।

[৫] মাওঃ মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, *আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী* (ঢাকা: দারুল কুরআন শাসমসুল উলুম মাদ্রাস, ১৯৯২), পৃ. ৭।

[৬] মুহাঃ ইসহাক ফরিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮।

[৭] দৈনিক জমীঅত (দিল্লীঃ ২৬ মার্চ ১৯৮০ সংখ্যা), পৃ. ২২৬।

[৮] Silken Letter Conspiracy Case and Whose Who, CID Report, ফৌজদারী মোকদ্দমা, ভারতের বড়লাট বনাম উবায়দুল্লাহ ও অন্যান্য।

[৯] মুশতাক আহমদ, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ২য় সংস্করণ (ঢাকা: শান্তিধারা প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ১৩৭-১৩।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।[১০] সাধারণ জনগণের নিকট ইসলামের সুমহান বানী ও দেওবন্দ আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রচারের জন্য দারুল উলুম দেওবন্দ হতে পত্র পত্রিকা বের হয়। ১৯১০ সালে দেওবন্দ হতে বের হয় মাসিক পত্রিকা আল-কাসিম এর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম সমাজের ইসলামী আকীদা ও ধর্ম সংক্রান্ত বিবিধ বিষয়ের সংশোধন এবং ইসলাম ও মুসলিম জনগণের প্রতি প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান। স্বনামধন্য দেওবন্দের উলামা শ্রেণী কর্তৃক বিভিন্ন গবেষণাধর্মী এবং পাণ্ডিত্য পূর্ণ প্রবন্ধ এখানে প্রকাশিত হত যা ছিল নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় তথ্যাবলীর উৎস। উলামাদের সহজবোধ্য নির্ভরযোগ্য ধর্মীয় তথ্যাবলীর উৎস উলামাদের সহজবোধ্য সাবলীল লেখনী শিক্ষিত মুসলিম সমাজের মধ্যে সাড়া জাগায়। এছাড়া আল-রশীদ নামেও একটি পত্রিকা প্রকাশিত হত। প্রকাশনার ২১ বছর পর মাসিক আল কাসিমের প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। এর পর প্রায় দুই দশকের অধিক সময়ব্যাপী দারুল উলুম হতে কোন জার্নাল, সাময়িকী বা পত্রপত্রিকা প্রকাশিত হয়নি। দারুল উলুমের সাথে সংশ্লিষ্ট শুভাকাঙ্খীগণ পত্রিকা বের করার জন্য চাপ দিতে থাকেন। দারুল উলুমের বুজুর্গবৃন্দও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করছিলেন কিন্তু পরিস্থিতির কারণে কোন বাস্তব পদক্ষেপ নেবার সুযোগ ছিলনা। অবশেষে ১৯৪২ সালে “দারুল উলুম” নামে আর একটি মাসিক পত্রিকা বের করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল-

ক. দারুল উলুমের সহায়তাকালীন এবং অনুগামীদের মাদ্রাসার সমসাময়িক পরিস্থিতি ও ঘটনাক্রমের ব্যাপারে অবগত রাখা।

খ. সহজ ও চিত্তাকর্ষকভাবে মুসলমানদের মাঝে ইসলামের শিক্ষা প্রচার যাতে মুসলমানদের মধ্যে সঠিক ইসলামী চেতনার স্ফূরণ ঘটে।

গ. পান্ডিত্যপূর্ণ সমস্যাসমূহ সমাধানের নির্মিতে দেওবন্দের উলামাবৃন্দের গবেষণাধর্মী প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন এবং মুদ্রণ এবং সমসাময়িক ঘটনাক্রমে দারুল উলুমের বক্তব্য উপস্থাপন।

ঘ. ইসলামের প্রতিপক্ষ শক্তিগুলোর আক্রমণকে বিনীত ভাবে প্রতিহত করা।

এই সকল পত্রিকাগুলোর ভাষা ছিল উর্দু। এ কারনে, ১৯৪২ সালে ‘দাওয়াত-আল-হক্ব নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকাও প্রকাশিত হতে থাকে। আরবী ভাষায় মুদ্রিত এই পত্রিকাটি দেশের আরবী মাদ্রাসা গুলোর পাশাপাশি আরব রাষ্ট্রগুলোতে আগ্রহের সাথে প্রতিষ্ঠিত হত। এর মাধ্যমে আরবী ভাষাভাষী রাষ্ট্রগুলোতেও দারুল উলুমের বিপ্লবী চেতনা দেশের মুক্তি সংগ্রামে ভূমিকা সংক্রান্ত খবরাখবর ছড়িয়ে তোলে। এর ফলে ঐ সকল রাষ্ট্রের সাথে দারুল উলুম দেওবন্দের সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে।

দারুল উলুমের পাঠ্যক্রম কি হবে প্রতিষ্ঠার পূর্বে এটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। কারণ ব্রিটিশরা শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছিল যে তা পরিণত হয়েছিল সরকারের প্রয়োজনীয় কর্মী এবং নিম্ন শ্রেণীর কেরানী তৈরির কারখানায়। অপরপক্ষে দীর্ঘদিন শিক্ষার আলো এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের স্পর্শ হতে পিছিয়ে থাকা মুসলিম শ্রেণীর জন্য সঠিক ইসলামী শিক্ষার যেমন প্রয়োজন ছিল তেমনি প্রয়োজন জ্ঞান-বিজ্ঞান শিল্পকলা সংক্রান্ত জ্ঞানের।

---

[১০] সাইয়্যিদ আবদুল বারী, *রশীদুল ওয়াহিদী* (সম্পাদিত), *শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী হায়াত ওয়া কারনামে* (দিল্লীঃ আল জামইয়াত বুক ডিপো.), পৃ. ২৭১।

৭.১.৩ সশস্ত্র ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন

ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে দেওবন্দ মাদ্রাসা এবং এর উলামা নেতৃবৃন্দের যে ভূমিকা তাকে দুইটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়। তা হল

ক) সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব ও বিস্তার (১৮৬৬-১৯১৯)

খ) জাতীয়বাদী অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯১৯-১৯৪৭)

সশস্ত্র আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব ও বিস্তার (১৮৬৬-১৯১৯)

এই দুই প্রকার আন্দোলন পরিচালনা করার মাধ্যম হিসেবে দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ গড়ে তোলেন কিছু একক ও সংঘবদ্ধ সংগঠন যার কিছু ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আবার কোনটি ছিল সামাজিক সংগঠনের আড়ালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্র। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলোঃ-

১৮৭৯ সালে দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রথম শিক্ষার্থী মাওলানা মাহমুদ হাসান কর্তৃক সামারাতুত তারবিয়াত' এর প্রতিষ্ঠা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সংযুক্ত করে।[১১] এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল দারুল উলুম দেওবন্দের শুভাকাঙ্খীদের সাথে সংযোগ স্থাপন এবং তাদের কাছ হতে বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা আদায় করা।[১২] কিন্তু এর পরোক্ষ উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করতে বিপ্লবীদের সংঘবদ্ধ করা ও তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা। পরবর্তীতে এই সংগঠনটি বহু মুসলিম বিপ্লবীদের পথপ্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছিল।[১৩] এ সংগঠনের কার্যক্রম সম্পর্কে খুব বেশী কিছু জানা যায় না কারণ, এর প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মাত্র দুই দশক পেরিয়েছে এবং এই পরিস্থিতির যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেজন্য ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে। এমতাবস্থায় উলামাশ্রেণীদের মধ্য হতে পুনরায় একটি বিপ্লবী সংগঠনের উৎপত্তি হয়েছে জানতে পারলে তা হতো অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত। একারনে "সামারাতুত তারবিয়াত" গোপনে বিপ্লবী সশস্ত্র আন্দোলনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করতো। এই সব বিপ্লবীদের অনেকেই ছিলেন আফগানিস্তান ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলের বাসিন্দা যারা পরবর্তীতে নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে প্রচারণা চালান এবং ভবিষ্যত ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার ভিত্তি গড়ে তোলেন। সামারাতুত তারবিয়াত, ডঃ মুখতার আহমদ আনসারী, হাকীম আজমল খান এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের "Umbrella organization" হিসেবে ভূমিকা রাখে।[১৪]

---

[১১] Farhat Tabassum, *Deoband Ulama's movement for the freedom of India* (New Delhi: Manak Publication Pvt. Ltd., 2006), p. 182.

[১২] Syed Mohammad Mian, *The Prisoners Of Malta*, translated by Mohammad Anwar Hussain and Hasan Imam, (New Delhi: Jamiat Ulama-I-Hind and Manak Publications PVT. LTD., 2005), p. 8.

[১৩] Farhat Tabassum, *op. cit.*, p. 182.

[১৪] *Ibid*., p. 182.

১৮৭৮/৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সামারাতুত তারবিয়াত' সংগঠনটি বিপ্লবী কর্মী তৈরীর মাধ্যম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি তাঁর আশানুরূপ সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়নি। ১৯০৯ সালে মাওলানা মাহমুদ হাসান 'সামারাতুত তারবিয়াত' কে পুনরায় সংগঠিত করেন এবং এর নতুন নাম দেন 'জমিয়াত-উল-আনসার'। বাহ্যিকভাবে এই সংগঠনটির উদ্দেশ্য ছিল- দারুল উলূমের প্রাক্তন ছাত্রদের সংগঠিত করা এবং আলীগড় ও দারুল উলূমের শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে হৃদ্যতার সম্পর্ক তৈরী করা।[১৫] সামারাতুত তারবিয়াত এর মতই এই সংগঠনটিরও সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল। তাহলো- দেওবন্দ মাদ্রসার প্রাক্তন ছাত্রদের নিয়ে একটি মুজাহিদ বাহিনী গড়ে তোলা এবং ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেয়া।[১৬] এই বিপ্লবী সংগঠনটির দায়িত্বভার তিনি অর্পণ করেন তারই সুযোগ্য ছাত্র মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর উপর যিনি শাহ আব্দুল আযীযের ফতোয়া এবং সৈয়দ আহমদ শহীদের শিখ ও ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম এর মাধ্যমে বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত হয়েছিলেন। সিন্ধী দারুল উলূম দেওবন্দে তাঁর যাহিরী ও বাতিনী শিক্ষক শায়খুল হিন্দ মাহমুদ হাসানের পৃষ্ঠপোষকতায় 'জমইয়াত-উল-আনসার'- এর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতে আরম্ভ করেন।[১৭]

মাওলানা মাহমুদ হাসানের সূদূরপ্রসারী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে মাওলানা সিন্ধী ১৯১৫ সালের ১৫ ই অক্টোবর কাবুল পৌছান। তার আগমনের পূর্বেই ২রা অক্টোবর ব্রিটিশ সম্মিলিত ঐক্য গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ভারত-তুর্কী-জার্মান মিশন কাবুলে পৌঁছেছিল কিন্তু আমীর হাবিবুল্লাহর অসহযোগী মনোভাবের কারণে তেমন সুবিধা করতে পারেনি। উবায়দুল্লাহ আমীর হাবিবুল্লাহর ভাই নায়িবুস সালতানাত সর্দার নাসরুল্লাহ খান এবং আমীরের পুত্র মুয়িনুস সুলতানাত ইনায়েত উল্লাহ খানের আনুকুল্য অর্জন করেন।[১৮] ১৯১৫ সালের ২৯ অক্টোবর বিচারপতি আব্দুর রাজ্জাক খানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত এক অধিবেশনে যৌথ মিশনের কর্মীদের প্রচেষ্টায় সম্মিলিতভাবে ভারতবর্ষ হতে ব্রিটিশদের বিতাড়নের পর সেখানে অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের মাধ্যমে ক্ষমতা নিজেদের হাতে আনার পরিকল্পনা করা হয়। এজন্য এ অধিবেশনে কাবুলে একটি অস্থায়ী ভারত সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ১৯১৫ সালের ১লা ডিসেম্বর এই অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত হয়। এ নবগঠিত সরকারে উবায়দুল্লাহ ভারতমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যেই "হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব-কে কেন্দ্র করে সরকারে মতানৈক্য দেখা দেয়। এর পেছনে কারণ ছিল রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের ঘোর সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ। কিন্তু মাওলানা উবায়দুল্লাহ ছিলেন হিন্দু-মুসলমি জাতীয়তাবাদের সমর্থক। তিনি রাজা মহেন্দ্রের সাথে আলোচনা চালিয়ে তার ওপর এতটাই প্রভাব বিস্তার করেন যে তাকে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করতে বাধ্য করেন। সিন্ধী জার্মান মিশন ও ভারতীয়দের মধ্যে

---

[১৫] আবুল ফাতাহ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া, *দেওবন্দ আন্দোলন, ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, পৃ. ১৭১।
[১৬] *তদেব*
[১৭] ফয়যুর রহমান, *মাশাহির উলামা-এ-দেওবন্দ*, ১ম খণ্ড (লাহোর: আল মাকতাবাতুল আযিযিয়্যা) পৃ. ৫১৭।
[১৮] আব্দুর রশিদ আরশাদ, *বীস বড়ে মুসলমান* (লাহোর: মাকতবা-ই-রশিদিয়্যাহ, ১৯৯১), পৃ. ৪০৭।

সমঝোতা সৃষ্টি করে আফগান আমীরের সামনে যুক্তিযুক্ত কর্মসূচী পেশ করেন এবং ব্রিটিশ ভারত আক্রমণ করার জন্য আবেদন জানান। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের পরামর্শ ক্রমে কাবুলস্থ নতুন 'অস্থায়ী ভারত সরকার' নসরুল্লাহ খানের অনুমতি ক্রমে ভারতের স্বাধীনতাকে সামনে রেখে বিদেশে (রাশিয়া, ইস্তাম্বুল ও জাপান) তিনটি মিশন প্রেরণ করেন।[১৯]

১৯১৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারী লাহোরের বিভিন্ন কলেজে অধ্যয়নরত ১৫ জন বিপ্লবী চেতনায় উজ্জীবিত মুসলমান ছাত্র উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অতিক্রম করে কাবুলে চলে যান। এই ১৫ জন ছাত্রকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'পলাতক ছাত্র', 'মুজাহিদ ছাত্র', দেশত্যাগী ছাত্র" প্রভৃতি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[২০] এছাত্ররা হলেন- লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের স্নাতকোত্তর শেষ বর্ষের শিক্ষার্থী আব্দুল বারী, শায়খ আব্দুল কাদির, এবং স্নাতকের শিক্ষার্থী আব্দুল মজিদ খান, আল্লাহ নেওয়াজ খান, শায়খ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রশীদ, গোলাম হাসান, যাফর হাসান আইবেক, এবং লাহোর স্টাফ কলেজের স্মাতক শ্রেণীর ছাত্র আব্দুল খালিক, লাহোর ইসলামিয়া কলেজের স্নাতক- শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মদ হাসান, মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র খুশী মুহাম্মদ, আব্দুল মজীদ, রহমত আলী, সুজাউল্লাহ এবং শাহ নউয়ায খান প্রমুখ।[২১]

এই ছাত্রদের উদ্দেশ্য ছিল তুরস্কে গিয়ে তুর্কীদের সহায়তায় মিত্র শক্তিবিরোধী যুদ্ধে যোগদান করা। তুরস্কে যাবার চেষ্টা করার সময় আফগান সরকার তাদের গ্রেফতার করে নজরবন্দী করে রাখে। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী সরদার নাসরুল্লাহ খানের কাছে সুপারিশ করে তাদের মুক্ত করেন। ইতোমধ্য পেশোয়ার হতে আগত আরও কিছু ছাত্রদের সাথে তাদের মতানৈক্য ঘটলে মাওলানা সিন্ধী বিবাদের মীমাংসা করেন। তাঁর অনুপ্রেরণায় এসকল ছাত্র তুরস্কে যাবার বাসনা ত্যাগ করে আফগানিস্তান হতেই ব্রিটিশ বিরোধী অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেয়। উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কাবুলে তাঁর সাথে আগত দুই সঙ্গী মাওলানা মনসুর আনসারী ও মাওলানা সাইফুর রহমান এবং এসকল ছাত্রদের নিয়ে জুনুদ-এ-রাব্বানিয়া বা জুনুদুল্লাহ নামে একটি মুক্তিফৌজ গঠন করেন।[২২]

মাওলানা সিন্ধী জুনুদ-এ-রাব্বানিয়ার যে প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেন তা হল-

ক) প্যাট্রন :

১) চীফ জেনারেল খলিফাতুল মুসলিমীন, তুরস্ক

২) সুলতান আহমদ শাহ কাচার, ইরান

৩) আমীর হাবিবুল্লাহ খান, কাবুল

---

[১৯] মুহাম্মদ তাহির, *মাল্টার বন্দী* (কোলকাতা: মদনী মিশন, ১৯৮৬), পৃ. ১১।

[২০] মোঃ মোদাব্বের, *ইতিহাস কথা কয়* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৭), পৃ. ১০৪।

[২১] যাফর হাসান আইবেক, *আপবীতি* (লাহোর: মনসুর বুক হাউস, ১৯৬৮), পৃ. ২৩।

[২২] সিন্ধী, *কাবুল মেঁ সাত সাল* (লাহোর: সিন্ধসাগর একাডেমী, ১৯৫৫), পৃ. ৭৪।

খ) ফিল্ড মার্শাল:

১) আনওয়ার পাশা

২) দওলতে উসমানিয়ার যুবরাজ

৩) দওলতে উসমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী

৪) আব্বাস হিলমী পাশা

৫) শরীফ, মক্কা মুকাররমা

৬) নায়িবুস সালতানাত সরদার নাসরুল্লাহ খান, কাবুল

৭) মুঈনুস সালতানাত সরদার ইনায়েতুল্লাহ খান, কাবুল

৮) নিযাম, হায়দ্রাবাদ

৯) ওয়ালী, ভূপাল

১০) নবাব, রামপুর

১১) নিযাম, ভাওয়ালপুর

১২) রঈসুল মুজাহিদীন

গ) জেনারেল:

১) সুলতানুল মুয়াজ্জম মাওলানা মাহমুদ হাসান মুহাদ্দিস দেওবন্দী

২ কাবুল জেনারেল স্থলাভিষিক্ত উবায়দুল্লাহ সিন্ধী।

ঘ) লেফটেন্যান্ট জেনারেল:

১) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান

২) মাওলানা আবদুর রহীম

৩) মাওলানা গোলাম মুহাম্মদ ভাওয়ালপুর

৪) মাওলানা তাজ মুহাম্মদ সিন্ধী

৫) মৌলভী হুসাইন আহমদ মাদানী

৬) মৌলভী হামদুল্লাহ হাজী সাহেব, তুরঙ্গযয়ী

৭) ডাঃ মুখতার আহমেদ আনসারী

৮) হাকীম আবদুর রাজ্জাক

৯) মুল্লা সাহেব বাবরা

১০) কুহিসতানী

১১) জান সাহেব বাজুরা

১২) মৌলভী ইব্রাহীম

১৩) মৌলভী মুহাম্মদ মিয়া

১৪)হাজী সাঈদ আহমদ

১৫) শায়খ আবদুল আযীয

১৬) মৌলভী আবদুল করীম রঈসুল মুজাহিদীন

১৭) মৌলভী আবদুল আযীয রহীম আবাদী

১৮) মৌলভী আব্দুর রহীম আযীয আযাদী

১৯) মৌলভী আবদুল্লাহ গাযীপুরী

২০) নবাব যমীরুদ্দীন আহমদ

২১) মৌলভী আবদুল বারী

২২) আবুল কালাম

২৩) মুহাম্মদ আলী

২৪) শওকত আলী

২৫) যাফর আলী

২৬) হাসরাত মুহানী

২৭) মৌলভী আবদুল কাদির কাশ্মিরী

১৫) মৌলভী বরকতুল্লাহ ভূপালী

২৮) পীর আসাদুল্লাহ শাহ্ সিন্ধী।

ঘ) মেজর জেনারেল:

১) মৌলভী সায়ফুর রহমান

২) মৌলভী মুহাম্মদ হাসান মুরাদাবাদী

৩) মৌলভী আবদুল্লাহ আনসারী

৪) মীর সিরাজুদ্দীন বাহাওয়ালপুরী

৫) পাচা মুল্লা আবদুল খালিক

৬) মৌলভী বশীর, র’ঈসুল মুজাহিদীন

৭) শায়খ ইব্রাহীম সিন্ধী

৮) মৌলভী মুহাম্মদ আলী কাসূরী

৯) সায়্যিদ সুলায়মান নদবী

১০) ইমাদী গোলাম হুসাইন আযাদ সুবহানী

১১) কাযিম বে

১২) খুশী মুহাম্মদ

১৩) মৌলভী আব্দুল বারী, অস্থায়ী ভারত সরকারের মুজাহিদ ওকীল

ঙ) কর্ণেল:

১) শায়খ আবদুল কাদির মুজাহিদ

২) সুজাউল্লাহ মুহাজির, অস্থায়ী ভারত সরকারের নায়িবে ওকীল

৩) মৌলভী আব্দুল আযীয, ইয়াগিস্তানের হিযবুল্লাহ-এর দূতের ওকীল

৪) মৌলভীফযলে রব্বী

৫) সদরুদ্দীন

৬) মিয়া ফযলুল্লাহ

৭) মৌলভী আবদুল্লাহ সিন্ধী

৮) মৌলভী আবু মুহাম্মদ আহম্মদ লাহোরী

৯) মৌলভী আহম্মদ আলী, সহরকারীসম্পাদক নিযারাতুল মা’আরিফ

১০) শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী

১১) মৌলভী মুহাম্মদ সাদিক সিন্ধী

১২) মৌলভী ওলী মুহাম্মদ

১৩) মৌলভী উযারগুল

১৪) খাজা আব্দুল হাই

১৫) কাযী যিয়াউদ্দিন, (এম.এ)

১৬) মৌলভী ইব্রাহীম সিয়ালকোটী

১৭) আব্দুর রশীদ (বি.এ)

১৮) মৌলভী যহুর মুহাম্মদ

১৯) মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ গাঙ্গূহী

২০) মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ আনসারী

২১) মৌলভী সায়্যিদ আব্দুস সালাম ফারুকী

২২) হাজী আহম্মদ জান সাহারানপুরী

চ) লেফ্‌টেন্যান্ট কর্ণেল:

১) ফযল মাহ্‌মুদ

২) মুহাম্মদ হাসান (বি.এ) মুহাজির

৩) শায়খ আব্দুল্লাহ (বি.এ) মুহাজির

৪) যাফর হাসান (বি.এ) মুহাজির

৫) আল্লাহ নাওয়াজ খান (বি.এ) মুহাজির

৬) রহমত আলী (বি.এ) মুহাজির

৭) আব্দুল হামীদ (বি.এ) মুহাজির

৮) হাজী শাহ বখ্‌শ সিন্ধী

৯) মৌলভী আব্দুল কাদির দীনপুরী

১০) মৌলভী গোলাম নবী

১১) মুহাম্মদ আলী সিন্ধী

১২) হাবীবুল্লাহ

ছ) মেজর:

১) শাহ্‌ নাওয়ায

২) আব্দুর রহমান

৩) আব্দুল হক

জ) ক্যাপ্টেন:

১) মুহাম্মদ সলীম

২) করীম বখ্‌শ

ঝ) লেফ্‌টেন্যান্ট:

১) নাদির শাহ(মাল্টা)

মে - জুন ১৯১৯ খ্রিঃ "৩য় ইঙ্গ আফগান যুদ্ধে জুনুদ-এ-রাব্বানিয়া তার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব প্রকাশ করে। উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর নেতৃত্বে জুনুদ-এ-রাব্বানিয়া ও ভারতীয় বিপ্লবী বাহিনীর অংশ গ্রহণে এ যুদ্ধে আফগান বাহিনী জয়লাভ করে। আফগানিস্থানে তৎকালীন ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত লর্ড হামফ্রে এ যুদ্ধে জয়লাভের কৃতিত্ব উবায়দুল্লাহ ও তার সহযোগীদেরকেই দেন। আফগান সরকারও তাদের সফল ভূমিকার স্বীকৃতি প্রদান করেন।

বাদশাহ আমানউল্লাহ খান ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে যখন মাওলানা সিন্ধী ও তার সহচরদের কারামুক্ত করেন তখনো ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম অর্জনের প্রশ্নে উবায়দুল্লাহ অনমনীয় ছিলেন। দীর্ঘ কারাভোগ তার স্বাধীনতা কামী বিপ্লবী চেতনাকে নির্বাপিত করতে পারেনি। বাদশাহ আমানুল্লাহ বিপ্লবী নেতাদের কার্যক্রমের ওপর শিথিল নজরদারি দেখে তিনি ধারণা করেন, ভারত আক্রমণে হয়তঃ পুনরায় আফগানিস্তানের সাহায্য নেয়া সম্ভব। যেহেতু তখন অস্থায়ী ভারত সরকারের কার্যক্রম সচল ছিলনা, একারণে তিনি কাবুলে সর্বভারতীয় কংগ্রেস এর একটি শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কংগ্রেসের প্রথম শাখা। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ছিলেন এর প্রেসিডেন্ট এবং যাফর হাসান ছিলেন এর সেক্রেটারী। তৎকালীন সময়ে ডঃ আনসারী ছিলেন ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি। তার সুদৃষ্টির ফলে এ শাখাটি গয়া অধিবেশনে কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের অনুমোদন লাভ করে।

জাতীয়বাদী অহিংস স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৯১৯-১৯৪৭)

১ম বিশ্বযুদ্ধ কালীন সময়ে ভারতীয় মুসলমানাদের সবচেয়ে বেশী চিন্তার কারণ ছিল "তুর্কী খিলাফত রক্ষা" ইস্যু। ব্রিটিশরা খিলাফত রক্ষার্থে বহু প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেও তার কিছুই রক্ষা করেনি। তদুপরি খলিফা ও খিলাফতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষণের দাবী পূরণ করার লক্ষ্যে সাংগঠনিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই আলেমগণ প্রতিষ্ঠা করেন একটি নতুন সংগঠন যার নাম 'জমইয়াত উলামা-ই-হিন্দ'। ১৯১৯ সালের নভেম্বর মাসে দিল্লীর খিলাফত কমিটি আয়োজিত এক সভায় ভারতের সাধারণ জনগণকে নিয়ে অহিংস স্বাধীনতা আন্দোলন পরিচালনাকারী এ সংগঠন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানকে সভাপতি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও তার মাল্টায় বন্দী থাকার কারণে মুফতী-এ-আজম মাওলানা কিফায়েতুল্লাহকে সভাপতি মনোনীত করে আব্দুল মোহাসিন

সাজ্জাদ, কাজী হুসাইন আহমেদ, আহমেদ সৈয়দ দেহলভী ও আবদুল বারী ফিরিঙ্গী মহল্লীর উদ্যোগে ১৯১৯ সালে গঠিত হয় 'জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ' ।[২৩]

স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এটি ছিল একটি যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ এ সংগঠনের মাধ্যমেই ভারতের উলামাশ্রেণী সশস্ত্র আন্দোলনের পথ পরিত্যাগ করে অহিংস আন্দোলন ও ইংরেজদের প্রতি অসহযোগিতার নীতি গ্রহণ করেন।

'জমিয়তে উলামা-ই-হিন্দ' এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল-

১. দেশের অমুসলিম জনগণের সাথে ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখা।
২. মুসলমানদের তাদের ধর্মীয় অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে তাদের সঠিক দিক নির্দেশনা প্রদান।
৩. মুসলমানদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক , ধর্মীয় ও শিক্ষাগত অধিকারসমূহের সংরক্ষণ।
৪. মুসলমানদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনের উন্নতি ও সংহতি সাধন করবে এমন সংগঠন প্রতিষ্ঠা।[২৪]

উলামাদের একটি পৃথক ধর্মীয়-রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠার পর 'জমইয়াতে উলামা-ই-হিন্দ' খিলাফত আন্দোলনের সাথে একীভূত হয়ে এদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে গৌরবময় অবদান রেখেছিল। ১৯২৪ সালে খিলাফতের বিলুপ্তির পর খিলাফত আন্দোলনের কার্যক্রম থেমে গেলেও 'জমইয়াতে উলামা-ই-হিন্দ' মুসলমানদের নির্ভরযোগ্য একটি রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে স্বাধীনতার দাবীতে আন্দোলন চালিয়ে যায়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত এই সংগঠনে যথাক্রমে মৌলভী কিফায়েতুল্লাহ ও তার পর মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানী নেতৃত্ব প্রদান করেন। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, সমন্বিত জাতীয়তাবাদ, পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ছিল এই সংগঠনের মৌলিক নীতি। 'জমাইয়াতে উলামা-ই-হিন্দ'-এর সিংহভাগ সদস্যই ছিলেন দেওবন্দের উলামাশ্রেণী। একারণে, 'জমইয়াতে উলামা-ই-হিন্দ'-এর ইতিহাস দারুল উলুম দেওবন্দের রাজনৈতিক ইতিহাসের অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়।

'তাবলীগ' আন্দোলনকে বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ধর্মীয় আন্দোলন হিসেবে গণ্য করা হয়, এ আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল মুসলমান সমাজের তৃণমূল পর্যায়ে গিয়ে তাদের আত্মিক উন্নয়ন সাধন এবং ইসলামী জ্ঞানে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন বুজুর্গদের সাথে তাদের সংযোগ স্থাপন। তাবলীগী জামাতের বিশ্বাস হল, অন্যায়ের সাথে লড়াইয়ের মাধ্যমে মুসলমানরা সর্বক্ষণই আধ্যাত্মিক জিহাদে রত রয়েছে। তাদের অস্ত্র হল দাওয়াত (ধর্মান্তরকরণ) এবং এই জিহাদের জয় অথবা পরাজয় মানুষে হৃদয় জয়ের মাধ্যমেই সম্ভব।

---

[২৩] কাজী মুহাম্মদ আদিল আব্বাসী, *তাহরিক ই খিলাফত* (নিউ দিল্লী: তারাক্কি ই উর্দূ ব্যুরো, ১৯৭৮), পৃ. ৩৯-৪০।
[২৪] Al Jamiat weekly Special issue, Jamiat Ulama Number (New Delhi: Jamiat-Ulama-i-Hind), p. 42.

দেওবন্দ আন্দোলনের একটি শাখা হিসেবে ‘তাবলীগী জামাত’- এর আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং মানুষের নৈতিকতার অবক্ষয় এবং ইসলামের ধর্মীয় নীতির প্রতি মানুষের অবহেলাই ছিল এর উদ্ভবের পেছনে নিহিত কারণ। এছাড়া ‘শুদ্ধি’ ‘সংগঠন, আর্য সমাজ প্রভৃতি কট্টর হিন্দু ধর্মীয় দলের নওমুসলিম ধর্মান্তকরণও এর উত্থানে ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক আন্দোলন হতে শুরু করে এটি জাতীয় আন্দোলনে রূপান্তরিত হয় এবং পরে আন্তর্জাতিক আন্দোলন হিসেবে বিভিন্ন দেশে ছাড়িয়ে পড়ে। তাবলীগী জামাত ধর্ম প্রচারে কোনও প্রকার সহিংসতা অনুমোদন করে না।

সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ এই মূলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মাওলানা ইলিয়াস কান্দলভী এ আন্দোলনের সূত্রপাত ঘটান। তিনি ছিলেন মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহীর ছাত্র। প্রাথমিক পর্যায়ে তিনি মেওয়াট অঞ্চলের মুসলমানদেরকে ইসলামী আকীদা ও আচার আচরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে মসজিদ কেন্দ্রিক ধর্মীয় শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের প্রচেষ্টা চালালেও তার ঈপ্সিত উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচারক তৈরী করা, যা সফল হয়নি। এ কারণে তিনি সাহারানপুরে মাজাহির-ই-ইলুমের শিক্ষকতার পদ ছেড়ে দিয়ে নিজেই ধর্মপ্রচারকের কার্যক্রম গ্রহণ করেন। দিল্লীর নিকটস্থ নিজামুদ্দীন মসজিদকে কেন্দ্র করে ১৯২৬/১৯২৭ সালে তার এ আন্দোলন শুরু হয়। এ সময় হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে মুসলমানরা তাদের ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য হারাতে বসেছিল। তাদের সামাজিক ভাবে পুনর্গঠিত করা, জীবন বিধান হিসেবে কেবল মাত্র রাসূলের সুন্নাহর অনুকরণের আর্দশকেই তিনি তার এই নতুন আন্দোলনের গাইডলাইন হিসেবে নির্ধারিত করেন। রাসূল (সাঃ) ইসলামের প্রথম যুগে যে দাওয়াতী পদ্ধতি অবলম্বন করে ইসলামের প্রচার করতেন তা হতেই মাওলনা ইলিয়াস আন্দোলনের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তিনি বলতেন ‘ হে মুসলমানগণ! মুসলমান হও।”

১৯৪৬ সালের পর এ আন্দোলন আরো সম্প্রসারিত হয় এবং দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।

মজলিশ-ই-আহরার-ই-ইসলাম

১৯২৯ সালের ২৯ ডিসেম্বর লাহোরে প্রতিষ্ঠিত হয় দেওবন্দী আলেমদের আরেকটি সংগঠন মজলিশ-ই-আহরার-ই ইসলাম, যেটি সংক্ষেপে 'আহরার' নামে পরিচিত হয়। মজলিস-ই-আহরার ছিল মূলত একটি রক্ষণশীল সুন্নী মুসলিম দেওবন্দী রাজনৈতিক দল। চৌধুরী আফজাল হক, সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী , হাবিবুর রহমান লুধিয়ানভী, মাজহার আলী আজহার, জাফর আলী খান এবং দাউদ গজনবী প্রমুখ ছিলেন এই দলটির প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৯ সালে বিপ্লবী আলিমগণ ও অন্যান্য জাতিয়তাবাদী দলের সমন্বয়ে ন্যাশনালিস্ট মুসলিম কনফারেন্স নামে যে সম্মিলিত জোট প্রতিষ্ঠা হয় জমইয়ত ই উলামা ই হিন্দের পাশাপাশি মজলিশ ই আহরার ও তাতে অংশগ্রহণ করে।

‘আহরার’ খেলাফত আন্দোলনের মুসলিম নেতৃবৃন্দ দ্বারা গঠিত হয়েচিল এবং এটি ছিল কংগ্রেসের সমর্থক। মজলিস-ই-আহরার মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ ও মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ’র ‘দ্বি-জাতি’ তত্ত্বেরও প্রবল বিরোধী ছিল। মজলিস-ই-আহরার-ই-ইসলাম ছিল মূলত ব্যর্থ হওয়া খিলাফত আন্দোলনের একটি অংশ। সর্বভারতীয় মজলিস-ই-আহরার-ই-ইসলাম এর সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ আতাউল্লাহ শাহ বুখারী এবং দলটির ইস্তেহার ঘোষণা করেন মাওলানা মাজহার আলী আজহার। দলটি প্রথমেই ’আহমদী মুসলিম পার্টি’র প্রতি বিরোধিতার মাধ্যমে আলোচনায় আসে। ‘আহরার’ তাদের আন্দোলনে ‘আহমদীয়া মুসলিম’ কে আনুষ্ঠানিকভাবে অমুসলিম বলে ঘোষণা দেয়। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের জাতীয়তাবাদ তথা ধর্মীয় ব্যাপারে পথ প্রদর্শন করা। ১৯৩০ সালের শুরুর দিকে, ‘মজলিম-ই-আহরার-ই-ইসলাম’ মুসলমানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। ‘আহরার’ ১৯৩১ হতে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ব্রিটিশ ভারতের মূলধারার রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিল। ১৯৪৫ সালের নির্বাচনে জমিইয়তে উলামায়ে হিন্দ এবং অপরাপর বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী দলগুলোর সমন্বয়ে যে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করেন, মজলিশ-ই-আহরারও তাতে অংশগ্রহণ করেছিল।

জমইয়তে উলামা-ই-ইসলাম

জমইয়তে উলামায়ে ইসলাম ছিল দেওবন্দী উলামাগণ কর্তৃক উদ্ভুত একটি রাজনৈতিক দল যারা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ ও অবিভক্ত ভারতের বিপক্ষে ছিলেন। মাওলানা শাব্বীর আহমেদ উসমানী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এর প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৯৪৫ সালে জমইয়তে উলামা-ই-হিন্দের একটি অংশ মুসলমানদের একটি পৃথক বাসভূমি প্রশ্নে ভিন্ন মত পোষণ করে এবং মাওলানা শাব্বীর আহমেদ উসমানীর নেতৃত্বে পৃথক হয়ে যায়। মাওলানা শাব্বীর আহমেদ উসমানী ছিলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার সদরে মুহতামিম। শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট তিক্ততার একপর্যায়ে তিনি তাঁর কয়েকজন অনুসারীসহ দেওবন্দ হতে ইস্তফা দিয়ে ‘জমিইয়ত-ই-উলামায়ে-ইসলাম’ নামে এই নতুন দলটি গঠন করেন। দেওবন্দী উলেমাদের মধ্যেকার এ ভাঙ্গনের সুযোগ নিয়ে মুসলিম লীগ ’দ্বি-জাতি তত্ত্বে’ এই উলেমাশ্রেণীর সমর্থন লাভের জন্য তাঁদেরকে ভবিষ্যৎ পাকিস্তান রাষ্ট্রে ‘ইসলামী হুকুমত’ কায়েম, খোলাফায়ে রাশেদীনের আদলে মদীনার ইসলামী সরকারের এক নতুন সংস্করণ প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখায় যা বাস্তবায়নের কোন ইচ্ছাই লীগ নেতৃবৃন্দের ছিল না। তাদের চটকদার প্রচারণায় আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানীও এতটা প্রভাবিত হন যে তিনি বলেন, ‘দীর্ঘদিন থেকে আমি ছিলাম রাস্তার একটি মোড়ে দাঁড়ানো, মিঃ আলী জিন্নাহ আমাকে পথের দিশা দিয়েছেন। আমি অন্ধকারে ছিলাম, তিনি আমাকে আলো দান করেছেন।[২৫] জমইয়তে-ই-উলামা-ই ইসলামের অন্যতম নেতা ভারতের বিশিষ্ট আলিম মুফতি শফী “কংগ্রেস অওর মুসলিম লীগ কী

[২৫] ফরীদুল ওয়াহিদী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬৪।

মুতা'আল্লাক শর'য়ী ফয়সালা" শিরোনামে ফতোয়া প্রকাশ করে মুসলিম লীগের প্রতি সমর্থন দানের জন্য জনগণকে উৎসাহিত করেন। ১৯৪৫ সালের ৩ রা নভেম্বর জমইয়তে-উলামা-ই-ইসলামের সভাপতি মাওলানা উসমানী কলকাতায় দেয়া এক ভাষণে বলেন, 'পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করা হল আমাদের প্রাথমিক পদক্ষেপ। এর অগ্রযাত্রা সবশেষে ইসলামী নীতিমালার ভিত্তিতে মহান রাব্বুল আলামীনের প্রদত্ত ন্যায় নীতির শাসন প্রতিষ্ঠায় গিয়ে শেষ হবে'।

১৯৪৫ সালের লীগ-কংগ্রেস ও জমইয়তে উলামা-ই-হিন্দ সংশ্লিষ্ট মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার নির্বাচনে 'দ্বি-জাতি তত্ত্ব' -এর দাবী প্রতিষ্ঠা কল্পে মুনলিম লীগের জয়লাভ করা ছিল জরুরী। এসময় জমইয়তে উলামা-ই-হিন্দ-এর কাওমিয়্যাত ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ধারণার বিপরীতে মাওলানা সহুল উসমানী এক ফত্ওয়া জারি করে বলেন যে, মুসলমানদের জাতীয়তার মাপকাঠি দেশ নয়, ধর্মের দিক দিয়ে নির্ণীত হয়ে থাকে। ভারতীয় মুসলমানরা হিন্দুদের থেকে পৃথক জাতি। একারণে পাকিস্তান সংগ্রামে তাদের যোগ দেওয়া বিশেষ জরুরী এবং শরীয়তের দিক দিয়ে ওয়াজীব। কেবল মাত্র মুসলিম লীগ মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দেওয়া একান্ত জরুরী। জমিইয়তে-উলামা-ই-ইসলামের নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে এটাই লক্ষণীয় যে, দেওবন্দ আন্দোলনে যে মৌলিক ইসলামী সংস্কারকে অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছিল তারই অংশ হিসেবে তাঁরা একটি ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন, যেখানে তারা ইসলামের প্রাথমিক যুগের সরকারের আদলে এবং শরীআহ'র অনুসরণের মাধ্যমে আইন কানুন ও বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন। ব্যক্তি-স্বার্থ দ্বার তাঁরা প্রভাবিত ছিলেননা। তবে একথা ও সত্য যে, তাদের কারণেই ১৯৪৫ সালেন নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়লাভ সহজতর হয় যা ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল ও দেশবিভক্তিকে সুনিশ্চিত করেছিল।

৭.১.৪ দেওবন্দ আন্দোলনের সাথে আলীগড় আন্দোলনের সম্পর্ক

রাজনীতির প্রাঙ্গণে দেওবন্দী উলামাদের আগমন ঘটে এর প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দের মাধ্যমে। ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলনের যে চিন্তাধারা শাহ আবুল আজিজের মাধ্যমে পল্লবিত হয়ে সৈয়দ আহমদ শহীদে সঞ্চারিত হয়ে সশস্ত্র আন্দোলনে রূপ নিয়েছিল তা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেই চরম উৎকর্ষ লাভ করে এবং এর পরে স্তিমিত হয়ে পড়ে। এ সময় ভারতের রাজনীতি ছিল অত্যন্ত নাজুক। মহাসমরের ক্ষত ছিল তখনো তাজা এবং চারি পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছিল অনুসন্ধানী গোয়েন্দা দল। এমন পরিস্থিতে মুসলমানদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দেওবন্দ আন্দোলন ও স্যার সৈয়দ আহমদের আলীগড় কেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্যে এক বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়। এই পরিস্থিতিতে ভারতবর্ষের মুসলমানদের দুইভাগে ভাগ করে দেন মাওলানা কাসিম নানতুবী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান। মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানতুবী এবং স্যার সৈয়দ আহমদ খান উভয়েই ছিলেন সতীর্থ। কিন্তু সমসাময়িক কালের পরিস্থিতি সম্পর্কে তাদের চিন্তা চেতনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। স্যার সৈয়দ আহমদ নয়া বাস্তবতার নিরিখে ব্রিটিশদের সাথে সমঝোতার পথ বেছে নেন। তাঁর ভয় ছিল যে, মুসলমানরা যদি পুনরায় ব্রিটিশদের সাথে সংগ্রামের পথে পা বাড়ায় তবে তারা

সফলতা তো লাভ করবেই না বরং ব্রিটিশদের রোষানলে পড়ে উপমহাদেশে হতে মুসলমান জাতিটিই হয়তো নিশ্চিত হয়ে যাবে। ব্রিটিশদের নিষ্পেষণের কারণে মুসলমানরা যে মানবেতর অবস্থার শিকার হয়েছিল তা হতে উত্তরণের লক্ষ্যে সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের রাজনীতিতে আসাকে চরমভাবে নিরুৎসাহিত করেন। তিনি মুসলমানদের পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহিত করেন যাতে তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন করে হিন্দুদের সমকক্ষতা অর্জন করতে পারে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক দৃষ্টিগোচর বিকাশ ঘটাতে প্রয়াসী হন এবং এ লক্ষ্যে তিনি সর্বস্তরের মুসলামানদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন করা উদ্যোগ নেন। এমনকি তিনি পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করে নারীশিক্ষাকেও উৎসাহিত করেন।

তার প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশদের বোঝানো যে, মুসলমানরা আর ব্রিটিশ বিরোধী কোন কর্মকান্ডে জড়িত নয় বরং তারা শিক্ষামূলক কর্মকান্ডে আগ্রহী। এ লক্ষ্যে তিনি ১৮৭৫ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন মোহামেডান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ যা পরবর্তীতে "আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়" এ রূপান্তরিত হয়। আলীগড়ের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেই সৈয়দ আহমদের চিন্তাধারার প্রচার ও প্রসার ঘটে এবং মুসলমানদের পাশ্চাত্য শ্ক্ষিা সংস্কৃতিমুখী এবং ব্রিটিশ আন্দোলন হতে দূরে রাখার সে আন্দোলন তিনি গড়ে তোলেন তাই "আলীগড় আন্দোলন" নামে পরিচিত।

অন্যদিকে আলীগড় আন্দোলন হতে সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী চিন্তাধারায় মাওলানা কাসিম নানতুবী গড়ে তোলেন দেওবন্দ আন্দোলন। তার এই আন্দোলনে তিনি পরিহার করেছিলেন নয়াযুগ চেতনার পথ ও আধুনিক শিক্ষা সংস্কৃতির অবলম্বন। মোট কথায় ব্রিটিশদের সাথে সংশ্লিষ্ট সব ধরণের বিষয়ই সযতনে পরিহার করা হয়েছিল এই প্রতিষ্ঠানের বিনির্মাণে। স্যার সৈয়দ আহমদ খান দীর্ঘদিন ব্রিটিশদের সংস্পর্শে থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার বিভিন্ন বিষয় কাছ থেকে পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন কিন্তু মাওলানা কাসিম নানতুবীর শৈশব কৈশোর ও যৌবন কেটেছে ব্রিটিশ বিরোধী নেতৃবৃন্দের ছাত্রছায়ায়। ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লবের পর মুসলমানরা যে অমানবিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের শিকার হয়, তিনি ছিলেন তার চাক্ষুষ স্বাক্ষী। এমবতাবস্থায় তার উদ্যোগে যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হবে তার অভ্যন্তরে যে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবের বীজ মুক্ত থাকবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য শুধু শিক্ষাদানে সীমাবদ্ধ ছিলনা; বরং তার উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত করে তাদেরকে জিহাদের প্রেরণায় উদ্ধুদ্ধকরা যাতে পরবর্তীতে তাদেরই মাধ্যমে ১৮৫৭ সালের ব্যর্থ বিপ্লব সকল বিপ্লবে রূপান্তরিত হয়।[২৬]

১৮৮১ সালে স্যার সৈয়দ আহমদ আরবী পাশার বিদ্রোহে স্পষ্টভাবেই ব্রিটিশ পক্ষে মনোভাব প্রদর্শন করেন। স্যার সৈয়দ আহমদের এই ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মতামতের বিরুদ্ধে দেওবন্দ তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করেছিল। সর্বশেষে ১৮৯৭ সালের তুরস্ক ও গ্রীসের যুদ্দে স্যার সৈয়দ আহমদের তুরস্কের বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য শক্তিগুলোকে সমর্থনদান এই ব্যবধানকে আরো বাড়িয়ে তোলে। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে এই ঘটনাটি বিশেষভাবে

[২৬] সাইয়্যিদ মানাযির আহসান গিলনি, *সাওয়ানিহে কাসিমী*, ১ম খ (দেওবন্দ: মাকতাবা রাহামানিয়া, ১৯৬৭), পৃ. ২২৬।

স্মরণীয় যে, সম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার ফলে নিজ দেশ যখন বিপর্যস্ত সেই সময়েও দেওবন্দ, কংগ্রেস ও স্বাধীনতার আর্দশের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়ে এসেছে।[২৭]

শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান যখন দারল উলুমের দায়িত্ব গ্রহণ করেন সে সময় দারুল উলুমের রাজনীতি সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পায়। তথাপিও ১৯০৯ সালে জমইয়্যাত-উল-আনসার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে দেওবন্দ ও আলিগড়ের দূরত্ব হ্রাস করার ব্যাপারে তিনি বিশেষ ভূমিকা রাখেন। আলীগড় ও দেওবন্দকে তিনি একই প্লাটফর্মে আনতে সমর্থ হন। আলীগড়ের সাথে শায়খুল হিন্দের মতভেদ থাকলেও তারই মাধ্যমে আলীগড় ও দেওবন্দের মাঝে যে দূরত্ব ছিল, তা হ্রাস পায়।[২৮] জমিয়াত-উল-আনসার এর মিটিং সমূহে আলীগড়ের প্রতিনিধি হিসেবে সাহেবযাদা আফতাব আহমদ খান অংশগ্রহণকরেন। এ সময়ে একটি চুক্তি হয় যে, আলীগড়ের উচ্চ ডিগ্রীধারীগণ দেওবন্দে ইসলামী শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলে দেওবন্দ তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অনুরূপভাবে ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত ডিগ্রীধারীগণ দেওবন্দ থেকে আলীগড়ের ইংরেজী শিক্ষা লাভ করার ইচ্ছা পোষণ করলে আলীগড় ও তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করবে।[২৯]

এতদসত্বেও দেওবন্দ আন্দোলন এবং আলীগড় আন্দোলনের মধ্যে চিন্তাধারার অমিল থেকেই যায়। ১৯২০ সালে যখন কংগ্রেস ও জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের উলামাবৃন্দ স্বরাজ ও অসহযোগ আন্দোলনের বিষয়ে ঐক্যমত্য হয় এবং মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে স্কুল কলেজের ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে বেরিয়ে আসে তখনও আলীগড় কলেজ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘোর বিরোধিতা করেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরোধীতা সত্ত্বেও মুসলিম স্বাধীনচেতা তরুনদের একটি দল আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। তারা কলেজ পরিত্যাগ করেন এবং মাওলানা মুহাম্মদ আলী, মাওলানা শওকত আলী, ডঃ জাকির হোসেন প্রমুখের নেতৃত্বে ইংরেজ প্রভাবমুক্ত একটি স্বাধীন জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারা এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষকতার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য শায়খুল হিন্দের নিকট আবেদন জানান। প্রবল অসুস্থতা সত্ত্বেও শায়খুল হিন্দ এই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। আলীগড় ও দেওবন্দী মতাবলম্বীদের মধ্যে যে মতাদর্শগত বিভেদ ছিল তা পরবর্তীতে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বনাম মুসলিম জাতীয়বাদের বিরোধে পর্যবসিত হয় এবং ভারত বিভাগের মধ্যে দিয়ে চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে।

৭.১.৫ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও মতের মধ্যে সমন্বয় সাধন

১৮৬৬ সালে দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠার পর ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গনে আরও কয়েকটি সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৭৬ সালে বাংলায় ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ১৮৭৮ সালে দেওবন্দে সামারাতুত তারবিয়াত, ১৮৮৪ সালে মহাজন সভা প্রভৃতি সংগঠনের বহিরাবরণ জনকল্যাণমূলক হলেও এদের উদ্দেশ্য ছিল

---

[২৭] সত্যেন সেন, *ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা* (ঢাকাঃ সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০১৩)।
[২৮] সারওয়ার, *মওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী* (লাহোরঃ নোবেল কিশোর প্রেস, ১৯৫৫), পৃ. ১৩০।
[২৯] শায়েখ মুহাম্মদ ইকরাম, *মওজে কাওসার* (দিল[illegible]ঃ তাজকোম্পানী, ১৯৯১), পৃ. ১২৪।

রাজনৈতিক। দেওবন্দ ও আলীগড়ের মতাদর্শ ও শিক্ষাদর্শনের মধ্যে ব্যপক ব্যবধান থাকলেও প্রতিষ্ঠাতা হযরত নানতুবী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খানের পারস্পরিক সম্পর্কে কখনো অপ্রীতিকর হয়নি। ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা কিংবা বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চাকে দেওবন্দী আলিমগণ কখনো হারাম ফতোয়া দেননি। তাঁরা বলেন ইসলামের দৃষ্টিতে আকীদা ও চিন্তাধারা অক্ষুন্ন রেখে যে কোন ভাষা শিক্ষা করা বৈধ এবং শরীআতের দৃষ্টিতে হারাম নয় এমন বৈষয়িক যে কোন বিদ্যার চর্চা করা যাবে।[৩০]

এ সকল সংগঠনের কর্মকান্ডে ইংরেজরা অনুমান করতে পারে যে, দীর্ঘদিন আর ভারত বাসীদের কণ্ঠস্বরকে দাবিয়ে রাখা যাবেনা। এমন একটি দল প্রতিষ্ঠা করতে হবে যারা অন্তরে ব্রিটিশদের স্বার্থ রক্ষা করবে এবং বাহ্যিকভাবে ভারতীয় দাবি দাওয়া তুলে ধরবে। এ উদ্দেশ্য ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন ব্রিটিশ সরকারি কর্মকর্তা এলান অক্টোভিয়ান হিউমাকে পরামর্শ দেন যাতে তিনি এমন একটি সংগঠন গড়ে তোলেন যার মাধ্যমে ভারতীয়রা তাদের চাহিদা ও দাবি দাওয়া সমূহ সরকারের কাছে পেশ করতে পারবে। এলক্ষ্যে ১৮৮৫ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পেছনে লর্ড ডাফরিনের যে গূঢ় অভিসন্ধি ছিল তা হল, ভারতীয় সাম্রাজ্যে এমন এক দল গঠন হবে যে দল হবে ব্রিটিশের পদলেহনকারী, চাটুকার এবং চিরস্থায়ীভাবে তাদের রাজস্ব স্থায়ী করার সহায়ক শক্তি। এ প্রেরণা থেকেই এদল শাসকদেরকে তাদের কাজকর্ম সম্পর্কে সচেতন করবে। কিন্তু লর্ড ডাফরিনের এই উদ্দেশ্য পূরণ হয়নি। বরং এই কংগ্রেস ব্রিটিশদের মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাড়ায়। কারণ, পুনেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ১ম অধিবেশনে যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঘোষিত হয় তা হল ঃ

ক. উপমহাদেশের বিভিন্ন গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়কে এক ও অভিন্ন জাতিতে গঠন করা।

খ. ভারতবাসীর জন্য যে অবস্থা ও পরিস্থিত ক্ষতিকারক ও অন্যায় তা সংস্কার ও সংশোধন করা এবং এ পদ্ধতিতে ভারত ও ইংল্যান্ডের মাঝে ঐক্য সুদৃঢ় করা।

গ. বিভিন্ন জাতির সম্মিলনে ভারতীয় যে জাতির সৃষ্টি হবে সে জাতির মজ্জাগত, চরিত্রগত এবং রাজনৈতিক যোগ্যতা পুনরুজ্জীবিত করা।

কংগ্রেস যে সকল জাতির সমন্বয়ে সম্মিলিত ঐক্যের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয় তা ব্রিটিশদের কোনমতেই কাম্য ছিলনা। ব্রিটিশ ও East India Company তাদের পুরো শাসনকালেই ভারতীয় সম্মিলিত ঐক্য যাতে গড়ে উঠতে না পারে সেজন্য Divide & Rule” নীতি অবলম্বন করেছিল। কারণ বিষয়টি তাদের সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের জন্য হুমকি হয়ে ওঠার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। এজন্য মুসলমানরা যাতে কংগ্রেসে যোগদান হতে বিরত থাকে এজন্য তারা বিভিন্ন প্রচারণা চালায়। যেমন, কংগ্রেসকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে সংগঠন হিসেবে অভিহিত করে এতে মুসলমানদের যোগদানের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে এবং যেখানে হিন্দুদের হাতে নেতৃত্ব

---

[৩০] সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানী, নকশে হায়াত, ২য় খন্ড (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে দীনিয়্যা, ১৯৫৪), পৃ. ২৫৭।

থাকবে সেখানে মুসলিম সংহতির বৈধতা নিয়েও তারা মুসলমানদের মনে সন্দেহ প্রবেশ করিয়ে দেয়। আবার, মুসলমানরা ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হবার কারণে হিন্দু মুসলিম সংহতি তাদের জন্য বিশেষ মঙ্গল জনক হবেনা এই মর্মে তাদের মধ্যে হীনমন্যতা জাগিয়ে তোলে। এই হীনমন্যতা হতেই পরবর্তীকালে ১৯০৬ সালে মুসলমানদের দাবী আদায়ের স্বতন্ত্র সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগের জন্ম হয়।

১৮৮৫ সালে নবগঠিত কংগ্রেস যখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহবান জানায়, দারুল উলুম দেওবন্দ তখন এই আহবানে সাড়া দিতে ক্রটি করেনি। সেই সময় দারুল উলুমের অধ্যক্ষ ছিলেন মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী। তিনি এ সম্পর্কে তার মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, শাহ আবুল আজিজের ফতওয়া অনুযায়ী ভারত হচ্ছে দার-উল-হরব অর্থাৎ যুদ্ধরত দেশ। কাজেই এই বিদেশী দখলদার শক্তিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করা প্রত্যেকটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। হিন্দুদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে তিনি এই মতামত ব্যক্ত করেন যে, বৈষয়িক ব্যাপারে জাতীয় উদ্দেশ্য সফল করার জন্য মুসলমানরা শরীয়তের বিধান অনুযায়ী হিন্দুদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। সেই কারনে তিনি ভারতের মুসলমানদের কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করে চলতে উপদেশ দেন। কিন্তু ব্যাক্তিগত ভাবে তিনি নিজে এর বাইরে থাকেন। কেননা তিনি ছিলেন পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শে বিশ্বাসী, কিন্তু কংগ্রেস তখনো সেই আদর্শকে গ্রহণ করেনি। দেওবন্দের উলেমারা সম্পূর্ণ একমত হয়ে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, বিভিন্ন সম্প্রদায়কে নিয়ে একটি জাতির সৃষ্টি করে তোলা ইসলামী জাতির বিরোধী নয়।[৩১]

মাল্টার কারাগার হতে শায়খুল হিন্দ ফিরে আসার পর দেওবন্দী আলেমগণ সশস্ত্র আন্দোলনের সুযোগ না থাকায় সাংগঠিনক আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। অখন্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দু-মুসলিম সংহতির ভিত্তিতে যে মুক্ত ভারতের স্বপ্ন তারা দেখেছিলেন তা বাস্তবায়িত করার জন্য দেওবন্দী উলামাদের সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ, মুসলিমপন্থী সংগঠন মুসলিম লীগের পরিবর্তে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক কংগ্রেসকেই তারা সমর্থন করেছিলেন। ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ যখন নিজেদের স্বার্থ রক্ষার খাতিরে নিজেদের নীতি পরিবর্তন করে তখন দেওবন্দী উলামাবৃন্দ তাদের সমর্থন দেন এবং মুসলিম লীগ প্রার্থীদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচারণা চালান। কিন্তু নির্বাচনের পর মুসলিম লীগ পুনরায় স্বমূর্তিতে ফিরে গেলে তারা লীগের সমর্থন পরিত্যাগ করেন এবং কংগেসের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। একারণে দেওবন্দী উলামাবন্দ বিশেষ করে হুসাইন আহমদ মাদানী মুসলিম লীগের উগ্র সমর্থকদের আক্রমন, জুলুম ও নির্যাতনের শিকার হন। কিন্তু নির্যাতনের মাধ্যমে তাদের চিন্তাধারাকে দমিয়ে রাখা যায়নি।

এভাবে ভারতবর্ষের উলামা শ্রেণীর প্রায় সম্পূর্ণ অংশ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের আহবান জানান। উলামা শ্রেণীর এ আহবান মুসলমানদের মধ্যে ধীরে হলেও

[৩১] সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩২।

ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। উদাহরণ স্বরূপ বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন দু'জন মুসলমান অংশগ্রহণ করে। কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল তেত্রিশ। ১৮৯০ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশনে উপস্থিত ৭০২ জন প্রতিনিধরি মধ্যে ১৫৬ জন ছিলেন মুসলমান, যা ছিল মোট সদস্যের প্রায় ২৫% ।[৩২]

৭.১.৬ ইসলামী আকীদার পুনরুদ্ধার

দারুল উলুম দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাকালেই এর অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষে ইসলামী চেতনার ও মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবন। এ কারণে দেওবন্দ আন্দোলনের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ছিল ইসলামী আকীদার পুনরুদ্ধার, কারণ, পূর্ণাঙ্গ ইসলামী জ্ঞান ও আকীদার শিক্ষণ ব্যতিরেকে কোন শিক্ষার্থীর ঈমান মজবুত হবে না এবং সে পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতির মোহের সাথে লড়াই করতে সক্ষম হবে না। এজন্য দারুল উলুমের পাঠ্যক্রমে ধর্ম ও নৈতিকতার অধ্যয়নকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইসলামী আকীদার পুনরুদ্ধার প্রসঙ্গে বলেন,

যদি পরিস্থিতি ও উপকরণের সুবিধা থাকত তাহলে আমি যুদ্ধ করে হলেও মুসলিম সমাজে সংস্কার সাধন করতাম।[৩৩] ওয়ালীউল্লাহী মতাদর্শের প্রভাবাধীন দেওবন্দের উলামাগণ সত্য ও ন্যায়ের সেই আদর্শকেই দৃঢ়ভাবে ধরে রাখেন যেটি ভারতীয় মুসলমানদের কর্মসূচী হিসেবে ইমামুল হিন্দ শাহ ওয়ালীউল্লাহ পূর্বেই চিহ্নিত করে দিয়েছিলেন। ধর্মীয় কর্মকান্ড ও ইবাদতের বিভিন্ন ভুলত্রুটি সংশোধনের লক্ষ্যে দেওবন্দের আলিমগণ বহু পুস্তক প্রণয়ন করেন যাতে মুসলমান ধর্মীয় নিয়মনীতি সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে পারে। ১৯২০-১৯২২ সালে খিলাফত ও কংগ্রেস যখন বন্ধুত্ব, মিত্রতা, সংহতির বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন শুদ্ধি সংগঠন, আর্য সমাজ প্রভৃতি কট্টরপন্থী হিন্দু সংগঠন সাদাসিধে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার প্রয়াস চালায়। Divide & Rule Policy কে পুনরায় ব্যবহার করে স্বামী সারদানন্দ কে প্ররোচিত করে ব্রিটিশরা হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনষ্ট করার জন্য এই প্রয়াস চালিয়েছিল। আর্য সমাজের প্রোপাগান্ডায় আগ্রার রাজপুতগণ, মথুরা, এতাহ, ইতাওরা, কানপুর, ফারুকাবাদ, গুরুগাও, মইনপুরী, মালকানা প্রভৃতি অঞ্চলের প্রায় সাড়ে চার লক্ষ নওমুসলিমকে 'শুদ্ধিকরণ' করে হিন্দু ধর্মে ফিরিয়ে নেয়।

দারুল উলুম এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায় এবং কংগ্রেসের কাছে এর বিরুদ্ধে স্বারকলিপি প্রদান করে। তাদের এই গণধর্মান্তরের বিরুদ্ধে দেওবন্দী উলামাগণ আগ্রাকে কেন্দ্র করে মাওলানা মীরাজ শেখের নেতৃত্বে ইসলামের প্রচার কার্যক্রম শুরু করেন। জনগণের কাছে বোধগম্য করে ইসলামের বার্তা তুলে ধরার জন্য সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী মৌলভী আবু রেহমাতকে দেওবন্দে নিয়োগ দেয়া হয় যিনি আর্য সমাজের সদস্য ছিলেন এবং পরবর্তীতে ইসলামে দীক্ষিত হন। দেওবন্দের এ সব কার্যক্রমের ফলে বহু এলাকায় আবার ইসলামের প্রভাব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

[৩২] Pattabhi Sitamaya, *History of the Indian National Congness* Vol-1 (New Delhi: 1969), p. 18.
[৩৩] শাহ ওয়ালীউল্লাহ, *তাফহীমাত*, ১ম খন্ড (লাহোরঃ কওমী কুতুবখানা, ১৯৬৪), পৃ. ১০১।

১৯২৭ সালে দেওবন্দের প্রখ্যাত আলিম মাওলানা ইলিয়াস কান্দলভীর নেতৃত্বে ভারতে 'তাবলীগ জামাত' এর আন্দোলন শুরু হয়। দ্বীনের দাওয়াত ও ধর্মীয় নব জাগরণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত এই সংগঠনটির বিশেষত্ব ছিল মুসলমানদের সনাতন সুন্নী ইসলামের দিকে আহ্বান জানান। তারা বিশেষ করে ধর্মীয় বিধি পোশাক আশাক ও ব্যক্তিগত আচার আচরন সম্পাদনে সহীহ্ সুন্নী তরীকার অনুসরনকে গুরুত্ব প্রদান করতেন।

৭.১.৭ বিভিন্ন দেশে মিশন প্রেরণ

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমর্থন দানের জন্য এবং বৈশ্বিক জনমত গঠনের জন্য দেওবন্দ আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা মাহমুদ হাসান জাপান, চীন, বার্মা, ফ্রান্স ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশে বিশেষ মিশন প্রেরণ করেন। এ মিশন প্রেরণের সময়কাল ছিল ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যবর্তী সময়।[৩৪] এসব মিশন প্রেরণের কারণ, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকার ও জনগণের সমর্থন লাভের জন্য সে সময়ে মিশন ও দূত প্রেরণ ব্যতীত অন্য কোন ব্যবস্থা ছিলনা। এসকল মিশন প্রেরণে প্রত্যক্ষ ভাবে উল্লেখিত হয় দিল্লীর প্রখ্যাত নেতা হাকীম আজমল খান ও ডাঃ মুখতার আহমেদ আনসারীর নাম কারণ তাঁরা ছিলেন শায়খুল হিন্দের ভারতীয় বিপ্লবী দলের উপদেষ্টা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এসব মিশন প্রেরণের নেপথ্যে ছিলেন শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান নিজেই।

এসকল মিশনের মধ্যে মাওলানা মকবুলূর রহমান ও শওকত আলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি মিশন চীন ও বার্মা গমণকরে। অধ্যাপক বরকত উল্লাহর নেতৃত্বে ৫ সদস্যের একটি মিশন জাপানে প্রেরিত হয়। চৌধুরী রহমত আলী পাঞ্জাবী ৩ জন সদস্য নিয়ে ফ্রান্স মিশনে যান। ৬ সদস্যের একটি মিশন হরদয়ালের নেতৃত্বে আমেরিকায় পৌছে। এসকল মিশন বিপ্লবের পক্ষে কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।[৩৫] এসকল মিশনের পক্ষ হতে বার্মার 'ইনসানে বেরাদরী', জাপানে ''ইসলামিক ফ্রেটারনিটি'' ফ্রান্স ও আমেরিকায় 'গদর পার্টি' প্রভৃতি সংগঠন স্থাপন করা হয় যা স্থানীয় জনগণের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র পত্রিকা যেমন-মাসিক আল-ইয়্যাকীন, ইনকিলাব, 'ইসলামিক ফ্রেটারনিটি, গদর প্রভৃতি বের করে এর মাধ্যমে ভারতের প্রকৃত অবস্থা জনগনের কাছে তুলে ধরে বিপ্লবী চেতনার প্রসার ঘটাতে ভূমিকা রাখে।

৭.১.৮ ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ছড়িয়ে দেয়া

শায়খুল হিন্দের বিপ্লবী সংগ্রামী কর্মসূচী শুধু ভারতকে কেন্দ্র করেই পরিকল্পিত ছিলনা। দেশে তার একান্ত অনুসারিদের মাধ্যমে তিনি একদিকে অভ্যন্তরীন বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন অন্যদিকে প্রতিবেশী মুসলিম পরাশক্তি আফগানিস্তান ও তুরস্কের ক্ষমতাসীন সরকারের সাথে ঐক্য গঠন করে বহিরাক্রমন চালিয়ে ভারতে পূনরায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার চিন্তা করছিলেন। এই সূদূর প্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে তিনি তার দুই

[৩৪] আবদুর রহমান, *তাহরীকে রেশমী রুমাল* (লাহোর: ক্লাসিক, ১৯৬০), পৃ. ১৩৮।
[৩৫] মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী জীবন ও কর্ম* (ঢাকা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২), পৃ. ২৪-২৭।

বিশ্বস্ত ও অনুগত শাগরেদ মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা মুহাম্মদ মিয়াঁ মনসুর আনসারীকে আফগানিস্তানে আমীর হাবিবুল্লাহর কাছে প্রেরণ করেন যাতে তারা আমীরকে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে ভারত আক্রমনে সম্মত করাতে পারেন। ভারতের বাইরে উত্তর পশ্চিম সীমান্তবর্তী অঞ্চল ইয়াগীস্তানে হতে তিনি বিপ্লবের সূচনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এ অঞ্চলের বহু শিক্ষার্থীদের শিক্ষা প্রদান ও বিপ্লবী চেনতায় উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বহু পূর্ব হতেই সশস্ত্র আন্দোলনের ক্ষেত্র হিসেবে প্রস্তুত করছিলেন। চূড়ান্ত পর্যায়ে সীমান্ত অঞ্চলের মুজাহিদদের সংগঠিত করার জন্য তিনি প্রেরন করেছিলেন হাজী সাহেব তুরঙ্গযয়ী ও মুল্লা সান্তাকের মত অত্যন্ত জনপ্রিয় নেতাদের। আর মুসলিম জাতির আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল তুরস্কের সমর্থন ও অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য শায়খুল হিন্দ নিজে হিজাজে গমন করেন। সেখানে তুরস্কের যুদ্ধমন্ত্রী ও সেনানায়ক আনওয়ার পাশার সাথেও তিনি বৈঠক করেন এবং তাদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন।

ভারতবর্ষের জিহাদী জনগনের উৎসাহ বৃদ্ধির ও শায়খুল হিন্দের সর্বতো সহায়তা করার জন্য আনওয়ার পাশা ও হিজাযের তুর্কী প্রতিনিধি গালিব পাশা দুটি খোলা চিঠি প্রেরণ করেন যা আনওাযরনামা ও গালিব নামা নামে ইতিহাসে সমধিক পরিচিত। তুর্কী খিলাতফ কর্তৃক ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম এর অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে শায়খুল হিন্দের অনুমোদন ভারতবর্ষে মুজাহিদ শ্রেণীর মনোবল শতগুণে বাড়িয়ে দেয়। শায়খুল হিন্দ তার আন্দোলনের আন্তর্জাতিক পর্যায়টিকে অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পাদন করলেও দুর্ভাগ্যক্রমে রেশমী রুমালে লিখিত উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর পত্রটি ফাঁস হয়ে গেলে শায়খুল হিন্দের দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

সকল শ্রেণীর জনগণের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রচারণা ও তাদেরকে স্বাধীনতার চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা দেওবন্দ মাদ্রাসার অন্যতম লক্ষ ছিল। দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ভারতবর্ষের মুসলিম শ্রেণীর মধ্যে প্রথমে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারণা চালান। মাওলানা মাহমুদ হাসানের শিক্ষার্থীবৃন্দ জিহাদের বাইআত গ্রহণকরে দেশের অভ্যন্তরে এই ব্রিটিশ বিরোধী চেতনার বিস্তারে ভূমিকা রাখেন। মাওলানা ফযলে রাব্বী, মাওলানা ফযল মাহমূদ এবং মাওলানা মুহাম্মদ আকবর তার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সক্রিয় সদস্য ছিলেন। মওলানা আব্দুর রহীম রায়পুরী, মওলানা খলীল আহমদ, মওলানা মুহাম্মদ আহমদ চাকওয়ালী, মওলানা মুহাম্মদ সাদিক, শায়খ আব্দুর রহীম সিন্ধী, মওলানা মুহাম্মদ ইব্রাহীম রান্দেরী, মওলানা গোলাম মুহাম্মদ দীনপুরী, মওলানা তাজ মাহমুদ আমরূঠী প্রমুখ তার আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। এদের মাধ্যমে মাওলানা মাহমুদ হাসান ভারতবাসীদের মনে আযাদীর প্রতি উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন।

৭.১.৯ দেওবন্দ আন্দোলনের জনপ্রিয়তা

ভারতবর্ষে অন্যান সংগঠন বা দলের মত পরিচিতি তৈরি করতে ভারতবর্ষের উলামা শ্রেণীকে কোন রকম প্রচারনা চালাতে হয়নি। ধনী অথবা নির্ধন সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই ছিল উলামা শ্রেণীর সমান জনপ্রিয়তা, কারণ, তাদের কর্মকান্ড ছিল জনকল্যানমূলক। কোন রূপ আর্থিক স্বার্থের আকাঙখী তারা ছিলেন না।

ইসলামের সুমহান বাণী জনসাধারনের কাছে পৌঁছানোই ছিল তাদের লক্ষ্য। ভারতবর্ষ যখন প্রায় বিনা বাধায় ইংরেজদের করতলগত হয় তার পর ইংরেজ বিরোধী বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সাধারণ মানুষের মনে বাসা বাঁধলেও দীর্ঘদিন সংগঠিত রূপে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেনি। ইংরেজ ও ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের প্রথম প্রতিরোধ এসেছিল মুসলমান উলামা সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে।

১৮৫৭ সালের মহাসংগ্রামে উলামা শ্রেণী প্রত্যক্ষ অংশগ্রহনের কারনে বিপ্লবে সাধারণ জনগণের সম্পৃক্ততা সম্ভব হয়েছিল আবার ১৮৫৭ সাল পরবর্তী ব্রিটিশ সহিংসতায় আলেমরা যে নৃশংস পরিস্থিতির শিকার হন এবং এর পরে তাদের প্রতি যে জনসাধারণের সহানুভূতির সৃষ্টি হয় তা দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ ঐতিহ্যগত ও পরস্পরাগত ভাবেই লাভ করেছিলেন। ধর্মীয় বিধানের সুষ্ঠুরূপে প্রতিষ্ঠার তাগিদে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ও শাহ আবদুল আজীজের ফতওয়ার ভিত্তিতেই তারা বিধর্মীদের হাত হতে দেশকে স্বাধীন করার সংগ্রামে নেমেছিলেন। দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠাপোষকদের অনেকেই ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন, এদের মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন, হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহজিরে মক্কী, মাওলানা কাসিম নানতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী।

একারণে দারুল উলুম দেওবন্দের মাধ্যমে উলামাবৃন্দ যে সনাতনী ইসলামী শিক্ষা প্রচার ও সংগ্রামী চেতনা বিস্তারের আন্দোলন গড়ে তোলেন এর প্রতি সাধারণ মুসলমানদের বিশ্বাসযোগ্যতা ও আস্থা অটুট ছিল। দেওবন্দের উলামাবৃন্দের জনপ্রিয়তা এতটাই বেশী ছিল যে স্যার সৈয়দ আহমদ ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসে মুসলমনাদের যোগদানের প্রবল বিরোধিতা করলেও দেওবন্দী আলেমদের উৎসাহ দানের কারণে তারা ভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থক এই সংগঠনে যোগদান করে। এই যোগদানের হার ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেয়েছিল। শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসানের সময় দেওবন্দের জনপ্রিয়তা আরো বৃদ্ধি পায়। শায়খুল হিন্দের পাণ্ডিত্য, বিদ্যাবত্তা, প্রসিদ্ধি, মাহাত্ম, অক্লান্ত পরিশ্রম, উৎসৃষ্টতা, একাগ্রচিত্ততা এবং অভ্যন্তরীণ সাহসিকতার ফলে দারুল উলুম দেওবন্দ মুসলিম বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ হিসেবে পরিগণিত হয়।[৩৬]

সাধারণ জনগণের কাছে মাওলনা মাহমুদ হাসান ছিলেন পরম শ্রদ্ধেয় একজন ব্যক্তিত্ব। ১২৮৯ হিজরী হতে ১৩৩৩ হিজরী পর্যন্ত চুয়াল্লিশ বছরে শায়খুল হিন্দের প্রত্যক্ষ শাগরেদের সংখ্যা ছিল এগারশত। এছাড়া সাধারণ শিক্ষার্থী, কিছু কিছু পাঠে অংশগ্রহণকারী এবং পরোক্ষ শাগরেদের সংখ্যা ছিল অসংখ্য। ১৩৩৩ হিজরী তিনি গোপনে মক্কা গমনের প্রাক্কালে শেষবারের মত দেওবন্দের খতমে বুখারীর দু'আর মজলিসে পাঠদান দান সমাপ্ত করার প্রাক্কালে প্রচুর গোপনীয়তা সত্বেও দেখার জন্য বিপুল জনসমাগম হয়।[৩৭] দেওবন্দ আন্দোলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন জমিয়াতুল আনসার যার প্রতিষ্ঠা শায়খুল হিন্দের মাধ্যমেই হয়েছিল। এ সংগঠনের প্রথম

---

৩৬ মুফতী আযীযুর রহমান বিজনৌরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭০।

৩৭ সাইয়্যেদ আসগর হুসাইন, *হায়াতে শায়খুল হিন্দ* (লাহোর: ইদারা ইসলামিয়াঁত, ১৯৭৭), পৃ. ৩৯।

অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রায় দশ হাজার লোকের জনসমাবেশ হয়েছিল। দ্বিতীয় সম্মেলনেও একই পরিমান শ্রোতার সমাগম হয়। শায়খুল হিন্দের আহবানে দেশে রেশমীরুমাল আন্দোলনের যে বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় তা সম্ভব হয়েছিল উলামায়ে দেওবন্দের গণমানুষের কাছ গ্রহণযোগ্যতার কারনেই। মাল্টায় বন্দী থাকাকালীন অবস্থায় দেশের সব এলাকা থেকে উলামাবৃন্দের মুক্তির দাবী উত্থাপিত হয়েছিল। সাধারণ জনগণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গ তাদের মুক্তির দাবিতে লিখিত আবেদন প্রেরণ করতে থাকেন। ১৯১৯ সালে যখন শায়খুল হিন্দের মুক্তির নির্দেশ জারি হয় উপমহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত জনগণ প্রফুল্লচিত্তে আনন্দ উল্লাস করতে থাকে। ১৯২০ সালের ৮ই জুন যখন তিনি স্টিমারযোগে মাল্টা হতে বোম্বে পৌঁছান তখন তাকে এক নজর দেখার জন্য ও মোসাফাহা করার জন্য অগণিত মানুষের ঢল নামে।[৩৮]

শায়খুল হিন্দের মুক্তির পর ভারতবর্ষে এসে যে খিলাফত আন্দোলনে যোগ দেন তাতেও তিনি বিপুল গণসমর্থন লাভ করেন। শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পর তার আন্দোলনকে সামনে অগ্রসর করে শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানী, শায়খুল হিন্দের শিষ্য হিসেবে তিনি জানাশীনে শায়খুল হিন্দ এবং হাদীস শাস্ত্রে পারদর্শীতার কারনে 'শায়খুল হাদীস' উপাধিতে ভূষিত হন, তার কৃতিত্ব শুধু দেওবন্দ নয় বরং সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ এবং মক্কা মদীনায়ও বিস্তৃত হয়েছিল। দেওবন্দের অনেক আলিমগণ মুসলিম লীগের প্ররোচনায় ভিন্নমত অবলম্বন করলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠা ও ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে তিনি জনগণকে এতটাই প্রভাবিত করেন যে, ব্রিটিশ সরকার তাকে বেশ কয়েকবার বিভিন্ন মেয়াদে কারাগারে প্রেরণ করে। তার জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে মুসলিম লীগ ১৯৩৫ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে। তার অনুসারীদের সংখ্যাও ছিল অগণিত। ইসলামর প্রচার, সমাজ ও সভ্যতার সংশোধনে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভূখণ্ডে তিনি কয়েক সহস্র ওয়াজ ও বক্তৃতা প্রদান করেন। ধর্মপ্রাণ ভারতীয় মুসলমানদের জন্য তিনি ছিলেন আর্দশ স্বরূপ, জমিয়তে উলামার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি মুসলিম গণজাগরনের উদ্দেশ্যে যে অনলবর্ষী বক্তৃতা প্রদান করতেন তাতে বিপুল জনসমাগম ঘটত।

৭.১.১০ উলামায়ে দেওবন্দের স্বদেশ প্রেম

দেওবন্দের আলিমগণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনের নিমিত্তে যে আন্দোলন পরিচালনা করেন তার পেছনে কোন স্বার্থ ছিলনা, ছিল নিখাদ স্বদেশ প্রেম। ইসলাম ধর্মে স্বদেশ প্রেমের অনুভূতিকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়াসকে ইবাদতের মর্যাদা দেয়া হয়েছে। দেওবন্দের আলিমগণ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ দেশপ্রেমিক। দেশকে বিদেশী শক্তির কবল হতে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে এর প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশই শামিল হয়েছিলেন ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে। সাইয়্যেদ আহমদ শহীদের আন্দোলন ও শায়খুল হিন্দের আন্দোলন উভয়টিই ছিল দেশকে পরাধীনতার শৃংখল হতে মুক্ত করার

[৩৮] সাইয়্যেদ মুহাম্মদ মিয়াঁ, *আসীরানে মাল্টা* (দিল্লীঃ আল জামইয়াত বুক ডিপো., ১৯৭৬)।

আন্দোলন। মুসলিম সমাজের আন্দোলনের সাধারণ লক্ষ ছিল মুসলিম সমাজের পূণর্জীবন দান। এ লক্ষ্যে মাহমুদ হাসান যে সব রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন তার উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ব্রিটিশ বিরোধী চেতনায় সজাগ করে দেশ মাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে বিপ্লবী যোদ্ধা হিসেবে তৈরি করা। রেশমী রুমাল' আন্দোলনের পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেলে তিনি ও আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নেতৃবৃন্দ কারাবরন করলেও দেশকে স্বাধীন করার যে অনির্বান চেতনা তার অন্তরে প্রোজ্বল ছিল তা দীর্ঘ কারাবরণ ও কঠোর নির্যাতনেও নির্বাপিত হয়নি। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভের পর বোম্বে পৌছে প্রথমেই খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেন। জীবনের অবশিষ্ট সময় জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ, কংগেস প্রভৃতি সংগঠনের সাথে জড়িত হয়ে সমকালিন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনেই নিয়োজিত ছিলেন।

অন্তিম মূহুর্তে তার উক্তি ছিল, মৃত্যুর জন্য দুঃখ করছিনা, কিন্তু দুঃখ হচ্ছে শয্যায় মৃত্যুবরণ করছি। আকাঙ্খা ছিল জিহাদের ময়দানে জিহাদরত অবস্থায় শাহাদাত বরন করব এবং রক্তাক্ত অবস্থায় ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে ইহলীলা ত্যাগ করব। তার এই কথা ভারতের স্বাধীনতার প্রতি গভীর ভালবাসা ও দেশপ্রেমের পরিচায়ক। তার দুই শিষ্য মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ও মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী তার এই দেশপ্রেমের আদর্শকে বুকে লালন করেই আজীবন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী একজন শিখ ধর্মান্তরিত হওয়ার পরও ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে যে অবদান রাখেন, তা নিঃসন্দেহে নজীরবিহীন। দেশকে স্বাধীন করার আন্দোলনে ১৯১৫ সালে কাবুল গমনের পর সাত বছর তিনি কাবুল স্বাধীনতা আন্দোলন সংগঠিত করার প্রয়াস চালিয়েও পর্যাপ্ত সফলতা অর্জন করতে পারেনেনি। কিন্তু তার মত বিপ্লবী নেতার দেশে ফিরে আসা বিপদজনক বিধায় ব্রিটিশ সরকার তার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রাখার দেশপ্রেমের মূল্য তাকে দিতে হয় দুই যুগেরও বেশী সময়। মাতৃভূমি ছেড়ে নির্বাসিত জীবন যাপন করে। প্রবল শক্তিধর ইংরেজদের জেল, যুলুম, নির্যাতন নিপীড়ন কোন কিছুই তাকে আমরণ স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে এতটুকু পিছাতে পারেনি।

শায়খুল হিন্দের অন্যতম সহযোদ্ধা ও পরবর্তী ভারতবর্ষে সমন্বিত জাতিয়তাবাদ ও হিন্দু মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের নেতা মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীও দেশপ্রেমের চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। তার সমগ্র পরিবার মক্কায় বাস করা সত্বেও তিনি শুধুমাত্র শায়খুল হিন্দের অনুরোধে এবং দেশমাতৃকার টানে ভারতে অবস্থান করেন। শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পরও এই আন্দোলনে নেতৃত্ব প্রদান করেন। এছাড়া স্বদেশী পণ্যের বৃহত্তর বিকাশের স্বার্থে তিনি বিলাতী পণ্য পরিহারের আন্দোলন করেন। আজীবন তিনি দেশী খদ্দর পরিধান করতেন এবং ভুলেও কোন বিদেশী পণ্য তার গৃহে এলে তিনি তা ফিরিয়ে দিতেন বা নষ্ট করে ফেলতেন। জানাযার কাফনের কাপড় বিদেশী হলে সে জানাযায় তিনি ইমামতি করেননি, তিনি অত্যন্ত জোর দিয়ে বলতেন, ভারত যদি নিজের উৎপাদিত পণ্যের উন্নতি সাধনে একনিষ্ঠ হয় এবং বিদেশী পণ্যের খরিদ বন্ধ করে

দেয়, তাহলে পৃথিবীর কারো সাধ্য নেই যে, ভারত কে পরাভূত করতে পারে। তিনি আরো বলেন, বাণিজ্যের পথ ধরেই ইংরেজরা ভারতের সিংহাসন দখল করেছে এবং এ পথ দিয়েই ভারতের ধনভাণ্ডার ইংল্যান্ডে পাচার করছে। বিলাতী পণ্যের বাণিজ্যই তাদের সকল উত্থানের বুনিয়াদ, কাজেই এই বুনিয়াদ বিধ্বস্ত করা আবশ্যক। এক পত্রে নিজের নীতি সম্পর্কে তিনি লিখেন, আমার কাছে ইসলাম ও দেশপ্রেম একটি মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত। আমি মুসলমান তথা সকল ভারতবাসীর জন্য দেশী কাপড় ব্যবহার করা এবং বিলাতী পণ্য যথাসম্ভব পরিহার করে চলা আবশ্যক মনে করি।[৩৯] অর্থ-বিত্ত, সম্মান, সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জীবন সামনে থাকা সত্ত্বেও দেশের প্রতি দায়িত্ববোধ হতে মাওলানা মাদানী বেছে নেন সংগ্রামী বন্ধুর পথ। পরিবারের বারবার আহ্বান সত্ত্বেও ফিরে যাননি মক্কায়। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর তার কাছে পাকিস্তানে হিজরতের প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি পরিস্কার ভাবে বলেন, আমি কাউকে চলে যেতে নিষেধ করিনা। তবে মুসলমানদের দুর্যোগের ভিতর ফেলে রেখে নিজে নিরাপদ কোথাও হিজরত করা আমার পছন্দ নয়। আমি দুর্যোগ কবলিত মুসলমানদের সাথেই নিজের বেঁচে থাকা কিংবা মরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।[৪০] শায়খুল ইসলাম হযরত মাদানীর এই এক সিদ্ধান্ত শুধু তার দেশপ্রেমের অনুকরণীয় উদাহরণই স্থাপন করেনি বরং ভারতে মুসলিম অস্তিত্ব টিকে থাকার শক্তিশালী বুনিয়াদ রচনা করে দিয়েছিল।

৭.১.১১ বিপ্লবী চেতনার কেন্দ্রস্থল

ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার উপরই দারুল উলুম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠাতাদের মনে একদিকে যেমন ছিল কুরআন- সুন্নাহর সঠিক শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে ইসলামকে তার মৌলিক রূপে পুনঃপ্রতিষ্ঠার চিন্তা, অন্যদিকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে যখন শিক্ষার্থীবৃন্দ প্রকৃত মুসলিম রূপে গড়ে উঠবে তখন তাদের মনে বিপ্লবী চেতনার উজ্জীবন ঘটিয়ে দেশমাতৃকার মুক্তি সংগ্রামে তাদের শামিল করার পরিকল্পনা। দারুল উলুমের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহর ধর্মীয় চেতনার সংরক্ষণ। এই চেতনা ভারত বর্ষের বিপ্লবী উলামাদের মধ্যে লালিত হয়ে আসছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহর সময় হতেই। মূলতঃ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতেই বিধর্মী শাসন তাদের কাছে অগ্রহণনীয় বলে মনে হয়েছিল। শাহ ওয়ালীউল্লাহ স্পষ্টই রায় দিয়েছিলেন যে, ইসলাম তার ধর্মীয় বিধান ও রাজনৈতিক ক্ষমতা এ দুই ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। কাজেই এ পরাধীন পরিবেশে ইসলাম কখনই সজীবতা ও স্ফূর্তি লাভ করতে পারেনা। তার এ সূত্রটির যুক্তিযুক্ত রূপায়ন ও অনুসরণের মধ্যে দিয়ে তার শিষ্য প্র-শিষ্যবর্গ ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম করে এসেছিলেন।[৪১]

শাহ আব্দুর আযীযের নির্দেশ ছিল, ব্রিটিশ শক্তিকে যদি তারা তাদের তুলনায় অনেক বেশী প্রবল বলে মনে করে অর্থাৎ সংগ্রামে যদি তাদের জয়লাভের আশা না থাকে তবে তারা যেন অন্যান্য স্বাধীন মুসলমান দেশে আশ্রয়

[৩৯] *আর-রশীদ পত্রিকা*, মাদানী ও ইকবালা সংখ্যা, পৃ. ৩৪৩।
[৪০] মুহাম্মদ যাকারিয়্যা, *আপবীতী* (সাহারানপুর: মাকতবায়ে শায়খ যাকারিয়্যা), পৃ. ২১।
[৪১] সত্যেন সেন, *প্রাগুক্ত*।

নেয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবেনা। বাইরের সেই সমস্ত শক্তির সাহায্য নিয়ে নতুন বলে বলীয়ান হয়ে এ দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করতে হবে। বাইরের মুসলমান রাষ্ট্রগুলো যে এ বিষয়য়ে তাদের অকুণ্ঠভাবে সাহায্য করবে এ সম্পর্কে তাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিলনা। শাহ আব্দুল আজিজের এই ফতোয়া ভারতের মুসলমানদের এক অংশের মনে সংগ্রামী প্রেরণা জাগিয়ে তুলেছিল এবং তার এই আহবানে তারা বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল। এই ফতওয়াই ছিল ১৯২০ সাল অবধি ভারতের উলামা শ্রেণীর রাজনৈতিক আন্দোলনের ভিত্তি। বালাকোট যুদ্ধের পর শাহ আব্দুল আজীজের উত্তরসূরী শাহ ইসহাক যখন ১৮৪১ সালে মক্কায় স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে চলে যান তখন ওয়ালীউল্লাহী আন্দোলন চালিয়ে যাবার জন্য তিনি যে চার সদস্য ব্রিটিশ বোর্ড গঠন করেন তার সভাপতি ছিলেন মাওলানা মামলুক আলী। দিল্লী কলেজের শিক্ষক মাওলানা মামলুক আলীর ছাত্র ছিলেন মাওলানা কাসিম নানতুবী, মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী ও স্যার সৈয়দ আহমদ খান।

সিপাহী বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে ভারতের সাধারণ মুসলমান এবং উলেমা শ্রেণীর উপরে যে হত্যাযজ্ঞ চলে তা মুসলিম সমাজের পরবর্তী পথপ্রবাহকে দুই ভাগে বিভক্তকরে দেয়। মাওলানা মামলূক আলীর দুই শিষ্য স্যার সৈয়দ আহমদ ও মাওলানা কাসিম নানতুবী মুসলমানদের দুটি পরস্পর বিপরীত ধর্মী ধারার নেতৃত্ব দান করেন।

অন্যদিকে মাওলানা মামলূক আলীর অপর শিষ্য মাওলানা কাসিম নানতুবী সৈয়দ আহমদের নয়া যুগ চেতনার সাথে খাপ খাওয়ানোর পথ পরিহার করে ব্রিটিশ সরকারকে সম্পূর্ণ উৎখাত করে ইসলামী জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করে ইসলামের পূর্ব গৌরব উজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে শাহ ওয়ালীউল্লাহর ভাবাদর্শ বিকাশের জন্য একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে মনস্থ করেন। ছয়জন ইসলামী ব্যক্তিত্বের উদ্যেগে এই মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা হলেও এর স্বপ্নদ্রষ্টা ও মূল উদ্যোক্তা ছিলেন শামলীর প্রান্তরের অকুতোভয় যোদ্ধা মাওলানা কাসিম নানতুবী ও মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী। পরবর্তীতে দেওবন্দ ও দেওবন্দে হতে শিক্ষা লাভ কৃত নেতৃবৃন্দ মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম ও ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে উজ্জীবিত করার যে আন্দোলন পরিচালনা করে তা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে “দেওবন্দ আন্দোলন” নামে পরিচিত। দেওবন্দ আন্দোলনের আদর্শ ছিল ব্রিটিশ শক্তির সাথে সর্বাত্মক অসহযোগিতা; ব্রিটিশ বিতাড়নই একমাত্র লক্ষ্য। ওয়ালীউল্লাহী ভাবাদর্শে ব্রিটিশ বিরোধী বিপ্লবী চেতনার লালন ছিল দেওবন্দ আন্দোলনের ভিত্তি।

৭.১.১২ মুসলিম নেতৃত্ব ও রাজনীতির সূতিকাগার

দেওবন্দ আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত হয় তৎকালীন শ্রেষ্ঠ উলামা নেতৃবৃন্দ কর্তৃক এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই উদ্ভব ঘটে পরবর্তী মুসলিম রাজনীতির নেতৃত্বদান কারী ব্যক্তিত্বের। দেওবন্দ হতে শিক্ষা লাভ করে তারা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন এবং মুসলমানদের ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে উজ্জীবিত করেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা সর্ব প্রথম ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান হতেই দেওবন্দী আলেমদের ভারতের স্বাধীনতা

সংগ্রামের নেতৃত সূচিত হয় এবং পরবর্তীতে এখান থেকেই উদ্ভব হয় অসংখ্য উলেমা বৃন্দের যারা ইসলামী জ্ঞান অর্জনের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক অঙ্গন উভয় ক্ষেত্রেই সফল পদচারণা করেছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন ঃ-

১) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসিম নানতুবী (রহ:)

২) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ রশীদ আহমদ গঙ্গোহী (রহ:)

৩) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াকুব নানতুবী (রহ:)

৪) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহ রফি উদ্দিন দেওবন্দী (রহ:)

৫) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (রহ:)

৬) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ খলীল আহমদ সাহীরান পুরী (রহ:)

৭) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উবায়দুল্লাহ সিন্ধী (রহ:)

৮) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সাইয়্যেদ হুসাইন আহমদ মাদানী (রহ:)

৯) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী (রহ:)

১০) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ:)

১১) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাব্বীর আহমদ উসমানী (রহ:)

১২) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ আশরাফ আলী থানভী (রহ:)

১৩) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ শাহ আব্দুর রহীম রায়পুরী (রহ:)

১৪) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুফতী আজীজুর রহমান উসমানী (রহ:)

১৫) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস কান্দলভী (রহ:)

১৬) হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মুফতী তাকী উসমানী (রহ:)

১৭) হযরত মাওলানা মুহাম্মাদুল্লাহ হাফেজী হুজুর (রহ:)

৭.২ মূল্যায়ন

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস যেমনই সংগ্রামমুখর তেমনি ছিল দীর্ঘ সময়ব্যাপী। এই দীর্ঘ ইতিহাসে কেবল কংগ্রেসের অবদানই সকলের কাছে গুরুত্ব সহকারে উপাস্থাপিত হয়েছে। অথচ, এ আন্দোলনের প্রথম স্ফুলিঙ্গ উৎসারিত হয়েছিল ভারতের উলামা শ্রেণীর মধ্য হতেই। কিন্তু তাদের অবদানকে ইতিহাসে লক্ষ্যণীয় ভাবে তুলে ধরা হয়নি। পূর্বে আলোচ্য অধ্যায়গুলোতে ভারতে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের গৌরবময় সুতিকাগার হিসেবে দেওবন্দের উলামা শ্রেণীর অক্লান্ত প্রচেষ্টাকে তুলে ধরার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। দেওবন্দ আন্দোলনের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট মূল্যায়ণ করলে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে এই আন্দোলনের মাধ্যমে প্রথমদিকে শুধু ব্রিটিশদের বিতাড়নের সংগ্রাম চললেও পরবর্তীতে তাদের চিন্তাধারা পরিবর্তিত হয় এবং একটি সংগঠিত আন্দোলনের মাধ্যমে অবিভক্ত ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস চালান হয়। এ লক্ষ্যে

দেওবন্দ আন্দোলনের মূলমন্ত্র ছিল হিন্দু মুসলিম তথা সকল দল মত ধর্ম নির্বিশেষে ভারতীয়দের মধ্যে সংহতি ও ঐক্যের বিকাশ ঘটানো এবং একতার বলে বলীয়ান হয়ে আন্দোলন পরিচালনা করে ব্রিটিশদের বিতাড়িত করে ভারতবর্ষের কাঙ্খিত পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার পর হতেই ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত দেওবন্দ আন্দোলন ছিল মূলতঃ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের বিশিষ্ট কেন্দ্র। এই শিক্ষাকেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা হতে শুরু করে বহু শিক্ষার্থী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন, সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছেন।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহে উলামাদের পক্ষ হতে শামলীতে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, বিদ্রোহ দমনের পর তাদের মধ্য হতে হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী ও তাঁর শিষ্য মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গোহী ও মাওলানা কাসিম নানতুবী রক্ষা পান। হাজী ইমদাদুল্লাহ স্থায়ীভাবে মক্কায় পাড়ি জমালেও তিনি তাঁর যে সংগ্রামী শিষ্য রেখে যান তাদের সুদূরপ্রসারী স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় দেওবন্দ মাদ্রাসা যেটির লক্ষ্য ছিল শাহ ওয়ালীউল্লাহ'র ধর্মীয় আদর্শ, শাহ আব্দুল আযীযের ঐতিহাসিক ফতোয়ার অনুসরণে এবং কুরআন ও সুন্নাহ'র মৌলিক জ্ঞান শিক্ষা দানের মাধ্যমে প্রকৃত ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত সংগ্রামী জনগোষ্ঠী তৈরী করা। প্রত্যক্ষভাবে দারুল উলূম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সরাসরি ব্রিটিশ বিরোধীতা না হলেও এর প্রতিষ্ঠাতাদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী মহাসংগ্রামে সরাসরি অংশগ্রহণকারী। এ কারণে ব্রিটিশ বিরোধী মর্দে মুজাহিদ তৈরীর যে গোপন আকাঙ্খা তাদের মধ্যে অব্যক্ত ছিল, ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থার কঠোর নজরদারীতে তা উদ্ভাসিত না হলেও পুনরায় স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করার যে অনির্বাণ শিখা তাদের অন্তরে জ্বলজ্বল করছিল তার প্রত্যক্ষ প্রমান হল দারুল উলূম দেওবন্দের সর্বপ্রথম ছাত্র মাওলানা মাহমুদ হাসান কর্তৃক পরবর্তী কালে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে নেতৃত্ব প্রদান। দারুল উলুম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র মাহমুদ হাসান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামের এমন এক জ্বলন্ত মশাল প্রজ্বলিত করেছিলেন যা তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসূরী উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মৌলভী কিফায়েতুল্লাহ, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী, প্রমুখ নেতাদের হাতে উৎকর্ষ লাভ করে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে এক ভিন্ন মাত্রা প্রদান করেছিল। যদিও দেওবন্দী উলামাবৃন্দ যে অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার দাবিতে তাদের আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন তা কতিপয় মুসলিম জাতীয়তাবাদী নেতাদের কারণে সাফল্য লাভ করতে পারেনি কিন্তু তারা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টি, সমন্বিত জাতীয়তাবাদের ধারণার সম্প্রসারণ ও ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনার নবজাগরণে যে অবদান রাখেন তা সত্যিই অনস্বীকার্য।

ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রধান দুটি দল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের পরিচিতি বেশী হলেও দেওবন্দের উলামাগণ তখন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন যখন কংগ্রেস ও মুসলিমলীগের অভ্যুদয়ই হয়নি। এছাড়া, শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদ হাসান এমন এক সময়ে পরিকল্পিত একটি সশস্ত্র আন্দোলন

সংগঠিত করেন যা অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রের সমন্বয়ের মাধ্যমে পরিপূর্ণ রূপ লাভ করেছিল। উবায়দুল্লাহ সিন্ধীর ৩টি রেশমী রুমালের লিখিত পত্রের নামানুসারে পরবর্তীতে এই সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামকে রেশমী রুমাল আন্দোলন নামে অভিহিত করা হয়। সুপরিকল্পিত এই আন্দোলনটি কার্যকর হবার পূর্বে নওমুসলিম আব্দুল হকের দুর্বলতা ও ব্রিটিশ অনুচর রব নাওয়াজ খানের ষড়যন্ত্রে প্রকাশিত হয়ে পড়লে এ আন্দোলন ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। শায়খুল হিন্দ ও তার অনুসারীরা মাল্টায় কারাগারে বন্দী ও নৃশংসভাবে নির্যাতিত হন। কিন্তু দেওবন্দ আন্দোলনের চেতনা তাদের মনোবলকে এতটাই সুদৃঢ় করে তুলেছিল যে শত নির্যাতনেও তারা তাদের মূলনীতি ও লক্ষ্য হতে পথভ্রষ্ট হয়নি। রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাবার পর পুরো দেশজুড়ে যে ধরপাকড় চলে তাতে দেওবন্দ আন্দোলনের আরো বহু নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। তারা দীর্ঘ কারাভোগের পাশাপাশি কঠোর জিজ্ঞাসাবাদের ও অবর্ণনীয় জুলুমের শিকার হন। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মাওলানা আবুস সিরাজ মুহাম্মদ , মাওলানা তাজ মাহমুদ, মাওলানা মুহাম্মদ সাদিক খান, আবদুল গাফফার খান, মাওলানা খলিল আহমদ সাহারান পুরী, মাওলানা হাদী সহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। তারা দেওবন্দ আন্দোলনের আদর্শে উদ্ধুদ্ব হয়ে এমন সাহসিকতা ও মজবুত ঈমানের পরিচয় দেন যে বল প্রয়োগ করেও তাদের কাছ হতে আন্দোলন অথবা এর সাথে জড়িত নেতৃবৃন্দের নাম ও কর্মতৎপরতা সম্পর্কে কোন তথ্য বের করা যায়নি। বৃহৎ পরাশক্তি ব্রিটিশদের আধুনিক যুদ্ধসরঞ্জাম এর বিপরীতে দেওবন্দ আন্দোলনের চেতনায় অনুপ্রাণিত মুজাহিদরা মৃত্যুভয়কে তুচছ করে নির্ভয়ে যে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এই সকল সাহসী নেতৃত্ব তৈরির পেছনে দারুল উলুম দেওবন্দের অনন্য ভূমিকা ছিল।

দারুল উলুমের মূল উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ আন্দোলনের জন্য মুজাহিদ তৈরির পাশাপাশি ইসলামকে যাবতীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করে তার মৌলিক রূপে পুনঃস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের ঈমানী শক্তি সুদৃঢ় করার জন্য তাদের কুরআন, হাদীস ফিকহ প্রভৃতি ইসলামিক জ্ঞান শিক্ষাদান। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে এই মাদ্রাসা তার আদর্শের বাস্তবায়নে কোন প্রকার শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। প্রতিষ্ঠার স্বল্পকালের মধ্যে এটি শিক্ষা কার্যক্রমের দ্বারা এতটাই প্রশংসিত ও অনুকরণীয় হয়ে ওঠে যে, এর সমআর্দশে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসাগুলির বেশির ভাগ প্রথম দিকে দারুল উলুম দেওবন্দের প্রশাসন বিভাগের সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হত। দেওবন্দের প্রদত্ত শিক্ষার সুনাম ভারত ছাড়াও সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ছাড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে বিদেশী ছাত্ররাও এখানে পড়াশোনা করতে আসত। দারুল উলুমের পাঠ্যক্রম সম্পর্কে মাওলানা নানতুবী বলেন,

বৈষয়িক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সরকার পরিচালিত বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কাজেই যারা বৈষয়িক জ্ঞান আহরন করতে চায় তাদের সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চলে যাওয়া উচিত। আমরা ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৈষয়িক শাস্ত্রসমূহের মিশ্রণ ঘটিয়ে কর্মসূচীকে আধা খেচড়া করতে রাজী নই, দু'দিকের মিশ্রিত শাস্ত্র শিক্ষাদানের ফল দাঁড়াবে যে শিক্ষার্থী কোন দিকেরই পান্ডিত্য অর্জনে সক্ষম হবে না। তাদের না বৈষয়িক

শাস্ত্রজ্ঞান অর্জিত হবে , আর না ধর্মীয় শাস্ত্র। এটি বৈষয়িক শাস্ত্রের প্রতি কোন বিদ্বেষভাব পোষণের কারণে নয় বরং ধর্মীয় শিক্ষাকে নিখুঁত, ত্রুটিমুক্ত ও পরিপূর্ণ রাখার লক্ষ্যেই এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।[৪২] দারুল উলুম দেওবন্দের শিক্ষা আন্দোলন শুধু রাজনৈতিক নেতৃবন্দই নয় বরং বহু বরেন্য ব্যক্তিত্বের জন্ম দেয় যারা নিজ নিজ ক্ষেত্র হতে ভারতের উন্নয়ন সাধনের ব্রতী হন। এক সমীক্ষায় দেখা যায় ১২৮৩ হিজরী হতে ১৩৮২ হিজরী পর্যন্ত একশত বছরের ইতিহাসে দেওবন্দ দেশকে উপহার দিয়েছিল-

১. ৫৩৬ জন শায়খ

২. ৫৮৮৮ জন শিক্ষক

৩. ১১৬৪ জন লেখক

৪. ১৭৮৪ জন মুফতি

৫. ১৫৪০ জন তর্কবিদ

৬. ৬৮৪ জন সাংবাদিক

৭. ৪২৮৮ জন ধর্মবেত্তা এবং ধর্ম প্রচারক

৮. ২৮৮৫ জন হাকীম

Syed Mahbub Rizvi বলেন

> The Dur al-Uloom Deoband arranged such a bouguet of its graduates in which parti-cloured and multi coloumed flowers are providing by their flagrance the means of exhiliration and delisght to the smelling sense of the soul.[43]

ভারতবর্ষে হিন্দু মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় দেওবন্দ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ বিশেষ ভূমিকা রাখেন। ১৯২০ সালের মাল্টার বন্দীশালা হতে মুক্তি লাভের পর শায়খুল হিন্দ জমিয়তে উলামায়ে হিন্দের নেতৃবৃন্দের সাথে একত্রিত হয়ে খিলাফত আন্দোলনের পাশাপাশি কংগ্রেসকে সমর্থন দান করেন। কারণ, তখন একমাত্র কংগ্রেসের মাধ্যমেই ঐক্যবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব ছিল। আর কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই ব্রিটিশদের ভারতে হতে বিতাড়িত করা সম্ভব। হিন্দুদের সাথে আন্দোলনের যোগদানের বৈধতা প্রসঙ্গে তিনি ফতোয়া দেন যে,

'বর্তমান বিপদের সময়ে হিন্দুদের সহমর্মিতা লাভ করা অথবা তাদের সাথে সমঝোতা করা অথবা তাদের সাথে সদাচরণ করা এবং সে সকল হিন্দু আমাদের দুঃখে দুঃখিত হবে এবং সমবেদনা জানাবে তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা শরীআত মতে বৈধ। তবে শর্ত হবে এই যে, এই সহায়তায় যেন শরীআতের বিধানের কিঞ্চিৎ পরিমাণ ব্যাঘ্যাত না ঘটে। তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী শায়খুল ইসলাম সাইয়্যিদ হুসাইন আহমদ মাদানীও আজীবন হিন্দু

[৪২] আসীর আদরবী, *মাওলানা কাসিম নানতুবী হায়াত আওর কারনামে* (দেওবন্দ: শায়খুল হিন্দ একাডেমী, ১৯৯৭), পৃ. ২১৬।
[৪৩] Syed Mahbub Rizvi, *History of Darul Uloom Deobad* (Deoband: Idara E Ihtemam, 1980), p. 312.

মুসলিম মৈত্রীর দৃঢ়মূল আদর্শকে আঁকড়ে ধরেছিলেন। তাঁর হিন্দু-মুসলিম একতার নীতি প্রতি সমর্থন বহু বিতর্কের সৃষ্টি করেছিল। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস ও প্রচার করতেন যে, ধর্মীয় বিভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও এদেশের হিন্দু ও মুসলমানদেরকে সম্মিলিত জাতি হিসেবে দাঁড় করাতে হবে এবং উভয়ের পক্ষে যা কল্যাণকর এমন পন্থা অবলম্বন করে চলতে হবে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন যে, আধুনিক জাতিসমূহ বর্ণ বা ধর্মের ভিত্তিতে নয় বরং ভৌগোলিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। আবার জাতি বর্ণ নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচারের কারণে তারা মুসলিম লীগ ও লীগ পন্থী উলামাদেরও বিরাগভাজন হন। লীগের উগ্র সমর্থকরা তাদের বিভিন্ন স্থানে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ ও লাঞ্ছিত করে। কিন্তু উলামায়ে দেওবন্দ নিজেদের পূর্বসূরীদের নীতি হতে এতটুকু টলেননি। তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি মূলত অসাম্প্রদায়িক চেতনার পরিচয়ই প্রদান করে।

ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারণা, জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী উত্থাপনের কারণে দেওবন্দী উলেমাগণ বিভিন্ন ভাবে নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। মাওলানা মাদানী ১৯২০-১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়কালে চারবার বিভিন্ন মেয়াদে কারাবন্দী হন। এসময়ে তার ওপরে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন। তার অন্যান্য সহকর্মীদেরও বিভিন্ন সময় কারাবন্দিত্বের শিকার হতে হয় যা মূলত তাদের গভীর স্বদেশ প্রেমের পরিচয় বহন করে।

কংগ্রেসের সাথে সম্মিলিত ভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে ভারতের মুসলিম জনগোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষায় তারা ছিলেন সর্বদা সচেষ্ট। জিন্নাহ ভারতের মুসলমানদের সংখ্যালঘু হিসেবে গণ্য করে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের যে পরিকল্পনা করেছিলেন এবং তার বাইরে বিচ্ছিন্ন ভাবে ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে বহু মুসলমানরা বাস করছিলেন তাদের ব্যাপারে কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত না নিয়ে তাদের কে ভাগ্যের হাতে সোপর্দ করেন। জিন্নাহ বিবৃতি দেন যে, আমরা ৫ কোটি মুসলমানদের নিরাপত্তা বিধানের স্বার্থে ৩ কোটি মুসলমানের ক্ষতিগ্রস্থতা সহ্য করে যাচ্ছি। কিন্তু শায়খুল ইসলাম মাওলানা মাদানী ভারতবর্ষের সকল মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে এ মতের বিরোধীতা করেন এবং বলেন ভারতীয় সভ্যতার বিনির্মানে মুসলমানদের অবদান সর্বাধিক। ভারতের মোট জনগোষ্ঠীর মধ্যে তারা এক চতুর্থাংশ হলেও ভারতে ১১টি সুবার মধ্যে ৪টি সুবায় তারা সংখ্যাগরিষ্ট। এ হেন অবস্থায় তাদের কোন অবস্থাতেই রাজনৈতিক সংখ্যালঘু আখ্যা দেয়া যেতে পারেনা। এ থেকেই স্পষ্ট হয় যে দেওবন্দ আন্দোলন ছিল সার্বজনীন।

ভারত বিভক্তির সবচেয়ে কট্টর বিরোধী ছিলেন বিপ্লবী ‘উলামায়ে কিরাম। এই ‘উলামা যারা নিজেদের নেতৃত্ব কিংবা মন্ত্রিত্বের রাজনীতি করেননি, যারা ভারতীয় গণমানুষের মুক্তির জন্য নির্মোহভাবে শতাব্দী কাল থেকে লড়াই করে আসছেন, তাঁরা ভারতের বিভক্তিকে ভারতীয়দের জন্য বিশেষত ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ভয়ানক ক্ষতিকর বিবেচনা করেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল, বিভক্তির ফলে উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ স্থায়ী আসন গেড়ে নিবে। তাছাড়া সুদীর্ঘ কাল থেকে জিহাদকারী মুসলিম বিপ্লবী শক্তিটি খন্ডিত হয়ে সম্পূর্ণ দুর্বল হয়ে পড়বে। তাঁরা আরো উপলব্ধি করেন যে, ভারতকে বিভক্ত করার এই চক্রান্ত বস্তত ব্রিটেন থেকে

সরবরাহকৃত। এশিয়ার উপর কূটনৈতিক আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ব্রিটিশ ভারতকে বিভক্ত করছে। কাজেই যেই ব্রিটিশকে এশিয়া থেকে উৎখাতের জন্য দেওবন্দ প্রতিষ্ঠাতাগণ জীবন ব্যাপী সংগ্রাম করে আসছেন, বিভক্তির মাধ্যমে সেই ব্রিটিশদের হাতেই এশিয়ার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবে, এটা তাঁরা মেনে নিতে পারেননি।

সবচেয়ে বড় কথা, তাঁরা পূর্বেই উপলব্ধি করেন যে, ন্যায্য বিভক্তি তো হবেই না, অধিকন্ত বিভক্তির নামে দাঙ্গা ও রক্তক্ষয়ের যেই সহিংস পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সেটি প্রতিরোধের কোন উপায় থাকবে না। তারপর যারা পাকিস্তানের ভূখন্ডে হিজরত করে তারা সেখানে গিয়েও বিদেশী নাগরিক (মুহাজির) হয়ে থাকবে আর যারা নিরুপায় হয়ে ভারতের মূল ভূখ েরয়ে যাবে তারা সংখ্যালঘু হিসাবে আজীবন নিষ্পেষিত জীবন যাপনে বাধ্য হবে। বিভক্তির কারণে ভারত ভূখ ে অবস্থিত হাজার হাজার বছর থেকে প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের সকল ঐতিহ্য তথা মসজিদ, মাদ্রাসা, গোরস্থান, ওয়াক্ফ সম্পত্তি সব কিছু হিন্দুদের হাতে বিধ্বস্ত হবে। কোন ভূখন্ডেকে এহেন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেওয়া শরী''অতের দৃষ্টিতেও বৈধ নয়। এ সব কারণে বিপ্লবী উলামা খ ান ও দেশ বিভক্তির বিরোধিতা করেন।

১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বাস্তবায়নে ১৯৩৭ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রদেশে ও কেন্দ্রে বিধানসভা এবং মন্ত্রীপরিষদ গঠনের যে সুযোগ দেয়া হয়, তাতে মুসলিম স্বার্থ সংরক্ষণে দেওবন্দের উলামাগণ ভূমিকা রেখেছিলেন।

তাই নির্বাচনের জয়লাভের লক্ষ্যে লীগ দেওবন্দী সংগঠন জমিয়তে উলামায়ে হিন্দকে কাছে টানে। লীগের স্বাধীনতাকামী ভাবধারায় উলামাগণ প্রভাবিত হন এবং ভাবেন যদি লীগ তাবেদারীর চরিত্র হতে মুক্ত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সকলের সাথে যুক্ত হয় তাহলে ভারতে মুসলিম রাজনীতির সবচেয়ে বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। এ কারনে জমিয়তে উলামার নেতৃবৃন্দ ও মাওলানা মাদানী সারা দেশে লীগের পক্ষে গণপ্রচারণা চালান, দেশে উলামা শ্রেনীর যে গ্রহণ যোগ্যতা ছিল তার প্রেক্ষিতে জনগণ লীগকে সাদরে গ্রহণ করে এবং ৩০ এর অধিক লীগ প্রার্থী নির্বাচনে জয়লাভ করে। যা দেওবন্দ আন্দোলনের জনসম্পৃক্ততা ও জনপ্রিয়তাকেই প্রমান করে।

আবার ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ছিল মূলতঃ মুসলমানদেরই দুটি দলের মধ্যকার প্রতিদ্বন্দ্বিতা যার একদিকে ছিলেন অবিভক্তির সমর্থক জমইয়াতে উলামার নেতৃবৃন্দ এবং অন্যদিকে ইংরেজদের আনুকূল্য ভোগী, বিভক্তির সমর্থক লীগ নেতৃবৃন্দ। এই নির্বাচন উপলক্ষে দেশবিভক্তি রোধ করে মুসলিম স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার লক্ষ্যে দেওবন্দের উলামাবৃন্দ মুসলমানদের বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী দলগুলোর সমন্বয়ে একটি জোট গঠন করেন এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য জোটের উদ্যোগে মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠিত হয়। জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ,

অল ইন্ডিয়া মুসলিম মজলিস. অল ইন্ডিয়া মজলিশে আহরার, অল ইন্ডিয়া মুমিন কনফারেন্স , ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি অব বিহার, কৃষক প্রজাপার্টি বঙ্গদেশ, খোদায়ী খিদমতগার, সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি দল এই জোটের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই জোটের সভাপতি ছিলেন হুসাইন আহমদ মাদানী। অবিভক্ত ভারত প্রতিষ্ঠায় তাদের প্রচেষ্টা প্রগতিশীল রাজনীতির পরিচয় বহন করে। তারা অখন্ড ভারতের স্বাধীনতার জন্য চূড়ান্ত মূহুর্ত পর্যন্ত প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, ১৯৪৭ সালের ১০ মে জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দের অধিবেশনে ভারতের বিভক্তির বিরোধিতা করা হয়। কিন্তু মুসলিম লীগের কূটনৈতিক চালের কারণে দেওবন্দী আলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিভাজন তাদের সকল প্রয়াস ব্যর্থ করে দেয়। দেশবিভক্তির পর ভারতবর্ষে অবশিষ্ট মুসলিমরা যে লুন্ঠন, হত্যা, রাহাজানির শিকার হয়, তা রোধ করার লক্ষ্যে দেওবন্দ মাদ্রাসা হতে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান করা হয়। মাওলানা মাদানী সহ দেওবন্দী আলিমরা পাকিস্তানে হিজরত না করে অসহায় মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান তাদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি পুনর্বাসনে সহযোগিতা করেন। এভাবে দেখা যায় যে, দেওবন্দ আন্দোলন এবং এর ঝান্ডাবাহী উলেমা নেতৃবৃন্দ ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক জাগরণের অগ্রদূতের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

অষ্টম অধ্যায়

উপসংহার

উপসংহার

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে উলামাদের ভূমিকা সম্পর্কে খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায়না। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে মাদ্রাসাগুলো হল মৌলবাদীদের দূর্গ, উলামাগণ হলেন ধর্মান্ধতার প্রবর্তক। ইতিহাসের অনেক জায়গায় মুসলমানদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থক আখ্যা দেয়া হয়েছে। ক্রমগ্রসর অধ্যায়গুলোতে আমি ১৮৬৬ সাল হতে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলনে তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠায় দেওবন্দ মাদ্রাসার ভূমিকা সম্পর্কে অধ্যয়ন করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি এবং নিম্নলিখিত উপসংহারে উপনীত হয়েছি। দেওবন্দ মাদ্রাসা ১৮৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ, প্রাচ্যদেশীয় শাসকদের পতন ও দুর্নীতিগ্রস্থ অবস্থা পরিবর্তনের জন্য জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বিপ্লব পরিচালনা করেছিলেন। ১৭৩১ সালে তাঁর মক্কা তিনি সাম্রাজ্যবাদ ও দুর্নীতিগ্রস্থ প্রশাসনকে বদলে ন্যায় ও সাম্যের ভিত্তিতে একটি সরকার গঠন করার স্বপ্নে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এটা চিরন্তন সত্য যে দেওবন্দ মাদ্রাসা সাম্রাজ্যবাদ ও অন্যায়ের তীব্র বিরোধী ছিল। যা এর প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য পর্যালোচনা করে দেখতে পেয়েছি।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন প্রত্যক্ষ করেছেন এবং এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশগুলোতেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে দেখেছেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, রাজ্য ও সাম্রাজ্য বিস্তার প্রবণতাই এই সকল ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী এবং তিনি সমাজ পুনঃনির্মাণ এবং পূনর্গঠনের জন্য কিছু মৌলিক নীতি প্রণয়ন করেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল-বালিগাতে মুঘল সাম্রাজ্য পতনের জন্য দায়ী আর্থ সামাজিক ঘটনাগুলোর উপর আলোকপাত করে এবং সাম্য ও ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গড়ার লক্ষ্যে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে বাস্তবায়নের পরামর্শ দিয়েছেন।

সনাতন আলিমগণ শাহ ওয়ালীউল্লাহর আর্থ সামাজিক বিশ্লেষণ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। তাঁরা ভারতবাসীর দুর্দিনের জন্য মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তুপের উপর গড়ে ওঠা ব্রিটিশ শাসনকে দায়ী করেছেন। উলামাগণ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণের পাশাপাশি ধর্মীয় কুসংস্কার ও ব্রিটিশদের উৎপাদিত পণ্যের প্রভাবে নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তথা দেশীয় কারিগরদের নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার কারণে ব্রিটিশ বিরোধী ছিলেন। এসকল আলিমগণ ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জনগণকে যুদ্ধ করতে অনুপ্রাণিত করেন এবং ভারতকে দারুল-হারব হিসেবে ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার কারণে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা মুসলমানদের ধর্মীয় দায়িত্বে পরিণত হয়। এটি ছিল উলামাদেরই অনুপ্রেরণা, যার ফলশ্রুতিতে ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ হয়। যাকে ব্রিটিশরা সিপাহী বিদ্রোহ এবং দেশপ্রেমিক ভারতীয়রা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করেছেন। সুতরাং তারা ব্রিটিশদের

ভারত থেকে বিতাড়িত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অন্যান্য সম্প্রাদায়ের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশগ্রহণ করেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহে তাঁরা বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে সংগঠিতভাবে যুদ্ধ করেছিলেন। ১৮৫৭ সালে ভারতীয়দের বিদ্রোহ ব্যর্থ হওয়ার পর মাওলানা কাসিম নানতুবী তাঁর ছাত্রদের প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে এবং ব্রিটিশ বিরোধী এক শ্রেণীর মুজাহিদ তৈরি করে ব্রিটিশদেরকে ভারত থেকে উৎখাত করার জন্য ১৮৬৬ সালে দেওবন্দে একটি ছোট মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা নানতুবী নিজে যেমন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন তেমনি তাঁর অনুসারীদের কাছ থেকেও অনুরূপ প্রত্যাশা করেছিলেন। দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল (পাশ্চাত্যের বিশেষ করে ব্রিটিশদের বিকৃত প্রভাব থেকে) ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা করা। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেওবন্দ মাদ্রাসার ব্রিটিশ বিরোধী অবস্থান সুস্পষ্ট যার অন্যতম একটি নিদর্শন হল হলো ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি তাদের প্রকাশ্য সমর্থন। প্রকৃতপক্ষে মাওলানা নানতুবী ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের পর মুসলমানদের বিচ্ছিন্নকরণের ব্রিটিশ পরিকল্পনার পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে দেওবন্দ মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিদ্রোহ পরবর্তী ব্রিটিশ সরকারের কঠোর ব্যবস্থার কারণে মুসলিম সমাজ যখন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছিল তখন তাদের সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ়করণের জন্য নেতৃত্বের অতীব প্রয়োজন ছিল। মাওলানা কাসিম চিন্তা করলেন যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার মত একটি প্রতিষ্ঠানই মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক, সামাজিক আশা আকাংখা পূর্ণ করতে পারে। আর ইসলামের পূর্বাবস্থায় ফিরে যাওয়া এবং ব্রিটিশদের বিতাড়নের এটিই হবে সর্বোত্তম পন্থা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দেওবন্দ মাদ্রাসা ছিল স্যার সৈয়দ আহমদ খানের মতাদর্শ এবং আলীগড় মাদ্রাসা বিরোধী। কারণ স্যার সৈয়দ আহমদ ছিলেন ব্রিটিশ তোষণকারী এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি তার প্রেরণা ছিল। পরবর্তীতে দারুল-উলুম-দেওবন্দ মাদ্রসা প্রতিষ্ঠার যে উদ্দেশ্য ছিল তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অর্থাৎ উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত তথা ভারতীয় জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য দেওবন্দ মাদ্রাসার মুখপাত্র মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী মুসলমানদেরকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য ফতওয়াও জারি করেছিলেন।

দেওবন্দ মাদ্রাসা তথা দেওবন্দী আলিমগণ দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের উদ্যোগ সবসময় ইতিবাচক ফল না দিলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের অঙ্গীকার ছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ। এই প্রসঙ্গে মাওলানা কাসেম নানতুবী, মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত যে, ঐ সময়ে দেওবন্দপন্থী উলামাগণ ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে সরাসরি জড়িত ছিল। দেওবন্দপন্থী উলামাদের মধ্যে রাজনীতিতে সক্রিয় অন্যতম ব্যক্তিত্ব মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীর জীবনী লেখক তার মুখবন্ধে লিখেছেন-ভারত বর্ষের রাজনৈতিক শক্তি এবং সাংস্কৃতিক জীবনের উপর ব্রিটিশ শাসন যে মারাত্মক হুমকি, সে সম্পর্কে উলামারাই প্রথম এদেশবাসীকে সতর্ক করেছিল। তারা এসেছিল বাণিজ্যিক সুবিধার অনুসন্ধান করতে কিন্তু স্থানীয় শাসক

ও রাজন্যবর্গের মধ্যে মতবিরোধের কারণে তারা এই সমৃদ্ধ দেশের শাসকে পরিণত হয়।[১] দেওবন্দ আলিমদের উত্তরাধিকারীদের একটি অংশের মতে, স্কুল/মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতাগণ সরাসরি বিদ্রোহে জড়িত ছিলেন। এমনকি থানা ভবন শহরে পাল্টা সরকার গঠন এবং ১৮৫৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সামরিক বিদ্রোহেও জড়িত ছিল।[২] প্রতিষ্ঠানটির অফিসিয়াল ওয়েবসাইট Dar-ul –Uloom in the fight for freedom এই নামে প্রকাশ করেছে যে,"এই আন্দোলনে জড়িতরা সবসময় পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সংগ্রাম করেনি বরং ভারতের স্বাধীনতার জন্য এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। যদি গভীরভাবে এবং ন্যায়সঙ্গতভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে,তাঁরাই (উলামায়ে দেওবন্দ) এই ধারনার প্রথম ব্যক্তি এবং অগ্রদূত। এই ভদ্রলোকদের অধিকাংশই ইংরেজসরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রেহের নিশান উত্তোলন করেছিলেন, ইংরেজ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধ করেছেন। এছাড়া ভারতের অধিকাংশ স্বাধীনতা আন্দোলনের সাথে উলামা এবং ধর্মীয় ব্যক্তিরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন।[৩]

এটা সত্য যে, দেওবন্দ মাদ্রাসার ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব মাওলানা মাহমুদ হাসান, মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা হোসাইন আহমেদ মাদানীর মত মুসলিম বিপ্লবী বা মুজাহিদ তৈরী করতে সক্ষম তো হয়েছেই পাশাপাশি অসংখ্য ব্যক্তিদের মুজাহিদ হিসেবে তৈরী করতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিল। দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রারম্ভিক সময়ে মাওলানা মাহমুদ হাসান তার শিক্ষকের আদর্শ আকড়ে ধরেছিলেন এবং এককভাবে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। পবিত্র কোরআন এবং হাদীসের উপড় অগাধ পান্ডিত্যেরে জন্য তিনি ব্যাপক খ্যাতি লাভ করেন এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান পদে আসীন হন। মুসলিমরা যখন ব্রিটিশ নির্যাতনের লক্ষে পরিণত হয় তখন মাওলানা মাহমুদ হাসান বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারনা আরম্ভ করেন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে, ভারতীয়রা কখনো তাদের মিশনে সফলকাম হতে পারবেনা, যদি না সীমান্তবর্তী দেশ তথা ইরান এবং আফগানিস্তান তাদের সহায়তা করে। তুরস্কের সামরিক সহায়তার পাশাপাশি তাদের নিকট থেকে সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে ভারত আক্রমনের সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। মাওলানা মাহমুদ হাসানের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের বিশেষ পরিকল্পনা ছিল এবং সরকার তাকে গ্রেফতার করতে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র অব্যহত রাখে। শায়খুল হিন্দ তাঁর বিপ্লবী কর্মকান্ড অব্যহত রাখেন এবং একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়া ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সর্বোত্তম পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯১৫ সালে গ্রেফতার এড়াতে তিনি তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ছাত্র মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী কে কাবুলে প্রেরন করেন এবং তিনি নিজে মক্কায় চলে যান। যেখানে তিনি তুরস্কের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাত করেন। যাঁরা তাকে তাঁর সংগ্রাম সফল করার আশ্বাস

---

[১] Goyal, *Maulana Ahmed Hussain Madani A Biographical study* (New Delhi: Anamika Publications and Distributors, 2004), p. 07.
[২] Barbara D. Metcalf. *Islamic Revival in British India, Deoband. 1860-1900* (ed. II) (New Delhi: 2002), p. 82.
[৩] http://www.darululoom-deoband.org.

দিয়েছিলেন। খায়বার পাস দিয়ে ভারত আক্রমণ সংক্রান্ত বিষয়ে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধী এবং শায়খুল হিন্দের কাপড়ের টুকড়ার মাধ্যমে পত্র বিনিময় হয়। যেটি ইংরেজদের কাছে রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র নামে পরিচিত। মাওলানা সিন্ধী কাবুলে বিপ্লবের দিক নির্দেশনার দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং মাওলানা মাহমুদ হাসানের নির্দেশে সেখানে অবস্থান করেছিলেন। মজার বিষয় হল মাহমুদ হাসানের আন্দোলন আন্তর্জাতিক মাত্রা লাভ করেছিল এবং আরব, তুরস্ক, রাশিয়া , জার্মানীতেও ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া এবং জার্মানীতে সফলভাবে মিশন প্রেরন করা হয়। প্রতুত্তরে এসব দেশসমূহ তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং তাঁর সংগ্রামের প্রতি তাদের সমর্থন জ্ঞাপন করেন। মাওলানা মাহমুদ হাসান তুরস্কের সমর্থনের বিষয়ে আরব বিশ্বকে অবগত করার লক্ষে আরবে ভ্রমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেন। যাহোক মক্কায় শরীফ হুসাইনের তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং রেশমী পত্রের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যাওয়ায় মাওলানা মাহমুদ হাসানের সমগ্র পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। তিনি তুর্কী গভর্ণর গালিব পাশার ন্যায় সীমান্ত জুড়ে মানুষের সমর্থন লাভ করেছেন। এছাড়া গালিব পাশা মাওলানা মাহমুদ হাসানের বিপ্লবী কর্মকান্ডে সমর্থনের আহবান জানিয়ে তাদের নিকট একটি পত্র লিখেন। এই আহবান কাঙ্খিত সাফল্য অর্জন করতে পারেনি কারণ তাঁর এই আহবান শুধু ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। সামগ্রিকভাবে এটি বলা যেতে পারে রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে।

কারণ এটি ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে একটি হুমকির সম্মুখিন করতে পেরেছিল। রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্রের বিশ্লেষণ শেষে বলা যায় যে, ব্রিটিশরা আব্দুল হক নামক একজন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের মাধ্যমে এর শান্তিপূর্ন সমাধান করেছিলেন। যিনি সবকিছু স্বীকার করেছেন। এটি বলা যেতে পারে যে, আপাত দৃষ্টিতে রেশমী রুমাল ষড়যন্ত্র শক্তিশালী মনে হলেও একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী আন্দোলন পরিচালনার মতো উপাদানের যথেষ্ট অভাব ছিল। উলামাদের দ্বারা সৃষ্ট এই ষড়যন্ত্র ধর্মীয় চেতনা এবং শিক্ষকদের আদর্শের উপড় ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। স্বাধীনতার জন্য সিন্ধী র প্রচেষ্টার কোন কমতি ছিলনা। অন্যদিকে এসময় আরবের রাজনৈতিক অবস্থা একটি অপ্রত্যাশিত মোড় নেয়। মক্কার শরীফ হুসাইন ব্রিটিশদের সহায়তায় তুরস্কের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এবং শাইখুল হিন্দ তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর সাথে গ্রেফতার হন। তাঁদেরকে মাল্টায় নিয়ে যাওয়া হয় এবং নিদারুন নির্যাতনের সাথে সদা সতর্ক অবস্থায় কারাগারে রাখা হয়। কিন্তু এসব কষ্ট তাদেরকে আন্দোলন থেকে নিবৃত্ত করতে পারেনি।

শায়খুল হিন্দের মৃত্যুর পর মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী তার মিশন চালিয়ে যান। তিনি বিংশ শতাব্দীতে ভারতে একজন ইসলামী পন্ডিত এবং আধ্যাত্মিক গুরু হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি ভারতের মুসলমানদের জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার পূনর্গঠন করেছিলেন। তিনি সকল নতুন প্রতিষ্ঠান ও প্রযুক্তির পূনর্বিন্যাস করার কাজে অংশগ্রহন করেছিলেন। যেগুলো ঔপনিবেশিক শাসনামলে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসারে এবং রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। একজন প্রশাসক এবং ভারতের

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাদ্রাসার শিক্ষক হিসেবে তিনি একদল খাটি নেতা তৈরি করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যারা তাদের পরবর্তী মুসলমানদের আধ্যাত্মিক এবং নৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ এর প্রেসিডেন্ট এবং দেওবন্দ মাদ্রাসার অধ্যক্ষ হিসেবে মাওলানা মাহমুদ হাসানকে শায়খুল হিন্দ উপাধী দেয়া হয় কিন্তু মাদানী ছিলেন একজন চমৎকার ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন আধ্যাত্মিক ক্ষমতার অধিকারী। চরিত্রের দিক দিয়ে তিনি ছিলেন নবীর বাস্তব প্রতিচ্ছবি। প্রকৃত পক্ষে তাঁর অনুসারীরা তাকে মুহাম্মদ (সঃ) এর বংশধর হিসেবে বিশ্বাস করত এবং তার নামের সাথে সাইয়্যেদ সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন। তবে তিনি এটি গ্রহন করেন নি আবার অস্বীকারও করেননি। মাদানী ছিলেন গান্ধীর অনুরূপ। তিনি খাদি পরিধান করতেন এবং অত্যন্ত সাধারণ জীবন যাপন করতেন। মাদানী নিজে বিশ্বাস করতেন তিনি সম্পূর্ণরূপে ভারতবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত। তিনি সেক্যুলার জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতির উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। মাদানী তাঁর বইয়ে সমসাময়িক ধর্মীয় ঐক্যের বিপরীতে ভৌগোলিক সীমানার ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদের উপড় গুরুত্বারোপ করেছেন। তবে তিনি ধর্মীয় বিশ্বাসের স্বাধীনতা এবং সমানাধিকারের নিশ্চয়তার কথাও উল্লেখ করেছেন। মাদানী সেক্যুলার শব্দটি উল্লেখ করেননি বরং তিনি জাগতিক বিষয়ে সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। আর ধর্মীয় বিষয় সম্প্রদায়ের উপর ছেড়ে দিতে জোর দিয়েছেন। এছাড়া রাষ্ট্র ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকবে এই ফর্মুলা দিয়েছেন।

১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত "জমইয়াতে উলামায়ে হিন্দ" নামে সংগঠনটি ছিল ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন দান এবং মুসলমানদের পক্ষে কথা বলার একটি আলাদা ফোরাম। মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী ৪ দশক ধরে এই সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সমন্বিত জাতীয়তাবাদের সমর্থক ছিলেন। এটি হল ধর্মীয় সম্প্রদায় তথা মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান ও শিখদের সমন্বয়ে গঠিত জাতীয়তাবাদ। যারা তাদের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত জীবন নিজ নিজ প্রথা অনুসারে পালন করবে। রাজনৈতিক জীবনে তাঁর স্বতন্ত্র অবদান হলো তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের জন্য অমুসলিমদের নিয়ে একটি ঐক্য গড়ে তুলেছিলেন।

মাদানী সাম্প্রদায়িক সমস্যার চেয়ে স্বাধীনতার উপর বেশী জোর দিয়েছেন। তিনি মুসলমানদের পক্ষ হতে কংগ্রেসকে সমর্থন করেছেন এবং কোরআনের নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় ঐক্যের উপর গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি ভেবেছিলেন মুসলমানরা যুগ যুগ ধরে এদেশে বসবাস করে আসছে তাই তাদের উচিত অধিকার রক্ষার জন্য ভারতীয়দের সাথে একত্রে বসবাস করা। তিনি মুসলিম লীগের সম্প্রদায়ভিত্তিক স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবির সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। একে তিনি মুসলমানদের জন্য মারাত্মক বিপদ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন কংগ্রেস হলো একমাত্র মূলধারার সংগঠন যেটি মানুষের সাধারণ আশা আকাঙ্খা পূরণ করতে পারে। তাঁর মতে, আমাদের একটি মারাত্মক ভুল হল সাম্প্রদায়িক দলসমূহ কর্তৃক স্বাধীনতা যুদ্ধের পর

হিন্দু মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ সমস্যাকে প্রাধান্য দেয়া। ধূর্ত ব্রিটিশরা এটি অনুধাবন করে এক সম্প্রদায়কে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিত যার ফলে স্বাধীনতা অর্জনে বিলম্ব হয়।

মাদানী তাঁর সহকর্মী আলিমদের কঠোর বিরোধিতার মুখে কংগ্রেসকে সমর্থন দিয়েছেন। সম্প্রদায়গত ঐক্য গঠনে তাঁর প্রচেষ্টা গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, এটি ছিল সময়ের দাবী। তিনি হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের কারণ ও প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন এবং জনগণকে এব্যাপারে সচেতন করে তোলার প্রয়াস চালান। দুর্ভাগ্যবশত মাদানী হিন্দু মুসলিম ঐক্য সৃষ্টিতে ব্যর্থ হন। অন্যদিকে মুসলিম লীগ চূড়ান্ত পর্যায়ে সফল হয়। যাহোক মাদানীর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি এবং এটি তাঁর অনুসারীদের জন্য একটি ট্রাজেডি। মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা যখন দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের দাবী করে সে সময় হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে মাদানীর অবদান ছিল লক্ষ্যণীয়। তাঁর তত্ত্ব ছিল "আধুনিক সময়ের জাতিতত্ত্ব ভূখন্ডের ভিত্তিতে নয়, তাঁর প্রচেষ্টার প্রধান বিষয় ছিল সমাজের সকল শ্রেনীর মাঝে সেক্যুলার জাতীয়তাবাদের সচেতনতা সৃষ্টি করা। যেটি মানুষের সর্বদা কল্যাণ কামনা করে। মাদানী সরাসরি "দ্বিজাতি তত্ত্বে" র বিরোধীতা করেছেন এবং বিভক্তির পূর্বে যৌগিক জাতীয়তাবাদের পক্ষে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তাঁর আদর্শের বিরোধীতাকারী বিশেষ করে আল্লামা ইকবালের বিরোধীতার প্রতিউত্তরে তিনি একটি বই লিখেছেন এবং সেখানে যৌগিক জাতীয়তাবাদের প্রতি বিশেষ জোর দিয়ে সাধারণ মাতৃভূমি, ভাষা, নৃতত্ব এবং রংয়ের ভিত্তিতে যৌগিক জাতীয়তাবাদ গঠন ইসলাম বিরোধী নয় এ মন্তব্য বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। ভারতীয় জাতীয়তাবাদ বিষয়ে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানীর তত্ত্ব ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য মাইলফলক। তিনি জাতি ,ধর্ম, নৃতত্ব ইত্যাদি আবেগের বিপরীতে ঐক্যবদ্ধ জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে স্বাধীন ভারত গঠন করার পরিকল্পনা করেন। তাঁর তত্ত্বের সাথে গান্ধীর "সামাজিক বৈষম্যহীন এবং সামাজিক ন্যায়বিচার, জাতীয় ঐক্য গঠন" এই নীতির যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। মাওলানা মাদানী এখনো বিশ্বের ঐক্য ও অখন্ডতা রক্ষার একজন পথপ্রদর্শক/বাতিঘর।

এটি লক্ষণীয় যে ভারতীয় ইতিহাসে মাওলানা মাদানী স্বল্প পরিচিত। তবে পাকিস্তানে তিনি এখনো তাদের রাষ্ট্র উৎপত্তির শক্তিশালী প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত। পিটার হার্ডি (Peter Hardy) মাওলানা মাদানীর দর্শন বিশ্লেষণ করে উল্লেখ করেছেন "অমুসলিমদের সাথে সমান নাগরিকত্ব এবং অংশগ্রহণের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারে ইসলামী ঐতিহ্যের মধ্যে মধ্যযুগীয় ধারণা থেকে এটি এক বিরাট পরিবর্তন। হার্ডি আরো উল্লেখ করেছেন মাদানীসহ "জমিয়তে উলামায়ে হিন্দ" এর লক্ষ্য ছিল জাতীয় কল্যাণ।

সবশেষে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের জন্য যথাযথ ভূমিকা হলো কোন ধর্মকে প্রাধান্য না দিয়ে রাষ্ট্র গঠন করা। যা হবে স্বাধীন ভারতীয় সংবিধানের মূলভিত্তি। দেওবন্দ মাদ্রাসার রাজনৈতিক চেতনার একমাত্র লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনের উৎখাত তথা ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। আর দেওবন্দপন্থী আলিমগণ ছিলেন একদিকে দেশপ্রেমিক

অন্যদিকে উপমহাদেশে হারিয়ে যাওয়া ইসলামী ঐতিহ্যের পূনরুদ্ধারক। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি শুধু ভারতের স্বাধীনতাই খর্ব করেনি বরং ইসলামের পবিত্র স্থানসমূহের জায়গা দখল করে ইসলামের অবাধ প্রচারের সুযোগ কেড়ে নিয়েছিল। দেওবন্দপন্থী আলিমদের ইসলামের প্রতি অবিচল আস্থা এবং দেশের প্রতি আন্তরিকতা ও ভালবাসা-ই ভারতের স্বাধীনতার দলিল। ইসলামের প্রতি ভালবাসা তাদেরকে সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ করে তোলেনি, তাঁদের দেশপ্রেম ছিল উগ্র জাতীয়তাবাদ/অন্ধদেশহিতৈষিতা থেকে মুক্ত। আজ এই জাতি স্বাধীনতার যে স্বাদ উপভোগ করছে তা বিংশ শতকের প্রথমার্ধের এক মহান ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার ফলাফল। বীরদের আত্মত্যাগ দেখিয়েছে অতীত কিভাবে বর্তমান সৃষ্টির জন্য অপরিহার্য। একটি স্বাধীন জাতি হিসেবে আমাদের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতাকে টিকিয়ে রাখতে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতনতা এবং আত্মপ্রত্যয়ের অধিকার বৃদ্ধির সচেতনতা প্রয়োজন।

গ্রন্থপঞ্জি

প্রাথমিক উৎসসমূহ

উর্দূ ও আরবী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

আজাদ, আবুল কালাম, *গুবার- ই খাতির*, দিল্লীঃ সাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯৩।

আদরবি, আসীর নিজামুদ্দিন, *মা'আসীরে- শায়খুল ইসলাম*, দেওবন্দ, দারুল মুয়ালিফিন, ১৯৮৭।

আব্বাসী, কাজী মোহাম্মেদ আদিল, *তাহরিক ই- খিলাফত*, নিউদিল্লীঃ তারাক্কি-ই-উর্দু ব্যুরো, ১৯৭৮।

আহমেদ, সাইয়্যেদ তুফায়িল, *মুসলমানো কা রোশান মুসতাকবিল*, মুম্বাইঃ মাকতাব আল হক মডার্ন ডায়েরী জোগেশ্বরী, ২০০১।

ওয়াহিদী, রশীদ আল, *শায়খুল ইসলাম মাদানী হায়াত ওয়া কারনামে*, দিল্লীঃ আল জামিয়াত বুক ডিপো, তা.বি.।

মাদানী, হুসাইন অহমদ, *মাকতুবাত ই মাদানী*, দেওবন্দঃ জমজম বুক ডিপো, ১৯৯৭।

--------------- *হামারা হিন্দুস্তান আউর উসকি ফাযায়িল*, নিউ দিল্লীঃ আল জামিয়াত বুক ডিপো, ১৯৪১।

--------------- *খুতবাত ই মাদানী*, দেওবন্দঃ জমজম বুক ডিপো, ১৯৯৭।

--------------- *নকশ-ই-হায়াত*, ভলিউম ১, দেওবন্দঃ মাকতাবা ই দীনিয়াত, ১৯৯৯।

--------------- *নকশ-ই-হায়াত, ভলিউম* ২, দেওবন্দঃ মাকতাবা ই দীনিয়াত, ১৯৯৯।

--------------- *সফরনামা আসীরে মালটা*, লাহোরঃ তাবিব পাবলিশার্স।

--------------- *মুত্তাহিদা কাওমিয়াত আউর ইসলাম*, দিল্লীঃ আলজামিয়াত বুক ডিপো.।

--------------- *মালটা কা কায়দি*, (অনু.) মোহাম্মদ সুলেমান এম. এ, সাহরানপুরঃ মাহমুদুল হাসান রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ২০০০।

--------------- *মুসলিম লীগ কি আথ মুসলিম কাশ সিয়াসি গলতিয়ান*, মারকাযি মুসলিম পার্লামেন্টারী বোর্ড, ১৯৪৫।

--------------- *পাকিস্তান কিয়া হায়*, ভলিউম ২, দিল্লীঃ নাজিম জামিয়াত উলামা হিন্দ, তা.বি.।

মিয়া, সাইয়্যেদ মোহাম্মেদ, *তাহরিকে শায়খুল হিন্দ*, দিল্লীঃ আল জামিয়াত বুক ডিপো, তা.বি.।

--------------- *তাহরিকে রেশমি রুমাল*, দেওবন্দঃ মাকতাবাই জাভিদ, দেওবন্দ, তা.বি.।

--------------- *উলামা-ই-হক আউর উনকি মুজাহিদীনে কারনামে*, ভলিউম ১, দিল্লীঃ আল জামিয়াত বুক ডিপো., ২০০৮।

--------------- *উলামা-ই-হক আউর উনকি মুজাহিদীনে কারনামে,* ভলিউম ২, দিল্লীঃ আল জামিয়াত বুক ডিপো, ২০০৮।

--------------- *আসীরান-ই-মাল্টা,* দেওবন্দঃ কুতুবখানা নাঈমিয়া, ২০০২।

--------------- *উলামা-ই-হিন্দ কি শান্দার মাযি,* দেওবন্দঃ মাকতাবা শায়খুল হিন্দ, দেওবন্দ, তা.বি.।

শাহজাহানপুরী, আবু সালমান, *শায়খুল ইসলাম মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী এক সিয়াসী মুতালাহ,* পাকিস্তান, মজলিশ-ই-যাদগার শায়খুল ইসলাম, ১৯৮৭।

--------------- *হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী কা ফতওয়া-ই- দারুল হারব তারিকি ওয়া সিয়াসি আহমিয়াত*, পাকিস্তানঃ মজলিশ-ই-যাদগার শায়খুল ইসলাম, ১৯৯৫।

--------------- *মুসলমানো কি আফকার ওয়া মাসায়িল-ই আযাদী*, পাটনাঃ খুদা বক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, ২০০৩।

সহায়ক উৎসসমূহ

আদরবি, আসীর নিজামুদিদ্দন, *হযরত শায়খুল হিন্দ হায়াত আউর কারনামে,* দেওবন্দঃ শায়খুল হিন্দ, ১৯৮৮।

আনজুম, খালিক, *মাওলানা আবুল কালাম আযাদ শাকসিয়াত আওর কারনামে,* দিল্লীঃ উর্দূ একাডেমী, ১৯৮৬।

আনসারী, ডাঃ মুখতার আহমদ, *শায়খুল হিন্দ,* দিল্লীঃ আনযুমানে ই আনতে নযরবান্দানে ইসলাম, ১৯১৮।

আনসারী, মাওলানা আবদুল্লাহ, *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী কি সারগুজেস্ত কাবেল*, ইসলামাবাদঃ কওমি ইদারা বড়' ই তাহকিক ও তারীখ সাকাফেত, ১৯৮০।

আরগলি, ফারুক, *ফিকরে ওয়াতান,* দিল্লীঃ ফরীদ বুক ডিপো, ২০১১।

আরশাদ, ড. আলী, *আল্লামা সাব্বির আহমদ উসমানী কা তেহরিক পাকিস্তান মেইন কিরদার*, লাহোরঃ পাকিস্তান স্টাডি সেন্টার পান্জাব ইউনিভার্সিটি, ২০০৫।

আলী, খান সালমান, *জঙ্গে আযাদী মেইন উলামা ই ইকরাম কা হিস্‌সা,* লাখনৌঃ মাওলানা মোহাম্মদ আলী জাওহার ফাউন্ডেশন, ১৯৮৮।

আহমদ, নিজামী খালিক, *হযরত সাইয়্যেদ আহমেদ শহীদ আওর উনকি তাহরিক ই ইসলাহ ওয়া জিহাদ,* রায়বেরেলীঃ দারুর আরাফাত দায়রা ই শাহ ইলমুল্লাহ, ১৯৯১।

ইসলাহী, নাজমুদ্দীন, *সীরাতে শায়খুল ইসলাম*, ১ম ও ২য় খন্ড, দেওবন্দঃ মাকতাবা দীনীয়্যা, ১৯৯৩।

---------------, *মাকতুবাতে শায়খূল ইসলাম* (সংকলিত), ১ম,২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড, গাওজরনাওয়ালা মাদানী কুতুবখানা, তা.বি.।

উদ্দীন, শেখ হাস্‌সাম *ইনকালাব ১৮৫৭: তাসবির কা দোসরা রুখ,* নিউ দিল্লীঃ কাওমি কাউন্সিল বাড়া ই ফারগ ই উর্দূ জবান, ২০০৬।

এবাদী, মাওলানা সাঈদ আহমদ আকবার, *হিন্দ পাক কি তেহরিক ই আযাদী আওর উলেমা ই হক কা সিয়াসি মুয়াকাফ*, লাহোর, জামিয়াত পাবলিশার্স, ২০০৭।

কাসমী, মাওলানা মুহাম্মদ তৈয়ব, *তারিখ দারুল উলুম দেওবন্দ*, করাচীঃ দারুল ইশা'আত, ১৯৭২।

কাসমী, মুফতি আতাউর রহমান, *হিন্দুস্তান কি পেহলি জঙ্গে আযাদী ১৮৫৭ মেইন মুসলমানো কা হিস্‌সা*, শাহ ওয়ালি উল্লাহ ইনষ্টিটিউট, ২০০৮।

কাসমী, হাবিবুর রহমান, *মুখাম ই মাহমুদ*, নিউ দিল্লীঃ জামিয়াত উলামা ই হিন্দ, ১৯৮৬।

---------------- *মাসলা মুত্তাহিদা কাওমিয়াত উলামা ইসলাম কি নজর মেইন*, নিউ দিল্লীঃ মারকায দাওয়াত ই ইসলাম, তা.বি.।

খান, মুহাম্মদ আসলাম, *তাহরিকে আযাদী*, এডুকেশনাল পাবলিশিং হাউস, ২০০৮।

খান, সাইয়্যেদ আহমদ, *রিসালা আসবাব ই বাগওয়াত ই হিন্দুস্তান*, পাটনাঃ খুদা বক্স ওরিয়েন্টাল পাবলিক লাইব্রেরী, ১৯৯৯।

খান, হাফিজ বাবর, *বড়-ই সাঘির পাক ও হিন্দ কি সিয়াসত মেইন উলামা কা কিরদার*, ইসলামাবাদ, ১৯৮৫।

খালিকউজ্জামান, সি. এইচ., *শাহরা ই পাকিস্তান*, করাচীঃ আনজুমান ইসলামিয়া পাকিস্তান, ১৯৬৭।

গুপ্ত, শ্রী মেওয়া রাম, *হিন্দুস্তান কি জঙ্গে আযাদী কে মুসলমান মুজাহিদীন*, নিউ দিল্লীঃ ইদারা-ই-শহীদান-ই-ভাতান প্রকাশন, ১৯৮৮।

জাফর, হাকিম মাহমুদ আহমদ, *শাহ ওয়ালীউল্লাহ আউর উনকি তাযদীদি কারনামে*, আরিব পাবলিশার্স, ২০১১।

----------------, *উলেমা মেদান ই সিয়াসাত মেইন*, লাহোরঃ বাইয়াত উল ইলুম, তা.বি.।

জুবায়রী, মুহাম্মদ আমীন, *সিয়াসত ই মিল্লিয়া*, আগরাঃ আজিজিয়া প্রেস, ১৯৪১।

জিলানী, মানাযির আহসান, *শানে কাসিমী*, পার্ট ২, দেওবন্দঃ জমিয়তে উলামা ই হিন্দ, ১৯৮০।

জেড, আনসারী, *আবুল কালাম আযাদ কা জাহিনী সফর*, দিল্লীঃ নায়ী আওয়াজ, ১৯৯০।

তৈয়ব, ক্বারী, *উলামা ই দেওবন্দ কা দ্বীনি রুখ আওর মাসলাকি মিযাজ*, দেওবন্দঃ ইন্ডিয়া, শো'বা ই নসর ওয়া ইশা'আত (এন.ডি)।

নদভী, সাইয়্যেদ আবুল হাসান আলী, *হিন্দুস্থানী মুসলমান*, দিল্লীঃ আয়না এ আইয়্যাম সে, ১৯৫০।

------------------ *তারীখে দাওয়াত ওয়া আজিমাত*, লক্ষ্ণৌ, মজলিশে তাহকিকাত, ওয়া নশরিয়াতে ইসলাম, ১৯৯০।

নিয়াজি, সাইয়্যেদ নাজির, *ইকবাল কি হুজুর*, করাচীঃ ইকবাল একাডেমী, ১৯৭১।

নোমানী, আবদুল হামিদ, *জামিয়াত উলামা ই হিন্দ মুখতেসার তারিখ ওতারুফ*, দেওবন্দঃ শোবা ই নসর ওয়া ইশহাত, ২০১০।

পারভীন, রোজিনা, *জমিয়তে উলামা ই হিন্দ দস্তবেজাত ই মারকাযি ইজলাশে ই আম ১৯১৯-১৯৪৫*, ভলিউম ১, ইসলামাবাদ, কাওমি ইদারা বরই তাহকিক তারিক ওয়া সাকফাত, ১৯৮০।

ফালাহি, উবায়দুল্লাহ ফাহাদ, *তাহরিক-ই-দাওয়াত ওয়া জিহাদ*, দিল্লীঃ হিন্দুস্তান পাবলিকেশন্স, ১৯৯৬।

ফারুকী, মোহাম্মদ মুজাফফরুদ্দীন, *হিন্দুস্তান কি জঙ্গে আযাদী মেইন মুসলমানো কা হিস্সা*, নিউ দিল্লীঃ আনজুমানে তারাকি উর্দু, ২০০৮।

ফিকরি, সাইয়্যেদ ইব্রাহীম, *হিন্দুস্তানি মুসলমানো কা জঙ্গে আযাদী মেইন হিস্সা*, দিল্লীঃ মাকতাব ই জামিয়া লি, ১৯৯৭।

বরকতি, মাহমুদ আহমেদ, *শাহ ওয়ালী উল্লাহ আউর উনকা খানদান*, নিউ দিল্লীঃ মাকতাবা ই জামিয়া লি, ১৯৯২।

বিজনৌরি, আযিযুর রহমান, *তাযকিরে শায়খুল হিন্দ*, মোরাদাবাদঃ মাকতাবা ফিদাই মিল্লাত, ২০১২।

বিজনৌরী, মুফতী আযীযুর রহমান, *তাযকিরায়ে শায়খুল হিন্দ*, বিজনৌরঃ দারুত তালীফ, ১৯৬৫।

মাদানী, *মিষ্টার জিন্নাহ কা পুরআসরার মু'আম্মা আওর-উসকা হল*, দিল্লীঃ আল জামইয়াত বুক ডিপো, তা.বি.।

মানসুরপুরী, মোহাম্মদ সালমান, *তাহরীকে আযাদী মেইন মুসলিম উলামা আওর আওয়াম কা কিদার*, দেওবন্দঃ কুতুবখানা নাইমিয়া, ২০০৪।

মিয়া, মোহাম্মদ শফী, *১৮৫৭ কি পেহলি জঙ্গে ই আযাদী*, ওয়াকিয়াত ওয়া হাকাইক, নিউ দিল্লীঃ আরিব পাবলিকেশন্স, ২০০৭।

মিয়া, সাইয়্যেদ মোহাম্মেদ, *উলামা-ই-হিন্দ কি শান্দার মাযি*, পার্ট-৫, পার্ট-৬, করাচীঃ মাকতাবা রাশিদীয়া, ১৯৮৬।

মুজাফ্ফর, মির্যা মুহাম্মদ, *আরশ ই আযাদী*, লাহোরঃ মকবুল একাডেমী, ১৯৯৩।

মেহের, গোলাম রসুল, *সারগুজাস্ত ই মুজাহিদীন*, লাহোর, ১৯৫৬।

রহমান, মৌলভী আবদুর, *তাহরীকে রেশমী রুমাল*, লাহোরঃ ক্লাসিক, ১৯৬০।

সিন্ধি, উবায়দুল্লাহ, *কাবুল মেঁ সাত সাল*, লাহোরঃ সিন্ধ সাগর একাডেমী, ১৯৫৫।

হাসান, শায়খুল হিন্দ মাহমুদ, *খুতবায়ে সদারত ইজলাসে জম্ইয়াতে উলামায়ে হিন্দ*, দিল্লীঃ গণিয়ুল মাতাবী, ১৯২০।

হুসাইন, সায়্যিদ আসগর, *হায়াতে শায়খুল হিন্দ*, লাহোরঃ ইদারা ইসলামিয়াত, ১৯৭৭।

বাংলা ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

আবদুল্লাহ, ডঃ মুহাম্মদ, *মওলানা মুহাম্মদ আলী জওহর*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮৬।

আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *মাওলানা উবায়দুল্লাহ সিন্ধী ঃ জীবন ও কর্ম*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯২।

আবদুল্লাহ, ড. মুহাম্মদ, *স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তাধারা*, ঢাকাঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮২।

আহমদ, মাওলানা মুশতাক, *তাহরীকে দেওবন্দ*, ঢাকা: বেফাকুল মাদারিস, ১৯৯২।

আহমদ, এমাজউদ্দীন, *রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কথা*, ঢাকা, ২০১০।

আনিসুজ্জামান, *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, ঢাকাঃ মুক্তধারা, ১৯৬৪।

আলী, রুস্তম, *উপমহাদেশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও দেশ বিভাগের প্রেক্ষাপট*, ঢাকাঃ ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ২০০৪।

আলী, এম. ওয়াজেদ, *বাংলার অর্থনৈতিক ইতিহাস*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশনা, ২০০০।

আলীম, এ.কে.এম., আব্দুল *ভারতে মুসলিম রাজত্বের ইতিহাস*, ঢাকাঃ মওলা ব্রাদাস, ২০১১।

ইসলাম, কাবেদুল, *ইংরেজ আমলে বাংলার প্রশাসনিক সংস্কার ও পূনর্বিন্যাস ১৭৬৫-১৯৪৭*, ঢাকাঃ এডর্ন, ২০১০।

ইসলাম, সিরাজুল, *বাংলার ইতিহাসঃ ঔপনিবেশিক শাসনকাঠামো*, ঢাকাঃ চয়নিকা, ২০০৮।

ইসহাক, মুহাম্মদ, *বাংলাদেশ ও ভারতের ইতিহাস*, ঢাকাঃ মল্লিক ব্রাদার্স, ১৯৬৩।

ইয়াহইয়া, মাওলানা আবুল ফাতাহ মুহাঃ, *দেওবন্দ আন্দোলনঃ ইতিহাস ঐতিহ্য অবদান*, ঢাকাঃ কওমী পাবলিকেশন্স, তা.বি.।

ত্রিপাঠী, অমলেশ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস*, (১৮৮৫-১৯৪৭), ২য় সংখ্যা, কলিকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স লিঃ, ১৯৩৮।

করিম, আবদুল, *বাংলার ইতিহাস (১২০০-১৮৫৭)*, ঢাকা; বড়াল প্রকাশনী, ২০০৮।

খান, মাওলানা মুহিউদ্দীন, *হায়াতে মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী*, ঢাকাঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭৫।

খান, সৈয়দ আহমদ, *ভারতে বিদ্রোহের কারণ*, (অনু.) মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ঢাকাঃ ১৯৭৯।

খায়রাবাদী, ফযলে হক, *আযাদী অন্দোলন ১৮৫৭*, (অনু.) মুহিউদ্দীন খান, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৬৮।

গুপ্ত, রজনীকান্ত, *সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস*, ২য় বাগ, কলকাতা, ১৮৯৩।

গুপ্ত, সুরজিৎ দাস, *ভারতবর্ষ ও ইসলাম*, কলকাতাঃ ডি. এম লাইব্রেরী, ১৯৯১।

জাফর, এস.এম, *মুসলিম শাসিত ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা*, (বাংলা অনু.) রশীদ আল ফারুকী, ঢাকা, ১৯৮৮।

জলীল, এ.এম.এম. আবদুল, *দেওবন্দ আন্দোলন একটি জেহাদ*, ঢাকাঃ ইসলামী গবেষণা কেন্দ্র, ১৯৮৩।

তারাচাঁদ, ডঃ, *ভারতীয় সংস্কৃতিতে ইসলামের প্রভাব*, (বাংলা অনু.) করুণাময় গোস্বামী, ঢাকা, ১৯৮৮।

দে, অমলেন্দু, *বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলকাতাঃ পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯১।

বন্দোপাধ্যায়, শৈলেশ কুমার, *জিন্না/পাকিস্তান/নূতন ভাবনা*, কলকাতাঃ মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১৯৮৮।

বর্মণ, রাখী ও ইয়াসমিন আহমেদ, *ব্রিটিশ ভারতে রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন*, ঢাকা: আজিজিয়া বুক ডিপো., ২০০৫।

বাংলাপিডিয়া, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা, ২০০৩।

মুসা, শায়খ মুহাম্মদ, *উপমহাদেশের মুজাহিদীনের অবদান*, ঢাকা: হোসাইনিয়া লাইব্রেরী, ১৯৭২।

মেহের, গোলাম রসুল, *হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদ*, (বাংলা অনু.) আবদুল জলীল ও মতিউর রহমান নূরী, ঢাকা, ১৯৮১।

মোজলে, লিওনার্দ, *ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের শেষ অধ্যায়*, (বাংলা অনু.) মোয়াজ্জেম হোসেন, ঢাকা, ১৯৭৭।

রহমান, মওলানা মুজীবুর, *মওলানা উবায়দুল্লাহর সিন্ধীর রোজনামচা*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৮৪।

রায়, ড. অতুলচন্দ্র, *ভারতের ইতিহাস*, কলিকাতা: মৌলিক লাইব্রেরি, ১৯৮১।

রহিম, এম.এ. ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ২০১১।

রহিম, এম.এ., বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০১১।

শাসমল, বিমলানন্দ, *ভারত কি করে ভাগ হলো*, কলকাতা, হিন্দুস্তান বুক সার্ভিস, ১৯৯১।

শাহনেওয়াজ, এ. কে. এম., *ভারত উপমহাদেশের ইতিহাস: মধ্যযুগ (মোগল পর্ব)*, ঢাকা: প্রতীক, ২০০৭।

সেন, সত্যেন, *ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের ভূমিকা*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশনালয়, ২০১৩।

হক, মুহাম্মদ ইনাম-উল, *বাংলার ইতিহাস: ভারতে ইংরেজ রাজত্বের সুচনাপর্ব (১৬৯৮-১৭১৪)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯।

------------------ *ভারতের মুসলমান ও স্বাধীনতা আন্দোলন*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ২০০৯।

হবিবুল্লাহ, আবু মহামেদ, *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ১৯৭৪।

হায়দার, জুলফিকার, *বাংলার সশস্ত্র কৃষক সংগ্রাম*, ঢাকা: এর্ডন পাবলিকেশন, ২০০৪।

ইংরেজী ভাষায় প্রণীত গ্রন্থসমূহ

Ahluwalia, B.K. and Ahluwalia Shashi, *Muslims and India's freedom Movement*, Delhi Heritage Publishers, 1985.

Ahmed, Aziz, *Studies in Islamic Culture in the Indian Environment*, London: Clarendon Press, 1964.

Ahmed, Sufia, *Muslim Community in Bengal (1844-1912)* Dhaka, 1974.

Akhanda, Latifa, *Social History of Muslim Bengal*, Dhaka, 1981.

Alam, Mohammad Manzoor, *Hundred Great Leaders of 20th Century,* New Delhi: Institute of objective studies, 2005.

Anil saxena (ed.), *Encyclopaedia of Indian history*, New Delhi: Anmol Publication Ltd., 2006.

Arun, Mehta, *History of Modern India*, Natraj Nagar, ABD Publishers B-16, 2004.

Avril Ann Powell, *Muslims and Missionaries in Pre-mutiny India,* London: Routledge Press Ltd, Taylor and Francis Group, 1993.

Azad, Abul Kalam, India Wins Freedom, Delhi: Oriental Longman Publications, 1988.

Azgar, Ali Engineer, *Indian Muslims*, Delhi: Ajanta Publication, 1985.

Azgar, Ali Engineer, *Islam and Muslims*, Jaipur: Rupa book International, 1985.

Aziz, K.K., *Britain and Muslim India*, London: Heinemann, 1963.

Bampford, P.C., *Histories of the Non-cooperation and Khiiafat Movements,* Delhi, 1974.

Banerji A.C. *Two Nations, The philosophy of Muslim Nationalism,* New Delhi: Concept publishing company, 1981.

Barbara, D. Metcalf, *Hussain Ahmed Madani,* England: One world Publication Oxford, 2009.

Barbara, D. Metcalf, *Islamic Rivival in British India*, Deoband (1860- 1900), (ed. II). New Delhi: 2002.

Barbara, D. Metcalf. *A concise History of Modern India* (2nd.ed.), Cambridge University, 2006.

Bearce, George D. *British Attitudes Towards India, 1784-1858,* London: Oxford University Press, 1961.

Bhattacharya, Sukumar, *The East India Company and the Economy of Bengal from 1704-1740*, London: Luzac, 1954.

Brijen K. Gupta, *Sirajuddaulah & The East India Company: 1756-1757,* Laiden: E.J Brill, 1966.

Chand, Tara *History of freedom movement in India*, Vol. I-IV, New Delhi: Ministry of Information and broadcasting, Government of India, 1972.

Chandra, Bipan, *India Since independence,* Penguin India, 2008.

Chandra, Satish, *History of Medieval India*, Orient Black Swan, 2009.

Chaudhury, K.N., *The English East India Company, The study of an early Joint-stock company,* London: Taylor and Francis group, 1915.

Chopra P.N., *Role of Indian Muslims in the Struggle for Freedom*, New Delhi: Light and Life Publishers, 1979.

Chopra P.N., *Role of Indian Muslims in the Struggle for Freedom*, New Delhi: Light and Life Publishers, 1979.

Chudhary, Muhammad Ali, *The Emergence of Pakistan*, Lahore: Research Society of Pakistan University of the Punjab, 1938.

Coupland, R. *The Constitutional Problem in India,* Oxford, 1944.

Datta, K.K., *Comprehensive History of India,* Vol. XI, People's publishing house, 1985.

Desai, Tripta, *The East Indian Company. A brief Survey from 1599-1857,* New Delhi: Kanak Publications, 1984.

Dodwell, H.H., *Cambridge History of India,* Cambridge, Cambridge University Press, 1932.

Edwardes, Michael, *The Last Years of British India*, World Pub. Co., 1st edition, London, 1964.

Eminent, G. Allana, *Muslim freedom fighters*, Delhi: Neeraj publishing house, 1983.

Farooqi, Diyaur Rahman, *The Ulama of Deoband Their Majestic past*, Karachi, Pakistan, Zamzam Publishers, 2006.

Farooqi, Zaiul Hassan, *The Deoband School and the demand for Pakistan*, Bombay: Asia Publishers, 1963.

Farooqi, Zialul Hassan (n.d.), *Maulana Abul kalam Azad towards freedom*, Delhi: B.R. Publishing co.

Farquharr, J. N., *Modern Religious Movements in India*. Kessinger Publishing, 2003.

Firminger, W.K., *Historical Introduction to the Bengal Portion of the Fifth Report,* Calcutta: Indian Studies edition, 1962.

Gandhi, M.K., *The Story of My Experiments with Truth*, Allabad: Navajivan Press 1956.

Gopal, Ram, *How India struggled for freedom,* Bombay: K. R. Samanthe the book center Pvt. Ltd., 1967.

Gopal, Ram, *How the British Occupied Bengal.* Bombay: Asia publishing house, 1963.

Goyal, *Maulana Ahmed Hussain Madani: A Biographical Study.* New Delhi, Anamika Publishers and Distributors, 2004

Graham, L. Col, *The Life and Work of Syed Ahmed Khan*, Delhi: Reprint, 1974.

Gupta, K.P. Sen, *The Christian Missions in Bengal (1793-1833),* Calcutta, 1971.

Hamid, Abdul, *Muslim Separatism in India: A Brief Surrey (1858-1947),* London: Oxford University Press, 1967.

Hamid, Myra, *The Political Struggles Of The Ulama Of Dar-Ul-Uloom,* Deoband: Identifying and Operationalizing The Traditionalist Approach to Politics.

Haq, Sayyid Moin-ul, *The great Revolution of 1857*, Karachi: Pakistan Historical Society, 1968.

Hardy Peter, *Partners in Freedom and true Muslims, The Political thoughts of some Muslim Scholars in British India 1912-1947*, Lund, Student literature, Quoted by Barbara Metcalf, 1971.

Hardy, Peter, *The Muslim of British India,* Cambridge: Cambridge University Press, 1973.

Hasan, Mushirul, *National and Communal Politics in India (1916-1928),* New Delhi, 1979.

Hassan, Mashrul, *Islam and Indian Nationalism, Reflections on Abulkalam Azad*, Delhi: Manohar Publishers and distributors, 1992.

Hector, Bolitho, *Jinnah, Creator of Pakistan*, John Murray Ltd. London, 1954.

Hestings to Shah Alam, Selections from the letters, Despatches, etc in the foreign Department of the Government of India, 1772-85, Vol. 1, 1890.

Hossain, Mahmood, *The Success of Sayyid Ahmed Shahid: History of the Freedom Movement,* Vol. I, Delhi: Ranaissance publishing House, 1984.

Hunter, W.W., *A History of the British India.* Vol. 1, Vol. 2, Newyork: Longmans, Green and Co., 1966.

Hunter, Willium, Willson, *The annals of rural Bengal,* New York: Leypoldt and Holt, 1868.

Hussain, S. Abid, *The Destiny of Indian Muslims,* Asia Publishing, 1965.

Ikram, S.M. *Indian Muslims and Partition of India,* Delhi: Atlantic Publishers and distributors, 1992.

Ikram, S.M., *History of Muslim Civilization in India and Pakistan: A Political and Cultural History*, Institute of Islamic Culture, 1993.

Ikram, S.M., *Indian Muslims and Partition of India,* New Delhi: Atlantic Publishers and Distributors, 1992.

Ikram, S.M., *Modern Muslim India and the Birth of Pakistan, 1858-1951.* India: Renaissance Publishing House, 1991.

Imdadullah, *The Ulama of Deoband their Majestic Past,* Karachi, Pakistan: Zam Zam Publishers, 1999.

Iqbal, Afzal (ed.), *Selected Writtings and Speeches of Muhammad Ali*, Lahore, 1944.

Iqbal, Mohammad, *Speeches and Statements of Iqbal,* Compiled by A.R. Tariq, Lahore, Sh. Gulam Ali and Sons, 1973.

Islam, Sirajul, *History of Bangladesh 1704-1971,* Vol. 3, Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2nd edition, 1997.

Islam, Sirajul, *The permanent settlement,* Dacca: Bangla academy, Dacca, 1979.

Jalal, Ayesha, *Partisans of Allah: Jihad in South Asia*, Cambridge: MA, Harvard University Press, 2008.

Jalbani, G.N., *Life of Shah Waliullah,* Delhi: Reprint, 1980.

Jones, Monckton, Warren Hastings in Bengal: 1772-1774, Oxford, Clarendon Press, 1918

Kaviraj, Narahari, *Wahabi and Farazi Rebels of Bengal,* India: People's Pub. House, 1982.

Khan, Muin-ud-din Ahmad, *A History of the Faradi Movement in Bengal*, Karachi: *Pakistan Historical Society,* 1965.

Khan, Muin-ud-din Ahmad, *Muslim Struggle for freedom in Bengal,* Dhaka: East Pakistan Govt. Press, 1960.

Madani Asjad, *Role of Jamiat ulama Hind in Freedom struggle,* New Delhi: Jamiat Ulama Hind.

Madani, Asjad, *Role of Jamiat Ulama Hind in Freedom Struggle,* New Delhi: Jamiat ulama Hind.

Madani, Hussain Ahmad, *Composite Nationalism and Islam*, New Delhi: Manohar publication, 2006.

Madani, Hussain Ahmed, *Composite Nationalism and Islam, with an introduction by* Barbara D. Metcalf, Trans. Mohammad Anwar Hussain, Delhi: Manohar, 2008.

Mahajan V.D., *Modern Indian History*, VII ed. New Delhi, S. Chand and Co. Ltd. Ramnagar, 1990.

Majumdar, R.C. , *History of the Freedom Movement In India*, Kolkata: Firma KLM Private Limited, 2004.

Mallick, Azizur Rahman, *British policy and the Muslims in Bengal*, Dhaka: Bangla Academy, 1977.

Metcalf, D. Barbara, *Hussain Ahmed Madani*, England: One World Publication Oxford, 2009.

Metcalf, D. Barbara, *Islamic Revival in British India: Deoband, 1860–1900*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1982.

Miftaahi, Mufti Muhammad Zafiruddin *Dar al–'Ulum Deoband: A brief Account of its establishment and Background.*

Miyan, Syed Mohammed, *The Prisoners of Malta,* Vol. III, New Delhi: Manak Publications, 2005.

Miyan, Syed Mohammed, *The Prisoners of Malta: The Heart rending tale of Muslim freedom fighter in British period*. Trans. Mohammad Anwar Hussain and Hassan Imam, New Delhi: Jamiat-Ulama-i-Hind, 2005.

Mosley, Leonard, *The Last Days of The British Raj*, Jaico Publishing House, Bombay, 1971.

Muhammad, Tariq, *Modern Indian History*, New Delhi: Tata Mc. Graw Hill, 2007.

Mukherjee, Amitabha, *Reform and Regeneration in Bengal (1774-1823)*, Calcutta, 1964.

Mukherjee, Ramkrishna, *The Rise And Fall of the East India Company*, BomBay: Popular Prokashon, 1958.

Mullick, Animesh, Encyclopedia of Indian History, Vol. 25, India: Dominant Publishers And Distributors, 1993.

Nadvi, Syed Abul Hasan Ali, *Saviours of Islamic Spirit*, Nadwa Lucknow: Islamic Research and Publications, 2004.

Nair, P. Thankappon, *British Beginnings in Bengal (1600-1660),* Calcutta: Punthi Pustak, 1991.

Nath, Narendra Law, *Promotion of Learning in India during Muhammadan Rule,* Longmans, Green, 1916.

Qasmi, Burhanuddin, *Darul Uloom Deoband: A Heroic Struggle against the British Tyranny,* Mumbai, Markazul Ma'arif, n.d.

Qureshi, I.H., *A Short History of Pakistan*, Karachi: University of Karachi, 1967.

Qureshi, I.H., *Ulema in Politics*, Karachi, IBS, Ma'aref Ltd, 1972.

Qureshi, Ishtiaq Husain, *The Struggle For Pakistan,* Pakistan: University of Karachi, 1969.

Rahim, Muhammad Abdur, *The Muslim Society and Politics in Bengal, A.D 1754-1947*. Dhaka: University of Dhaka, 1978.

Rahman, Hossainur, *Hindu-Muslim Relation in Bengal 91905-1942,* Bombay, 1974

Rahman, Siddiqui Ziaur, *Freedom Movement and Urdu Prose,* Kanpur: Vikas Pakistan, 2004.

Rajive, Ahir, *A Brief History of Modern India,* New Delhi: Spectrum books publications, 2013.

Razvi, Syed Mahboob, Tr. Prof. Qureshi Murtuza Hasain, *History of the Dar-ul- uloom Deoband vol-.I*, Deoband, Idara-e- Ihtemam Dar-ul- uloom, 1980.

Reetz, Dietrich, *Islam in the Public Sphere, Religious Groups in India, 1900–1947*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Rizvi, Syed Mohboob, Tr. Murtuza Hussain F. Qureshi, *History of Dar-ul-uloom Deoband Vol. II,* Deoband, Idara Ihtemam Dar-ul- uloom Deoband, 1981.

Robert Montgomery Martin, *Historical Documents of Eastern India,* New Delhi, Sundeep Prakashan, 1990.

Rumila, Thapar, *A History of India,* Vol. I, Penguin books, 1990.

Saeed, Khalid Bin, *Pakistan: The Formative Phase*, 2nd, Karachi: Pakistan Publishing House, 1968.

Sanfimoy, Ray, *Freedom Movement and Indian Muslims,* People's publishing house, 1983.

Sen, Sachin *The Birth of Pakistan,* Calcutta, 1966.

Sikand, Yoginder, *Bastions of the Believers: Madrasas and Islamic Education in India*, New Delhi: Penguin India, 2005.

Sinha, Narendra Krishna, *The History of Bengal 1757-1905*. Calcutta: University of Calcutta, History of Bengal Publication Committee, 1967.

Sitaramaya, Pattabhi, *History of the Indian National Congress*, Vol. I, New Delhi, 1969.

Stern, Philip J., *The Company-State: Corporate Sovereignty and the Early Modern Foundations of the British Empire in India,* USA: Oxford University Press, 2011.

Tabassum, Farhat, *Deoband Ulama's Movement for the Freedom of India*, New Delhi: Manak Publication Pvt. Ltd., 2006.

Thompson, E., *The life of Charles Lord Metcalfe*, London, 1937.

Trotter, Lionel J, *Rulers of India - Warren Hastings.* Baker Press, United Kingdom: 2009.

Uma, Kaura, *Muslims and Indian Nationalism: the Emergence of the Demand for India (1928-40)*, Delhi: Manohar, 1977.

Vincent, A Smith, *The Oxford History of India*, Oxford: Clarendon Press, 1919.

Walter T., Wallbank, *A Short History of India and Pakistan*, New York: New American Library, 1958.

Zakaria, Rafiq, *Indian Muslims where they have gone wrong*, New Delhi: Popular Prakashan Bhartiya Bhavan, 2004.

Zakaria, Rafiq, *Rise of Muslims in Indian politics*, Mumabai: Somaiya Publications Pvt. Ltd., 1986.

Zakaria, Rafiq, *The Man Who Divided India*, Delhi: Popular Prakashan, 2001.

Zakaria, Rafiq, *Widening Divide*, Mumbai, Idar-e-Inquilab, Midday publications Ltd., 1997.

পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, রিপোর্ট

মাওলানা রফিক আহমদ ঃ *মাসিক আত-তাওহীদ*, চট্টগ্রাম: আল জামেআতুল ইসলামিয়া, ১৯৮৭।

মাওলানা হাবীবুর রহমান, ঃ *জমইয়াতুল আনসার কে মাকাসিদ*, মাসিক আল কাসিম, ১৩২৯।

অগ্রপথিক (ঢাকা) ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮; সেপ্টে- ১৯৯৫।

আর রশীদ (চট্টগ্রাম) ঃ জামেয়া ওবায়দিয়া নানুপুর, অক্টো ১৯৯৯; জানু-ফেব্রু ১৯৯৮।

আল্-বুরহান, মাসিক, দিল্লী ঃ ডিসেম্বর, ১৯৪৮, একবিংশ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আল হক (চট্টগ্রাম) ঃ দারুল মা'আরিফ, নভেম্বও ১৯৯৭।

আল্-কুর'আন, লক্ষ্ণৌ ঃ এপ্রিল ১৯৭৭।

আল্-কাসিম, মাসিক, দেওবন্দ ঃ দারুল 'উলূম, ১৩২৯ হি., রবীউল আওয়াল সংখ্যা; ১৩৩০ হি.জুমাদাল উলা সংখ্যা; ১৩৩২ হি. সফরসংখ্যা।

আল্-খলীল, দৈনিক, বিজনৌর ঃ আল্-খলীল কার্যালয়, ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯১৮।

আল্-জম্'ইয়াত, ঃ শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৮৫।

আল্–ফুরকান, মাসিক, বেরেলী ঃ মাকতাবা আল ফুরকান, ১৩৫৯ হি., শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ্ সংখ্যা; ১৯৪১ শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ সংখ্যা।

আল্ ফুরকান, লক্ষ্ণৌ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৫; মাচ্ ১৯৭৬।

আল্-বুরহান, মাসিক, দিল্লী ঃ ডিসেম্বর, ১৯৪৮, একবিংশ সংখ্যা, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

আর-রশীদ, লাহোর ঃ দেওবন্দ সংখ্যা, ১৯৭৬।

আর-রহীম, মাসিক, দিল্লী ঃ অক্টোবর, ১৯৬৩; নভেম্বর ১৯৬৬; আগস্ট ১৯৯৬।

ইনসানিয়্যত (ঢাকা) ঃ জামেয়া মালিবাগ- এর বার্ষিকী, ১৯৯২; ৯৩; ৯৪; ৯৫।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন পত্রিকা (ঢাকা) ঃ এপ্রিল-জুন ১৯৮৮; অক্টো-ডিসে ১৯৯৩; এপ্রিল-জুন ১৯৯৬; জুলাই-সেপ্টে ১৯৯৬; জানু-মাচ্ ১৯৯৭; অক্টো-ডিসে ১৯৯৭; জানু-মার্চ ১৯৯৯।

চাটান, দৈনিক, লাহোর ঃ ১ এপ্রিল ১৯৬৫; ৭ জুন ১৯৬৫।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা (ঢাকা) ঃ জুন ১৯৮৩; ফেব্রু ১৯৮৯; জুন ১৯৯১; জুন ১৯৯২; অক্টো ১৯৯২।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জুন ১৯৮৩; ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫।

দিশারী (ঢাকা) ঃ চৌধুরী পাড়া মাদ্রাসার বার্ষিকী, ১৯৯২;৯৩;৯৪;৯৫;৯৬।

দৈনিক আল্-জম্ইয়াত ঃ দিল্লী, শায়খুল ইসলাম সংখ্যা, ১৯৫৮।

দৈনিক আজাদ ঃ কলিকাতা, ফালগুন- ২৪, ১৩৪৫/ মার্চ ৮, ১৯৩৯।

দৈনিক জমীঅত, দিল্লী ঃ ২৬ মার্চ ১৯৮০ সংখ্যা।

নুকূশ, মাসিক, লাহোর ঃ ইদারা ফরূগ, উর্দু, ১৯৬৪, আপবীতী সংখ্যা।

নুর-উদ-দীন, আহম্মদ, (অনুঃ) ঃ শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ ও তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯২।

পাথেয় (ঢাকা) ঃ নভেম্বর ১৯৯৮।

ফয়যুল উলূম স্মরণিকা, ঢাকা ঃ ১৯৯৫।

মুসা, মুহাম্মদ ঃ পাক ভারতের উলামার অবদান, ওসমানিয়া লাইব্রেরী , ঢাকা, ১৯৯১।

মুহাম্মদ ইসহাক ফরিদী, মাওলানা ঃ আযাদী আন্দোলনের বীর সেনানী মাওলানা উবায়দুল্লাহ্ সিন্ধী, দারুল কুরআন শামসুল উলুম মাদ্‌রাসা, চৌধুরীপাড়া, ঢাকা, ৩১ শে আগস্ট ১৯৯২।

মদীনা, দৈনিক বিজনৌর ঃ ২৮ জুলাই ১৯২০।

রোয়েদাদ, দেওবন্দ ঃ দারুল উলূম ১২৮৩ হি.।

রাওল্যাট কমিটি রিপোর্ট, লাহোর ঃ কাশিরাম প্রেস, ডিসেম্বর ১৯১৮।

হামদম, দৈনিক, দিল্লী ঃ ১২ জানুয়ারি ১৯২২।

Al Jamiat weekly (Special issue, Jamiat Ulama Number), New Delhi, Jamiat-Ulama-i-Hind.

Aurangabad Times, Urdu daily, Aurangabad.

Daily, Jang, Karachi, 11 October 2001.

Dhaka University Studies: Dhaka: Dhaka University, December, 1984.

Inquilab, Urdu daily, Mumbai.

Monthly, Al-Rasheed, Lahore (Darul-uloom Deoband No.), February, March, 1963.

Munsif, Urdu daily, Hydrabad.

Silken Letters Conspiracy Case and Who is Who, C.I.D. Report, (ইন্ডিয়া অফিস, লন্ডনে সংরক্ষিত রেকর্ড)।

Siyasat, Urdu daily, Hydrabad Part-IV.

Weekly, Chattan, 13 November 1967, Lahore.

Electronic Sources

Web Sites

http://www.dartmouth.edu/~alnur/ISLAM/GRMUSLIMS/Ali_Nadwi.htm; *Accessed on, 11 January 2013.*

http://www.islaminterfaith.org/aug2002/article.html, *Accessed on, 11 January 2013.*

azharacademey.com/scripts/prod, *Accessed on, 11 May 2013.*

www.sunniforum.com, *Accessed on, 11 May 2013.*

www.deoband.org, *Accessed on, 22 August 2013.*

http://www.rauf96.supanet.com/syed.htm, *Accessed on, 9 March 2014.*

http://baytunur.blogspot.com, *Accessed on 25 March 2014.*

http://islamibook.wordpress.com, *Accessed on 30 June 2014.*

www.ismaeelnakhuda.com, *Accessed on, 14 July 2014.*

www.darululoom.deoband.com, *Accessed on, 10 August 2014.*

www.almahmood.org, *Accessed on, 10 August 2014.*

www.deoband.net/, *Accessed on 20 April 2015.*

www.islam.org, *Accessed on, 7 May 2015.*

http://www.darululoom-deoband.com, *Accessed on 7 May 2015*.

http://islamicsystem.blogspot.com, *Accessed on 7 May 2015.*

http://www.archive.org, *Accessed on 7 May 2015.*

https://islamicbookslibrary.wordpress.com, *Accessed on 7 May 2015.*

www.jamiat.org. za/al jamiat, *Accessed on, 7 June 2015.*

www.jamiat .com, *Accessed on, 7 June 2015.*

www.markazulmaarif.org, *Accessed on, 22 June 2015.*

www.academia.edu/, *Accessed on 28 July 2015.*

www.Jamiatulamaihind.org, *Accessed on 7 August 2015.*

Subahesadiq.wordpress.com, *Accessed on 30 December 2015.*

https://islamicbookslibrary.wordpress.com, *Accessed on 1 January 2016.*

http://www.nadwi.net/e/introdata.htm, *Accessed on, 9 March 2016.*

www.markazulmaarif.org/, *Accessed on 22 May 2016.*

http://www.asiantribune.com/node/6705, *Accessed on, 11 January 2013.*

E-Books

Bipan Chandra (n.d.), Nationalism and Colonialism in Modern India.http://www.allbookz.com/pdf, Accessed on, 9 March 2016.

Colonel G.B. Malteson, n.d., History of the Indian Mutiny 1857-1859, http://ebookbrowsee.net/ history, Accessed on, 9 March 2016.

Gandhi Mohandas Karamchand, The Non Cooperation Movement, Source Autobiograph-"The Story of my Experiments with truth." Tr. Mahadevan desai, Bostan Beecon press, 1957 print. http://e-bookbrowsee.net/history, Accessed on, 9 March 2016.

Modern India Revoltof 1857 detailed Notes.n.d.http://ebookbrowsee.net/history, Accessed on, April 2016.

Reddy Krishna (1999), Indian History,ed.III,http://e-bookbrowsee.net/history, Accessed on, April 2016.

Role-of-darul-uloom-deoband-in-indias.http://hudaqasmi.blogspot.com/2011/07/ html, Accessed on, April 2016.

Sajiv.V. (n.d.), India- National Movment, http://e-bookbrowsee.net/history, Accessed on, April 2016.

Articles

Ansari N.A. (2012, Sept.13), The Milligazzette (p.01). print issue-16-30.

Barbara D. Metcalf, Re inventing Islamic poltics in Inter-war India: The clergy commitment to Composite Nationalism.

Desai Mufti Ibrahim, Shakh Hussain Ahmed Madani.(p.01).Info.@ almahmood.org.

Engr.Asgar Ali, (Dec-2005), Indian Muslims in India's Freedom Struggle, Secular perspective by Kashif.

Eugen D'souza (n.d.), August 15,1947, From Bondage to Freedom, http://mkgandhi.org.

Farooqui Abdul Malik (1988), Hazrat Shaikhul Islam Aur Dar-ul- uloom Deoband, New Delhi (A paper submitted at Jamia Millia Islamia)

Islahi Zafarul Islam (Nov. 2006), Role of Fatwa in the Freedom movement. The Milligazzette.

M. Raesur Rahman (2009), SouthEast Review of Asian studies. Vol. III. Wake forest Universtity.

Rozina Parveen (1995), Jamiat-Ulama-i-Hind: Its Formation and Organisation, Pakistan Journal of History and Culture. 16: 1-27-37.

Zakaria Mohammad (1994), Al-Etidaal Fi Maraatib ur Rijaal (Islamic politics), New Delhi, Idare Ishaate Diniyat.

পরিশিষ্ট

দারুল উলুম দেওবন্দের পুরাতন ভবন

দারুল উলুম দেওবন্দের বর্তমান ক্যাম্পাসের একাংশ

মসজিদ-ই-রশীদিয়্যা (দারুল উলুম দেওবন্দ)

মসজিদ-ই-রশীদিয়্যার প্রাঙ্গন (সাহান)

ঐতিহাসিক নওদুয়ারার সামনে গবেষক

মাওলানা হুসাইন আহমেদ মাদানীর প্রাক্তন অফিসকক্ষ

দারুল উলুম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের একাংশ

দারুল উলুম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পান্ডুলিপিসমূহের একাংশ

দারুল উলুম দেওবন্দের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে গবেষক

দারুল উলুম দেওবন্দের গ্রন্থাগারিক এবং হাদীস বিভাগে অধ্যয়নরত জনাব গোলাম মুক্তাদিরের সাথে গবেষক